ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালা

বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

বেদান্ত-প্রমাণ-পরিক্রমা

ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি,
প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-স্কলার,
কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যাবাচস্পতি,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য দশ টাকা

উৎসর্গ

ওঁ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

আমার

পরমারাধ্য

পিতৃদেব

স্বর্গীয় অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

পূত চরণকমলে

অকৃতী সন্তান—আশুতোষ

মুখবন্ধ

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ—বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে বেদান্তের প্রমাণ-রহস্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় খণ্ডেই বেদান্তোক্ত বিভিন্ন প্রমাণ, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিব, এবং দুই খণ্ডে আমাদের আরব্ধ বেদান্ত দর্শন সমাপ্ত হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিলাম তাহা হইল না। প্রমাণ-বিচারের জন্যই স্বতন্ত্র এক খণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হইল। প্রমাণ-বিচারের কণ্টকবনে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম, ইহা নিশিত বুদ্ধি-ভেদ্য দুর্গম মহারণ্য। এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন এমন ভাগ্যবান্ অতি অল্পই আছেন। দর্শনের প্রমাণ-রহস্য যেমন গভীর, তেমনই দুর্জ্ঞেয় এবং দর্শন-জিজ্ঞাসুর অবশ্য শিক্ষণীয়ও বটে। প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়ের প্রতিপাদনই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রমাণ না জানিলে প্রমেয় তত্ত্বকে জানিবার উপায় নাই। এইজন্যই ভারতীয় দার্শনিক আচার্য্যগণ তাঁহাদের দর্শনে প্রমাণ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং স্ব স্ব দার্শনিক তত্ত্ব-সিদ্ধির অনুকূল করিয়া বিভিন্ন প্রমাণের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন এক দর্শনের প্রমাণ-বিচারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলেই ঐ সকল প্রমাণ-সম্পর্কে প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণের বক্তব্য কি, তাহা আলোচনা করা এবং তর্কের তুলাদণ্ডে তাঁহাদের যুক্তির বলাবল পরিমাপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা কোন দর্শনের প্রমাণ-বিচারই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কেবল প্রমাণ-বিচার কেন, তত্ত্ব-বিচারের ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডন-মণ্ডনের বন্ধুর পথেই দার্শনিক চিন্তা দুর্ব্বার গতিবেগ এবং সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি লাভ করে। প্রতিপক্ষ দার্শনিক-মতের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করতঃ ঐ মত খণ্ডন করিয়া বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত স্বীয় মত সংস্থাপন করাই দার্শনিকের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বেদান্তের প্রমাণ-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে একদিকে যেমন অদ্বৈত, দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে

হইয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি প্রবল প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণের যুক্তিলহরীরও সম্যক্ আলোচনা করিতে হইয়াছে; এবং কোন্ দর্শনের অভিমতের সহিত অপর কোন্ মতের কতদূর সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহারও পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। ফলে, বেদান্তোক্ত প্রমাণের পর্য্যালোচনাও বিভিন্ন দর্শনের বিরুদ্ধ মতবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া যে দুরতিক্রমণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে গিয়া আমরা কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার দীর্ঘ আট বৎসর পর আজ দ্বিতীয় খণ্ড শ্রদ্ধাশীল পাঠক-পাঠিকার পবিত্র করে উপহার দিতে পারিতেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা সুদীর্ঘকাল এই পুস্তকের অপেক্ষায় থাকিয়া অধীর আগ্রহে আমার নিকট চিঠি-পত্র লিখিয়া পুস্তক-সম্পর্কে খোঁজ খবর লইয়াছেন, আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার দুই বৎসর পরেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। তখন পৃথিবীব্যাপী রণরঙ্গিনীর প্রচণ্ড তাণ্ডব চলিতেছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ শবসঙ্কুল শ্মশানের ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই, জাতির জীবন-মৃত্যুর এইরূপ সন্ধিক্ষণেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি-প্রচারের পবিত্র ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। ছাপিবার কাগজ তখন কেবল দুর্মূল্য নহে, দুষ্প্রাপ্য। এই অবস্থায়ও আমি যখন পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের কার্য্যকরী সমিতির তদানীন্তন সভাপতি, বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারত-সরকারের শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ডি-লিট্, এল্-এল্-ডি, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম্-এল্-এ, মহোদয়ের হস্তে অর্পণ করি, দয়া করিয়া তিনি তখনই এই পুস্তক প্রকাশের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বর্ত্তমান উপাচার্য্য অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, এল্-এল্-ডি, ডি-লিট্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, মহোদয়ও এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার উদ্দেশে আমার হৃদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিগত ইং ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে শ্যামপুকুরে অবস্থিত পুরাণ প্রেসে এই পুস্তকের ছাপা-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং আজ চারি বৎসর পরে পুস্তকখানি লোক-লোচনের গোচরে আসিতেছে ইহাও মন্দের ভাল সন্দেহ নাই। পুস্তক-প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, মহাশয় এবং সহকারী কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, মহোদয় প্রেস-কর্ত্তৃপক্ষকে তাড়াতাড়ি পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া এবং আরও নানাপ্রকার সহায়তা করিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি প্রথিতযশা বহু দার্শনিকের লিখিত বিবিধ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পাঠ করিয়াছি এবং তাহা হইতে যথাসম্ভব সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছি। এইজন্য ঐ সকল সুধী লেখক-গণের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় কর্ত্তৃক অনূদিত এবং ব্যাখ্যাত ন্যায়দর্শন-বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি প্রভৃতি হইতে আমি প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য স্বর্গত মঃ মঃ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার অনাবিল শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত এবং ব্যাখ্যাত জয়ন্তভট্ট-কৃত প্রসিদ্ধ ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থ হইতেও আমি স্থানে স্থানে সাহায্য লইয়াছি। তাহার জন্য শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রমাণ-সম্পর্কে বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখিত বিবিধ প্রবন্ধ হইতেও আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এইজন্য ঐ সকল প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-মীমাংসা প্রভৃতি বিবিধ দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এবং

বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত-মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের অধ্যাপক সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার তর্কতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের সহিত মৌখিক অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। সেইজন্য এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রুফ্-সংশোধনে আমি অপটু। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাগ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও প্রুফ্-সংশোধনে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভুল রহিয়া গেল, তাহার জন্য সুধী পাঠকগোষ্ঠীর ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। যে দুই একটি মারাত্মক ভুল দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, 'ভ্রম-সংশোধনে' তাহা শোধন করিয়া দিলাম।

আমার কন্যাস্থানীয়া ছাত্রী শ্রীমতী বাসনা সেন, এম-এ, কাব্যতীর্থ এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট বা শব্দ-সূচি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেইজন্য শ্রীমতী বাসনাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি। ইতি।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৬ সাল
ইং ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

ভ্রম-সংশোধন

প্রথম পরিচ্ছেদের ৫ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে 'অনধিগত' কথাটি অবাধিত হইবে; ঐ পরিচ্ছেদেরই ৪৬ পৃষ্ঠায় একুশ পংক্তিতে 'ধ্রুব' কথাটি হইবে বোধ।

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

বিষয়-সূচী সমাপ্ত

বেদান্ত দর্শন

অদ্বৈতবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রমা ও প্রমাণ-পরীক্ষা

দর্শন শাস্ত্রের অপর নাম পরীক্ষা-শাস্ত্র। দার্শনিক তত্ত্ব-পরীক্ষা সর্ব্বদাই প্রমাণমূলক; সুতরাং দার্শনিক পরীক্ষার সূচনাতেই প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের স্বরূপ ও শৈলীর আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ বুঝিতে হইলে (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ ও (৩) পরীক্ষা বস্তু-পরীক্ষার এই ত্রিবিধ পদ্ধতি অনুসারেই উহা বুঝিতে হইবে। উদ্দেশ শব্দের অর্থ জ্ঞাতব্য বস্তুর নামোল্লেখ—নামমাত্রেণ বস্তু-সঙ্কীর্ত্তনমুদ্দেশঃ, জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণ-চন্দ্রিকা ১পৃঃ; যে কোন পদার্থেরই স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ উহার নামটি মনে পড়ে; তারপর, ঐ পদার্থের লক্ষণ বা অসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ যেই ধর্ম্মটি সকল লক্ষ্য পদার্থেই বিদ্যমান আছে, অথচ লক্ষ্যবস্তু-ব্যতীত অন্য কোথায়ও যেই ধর্ম্মটি নাই, এইরূপ পরিচায়ক চিহ্ন কি হইতে পারে তাহার আলোচনা চলে; এই ভাবে বস্তুর লক্ষণ নির্ণীত হইলে ঐ লক্ষণটির ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি বিচার করা হয়, ইহারই নাম পরীক্ষা। এই পরীক্ষা যেখানে নির্ভুল হইবে, বস্তুর স্বরূপ আলোচনাও সেখানে নির্দ্দোষ ও নিঃসংশয় হইবে। আলোচ্য রীতিতে প্রমাণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রমাণের একটি নির্দ্দোষ লক্ষণের নিরূপণ ও তাহার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। "প্রমাণ" শব্দের

১। *যুক্তাযুক্ত-চিন্তা পরীক্ষা, প্রমাণ চন্দ্রিকা ১৩১ পৃঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং; নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানমুদ্দেশঃ,* তত্র উদ্দিষ্টস্য অতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্ম্মো লক্ষণম্, লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপদ্যতে নবেতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা।

—ন্যায়দর্শন, বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ১।১।২

ব্যুৎপত্তি কি তাহা দেখিলেই প্রমাণের লক্ষণটি যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বুঝা যাইবে। প্র-পূর্ব্বক "মা" ধাতুর পর করণ-বাচ্যে ল্যুট্ বা অনট্ প্রত্যয় করিয়া "প্রমাণ" শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'মা' ধাতুর অর্থ জ্ঞান; 'প্র' এই উপসর্গটি প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট অর্থ সূচনা করে; ফলে, যাহা প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞান তাহাই "প্রমা" শব্দে বুঝা যায়; আর, যথার্থ জ্ঞানের যাহা সাক্ষাৎ সাধন বা করণ তাহার নাম "প্রমাণ"। অনট্ প্রত্যয়টি করণার্থে বিহিত হওয়ায় প্রমাণ শব্দে এখানে যথার্থ অনুভূতির করণকে পাওয়া গেল; এবং দাঁড়াইল এই যে, "যথার্থ অনুভূতির করণই প্রমাণ", ইহাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। প্রমাণ-রহস্যবিদ্ মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে এবং অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক আচার্য্য রামানুজ তাঁহার সিদ্ধান্তসংগ্রহে, বেঙ্কটনাথ তদীয় ন্যায়-পরিশুদ্ধিতে, দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণ-পদ্ধতিতে এবং শলারি-শেষাচার্য্য তৎকৃত প্রমাণ-চন্দ্রিকা প্রভৃতি প্রমাণ-গ্রন্থে উল্লিখিত রূপেই প্রমাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন।[১]

প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ অনুভূতি কাহাকে বলে? ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান শব্দে সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকার জ্ঞানকেই বুঝায়। এইজন্যই সত্য জ্ঞান বুঝাইতে হইলে ভারতীয় দর্শনে "প্রমা" শব্দের প্রয়োগ করা হয়, আর, যে জ্ঞান সত্য নহে, তাহাকে ভ্রমজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান সত্য ব্যতীত মিথ্যা হইতেই পারে না। মিথ্যা জ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে জ্ঞানই নহে। জ্ঞানের সঙ্গে এই মতে বিশ্বাস (belief) এবং সত্যতার (truth) প্রশ্ন এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে, যেখানে বিশ্বাস বা সত্যতা না থাকিবে, সেখানে জ্ঞানকে জ্ঞানই বলা চলিবে না। পাশ্চাত্য দর্শনের মতে জ্ঞান অর্থই সত্য-জ্ঞান; জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান বা প্রমাজ্ঞান এইরূপ বিশেষভাবে বলা নিতান্তই অর্থহীন; ভ্রমজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান এইরূপ উক্তি তো পাশ্চাত্য

১। তত্র প্রমা-করণং প্রমাণম্। বেদান্তপরিভাষা ৩ পৃষ্ঠা; প্রমা-করণং প্রমাণমিত্যুক্তমাচার্য্যৈঃ, রামানুজ-কৃত সিদ্ধান্তসংগ্রহ, Govt. Oriental MSS, No 4988; ন্যায়পরিশুদ্ধি ৩৫ পৃঃ, প্রমাণ-চন্দ্রিকা ১৩১ পৃঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং, প্রমাণ-পদ্ধতি ৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ ভাব ও ভাষার সমাবেশ মাত্র (positively contradictory)। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে যেখানে জ্ঞেয় বস্তুটি যথাযথভাবে অর্থাৎ যে পদার্থটি বস্তুতঃ যেরূপ, সেইরূপে উহা জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচরে আসিবে, সেইখানেই জ্ঞানকে সত্য বলা যাইবে। তাহা না হইলে (অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাতা প্রকৃত বা যথার্থ রূপে গ্রহণ না করিলে) জ্ঞানকে কোন মতেই সত্য বলা চলিবে না। পথে চলিতে চলিতে পথের উপর পতিত ঝিনুক খণ্ডকে যদি ঝিনুক খণ্ড বলিয়া দেখিতে পাই, তবেই বুঝিব ঐ জ্ঞানটি আমার সত্য বা যথার্থ। আর, ঝিনুক খণ্ডকে যদি রূপার খণ্ড বলিয়া বুঝি, তবে জ্ঞেয় ঝিনুক সেখানে উহার সত্য যে রূপ (ঝিনুক রূপ) সেই যথার্থ রূপে আমার জ্ঞানের গোচর হয় নাই বলিয়া ঐ জ্ঞান হইবে মিথ্যা জ্ঞান;[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞেয় বিষয়ের রূপই জ্ঞানের সত্যতার বা মিথ্যাত্বের মাপকাঠি। জ্ঞানের বিষয়টি অবাধিত হইলে, এবং জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সংবাদ বা সারূপ্য থাকিলেই জ্ঞানকে সেক্ষেত্রে প্রমাজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান বলা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও কোন কোন দার্শনিক এই দৃষ্টিতেই জ্ঞানের সত্যতার বিচার করিয়াছেন। প্রাগ্‌মেটিক্ (Pragmatic) মতবাদে যাঁহারা আস্থাবান্, তাঁহারা কেবল জ্ঞান ও বিষয়ের তুল্যতা বা সারূপ্য দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই ; ঐ জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তু ব্যাবহারিক জীবনে কতখানি কার্য্যকর বা ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া উঁহারা জ্ঞানের সত্যতায় উপনীত হইয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের বৌদ্ধমতের প্রমা বা সত্য জ্ঞানের বিচার-পদ্ধতিকে অনেকাংশে উল্লিখিত পাশ্চাত্য মতবাদের সহিত তুলনা করা চলে।[২] পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে আবার জ্ঞান ও বিষয়ের সংবাদ (harmony or coherence) অথবা অবাধকে (non-contradiction) জ্ঞানের সত্যতার পরিমাপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (See Coherence theory of the western thinkers); কেহ কেহ জ্ঞান ও বিষয়ের

১। যথার্থানুভবঃ প্রমা, যত্র যদস্তি তত্র তস্যানুভবঃ প্রমা, তদ্‌বতি তৎপ্রকারানুভবো বা ; তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষ খণ্ড ৪০১ পৃঃ ;

২। ততঃ অর্থক্রিয়া-সমর্থ বস্তুপ্রদর্শকং সম্যগ্ জ্ঞানম্ ; ন্যায়বিন্দু ১ পৃঃ, যতশ্চ অর্থসিদ্ধিস্তৎ সম্যগ্ জ্ঞানম্, ন্যায়বিন্দু ২ পৃঃ,

সারূপ্য বা তুল্য রূপতার উপরই জোর দিয়াছেন (compare Correspondence theory of the western Realists), আমাদের ভারতীয় নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কেও অনেকাংশে এইরূপ মতেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান ও বিষয়ের সারূপ্য (correspondence) বুঝিতে হইলে hermony বা সংবাদের উপরেই শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে হয়; অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের সংবাদ (hermony) দেখিয়াই উহাদের সারূপ্য (correspondence) অনুমান করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় সারূপ্যবাদকে (correspondence theoryকে) স্বতন্ত্র মতবাদ হিসাবে বিশেষ একটা স্থান দেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।[১] জ্ঞানের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য coherence বা বিষয়ের অবাধের উপরই নিঃসংশয়ে নির্ভর করা চলে। অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনায় দেখা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্তী বিষয়ের অবাধের উপর দাঁড়াইয়াই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রাগ্‌মেটিক্ (Pragmatic)-মতবাদী দার্শনিকগণ জ্ঞানের সত্যতা-সাধনের জন্য যে, জ্ঞেয় বস্তুর ব্যাবহারিক জীবনে কার্য্যকারিতা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, ব্যাবহারিক জীবনে অনেক সময় মিথ্যা বস্তু-বোধ এবং অসত্য দর্শনকেও সত্য, শুভ ফলের জনক হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে চিৎসুখ বলেন যে, কোনও উজ্জ্বল মণির ভাস্বর জ্যোতিঃপুঞ্জকে মণি-ভ্রম করিয়া যদি কোন ভ্রান্তদর্শী মণি আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়, তবে, সে সেখানে মণিটি অবশ্যই পাইবে, এবং ঐ মণির দ্বারা জীবনে অনেক কাজও করিতে পারিবে। এখানে কিন্তু সে মণি দেখিয়া মণি আহরণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই, মণির উজ্জ্বল জ্যোতিকে মণি ভ্রম করিয়া ধাবিত হইয়াছে। ভ্রমই যে এখানে তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ আরও অনেক বিভ্রম দেখা যায়, যাহা ভ্রম হইলেও ব্যাবহারিক জীবনে তাহার কার্য্যকারিতা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। পৃথিবী বস্তুতঃ সচলা হইলেও পৃথিবী অচলা; পৃথিবী ঘোরে না, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষের চিত্তকে অধিকার করিয়া আছে, এবং ঐরূপ মিথ্যা বিশ্বাস-মূলে কত কাজ কত ভাবে মানুষ করিয়া চলিয়াছে। জীবনের

১। চিৎসুখী ২১৮ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং

গতিপথে তাঁহার ঐ মিথ্যা জ্ঞান তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্যই করিয়াছে; জীবনের গতিতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে নাই; সুতরাং কেমন করিয়া বলিবে যে, মিথ্যার কোন প্রকার কার্য্যকারিতা নাই। ফলে, ব্যাবহারিক জীবনে কার্য্যকারিতাই সত্যতার একমাত্র মাপকাঠি এইরূপ মতবাদকে (the modern pragmatic theory of the west) নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না।

অদ্বৈত মতে প্রমা-জ্ঞানের স্বরূপ

এই জন্যই অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, যে-জ্ঞানের বিষয়টি পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না (অবাধিত) এবং যে-জ্ঞানের বিষয়টি পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না (অনধিগত), এইরূপ জ্ঞানই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলিয়া জানিবে—প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্। বেদান্তপরিভাষা ৩ পৃঃ, আলোচ্য লক্ষণের "অনধিগত" বিশেষণটির দ্বারা ভ্রমজ্ঞান যে প্রমা নহে, ইহাই সূচিত হইল। কেন না, রজ্জুতে যে মিথ্যা সর্প-ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহা রজ্জু-জ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হয়; রজ্জুতে সর্প-ভ্রম "অবাধিত" নহে, সুতরাং প্রমাও নহে। প্রমা জ্ঞানকে কেবল "অবাধিত" হইলেই চলিবে না; ঐ জ্ঞান যদি জ্ঞাতাকে কোনও নূতন বস্তুর সহিত পরিচিত করিয়া তাঁহার জ্ঞানের পরিধি বর্দ্ধিত করিতে পারে, তবেই উহা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের পর্য্যায়ে পড়িবে; জ্ঞানের যদি কোনরূপ নূতনতা (novelty) না থাকে, পূর্ব্বে যাহা জানা ছিল, পরবর্ত্তী জ্ঞানোদয়েও যদি তাহাই কেবল জানা যায়, তবে পূর্ব্বের পরিজ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন জ্ঞানকে কোন মতেই "প্রমা" জ্ঞানের মর্য্যাদা দেওয়া চলিবে না। এই জন্যই পূর্ব্বতন সংস্কারের ফলে উৎপন্ন স্মৃতি-জ্ঞান (memory knowledge) এই মতে প্রমাজ্ঞান নহে। স্মৃতি-জ্ঞান কোন নূতন বিষয়ের সহিত জ্ঞাতাকে পরিচিত করে না; কেবল পূর্ব্বতন সংস্কার যেরূপ থাকিবে, তাহাই স্মৃতি-পথে উদিত হইবে; সংস্কারে যাহা নাই, এমন কিছুই স্মৃতি-জ্ঞানে ভাসিবে না। স্মৃতি-জ্ঞান পূর্ব্বতন জ্ঞাত বিষয়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই স্মৃতি-জ্ঞানের স্বভাব। অজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি হয় না, হইতে পারে না। জ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন স্মৃতি-জ্ঞান (memory knowledge) যে প্রমাজ্ঞান নহে ইহা, বুঝাইবার জন্যই প্রমার লক্ষণে "অনধিগত"

স্মৃতি-জ্ঞান প্রমা কিনা, এই সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তের মত।

(বা অজ্ঞাতবিষয়ক) বিশেষণটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেহ কেহ স্মৃতি-জ্ঞানকেও প্রমাজ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করেন, (অর্থাৎ স্মৃতিকে প্রমা-লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়াই ধরিয়া লন)। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্ত-পরিভাষায় এই মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতে প্রমার লক্ষণে "অনধিগত" বিশেষণটিকে বাদ দিয়া, অবাধিত অর্থ বা বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহাই প্রমাজ্ঞান, এইরূপে প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইবে—স্মৃতিসাধারণন্তু অবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্।) বেদান্তপরিভাষা, ৩ পৃঃ ; ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণের ভঙ্গী দেখিয়া ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহার স্মৃতিকে "প্রমা" বলিতেও বিশেষ কিছু আপত্তি নাই ; তবে স্মৃতি যে অনুভব হইতে নিকৃষ্ট স্তরের জ্ঞান, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অনুভূতি হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কারের ফলে স্মৃতি-জ্ঞান উদিত হয়। এইরূপে (অনুভূতি-জাত সংস্কারের ফলে উৎপন্ন) স্মৃতি-জ্ঞান অনুভূতির অধীন এবং অনুভূতির অধীন বলিয়াই স্মৃতি অনুভূতি হইতে নিকৃষ্ট স্তরের জ্ঞান। ঐরূপ জ্ঞানকে অনুভূতির সমপর্য্যায়ে গণনা করা সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। প্রমাজ্ঞানে 'প্র' উপসর্গ-যোগে 'মা' বা জ্ঞানের যে প্রকর্ষতা সূচিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুভূতিই প্রকৃষ্ট জ্ঞান ; স্মৃতি অনুভূতির অধীন বলিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান নহে, অতএব উহা প্রমাও নহে। ইহা বুঝাইবার জন্যই প্রথমে স্মৃতিকে বাদ দিয়াই পরিভাষায় প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। স্মৃতি এবং অনুভূতি এক স্তরের জ্ঞান নহে বলিয়াই বিশ্বনাথ তাঁহার ভাষা-পরিচ্ছেদে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে দুই স্তরে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন—বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি ; বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা, অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাৎ—ভাষা-পরিচ্ছেদ, ৫১ কারিকা। বিশ্বনাথ এই ভাবে অনুভূতি এবং স্মৃতিকে দুই স্তরে বিভাগ করিয়া দেখাইলেও তাঁহার প্রমাজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা *দেখিলে মনে হয় যে, বিশ্বনাথের মতে অবাধিত বিষয় সম্পর্কে যে স্মৃতি হইয়া থাকে, তাহাকে প্রমা বলিতেও তাঁহার কোন আপত্তি নাই।* স্মৃতি জ্ঞাত বিষয়ে উদিত হইয়া থাকে বলিয়া স্মৃতি কখনই প্রমা হইবে না। এই মত বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে। কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক স্মৃতিকে প্রমা বলিয়াই স্বীকার করিয়া

থাকেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কিন্তু স্মৃতিকে প্রমার পর্য্যায়ে গণনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ন্যায়-গুরু উদয়নাচার্য্য তদীয় কুসুমাঞ্জলির চতুর্থ স্তবকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যথার্থ অনুভবই প্রমা; অবাধিত বিষয়ে উৎপন্ন স্মৃতিজ্ঞান যথার্থ হইলেও স্মৃতি অনুভূতি নহে বলিয়া প্রমাও নহে। উদ্দ্যোতকর ন্যায়-বার্ত্তিকে এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তাৎপর্য্য টীকায় স্মৃতি-ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকেই প্রমাজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে স্মৃতি প্রমাই বটে, প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া গ্রহণ করেন না।

স্মৃতি তাঁহাদের মতে যথার্থ হইলেও প্রমা নহে। সাংখ্য. মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনেও স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসক আচার্য্য প্রভাকরও স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ঐ মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। স্মৃতিকে প্রমার পর্য্যায়ে গণনা করিলে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমার করণ যেমন স্বতন্ত্র প্রমাণ হইবে, সেইরূপ স্মৃতিও যখন প্রমা, তখন উহার করণই বা স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? ফলে, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের অতিরিক্ত আর একটি স্বতন্ত্র (স্মৃতির করণের) প্রমাণের প্রশ্ন প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ আপত্তির সমাধান করিতে গিয়া বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন যে, স্মৃতিকে প্রমার মধ্যে গণনা করিলেও তাহার করণ স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ, এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা বিশ্বনাথের অভিপ্রেত নহে; যথার্থ অনুভবের যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ, এইরূপেই বিশ্বনাথ প্রমাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন।[১] ফলে, স্মৃতি প্রমা হইলেও স্মৃতি অনুভব হইতে ভিন্ন স্তরের জ্ঞান বলিয়া স্মৃতির করণকে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা চলে না। স্মৃতিকে প্রমা বলিলে স্মৃতির করণেরও স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার প্রশ্ন আসে দেখিয়াই সম্ভবতঃ উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্মৃতি-ভিন্ন যথার্থ উপলব্ধি প্রমা, এবং ঐ যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাণ, এইরূপে

১। অথৈবং স্মৃতেরপি প্রমাত্বং স্যাত্ততঃ কিমিতি চেৎ তথাসতি তৎকরণস্যাপি প্রমাণান্তরত্বং স্যাদিতি চেন্ন যথার্থানুভব-করণস্যৈব প্রমাণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। মুক্তাবলী, ১৩৫ কারিকা।

প্রমা এবং প্রমাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

স্মৃতি-জ্ঞান প্রমা, কি অপ্রমা, ইহা লইয়া মত-ভেদ কেবল মীমাংসক, নৈয়ায়িক সমাজেই সীমাবদ্ধ নহে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মধ্যেও ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে যে দুই প্রকার মতই প্রচলিত ছিল, তাহা ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের উক্তি হইতে স্পষ্টতঃ আমরা জানিতে পারি। রামানুজোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্ত-মতের প্রমাণ-রহস্যবিদ্ আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তদীয় ন্যায়পরিশুদ্ধিতে বিশিষ্টাদ্বৈত মতেও এ বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন; এবং অবাধিত বিষয়-সম্পর্কে যে স্মৃতি-জ্ঞান উদিত হয়, তাহার প্রামাণ্য স্পষ্ট বাক্যেই বেঙ্কট অঙ্গীকার করিয়াছেন।[১] এইজন্য বেঙ্কট "প্রমার" লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যথার্থ ব্যবহারের অনুকূল যে জ্ঞান, তাহাই প্রমা—

রামানুজ-মতে প্রমাজ্ঞানের স্বরূপ

যথাবস্থিতব্যবহারানুগুণং জ্ঞানং প্রমা, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬ পৃঃ। উল্লিখিত লক্ষণের "জ্ঞান" শব্দ-দ্বারা তাঁহার মতে কেবল অনুভবকে বুঝায় না। স্মৃতি এবং অনুভব এই উভয়বিধ জ্ঞানকেই বুঝায়। এই উদ্দেশ্যেই লক্ষণে "অনুভব" পদটির ব্যবহার না করিয়া "জ্ঞান" পদটির ব্যবহার করা হইয়াছে। ফলে, স্মৃতিও এইমতে প্রমাই হইল। লক্ষণে ব্যবহারের অংশে "যথাবস্থিত" বিশেষণ দেওয়ায় ভ্রমজ্ঞান বা সংশয়কে প্রমা বলা চলিল না। কেন না, ভ্রম ও সংশয় কখনও যথার্থ (যথাবস্থিত) ব্যবহারের অনুকূল হয় না, বরং যথার্থ ব্যবহারের প্রতিকূলই হইয়া থাকে। রামানুজ-সম্প্রদায় প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্যবহারের অনুকূল না হইলে, যথার্থ জ্ঞান হইলেও তাহা প্রমা হইবে না। এই উদ্দেশ্যেই প্রমার লক্ষণে ইঁহাদের মতে "অনুগুণ" পদটির অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কাল, অদৃষ্ট প্রভৃতি বস্তুর সাধারণ কারণগুলি ব্যবহারের অনুকূল হইলেও, জ্ঞান নহে, বলিয়া উহা

১। স্মৃতিমাত্রাপ্রমাণত্বং ন যুক্তমিতি বক্ষ্যতে।
অবাধিতস্মৃতে র্লোকে প্রমাণত্ব-পরিগ্রহাৎ॥

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৮ পৃঃ,

প্রমা নহে। আচার্য্য রামানুজের মতে ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। সমস্ত জ্ঞানই তাঁহার মতে সত্য এবং যথার্থ—যথার্থং সর্ব্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্। শ্রীভাষ্য, ১৯৮ পৃঃ, সাহিত্য পরিষৎ সং; রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী। জ্ঞানে সর্ব্বত্রই তাঁহার মতে সৎ বা সত্যবস্তুরই ভাতি হইয়া থাকে। শুক্তি-রজতে যে মিথ্যা-রজতের বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ রজতও রামানুজের মতে মিথ্যা নহে, উহাও সত্যই বটে। ঐ রজতের সত্যতা উপপাদন করিবার জন্য রামানুজ বস্তুমাত্রেরই মৌলিক তত্ত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বস্তু-তত্ত্বের মূল খুঁজিলে দেখা যায় যে, সমস্ত বস্তুই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ এই ভূতত্রয়ের অথবা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত ভূতত্রয় বা পঞ্চ মহাভূতব্যতীত বস্তুর অন্য কোন মৌলিক উপাদান নাই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই অপরাপর বস্তুর মৌলিক উপাদানও যে অল্লাধিক মাত্রায় বিদ্যমান. আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুক্তিতে যেমন শুক্তির মৌলিক পরমাণু আছে, সেইরূপ শুক্তিতে রজতের পরমাণুও অল্লাধিক আছে, নতুবা শুক্তির সঙ্গে রজতের সাদৃশ্য-বোধের উদয় হয় কেন? উভয়ের ঐরূপ সাদৃশ্য হইতে উহাদের মৌলিক উপাদানও যে অনেক অংশে তুল্য, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। শুক্তিতে শুক্তির মৌলিক পরমাণু বেশী মাত্রায় আছে, রজতের পরমাণু কম মাত্রায় আছে; পক্ষান্তরে, রজতে রজতের পরমাণু অধিক, শুক্তির পরমাণু অপেক্ষাকৃত কম। এইজন্য পরমাণুর আধিক্য-দৃষ্টে শুক্তিকে শুক্তি, রজতকে রজত বলা হইয়া থাকে। শুক্তিকে যখন রজত-রূপে লোকে প্রত্যক্ষ করে, চক্ষুর দোষ বা শুক্তির সত্যদৃষ্টির প্রতিবন্ধক অন্য কোনও দোষবশতঃ সে ক্ষেত্রে শুক্তি-ভাগ বা শুক্তির মৌলিক পরমাণুসমূহ দ্রষ্টার জ্ঞান-গোচর হয় না। শুক্তির মধ্যে যে অল্পমাত্রায় রজতের পরমাণু আছে, তাহাই রজতদর্শীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং রজত পাইবার আশায় রজতার্থী তাহার প্রতি ধাবিতও হয়। রামানুজের মতে শুক্তি-রজতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে রজতেই (রজতের পরমাণুসমূহেই) রজতের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ জ্ঞান রামানুজের দৃষ্টিতে রজতে রজতের প্রত্যক্ষের ন্যায়ই যথার্থ বা সত্য।[১] পার্থক্য শুধু এই যে, শুক্তি-রজতের রজত ব্যবহারে লাগে না,

১। রামানুজ-ভাষ্য, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা, সাহিত্যপরিষৎ সং;

তাহার দ্বারা গহনা প্রস্তুত করা চলে না; রজতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা-দ্বারা ব্যবহার চলে। শুক্তি-রজতের রজত রামানুজের মতে মৌলিক ভাবে যথার্থ হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে উহাকে সত্য বলা চলে না। এই জন্যই রামানুজ-সম্প্রদায় (সৎখ্যাতিবাদী হইলেও) সত্য ও মিথ্যার সর্ব্ব-সম্মত পার্থক্য উপপাদন করার উদ্দেশ্যেই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া ব্যবহারের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। সত্য ও মিথ্যা বস্তুর বা জ্ঞানের পার্থক্য স্বীকার না করিলে ব্যাবহারিক জীবন যে অচল হইয়া পড়িবে, ইহা কোন সুধী দার্শনিকই অস্বীকার করিতে পারেন না। বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধির টীকাকার আচার্য্য শ্রীনিবাস যথার্থই বলিয়াছেন যে, সুধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার-দৃষ্টেই সাধারণতঃ সত্য-মিথ্যা, প্রমাণ-অপ্রমাণ সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।[১] অপরিপক্ক ঐ সাধারণ জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হইয়া বিশেষ জ্ঞান আহরণ করিবার জন্যই তত্ত্বশাস্ত্রের সেবা এবং দার্শনিক পরীক্ষা আবশ্যক। যদি প্রমাণ-অপ্রমাণ-ব্যবহার বা সত্য-মিথ্যার সর্ব্ববাদি-সম্মত পার্থক্য তুমি (প্রতিবাদী রামানুজ) না মান, তবে তোমার না মানার অনুকূলে কি যুক্তি আছে, তাহা বলা প্রয়োজন। তুমি বলিতে পার যে, (i) সমস্তই অসত্য বা অপ্রমাণ, সত্য বলিয়া কিছুই নাই, (ii) অথবা সমস্তই হয়তো সত্য এবং প্রমাণ-সিদ্ধ, অসত্য বলিয়া কিছুই নাই, (iii) তৃতীয়তঃ সমস্তই পরস্পর-বিরুদ্ধ (iv) কিংবা সমস্তই সন্দেহ-সঙ্কুল; সুতরাং প্রমাণ-অপ্রমাণ বা সত্য-মিথ্যা বলিয়া কিছুই বলা যায় না। উল্লিখিত চার প্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, সমস্তই যদি অসত্য বা অপ্রমাণ হয়, তবে প্রতিবাদী সমস্ত বস্তুর অপ্রামাণ্য-সিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞা-বাক্য এবং যুক্তিজালের অবতারণা করিবেন তাহাও তো অসত্যই হইবে (যেহেতু সমস্তই অসত্য, ঐ অসত্য প্রতিজ্ঞা-বাক্য বা তর্কজালের দ্বারা প্রতিবাদী তাঁহার স্বপক্ষ কোন মতেই সাধন করিতে পারিবেন না। ফলে, সমস্তই অসত্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞা (thesis) কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে, যদি সমস্তই সত্য এবং প্রমাণ-সিদ্ধ হয়, তবে "সমস্তই সত্য"

১। অপ্রতিরোধো লৌকিক-পরীক্ষক-ব্যবহার এব প্রমাণাপ্রমাণ-ব্যবস্থা-সাধকঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি-টীকা, ৩১ পৃঃ,

তোমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য নহে। এইরূপ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ উক্তিকেও সত্যই বলিতে হইবে, ফলে, পরস্পর বিরোধই আসিয়া পড়িবে। সমস্তই পরস্পর-বিরুদ্ধ, এইরূপ কথারও কোন মূল্য দেওয়া চলে না। সত্য বটে, মিথ্যা বা অপ্রমাণ, সত্য বা প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয়, কিন্তু যাহা সত্য এবং প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহা কস্মিন্ কালেও মিথ্যা-দ্বারা বাধিত হয় না। দুইটি সত্য প্রতিজ্ঞাও একে অন্যের বাধক হয় না। তারপর, সমস্তই সন্দিগ্ধ এইরূপ সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন। কেননা, সমস্তই যদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে তোমার "সর্ব্বং সন্দিগ্ধম্" এই প্রতিজ্ঞাও সন্দিগ্ধ। এইরূপ সন্দিগ্ধ প্রতিজ্ঞা-মূলে কোন তথ্যই নির্ণয় করা চলে না। আর এক কথা, তুমি প্রতিবাদী যে সমস্তই সন্দেহ করিতেছ, এই ক্ষেত্রে তুমি তোমার নিজেকে অথবা তুমি যে সন্দেহ করিতেছ, এই সন্দেহ করাকেও সন্দেহ করিতেছ কি? তাহা তুমি নিশ্চয়ই কর না। সমস্তই সন্দিগ্ধ, এই বিষয়ে তোমার নিশ্চিতই ধারণা আছে। ফলে, তোমার "সর্ব্বং সন্দিগ্ধম্" এই প্রতিজ্ঞাই সিদ্ধ হয় না।[১] ব্যাবহারিক জীবনে আলোক-অন্ধকারের মত সর্ব্বত্র সত্য-মিথ্যার খেলা চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক ভাবে সত্য-মিথ্যা, প্রমা ও অপ্রমার সামান্য জ্ঞান থাকিলেও সত্য ও মিথ্যার যথার্থ স্বরূপটি যে কি, সে বিষয়ে সংশয় অবশ্যম্ভাবী; এবং ঐ সংশয় অপনোদনের জন্য সত্য-মিথ্যার, প্রমা এবং অপ্রমার যথার্থ স্বরূপের আলোচনা দার্শনিক তত্ত্ব-পরীক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ। সৎখ্যাতিবাদী রামানুজ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেই তাঁহার দর্শনে সত্য-মিথ্যার এবং প্রমা-অপ্রমার তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

মাধ্বমতে প্রমার স্বরূপ

দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্য্যের মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, যথার্থ জ্ঞানই প্রমা বা সত্যজ্ঞান—যথার্থজ্ঞানং প্রমা, প্রমাণ-পদ্ধতি ৯ পৃঃ, প্রমাণ-চন্দ্রিকা, ১৩২ পৃষ্ঠা, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সং; জ্ঞানমাত্রই প্রমা বা সত্য নহে; যে-জ্ঞানের অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুটি যে-রূপ, সেইরূপেই যদি উহা জ্ঞানের গোচর হয়, তবে সেই জ্ঞান যথার্থ এবং প্রমা হইবে। জ্ঞানকে "যথার্থ" শব্দের দ্বারা এইরূপে বিশেষ করিয়া বলায় সংশয় এবং ভ্রম যে প্রমা হইবে না, তাহা

১। বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি ও ন্যায়পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-কৃত টীকা, ৩২-৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

স্পষ্টতঃ বুঝা গেল। প্রমাণ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়তীর্থ বলেন যে, যাহার ফলে জ্ঞেয় বস্তুটি উহার যথার্থ যে-রূপ, সেই রূপেই জ্ঞানে ভাসে, তাহাই প্রমাণ—যথার্থং প্রমাণম্। প্রমাণ-পদ্ধতি ৭ পৃঃ; আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, জ্ঞেয় বস্তুটি বস্তুতঃ যে-রূপ সেইরূপেই যে-ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বস্তুটি জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানই প্রমা এবং সত্যজ্ঞান; এবং ঐ জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ বলিয়া জানিবে,—যথাবস্থিত-জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বং প্রমাণত্বম্। প্রমাণ-চন্দ্রিকা ১৩১ পৃষ্ঠা, ফল কথা, অবাধিত অর্থ বা জ্ঞেয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রমা বা সত্যজ্ঞান এবং উহার করণই প্রমাণ। যাহা কোনও জ্ঞেয় বস্তুকে বিষয় করে, তাহাকেই প্রমাণ বলিলে, সংশয় এবং ভ্রম-জ্ঞানও কোন না কোন জ্ঞেয় বস্তুকে বিষয় করিয়া উদিত হইয়া থাকে বলিয়া সংশয় এবং ভ্রমও প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই জ্ঞেয় অংশে আলোচ্য লক্ষণে "যথাবস্থিত" (যে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যে-রূপ সেইরূপ) বা অবাধিত বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সংশয়-স্থলে সন্দিগ্ধ বস্তুটির স্বরূপ ও স্বভাব-সম্পর্কে কোনরূপ অবধারণ বা নিশ্চয় না থাকায়, ভ্রম-স্থলে এক বস্তু অন্য বস্তু-রূপে (শুক্তি রজত-রূপে) প্রতীয়মান হওয়ায় সংশয় কিংবা ভ্রম-জ্ঞানের জ্ঞেয়কে "যথাবস্থিত" (বা অবাধিত) জ্ঞেয় বলা চলে না। দ্বৈতবেদান্তের মতে প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার (১) কেবল-প্রমাণ এবং (২) অনুপ্রমাণ; যে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই, সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানকেই মাধ্ব-বেদান্তের পরিভাষায় "কেবলপ্রমাণ" বলা হইয়া থাকে (self-contained, absolute knowing)। এই "কেবল-প্রমাণ" এই মতে চার প্রকার (১) ঈশ্বরের জ্ঞান, (২) লক্ষ্মীর জ্ঞান, (৩) যোগী মহাপুরুষের জ্ঞান এবং (৪) অযোগী জনসাধারণের জ্ঞান। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ বস্তু-সম্পর্কে যে স্বাধীন, সুস্পষ্ট, নিত্য জ্ঞান আছে, ঐরূপ জ্ঞান "ঈশ্বরের জ্ঞান" বলিয়া জানিবে। তত্র সর্ব্বার্থবিষয়কমীশ্বরজ্ঞানং নিয়মেন যথার্থমনাদি নিত্যং স্বতন্ত্রং নিরতিশয়স্পষ্টঞ্চ; প্রমাণ-পদ্ধতি, ১৬ পৃঃ, একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানই স্বতন্ত্র, ঈশ্বরব্যতীত অন্য সকলের জ্ঞানই (লক্ষ্মীর জ্ঞান প্রভৃতি) ঈশ্বর-পরতন্ত্র বা ঈশ্বরের অধীন। যে-জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানের ন্যায়ই সর্ব্ববিষয়ে বাধা-রহিত, অনাদি, নিত্য হইলেও ঈশ্বরের জ্ঞানের অধীন,

ঈশ্বরের জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সুস্পষ্ট ও স্বাধীন নহে, উহা "লক্ষ্মীর জ্ঞান" বলিয়া পরিচিত। এই জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্টস্তরের জ্ঞান। ব্রহ্মাদি দেবগণের জ্ঞান, ঈশ্বরের জ্ঞান এবং লক্ষ্মীর জ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানের অধীন, অতএব ব্রহ্মাদির জ্ঞান যে লক্ষ্মীর জ্ঞান হইতেও নিম্নস্তরের জ্ঞান, ইহা নিঃসন্দেহ। (৩) যোগী মহাপুরুষ যোগ-শক্তির প্রভাবে যে নির্ম্মল সর্ব্বাতিশায়ী জ্ঞান লাভ করেন, তাহাই "যোগি-জ্ঞান"। এই "যোগি-জ্ঞান" আবার তিন প্রকার (ক) ঋজু যোগি-জ্ঞান, (খ) তাত্ত্বিক যোগি-জ্ঞান (গ) এবং অতাত্ত্বিক যোগিজ্ঞান। যে সকল জীব (Individual) যোগ-সাধনের ফলে ব্রহ্ম-দর্শনের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদিগকে ঋজুযোগী বলা হইয়া থাকে—ঋজবো নাম ব্রহ্মত্বযোগ্যা জীবাঃ। প্রমাণ-পদ্ধতি, ১৬ পৃঃ, উঁহাদের নির্ম্মল, নিষ্কলুষ জ্ঞান ঋজুযোগি-জ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানের অভিমান যাঁহাদের আছে ঐরূপ অভিমানী যোগীর ঈশ্বরব্যতীত অপর সকল বিষয়ে যে সুস্পষ্ট জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই "তাত্ত্বিক যোগি-জ্ঞান"; যে সকল যোগীর জ্ঞান পরিমিত এবং অপরিপক্ক, ঐরূপ অল্পজ্ঞ যোগীর জ্ঞান "অতাত্ত্বিক যোগি-জ্ঞান" বলিয়া জানিবে। যোগী ভিন্ন সকল জীবই অযোগী। অযোগীর পরিমিত, আবিল জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভের কোন আশা নাই। ঈশ্বর-সম্পর্কে অযোগিগণের কখনও কোনরূপ জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায় না। অযোগীও মাধ্ব-মতে তিন শ্রেণীর দেখা যায় (১) মুক্তি-যোগ্য, (২) নিত্যসংসারী এবং (৩) তমোযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে মুক্তি-যোগ্য অযোগীর জ্ঞান নিত্যসংসারী কিংবা তমোযোগ্য অযোগীর জ্ঞানের তুলনায় সত্যও বটে, অনেকটা পরিপক্কও বটে; ফলে, মুক্তি-যোগ্য অযোগীর উন্নততর যোগি-পর্য্যায়ে পৌঁছিবার এবং তত্ত্বদৃষ্টি-লাভের যে সুদূর সম্ভাবনা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যাঁহারা সংসার-বদ্ধ জীব তাঁহারাই নিত্যসংসারী বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা অজ্ঞানী হইলেও "তমোযোগ্য" অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের তুলনায় নিত্য-সংসারী জীব কতকটা যে উন্নত স্তরের ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কেননা, সংসারী জীবের মনে কখনও কখনও ধর্ম্মভাব এবং উচ্চ চিন্তার উদয় হইতেও দেখা যায়। ঐরূপ ভাবের উদয় সংসারী জীবের আবিল চিত্তে একান্তই ক্ষণস্থায়ী

বলিয়া উন্নত ভাব-ধারা তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর রেখা-পাত করে না; সুতরাং সংসারে বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত সংসারী জীবের নিশ্চিত শ্রেয়ঃ লাভের আশা দুরাশা। বাহ্য জাগতিক বস্তু-সম্পর্কে উক্ত ত্রিবিধ অযোগীর জ্ঞানই কখনও সত্য, কখনও বা মিথ্যা হইতে দেখা যায়। উঁহাদের জ্ঞান যখন নির্দোষ প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম প্রমাণ-মূলে উদিত হয়, তখন ঐ জ্ঞান হয় সত্য, আর, তাহা না হইলে জ্ঞান হয় মিথ্যা। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণকে মাধ্ব-বেদান্তের পরিভাষায় "অনুপ্রমাণ" বলা হইয়া থাকে। কেবল-প্রমাণ এবং অনুপ্রমাণ এই দ্বিবিধ প্রমাণই দ্বৈতবেদান্তীর মতের আলোচিত প্রমাণ-লক্ষণের লক্ষ্য। এই দ্বিবিধ লক্ষ্যে প্রমাণ-লক্ষণের সঙ্গতি-প্রদর্শনের জন্য জয়তীর্থ বলেন যে, আলোচিত প্রমাণ-লক্ষণের "জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বম্" কথাটির দ্বারা যাহা জ্ঞেয় বস্তুকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয় করে, সেই ঈশ্বর, যোগী, অযোগী প্রভৃতির যথার্থ জ্ঞানকে এবং যথার্থ জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিকে, এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে।[১] প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি জ্ঞানের কারণগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞেয় বস্তুকে বিষয় করে না; (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা জ্ঞেয় বস্তুকে বিষয় করে, সেই প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের কারণ বলিয়া গণ্য হইলেও, প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি প্রমা বা সত্যজ্ঞানের মুখ্য সাধন (করণ) নহে,) এইজন্য প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতিকে প্রমাণের মধ্যে গণ্য করা চলে না।[২]

স্মৃতি প্রমাণ হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়তীর্থ বলেন যে, সত্য বস্তু-সম্পর্কে যে স্মৃতি হইয়া থাকে, তাহা দ্বৈতবেদান্তীর মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির ন্যায় অন্যতম প্রমাণই বটে। কেন-না, যে-বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যে-রূপ, সেই রূপেই যাহা জ্ঞেয় বস্তুটিকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই প্রমাণ - যথাবস্থিত-জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বং প্রমাণত্বম্, এইরূপ প্রমাণের লক্ষণটিকে, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির ন্যায় সত্য স্মৃতি-স্থলেও

১। জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বঞ্চ সাক্ষাদ্ বা সাক্ষাজ্‌জ্ঞেয়বিষয়ীকারি-সাধনত্বেন বা বিবক্ষিতমিতি নানুপ্রমাণেষ্বব্যাপ্তিঃ। জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণ-পদ্ধতি. ৮ পৃষ্ঠা,

২। জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বেনৈব প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োর্ব্যবচ্ছেদঃ। তয়োঃ সাক্ষাজ্‌-জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বাভাবাৎ। সাক্ষাজ্‌জ্ঞেয়বিষয়ীকারি-কারণত্বেঽপি তৎসাধনত্বা-ভাবাচ্চ। প্রমাণ-পদ্ধতি, ৯ পৃষ্ঠা,

প্রয়োগ করার পক্ষে তো কোন বাধা দেখা যায় না। প্রমাণ তাহা হইলে মাধ্ব-মতে দাঁড়াইতেছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এবং স্মৃতি—এই চারি প্রকার।[১] স্মৃতি যে অন্যতম প্রমাণ, তাহা জৈন দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রমাণকে যে (অগৃহীত-গ্রাহী বা) পূর্ব্বের অজ্ঞাত বিষয়-সম্পর্কেই উদিত হইতে হইবে, স্মৃতি সর্ব্বদা পূর্ব্বের পরিজ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া স্মৃতিকে প্রমা বা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা চলিবে না, অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের এই মত বৈশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তী বেঙ্কটনাথ এবং দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থ প্রভৃতি কেহই অনুমোদন করেন নাই। যাহা পূর্ব্বের অজানা বিষয়কে জানাইয়া দেয়, তাহাই প্রমা বা প্রমাণ হইবে, এইরূপ ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মত পণ্ডিত রামাদ্বয়ও তাঁহার বেদান্ত-কৌমুদীতে গ্রহণ করেন নাই। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, যাহা অজানা বিষয়কে জানাইয়া দেয়, তাহাই যদি প্রমা বা সত্যজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়, তবে একই বস্তু-সম্পর্কে যখন পুনঃ পুনঃ (ধারাবাহিক ভাবে) জ্ঞানোদয় হইতে থাকে, তখন ঐ জ্ঞান-ধারার প্রথম জ্ঞানটি জ্ঞাতাকে পূর্ব্বের অজ্ঞাত কোনও নূতন বস্তুর সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেও পরবর্ত্তী জ্ঞান-গুলিতো স্মৃতি-জ্ঞানের ন্যায় প্রথম জ্ঞানের পরিজ্ঞাত বিষয়টিকেই বার বার জানাইয়া দেয়, পূর্ব্বের অজানা কোন বিষয় জানায় না; এই অবস্থায় ঐ সকল জ্ঞান প্রমা বা সত্যজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয় কিরূপে? ঐ সকল জ্ঞান যে প্রমা-জ্ঞান তাহাতে তো কোন দার্শনিকেরই কোন আপত্তি নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, ঐরূপ জ্ঞান যদি প্রমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে স্মৃতি-জ্ঞানই বা প্রমা হইবে না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতানুসারে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণে যে "অনধিগত" বিশেষণটির প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ঐ বিশেষণ-বলে প্রমা-জ্ঞান অজ্ঞাত

১। নমু যথাবস্থিত-জ্ঞেয়বিষয়ীকারিত্বং প্রমাণ-লক্ষণ মিতি যদুক্তং তদনুপপন্নং, স্মৃতাবতিব্যাপ্তেরিতিচেন্ন,

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণমিতি বিজ্ঞেয়ং ধর্ম্মাদ্যর্থে মুমুক্ষুভিঃ॥

ইতি শ্রুত্যাদেঃ স্মৃতি-প্রমাণস্য সিদ্ধত্বাৎ। প্রমাণ-চন্দ্রিকা, ১৩৪ পৃঃ,

বিষয়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যেই জাতীয় জ্ঞান অধিগত বা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্‌ভিন্ন জ্ঞানই "অনধিগত" জ্ঞান বলিয়া জানিবে, এবং ঐরূপ জ্ঞানই প্রমা বা সত্য জ্ঞান। স্মৃতি সর্ব্বদাই পূর্ব্বানুভবজাত সংস্কারের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন সংস্কার না থাকিলে স্মৃতি কোন মতেই উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্মৃতির ইহাই স্বভাব বা অপরিহার্য্য নিয়ম যে, উহা অধিগত বা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জ্ঞাত না হইয়া কোন বস্তুরই স্মৃতি উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের স্থলে কিন্তু ঐরূপ নিয়ম বলা চলে না। একই বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ-স্থলে প্রত্যক্ষের ধারার মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পরবর্ত্তী প্রত্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বের পরিজ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন হইলেও প্রথম প্রত্যক্ষটি তো পূর্ব্বের কোনও জ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন হইয়াছে বলা চলে না। উহাতো অজ্ঞাত নূতন বস্তুর সহিতই জ্ঞাতাকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া বলা যায় যে, স্মৃতির যেমন জ্ঞাত-বিষয়ে উৎপন্ন হওয়াই স্বভাব, প্রত্যক্ষেরও সেইরূপ জ্ঞাত-বিষয়ে উদিত হওয়াই স্বভাব। এইরূপে স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির মধ্যে যে একটা মৌলিক ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিতে হইবে এবং ঐ মৌলিক ভেদ-দৃষ্টির সাহায্যেই স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের পার্থক্য স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে, প্রতিপক্ষের সকল রকম আপত্তিরও সমাধান করা চলিবে। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে প্রমা-লক্ষণের "অনধিগত" বিশেষণটির অন্তরালে যে "অধিগত" শব্দটি আছে, তাহাদ্বারা স্মৃতি-জ্ঞানের স্বভাবটিই সূচিত হইয়া থাকে। অধিগত বা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়া উৎপন্ন হওয়াই যে জাতীয় জ্ঞানের স্বভাব, সেই জাতীয় (স্মৃতি) জ্ঞানই এখানে "অধিগত" শব্দ দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। জ্ঞানের স্বভাব-হিসাবে বিচার করিলে স্মৃতি-জ্ঞান সম্পর্কেই কেবল ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রথম প্রত্যক্ষটি যে অজ্ঞাত বিষয়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। ফলে, স্মৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়া উৎপন্ন হওয়াই স্বভাব, ইহা বলা চলে না; এবং একমাত্র স্মৃতি-জ্ঞানই যে লক্ষণস্থ "অধিগত" শব্দের লক্ষ্য, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। স্মৃতি-জ্ঞান ভিন্ন অন্য জাতীয় জ্ঞানই "অনধিগত" শব্দে বুঝায়।

"অনধিগত" শব্দের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার ফলে, একই বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ বা ধারাবাহিক জ্ঞানও প্রমা-জ্ঞানই হইল, ধারাবাহিক জ্ঞানে প্রমা-লক্ষণের অব্যাপ্তির আপত্তি চলিল না। প্রবীণ মীমাংসক আচার্য্য প্রভাকরও এই দৃষ্টিতেই স্মৃতির প্রমাত্বের দাবী খণ্ডন করিয়া ধারাবাহিক প্রত্যক্ষের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষকেই প্রমা বা যথার্থজ্ঞান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ন্যায়-মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, ধারাবাহিক জ্ঞানে (একই বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ-স্থলে) প্রমা-লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা অপরিহার্য্য বুঝিয়াই কোন কোন নৈয়ায়িক প্রমাকে যে পূর্ব্বের অজ্ঞাত পদার্থের বোধক হইতে হইবে, এ-রূপ প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করিতে প্রস্তুত নহেন।[১] নব্য-নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বনাথ প্রভৃতি যাঁহারা স্মৃতিকে প্রমা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে প্রমাকে অজ্ঞাত পদার্থের বোধক বলা কোন মতেই চলে না। উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। স্মৃতি-ভিন্ন যথার্থ-জ্ঞানকে প্রমা আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রাচীন-মতে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ গৃহীত-গ্রাহী বা জ্ঞাত পদার্থের বোধক হইলেও উহা অপ্রমা নহে। কারণ, প্রমাকে যে অগৃহীত-গ্রাহী অর্থাৎ অজ্ঞাত পদার্থের বোধক হইতে হইবে, এইরূপ কোন মত প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ অনুমোদন করেন না। আলোচ্য প্রাচীন-ন্যায়ের পথ অনুসরণ করিয়া প্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে প্রমা-জ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রমাকে যে অজ্ঞাত বস্তুরই বোধক হইতে হইবে, পূর্ব্বের জ্ঞাত কোন বস্তুকে বুঝাইলে, সেই জ্ঞান যে প্রমা হইবে না, এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি অগৃহীত-গ্রাহীর ন্যায় গৃহীত-গ্রাহী ধারাবাহিক প্রত্যক্ষও যে প্রমাই হইবে, ইহাই বিচারপূর্ব্বক সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রমা পূর্ব্বের অজ্ঞাত কোন বিষয়-সম্পর্কেই উৎপন্ন হউক, কি পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয়-সম্পর্কেই উৎপন্ন হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। প্রমা যে-ক্ষেত্রে জ্ঞাতাকে পূর্ব্বের পরিচিত বিষয়টিকে জানাইয়া দেয়, সেখানে ঐ

১। অব্যাপ্তেরধিকব্যাপ্তেরলক্ষণমপূর্ব্বদৃক্।
যথার্থানুভবোমানমনপেক্ষতয়েষ্যতে॥
উদয়ন-কৃত কুসুমাঞ্জলি, ৪।১,

প্রমা-জ্ঞান জ্ঞাতাকে কোনরূপ নূতন বিষয়ের সন্ধান দেয় না বলিয়া জ্ঞানের কার্য্য সে-স্থলে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হয়, এইরূপ আপত্তির জয়ন্তের মতে কোন মূল্য নাই। উগ্র বিষধর কাল সাপ গলায় দোলাইয়া যদি কোন ব্যক্তি কখনও সম্মুখে উপস্থিত হয়, কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বিশালকায় বাঘ বা সিংহ যদি হঠাৎ কাহারও সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তবে যতক্ষণ উহা সম্মুখে থাকিবে, ততক্ষণ সমানভাবেই দর্শকের চিত্তে ভীতির সঞ্চার করিবে। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার যতবার দেখিবে, ততবার একই প্রকারের গাত্র-কম্প, আড়ষ্টতা প্রভৃতি উপস্থিত হইবে। চন্দ্র, চন্দন-সার, পুষ্প-হার, সুদর্শনা কামিনী প্রভৃতি রমণীয় বস্তু দর্শকের সম্মুখীন হইলে ঐ সকল প্রীতিপ্রদ বস্তু যতবার দর্শক দেখিবেন, ততবারই ঐ সকল বস্তু দেখিয়া তাঁহার চিত্ত সমানভাবে আনন্দরসে অভিষিক্ত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমবারের দেখা অগৃহীত-গ্রাহী, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারের দেখা গৃহীত-গ্রাহী বা জ্ঞাত-বিষয়ক বলিয়া ভয়ের বা আনন্দের স্বরূপের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুধী দর্শক নিজের হাতখানি শতবার দেখিলেও ঐ দেখার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাইবেন না। এই অবস্থায় অগৃহীত-গ্রাহীর ন্যায় গৃহীত-গ্রাহী প্রত্যক্ষও যে প্রমাই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? জয়ন্ত ভট্টের মতে যেই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়টি পরবর্ত্তী অন্য কোনও জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, ঐরূপ জ্ঞানই প্রমা-জ্ঞান; যে-জ্ঞানের বিষয় বাধিত হয়, সেই শ্রেণীর জ্ঞান অপ্রমা বা ভ্রম-জ্ঞান। অগৃহীত-গ্রাহী প্রত্যক্ষের ন্যায় গৃহীত-গ্রাহী ধারাবাহিক প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুও কখনও বাধিত হয় না; সুতরাং অগৃহীত-গ্রাহীর ন্যায় গৃহীত-গ্রাহী ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও প্রমাই বটে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায় আলোচিত মতের সমর্থনে বলিয়াছেন যে, প্রথমবারের প্রত্যক্ষও যেরূপ-ভাবে দৃশ্য বিষয়কে প্রকাশ করে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারের প্রত্যক্ষও সেইরূপ ভাবেই জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবাধিত দৃশ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষকে প্রমা বা সত্য-জ্ঞান বলিতে বাধা কি? এখন প্রশ্ন এই যে, অগৃহীত-গ্রাহী বা পূর্ব্বের অজ্ঞাত বস্তু-সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞান যেমন প্রমা, জ্ঞাত বিষয়-সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞানও যদি সেইরূপ প্রমাই হয়; এই উভয় প্রকার জ্ঞানের মধ্যে যদি

কোনরূপ প্রভেদ না থাকে, তবে জ্ঞাত-বিষয়ে উৎপন্ন স্মৃতি-জ্ঞান জয়ন্ত ভট্টের মতে গৃহীত-গ্রাহী প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ন্যায় প্রমা-জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয় না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে, তাঁহার মতে স্মৃতি গৃহীত-গ্রাহী বা জ্ঞাত-বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া যে স্মৃতি অপ্রমা হয়, তাহা নহে। স্মৃতিকে যে অপ্রমা বলা হয় তাহার কারণ জয়ন্তের মতে এই যে, যে-বিষয়টির যখন স্মরণ হয়, ঐ স্মৃত বিষয় স্মৃতির সময় স্মরণ-কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত থাকে না। যে-বিষয়ের স্মৃতি হয় ঐ বিষয়টি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে উহাকে আর স্মৃতি বলা চলে না, উহা হয় তখন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। অনুপস্থিত স্মৃত বিষয়টিকে স্মৃতি-উৎপত্তির কারণও বলা চলে না। কেননা, স্মৃতির প্রতি একমাত্র দৃশ্য বিষয়ের পূর্ব্বতন সংস্কারই কারণ। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি স্থলে প্রত্যক্ষের বিষয় দৃশ্যবস্তুও যে প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ হইবে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমি মাঠের উপর ঐ যে ঘোড়াটিকে চরিতে দেখিতেছি আমার এই ঘোড়া-দেখায় ঘোড়াটিও যে কারণ, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেননা, ঘোড়া মাঠে না থাকিলে আমি দেখিতাম কি? কিন্তু আমার বাড়ীর ঘোড়াটির কথা আমি যখন স্মরণ করি, এই স্মরণে ঘোড়ার পূর্ব্বতন সংস্কারই আমার স্মৃতি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট; অনুপস্থিত ঘোড়াকে স্মৃতির কারণের মধ্যে গণনা করিতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই প্রস্তুত নহেন। এইজন্যই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানকে "অর্থ-জন্য" এবং স্মৃতিকে "অনর্থজ" (অর্থ-জন্য নহে) বলা হইয়া থাকে—অর্থজং প্রত্যক্ষমনর্থজা স্মৃতিঃ। যাহা অর্থ বা বিষয়-জন্য নহে, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় যে জ্ঞানের কারণ বলিয়া গণ্য হয় না, এইরূপ জ্ঞান জয়ন্ত ভট্টের মতে প্রমা নহে। এই যুক্তিতেই জয়ন্ত ভট্ট স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। স্মৃতি গৃহীত-গ্রাহী অর্থাৎ সর্ব্বদাই জ্ঞাত বিষয়েই উদিত হইয়া থাকে বলিয়া তিনি স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডন করেন নাই। ভাল কথা, স্মৃতির বিষয়বস্তু স্মরণকারীর সম্মুখে উপস্থিত থাকে না, এইজন্য স্মৃতি যদি অপ্রমা হয়, তবে, অনুপস্থিত বিষয়-সম্পর্কে যে অনুমানের উদয় হয়, ঐ অনুমানও স্মৃতির ন্যায় অপ্রমা হইবে কি? এইরূপ আপত্তির উত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে, মৃত্যুর পরে পিতামাতার নশ্বর দেহকে শ্মশানের ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইতে দেখিয়াও ভাগ্যহীন পুত্র-কন্যা পিতা-মাতার কল্যাণময়ী

মূর্ত্তিকে অনেক সময়ই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। এ-ক্ষেত্রে ভস্ম-রাশিতে পরিণত পিতামাতার মূর্ত্তি অসত্য বস্তু। ঐরূপ অসত্য বস্তু-সম্পর্কেও স্মৃতি-জ্ঞানের উদয় হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। স্মৃতিকে সম্পূর্ণ বিষয়-নিরপেক্ষভাবেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্মৃত বস্তু থাক, বা না থাক, স্মৃতির তাহাতে কিছু আসে যায় না। স্মরণের প্রতি বিষয়টি আদৌ কারণ নহে, সেই বিষয়ের সংস্কারই মাত্র কারণ। এই দৃষ্টিতেই জয়ন্ত ভট্ট স্মৃতিকে "অর্থ-জন্য নহে" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতীত বা ভাবী বস্তুর অনুমানকে স্মৃতির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিষয়-নিরপেক্ষ বলা চলে না। কারণ, অনুমানের যাহা সাধ্য (পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে বহ্নি সাধ্য, আর, পর্ব্বত হয় পক্ষ,) তাহা অতীতই হউক, কি ভবিষ্যৎই হউক, অনুমানের যাহা পক্ষ, (অনুমানের সাহায্যে যেখানে সাধ্যটি সাধন করা হয়, সেই সাধ্য বহ্নির আধার পর্ব্বত প্রভৃতিকে পক্ষ বলে) তাহা অনুমানকারী ব্যক্তির সম্মুখে অবশ্যই উপস্থিত থাকিবে। অনুমানের পক্ষটিকে "ধর্ম্মী" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সাধ্যটিকে বলে পক্ষের ধর্ম্ম ; ঐ সাধ্য-ধর্ম্মের ধর্ম্মীতে বা পক্ষে অনুমান হইয়া থাকে। নির্ধর্ম্মক বা সাধ্যশূন্য অনুমান কখনও হয় না, হইতে পারে না। নদীতে হঠাৎ জল-বৃদ্ধি দেখিয়া নদীর মোহনায় কোনও স্থানে অতীত বৃষ্টির অনুমান করা যায়। এখানে নদী আলোচ্য অনুমানের পক্ষ বা ধর্ম্মী, অনুমান-কর্ত্তা হঠাৎ নদীর জল-বৃদ্ধি দেখিয়া বর্ষণ-জনিত জল-প্রবাহের সহিত নদীর সম্বন্ধবশতঃ নদীর মোহনায় কোথায়ও বৃষ্টির অনুমান করিয়া থাকেন। এ-ক্ষেত্রে বৃষ্টি অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমানের ধর্ম্মী বা পক্ষ নদী তো প্রত্যক্ষই বটে, এবং উহা অনুমানের অন্যতম কারণও বটে। পক্ষও ধর্ম্মি-রূপে অনুমানের বিষয় এবং কারণ হইয়া থাকে। কেননা, ধর্ম্মী পক্ষকে বাদ দিয়া তো অনুমান করা চলে না। পক্ষে সাধ্য-ধর্ম্মের সাধনই তো অনুমান। এই অবস্থায় অতীত বা ভাবী বিষয়-সম্পর্কে যে অনুমান-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, সেই অনুমানকে স্মৃতির ন্যায় সম্পূর্ণ বিষয়-নিরপেক্ষ বা অর্থ-জন্য নহে, এরূপ বলা চলে কি? কোনও অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন শব্দ করিলে ঐ শব্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও জয়ন্ত ভট্টের মতে অর্থ-জন্যই বটে। জয়ন্ত এইরূপে অতীত-বিষয়ক অনুমান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতিও যে অর্থ-জন্য তাহা নানারূপ যুক্তি-

তর্কের সাহায্যে উপপাদন করিয়া স্মৃতি এবং অনুমান প্রভৃতির মধ্যে মৌলিক ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রমা-জ্ঞানকে যে অজ্ঞাত-বস্তুর বোধক বা অগৃহীত-গ্রাহী হইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন।[১]

আলোচিত জয়ন্তের সিদ্ধান্ত অনেকাংশে তাঁহার উদ্‌ভাবিত এবং অভিনব বলিয়া মনে হয়। কারণ, নব্য-ন্যায়ের আকর তত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গঙ্গেশ উপাধ্যায়প্রমুখ ন্যায়াচার্য্যগণ কেহই ভাবী বা অতীত বস্তুর অনুমান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতিকে অর্থ-জন্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। একমাত্র প্রত্যক্ষই উঁহাদের মতে অর্থ বা বিষয়-জন্য; অন্য কোনও প্রকার জ্ঞান বিষয়-জন্য নহে। প্রত্যক্ষের মধ্যেও লৌকিক বা স্থূল প্রত্যক্ষকেই অর্থ-জন্য বলা যাইতে পারে। যোগীদিগের অদ্ভূত যোগশক্তি-প্রভাবে অতীত ও অনাগত বস্তু-সম্পর্কে যে অলৌকিক বা যৌগিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ঐ সকল অলৌকিক প্রত্যক্ষকে বস্তুতঃ অর্থ-জন্য বলা চলে না। তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ-খণ্ডে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের বিচার-প্রসঙ্গে মথুরানাথ তর্কবাগীশ দেখাইয়াছেন যে, কাহারও কাহারও মতে লৌকিক এবং অলৌকিক সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষই যে বিষয়-জন্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, কেবল অলৌকিক বিষয় লইয়া কোন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই উদয় হইতে দেখা যায় না। সকল প্রকার প্রত্যক্ষের মূলেই কোন-না-কোন লৌকিক বিষয় অন্তর্নিহিত থাকে। ফলে, সকল প্রত্যক্ষই যে বিষয়-জন্য হইবে, তাহা কে না স্বীকার করিবে?[২] অলৌকিক প্রত্যক্ষও যেহেতু প্রত্যক্ষ, সুতরাং উহাও যে, বিষয়-জন্য যে সকল স্থূল লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেই প্রত্যক্ষ জাতীয়ই বটে, তাহা তো কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে অলৌকিক প্রত্যক্ষকেও বিষয়-জন্য বা বিষয়-জন্য-জাতীয় বিধায় প্রমা-লক্ষণের লক্ষ্য বলিতে আপত্তি কি? গঙ্গেশ

১। তস্মাদনর্থজত্বেন স্মৃতি-প্রামাণ্য-বারণাৎ।
অগৃহীতার্থ-গন্তৃত্বং ন প্রমাণ-বিশেষণম্॥
ন্যায়মঞ্জরী, ২১ পৃঃ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ,

২। নচৈবং সর্ব্বাংশে অলৌকিকপ্রত্যক্ষস্য বিষয়াজন্যত্বাত্তত্রাব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং তস্যাপ্যান্যাংশে লৌকিকত্বে বাধকাভাবেন বিষয়-জন্যত্বাৎ প্রত্যক্ষমাত্রস্যৈব যৎকিঞ্চিদ্‌বিষয়াংশে লৌকিকত্ব-নিয়মাৎ। তত্ত্বচিন্তামণি, সন্নিকর্ষবাদ-রহস্য, ৫৫১ পৃঃ,

উপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ-লক্ষণের আলোচনায় দেখা যায় যে, গঙ্গেশ উপাধ্যায় একমাত্র লৌকিক প্রত্যক্ষকেই বিষয়-জন্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞানকে তিনি বিষয়-জন্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।[১] এই অবস্থায় জয়ন্ত ভট্টের মত গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য-নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতের প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়। স্মৃতি প্রমা হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গেশ জয়ন্ত ভট্ট হইতে ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া স্মৃতি যে প্রমা হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। গঙ্গেশের মতে স্মৃতিমাত্রই ভ্রম বা অপ্রমা। অবাধিত বিষয়-সম্পর্কে যে স্মৃতি-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেও গঙ্গেশের মতে প্রমা বা সত্য বলা চলে না। কারণ, স্মৃতি-জ্ঞানের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যদিও অতীত, পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুরই স্মৃতি হইয়া থাকে, তবু ঐ স্মৃত বস্তু বর্ত্তমান বস্তুর মতই স্মৃতিতে ভাসে, অতীত বস্তুর মত ভাসে না, ইহাই স্মৃতির স্বভাব। অতীত কোনও বস্তু যখন পরবর্ত্তী কালে স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তখন সেই অতীত কালও থাকে না, স্মৃত বস্তুর আকার, রূপ, রস, প্রভৃতিরও নানারূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন হইয়া যায়। এই অবস্থায় অতীত বিষয়কে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রকাশ করায় স্মৃতি যে বস্তুতঃ বিষয় অংশে ভ্রম হইবে, তাহা কিরূপে অস্বীকার করা যায়? দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতি সংস্কারের ফল। সংস্কারে যাহা আছে, তাহাই কেবল স্মৃতিতে ভাসিবে, যাহা সংস্কারে নাই, তাহা কোনমতেই স্মৃতিতে ভাসিতে পারে না। সংস্কার অনুভবেরই শেষ ফল। অনুভূতি যেই প্রকারের হইবে, সংস্কার এবং স্মৃতিও তদনুরূপই হইবে। এই দৃষ্টিতে স্মৃতি এবং অনুভব সমান-বিষয়ক হইলেও উহাদের আকারের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। স্মৃতির আকার (Form) "সেই গরু" "সেই ঘোড়াটি" এইরূপ; আর, অনুভবের আকার (Form) "এই গরুটি" "এই ঘোড়াটি" এই প্রকার হইয়া থাকে। স্মৃতি-স্থলে সংস্কারই স্মৃতির আকারের "সেই" অংশটুকু আনাইয়া দেয় বটে, কিন্তু "সেই" অংশটুকু স্মৃতির বিষয় হয় না। "সেই" অংশটুকু স্মৃতির বিষয় না হইলেও স্মৃতিতে সংস্কারের অত্যধিক

১। যদ্বা বিষয়ত্বেন স্ববিশেষ্যজন্যংজ্ঞানং জন্যপ্রত্যক্ষম্। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ঐ পংক্তির ব্যাখ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ বলিয়াছেন—বিশেষ্যপদং বিষয়মাত্রপরং স্বপদঞ্চানাদেয়ম্। তথাচ বিষয়ত্বেন বিষয়জং জ্ঞানং লৌকিকপ্রত্যক্ষম্। তত্ত্বচিন্তামণি, *প্রথম খণ্ড, সন্নিকর্ষবাদ-রহস্য,* ৫৫১ পৃঃ,

প্রভাববশতঃ স্মৃতির পরিচয় দিতে হইলেই "সেই" অংশের উল্লেখ করিয়াই দিতে হয়। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের স্বরূপ-বিচার করিলেও দেখা যায় যে, সেখানেও "এই গরুটি", "এই ঘোড়াটি" এইরূপে "ইদম্" অংশের দ্বারাই প্রত্যক্ষের পরিচয় দেওয়া হয়। ঐ "ইদম্" অংশটুকু মুখ্যতঃ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, কেবল স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষের প্রভেদ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এখন এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, স্মৃতির "সেই" অংশটুকু অনুভবের বিষয় হয় না বলিয়া স্মরণেরও উহা বিষয় হইতে পারে না। কেননা, অননুভূত বিষয়ের স্মরণ কস্মিন্‌কালেও হয় না, হইতে পারে না। অনুভব-জাত সংস্কারই স্মৃতিকে রূপ দিয়া থাকে। স্মরণমাত্রই সংস্কারের অধীন। স্মরণ সংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া "সেই" অংশটুকু গ্রহণ করায়, স্মরণমাত্রই যে অপ্রমা বা ভ্রম হইবে, তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন কি? তারপর, "সেই" অংশটুকু দ্বারা স্মৃতির পরিচয় দেওয়ায় বর্ত্তমান-কালীন স্মরণ অতীত-কালীন রূপে ("সেই"রূপে) প্রকাশ পাওয়ায় বিষয়াংশের ন্যায় কালাংশ লইয়াও স্মৃতি যে অপ্রমা হইবে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। উল্লিখিত যুক্তি-বলেই গঙ্গেশ স্মৃতি-জ্ঞান যে প্রমা হইতে পারে না, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্মৃতি অর্থ-জন্য নহে, সুতরাং তাহা প্রমা নহে, এইরূপ জয়ন্তের মতের, কিংবা গৃহীত-গ্রাহী বা জ্ঞাত-পদার্থের বোধক হইয়া থাকে বলিয়া স্মৃতি প্রমা-জ্ঞানের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না, প্রমাকে অগৃহীত-গ্রাহী বা অজ্ঞাত-পদার্থের বোধক হইতে হইবে, এইরূপ কোন সিদ্ধান্তের কোন মূল্য আছে বলিয়া গঙ্গেশ মনে করেন না।

অদ্বৈতবেদান্তের প্রমার স্বরূপের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে এবং পাতঞ্জল ও সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্তে "অনধিগত" বা পূর্ব্বের অজ্ঞাত বস্তু-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, সেই অগৃহীত-গ্রাহী জ্ঞানই প্রমা বা সত্যজ্ঞান, গৃহীত-গ্রাহী বা পূর্ব্বের জ্ঞাত বস্তু-সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞান প্রমা নহে, উহা অপ্রমা। ফলে, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের কিংবা পাতঞ্জল, সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতির মতে গৃহীত-গ্রাহী স্মৃতি-জ্ঞান "প্রমা" হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই যে, স্মৃতি গৃহীত-গ্রাহী বলিয়া যদি প্রমা না হয়, তবে গৃহীত-গ্রাহী (অধিগত বা জ্ঞাতবিষয়ে উৎপন্ন) প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানই বা প্রমা-জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয় কিরূপে? পূর্ব্বে জ্ঞাত না হইয়াতো

প্রত্যভিজ্ঞান হইতেই পারে না ; সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা কখনই অগৃহীত-গ্রাহী বা অনধিগত-বিষয়ক হয় না, উহা চিরদিনই অধিগত বা জ্ঞাত বিষয়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন যে, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, স্মৃতি যেমন কেবল সংস্কার-জন্য, এবং যাহা সংস্কারে ভাসে, স্মৃতিতেও তাহাই আসে ; সংস্কারে যাহা নাই, তাহা স্মৃতিতে কোন মতেই আসিতে পারে না। সংস্কারের যাহা বিষয় হয়, স্মৃতিরও তাহাই বিষয় হয়। সংস্কারের বিষয় কোন অংশেই স্মৃতির বিষয় হইতে ন্যূন হইতে পারিবে না, ইহাই স্মৃতির স্বভাব। প্রত্যভিজ্ঞা কিন্তু সংস্কার-জন্য হইলেও স্মৃতির ন্যায় কেবল সংস্কার-জন্য নহে ; এবং সংস্কারের যাহা বিষয় হয়, প্রত্যভিজ্ঞার তাহাই মাত্র বিষয় নহে। প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় সংস্কারের বিষয় হইতে ন্যূন নহে, অধিক। "এই সেই গরুটি" সোঽয়ং গৌঃ, ইহা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের (Re-representative judgment) আকার। ইহাতে প্রত্যভিজ্ঞার তিনটি অংশ সূচিত হইয়া থাকে। একটি অংশ ধর্ম্মী, অপর দুইটি অংশ, তদ্ এবং ইদম্ অংশ, ধর্ম্ম। "তদ্" শব্দ ও "ইদম্" শব্দ-দ্বারা ধর্ম্মী গরুটির অতীত ও বর্ত্তমান-কালীন অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছে। "সেই গরু" এই অংশটুকু স্মৃতির অংশ, এবং উহা একমাত্র সংস্কার-জন্য। প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের ফলে ধর্ম্মী গরুটির যে বর্ত্তমান-কালীন অস্তিত্ব বুঝাইয়া থাকে, ইহা-দ্বারাই প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য সাব্যস্ত হয়। ধর্ম্মী গরুর এই বর্ত্তমান-কালীন অস্তিত্ব-বোধই স্মৃতি হইতে প্রত্যভিজ্ঞার অধিক বিষয়। ধর্ম্মী গরুটির বর্ত্তমান-কালীন অস্তিত্ব সংস্কারের বিষয় হয় না। এই অবস্থায় প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইতে সংস্কারের বিষয় যে ন্যূন, এবং সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় যে অধিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মরাজা-ধ্বরীন্দ্রের মতে প্রমার লক্ষণে যে "অনধিগত" বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানের বিষয় এবং সংস্কারের বিষয় যখন তুল্য হইবে, অর্থাৎ সংস্কারের বিষয় যখন জ্ঞানের বিষয় হইতে কোন অংশে ন্যূন হইবে না, তখনই সেই জ্ঞানকে "অধিগত" জ্ঞান বলিয়া জানিবে, তদ্ভিন্ন জ্ঞানই "অনধিগত" জ্ঞান এবং প্রমা-জ্ঞান।[১] "অনধিগত"

১। অনধিগতপদেন স্বসমানবিষয়কসংস্কারাজন্যত্বং বিবক্ষিতম্ স্বসমানবিষয়ত্বং স্বান্যূনবিষয়ত্বম। শিখামণি, ৩৫ পৃষ্ঠা,

বিশেষণটির এইরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার ফলে স্মৃতির বিষয় এবং সংস্কারের বিষয় সর্ব্বাংশে তুল্য হওয়ায় একমাত্র স্মৃতি-জ্ঞানই অপ্রমা হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান সংস্কারের যাহা বিষয়, তাহা হইতে অতিরিক্ত "ইদম্" রূপে সম্মুখস্থ বিষয়েরও প্রকাশক হইয়া থাকে। এইজন্য সংস্কারের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে ন্যূন হইয়া পড়ে। প্রত্যভিজ্ঞা-স্থলে জ্ঞানের বিষয় ও সংস্কারের বিষয়ের স্মৃতি-জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বাংশে তুল্যতা না থাকায় 'অধিগত' জ্ঞান বলিয়া কেবল স্মৃতি-জ্ঞানকেই ধরা গেল, প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান 'অধিগত' জ্ঞান হইল না, 'অনধিগত' জ্ঞানই হইল এবং প্রমাও হইল। অনুমান-জ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য সংস্কারের ফলে উৎপন্ন হইলেও সংস্কারের বিষয় এবং জ্ঞানের বিষয় সর্ব্বাংশে তুল্য না হওয়ায়, (অনুমান-জ্ঞানের বিষয় সংস্কারের বিষয় হইতে অধিক হওয়ায়) অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানও প্রমাই হইল। (ঐ সকল জ্ঞানে প্রমা-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না)। ব্যাবহারিক সত্য বস্তু-সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তীর যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা অবিদ্যা-সংস্কারের ফলে উৎপন্ন হইলেও সে-ক্ষেত্রেও সংস্কারের বিষয় এবং জ্ঞানের বিষয় তুল্য নহে, জ্ঞানের বিষয় সংস্কারের বিষয় হইতে অধিক। এইজন্য ব্যাবহারিক ঘটাদির জ্ঞান অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রমাই হইবে।[১]

ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের আলোচিত "অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বং প্রমাত্বম্," এইরূপ প্রমার লক্ষণে 'জ্ঞান' পদটি কেন দেওয়া হইল, ইহা যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, "জ্ঞান" পদটি লক্ষণে না দিলে চক্ষুপ্রমুখ ইন্দ্রিয়বর্গ, এবং পূর্ব্বে দৃষ্ট সত্য বস্তুর সংস্কার প্রভৃতিও অনধিগত এবং অবাধিত অর্থ বা বস্তুকে বিষয় করে বলিয়া ঐ সকল স্থলে প্রমা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষণস্থ জ্ঞানশব্দে ভাববাচ্যে ল্যুট্ বা অনট্ প্রত্যয় করায় "জ্ঞান" বলিতে এখানে একমাত্র জ্ঞান বা জ্ঞপ্তিকেই বুঝাইবে, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানের সাধনকে বুঝাইবে না এবং উহা প্রমাও হইবে না। লক্ষণোক্ত "অর্থ" পদটি জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে ; "বিষয়" পদটির দ্বারা জ্ঞান ও অর্থের তুল্যরূপতা সূচিত হইয়া থাকে। ফলে, অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎপদার্থের সহিত

১। ব্রহ্মব্যতিরিক্তঘটাদিসকলপ্রমায়াঃ সংস্কারজন্যত্বেঽপি তস্যা ভিন্নবিষয়ত্বান্না-ব্যাপ্তিঃ। শিখামণি, ৩০ পৃষ্ঠা,

সত্য জ্ঞানের তুল্যতা না থাকায় ঐ সকল আকাশকুসুম প্রভৃতি অসত্য বস্তু যে প্রমা-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম প্রমাণবিদ্ আচার্য্য রামাদ্বয় পণ্ডিত তাঁহার রচিত বেদান্তকৌমুদীতে প্রমা-জ্ঞানের যে লক্ষণ ও স্বরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, রামাদ্বয় ন্যায়-চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন; এবং ধারাবাহিক জ্ঞানে (অর্থাৎ একই বস্তুর বারংবার প্রত্যক্ষে) প্রমা-লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াই রামাদ্বয় অনধিগত, বা পূর্ব্বের অজ্ঞাত জ্ঞানকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করেন নাই—অজ্ঞাত-জ্ঞাপনং প্রমাণমিতি তদসারম্। বেদান্তকৌমুদী, পুথী ১৮ পৃঃ, রামাদ্বয়ের মতে যথার্থ অনুভবই প্রমা—যথার্থানুভবঃ প্রমা। যেখানে যে বস্তু প্রকৃতই আছে, সেখানে সেই বস্তুর বোধই যথার্থ অনুভব এবং ঐরূপ অনুভবই প্রমা বা সত্য-জ্ঞান। (যদ্‌যত্রাস্তি তত্র তস্যানুভবঃ প্রমা—তত্ত্ব-চিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড, ৪০১ পৃঃ,) অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অদ্বৈতবেদান্তী কোন মতেই ঐরূপ প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করিতে পারেন না। কেননা, অদ্বৈতবেদান্তের মতে ঝিনুক-খণ্ডে যেখানে রজতের ভ্রম জন্মে, সেখানেও অবিদ্যা-প্রভাবে অনির্ব্বচনীয় অভিনব রজতেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলে, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে যাহা ভ্রম, সে-ক্ষেত্রেও যে বস্তু আছে, সেই বস্তুরই বোধ হইয়া থাকে বলিয়া রামাদ্বয়ের দৃষ্টিতে তাহাও প্রমাই হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রমার স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া প্রমাকে বিষয়ের দিক্ হইতে বিচার না করিয়া জ্ঞান ও জ্ঞাতার দিক্ হইতে বিচার করিয়াছেন। রামাদ্বয়ের ন্যায় জ্ঞেয় বিষয়ের যথার্থতা এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সারূপ্যের (Correspondence) প্রতি অত্যধিক মনোযোগ না দিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র পূর্ব্বের অনবগতি ও বাধাভাবকে প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া প্রমার নিরূপণে জ্ঞাতার প্রাধান্যই বজায় রাখিয়াছেন। কেননা, পূর্ব্বের অনবগতি, বাধাভাব প্রভৃতির জ্ঞাতার নিকটই স্ফুরণ হইয়া থাকে। যে-জ্ঞানের বিষয় বাধিত হইবে অর্থাৎ যে-সকল বিষয় আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে কার্য্যকর হইবে না, উহাই মিথ্যা বলিয়া জানিবে। শুক্তি-রজতে অবিদ্যাবশতঃ অভিনব রজতের উৎপত্তি হইলেও ঐ রজত ব্যাবহারিক সত্য রজতের ন্যায় অলঙ্কার

নির্ম্মাণের পক্ষে উপযোগী হইবে না। শুক্তি-রজতের ব্যাবহারিক জীবনে কোন উপযোগিতা নাই, সুতরাং শুক্তি-রজত বাধিত বা মিথ্যা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রমাণের স্বরূপ-নিরূপণ

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করা গেল। প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ, প্রমা-করণং প্রমাণম্। বেদান্ত-পরিভাষা, ১৬ পৃঃ, প্রমার করণ বলিলে আমরা এখানে কি বুঝিব তাহার বিচার করা যাইতেছে। মহর্ষি পাণিনির সূত্রে দেখা যায় যে, কারণগুলির মধ্যে যে কারণটিকে সাধকতম, বা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তাহাকেই 'করণ' বলা হইয়া থাকে—সাধকতমং করণম্। পাঃ সূঃ। প্রসিদ্ধ কোষ-রচয়িতা অমরসিংহের মতেও, করণং সাধকতমম্,—যে কারণটি সাধকতম বা মুখ্য কারণ তাহাই 'করণ' বলিয়া জানিবে। এইরূপে করণ শব্দের অর্থ বিচার করায় পাওয়া গেল যে, প্রমার কারণমাত্রকেই প্রমাণ বলা চলিবে না। প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি প্রমার কারণ বটে, কিন্তু উহা শ্রেষ্ঠ কারণ বা করণ নহে, সুতরাং প্রমাণও নহে। কারণের এই শ্রেষ্ঠতা কি ভাবে বুঝা যাইবে? কারণগুলির মধ্যে কোনটিকে সাধকতম বলিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যেই কারণের "ব্যাপারের" (function) পরই কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কারণের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ কারণ বা "করণ" আখ্যা লাভ করে। আমার চক্ষুও আছে, টেবিলের উপর বইখানিও আছে, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত বইখানির সংযোগ না ঘটিবে, সেই পর্য্যন্ত বইখানি আমি দেখিতে পাইব না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত বইখানির সংযোগ হইলেই বইখানি আমার দৃষ্টি-গোচর হইবে। এ-ক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বইখানির সহিত সংযোগই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের "ব্যাপার" বা কার্য্য। ব্যাপার কাহাকে বলে? করণবস্তুটি কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ঐ কার্য্য-সিদ্ধির অনুকূল অপর যে একটি কার্য্যকে অপেক্ষা করে, সেই মধ্যবর্ত্তী কার্য্যটির নামই "ব্যাপার"। বইখানির প্রত্যক্ষের অনুকূল বইখানির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে সংযোগ, তাহাই এ-ক্ষেত্রে "ব্যাপার"। চক্ষুরিন্দ্রিয় এই ব্যাপারকে দ্বার করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষের জনক হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষের সকল কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ, সাধকতম বা করণ বলিয়া অভিহিত করা হয়; এবং "চক্ষুষা পশ্যতি," চক্ষু শব্দের পর করণ কারকে তৃতীয়া

বিভক্তিরও প্রয়োগ করা হয়, "চক্ষুর দ্বারায় দেখিতেছি" এইরূপ ব্যবহারও চলে। ইহাই করণ-সম্পর্কে নব্য ন্যায়ের সিদ্ধান্ত। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে যাহা স্বয়ং ব্যাপারশালী তাহাই করণ; ব্যাপার-হীন পদার্থ এইমতে করণ হইতে পারে না। চক্ষুর দৃশ্য বস্তুর সহিত সংযোগরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষের সর্ব্ব শেষ (চরম) কারণ হইলেও ঐ ব্যাপার স্বয়ং ব্যাপারহীন বিধায় চক্ষুর সংযোগকে করণ বা সাধকতম বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, সংযোগকে দ্বার করিয়া চক্ষুঃ প্রভৃতিকেই "করণ" বলা হইয়া থাকে। বেদান্তপরিভাষার টীকাকার রামকৃষ্ণাধ্বরির মতও এ-বিষয়ে আলোচিত নব্য ন্যায়-মতের অনুরূপ। তিনি বলেন যে, যাহা ব্যাপারযুক্ত এবং অসাধারণ কারণ, তাহাই করণ বলিয়া জানিবে—অসাধারণকারণত্বে সতি ব্যাপারবত্ত্বং করণত্বম্, শিখামণি টীকা, ১৬ পৃষ্ঠা, জ্ঞানমাত্রই মনের ব্যাপারের ফল। মনঃ ক্রিয়াশীল না হইলে কখনও কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। মনঃ জ্ঞানমাত্রের প্রতিই সাধারণ কারণ, অসাধারণ কারণ নহে; সুতরাং মনঃ কোন জ্ঞানেরই করণ নহে, অন্যতম কারণমাত্র। ইন্দ্রিয়েয় সংযোগ প্রভৃতি কার্য্য বা ব্যাপার প্রত্যক্ষাদির অসাধারণ কারণ হইলেও ঐ ব্যাপার ব্যাপারশূন্য বলিয়া ঐ ইন্দ্রিয়-সংযোগরূপ ব্যাপারও প্রত্যক্ষের করণ হইবে না। ঐ ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই করণ হইবে। বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন যে, দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুর সংযোগ ঘটিবামাত্রই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায়। কাঠের সহিত কুঠারের সংযোগ না হইলে কুঠার কোন মতেই কাঠ ছেদন করিতে পারে না; কুঠারের সহিত কাঠের সংযোগ ঘটিলেই কাঠের ছেদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারকেই চরম কারণ বা করণ বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ঐ মুখ্য করণ বা ব্যাপারকে দ্বার করিয়া যে সকল চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাৎজনক হইয়া থাকে, তাহাও প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণের মতে করণই বটে। নতুবা, তাঁহাদের মতে "চক্ষুষা পশ্যতি" প্রভৃতি স্থলে চক্ষুঃ শব্দের পর করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা সম্ভব হয় কিরূপে? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং ঐ ইন্দ্রিয়-ব্যাপার ইন্দ্রিয়-সংযোগ প্রভৃতি, এই দুইই এই মতে প্রত্যক্ষাদির করণ; তবে, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষের চরম কারণ নহে বলিয়া উহা অপেক্ষাকৃত গৌণ করণ। প্রত্যক্ষের চরম কারণ ইন্দ্রিয়-সংযোগ প্রভৃতিই মুখ্য করণ। ফলকথা,

প্রাচীনগণের মতে যাহার অব্যবহিত পরেই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, তাহাই মুখ্য করণ। চক্ষুর সংযোগের পরক্ষণেই প্রত্যক্ষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া চক্ষুর সংযোগরূপ প্রত্যক্ষের ব্যাপারই মুখ্য করণ; আর, সংযোগকে দ্বার করিয়া প্রত্যক্ষ জন্মায় বলিয়া চক্ষু হয় অপ্রধান করণ। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও আলোচ্য চরম কারণ ব্যাপারকেই করণ এবং সাধকতম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি অপ্রধান করণই নব্য-মতে প্রধান করণ বা "সাধকতম" আখ্যা লাভ করিয়াছে। বৈয়াকরণগণও প্রাচীন নৈয়ায়িকের অপ্রধান করণকেই সাধকতম বলিয়া গ্রহণ করিয়া করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। বৈয়াকরণের মতে ইহাও দেখা যায় যে, করণ-কল্পনা বক্তার ইচ্ছাধীন। বক্তা ইচ্ছা করিলে কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ প্রভৃতি যে কোন কারককেই করণ বা "সাধকতম" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন; এবং করণে তৃতীয়ার প্রয়োগও করিতে পারেন। ফলে, বৈয়াকরণও করণের গৌণ-মুখ্য-ভেদ স্বীকার করেন, ইহা না মানিয়া পারা যায় না। বস্তুতঃ কারণবর্গের মধ্যে কোন একটি কারণকেই অসাধারণ কারণ বা সাধকতম বলা চলে না। অবস্থা-বিশেষে কর্ম্ম, কর্ত্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারণও অপরাপর কারণের তুলনায় প্রধান এবং অসাধারণ হইয়া দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে বলিয়াছেন যে, মনে কর অমানিশার সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক ঘিরিয়া আছে, আকাশে মেঘের উপর মেঘ জমিয়াছে, বিজলী চমকিতেছে, মুষলধারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পাত হইতেছে। প্রকৃতির এরূপ দুর্য্যোগপূর্ণ রজনীতে কোনও পথিক ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চারিদিকের গভীর অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টি-পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বিভ্রান্ত পথিক যদি বিজলীর আলোকে তাঁহার সম্মুখে পথের মধ্যে কোন মহিলাকে দেখিতে পায়, তখন পথিকের ঐ রমণী-দর্শনে তুমি কোন্ কারণটিকে প্রধান বলিয়া মনে করিবে? বিদ্যুতের আলোককে, পথিকের চক্ষু দুইটিকে, না ঐ দৃশ্যমান মহিলাটিকে? তুমি হয় তো বলিবে যে, চারিদিকের জমাট অন্ধকারের গাঢ় আবরণের মধ্যে বিদ্যুতের আলোক-রেখা না ফুটিলে কোনমতেই মহিলাটিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইত না, সুতরাং বিদ্যুতের আলোককেই মহিলাটিকে দর্শন করার পক্ষে অসাধারণ কারণ বা করণ বলিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি বলিব যে, বিদ্যুৎই থাকুক, পথিকই থাকুক,

কিংবা পথিকের চক্ষুদ্বয়ই থাকুক, যদি মহিলাটি ঐ সময়ে ঐ স্থানে না আসিত, তবে সহস্র বিদ্যুৎ, পথিক বা পথিকের নেত্রদ্বয় তাঁহাকে কিছুতেই দেখিতে পাইত না; সুতরাং উল্লিখিত রমণী-দর্শনে আমার মতে বিদ্যুৎ প্রভৃতির অপেক্ষাও রমণীই বিশেষ সাহায্যকারিণী হইয়াছে। সেই রমণী এক্ষেত্রে দৃশ্য হইলেও তাঁহাকেই এই প্রত্যক্ষের অপরাপর কারণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। রমণীটি এখানে দর্শনের কর্ম্ম হইলেও কর্ম্ম-কারকই এখানে করণের স্থান লাভ করিয়াছে। বিদ্যুতের আলোক যাহা তোমার মতে সাধকতম বা করণ, তাহা এ-ক্ষেত্রে আমার মতে কর্ম্মের তুলনায় গৌণ কারণ।[১] এইরূপ দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যে-সকল কারকগুলি মিলিয়া কার্য্যটি সম্পাদন করিতেছে, সেই সকল কারকের মধ্যে কোন্‌টি যে প্রধান কারণ, আর কোনটি যে অপ্রধান কারণ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। কেননা, স্থলবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে অপ্রধান কারণও প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, আবার প্রধানও অপ্রধান হইয়া পড়ে। এইজন্যই জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে, একটি কারণ হইতে তো কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। অনেকগুলি কারণ মিলিতভাবে কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। মিলিত কারণগুলির মধ্যে কোন একটিকে প্রধান বলা, অপরাপর কারণকে অপ্রধান বলার কোনই অর্থ হয় না। কারণ-সমষ্টি উপস্থিত থাকিলে কার্য্যোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী দেখা যায়। কারণগুলির মধ্যে কোন একটি কারণ উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থায় কোন একটি কারণকে কার্য্যসিদ্ধির বিশেষ সহায় বা সাধকতম কল্পনা করার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, মিলিতভাবে সকল কারণগুলিকে কার্য্যোৎপত্তির করণ বা সাধন বলাই যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়।[২] মহামতি

১। অবিরলজলধরধারাপ্রবন্ধবদ্ধান্ধকারনিবহে বহুলনিশীথে সহসৈব স্ফুরতা বিদ্যুল্লতালোকেন কামিনী-জ্ঞানমাদধানেন তজ্জন্মনি সাতিশয়ত্বমবাপ্যতে। এবমিতর-কারককদম্ব সন্নিধানে সত্যপি সীমন্তিনীমন্তরেণ তদ্দর্শনং ন সম্পদ্যতে। আগত-মাত্রায়ামেব তস্যাং ভবতীতি তদপি কর্ম্মকারকমতিশয়যোগিত্বাৎ করণং স্যাৎ। ন্যায়মঞ্জরী, ১৩ পৃঃ, চৌখাম্বা সং,

২। তস্মাৎ ফলোৎপাদাবিনাভাবিস্বভাবত্বমবশ্যতয়া কার্য্যজনকত্বমতিশয়ঃ। স চ সামগ্র্যন্তর্গতস্য ন কস্যচিদেকস্য কারকস্য কথয়িতুং পার্য্যতে। সামগ্র্যাস্তু [illegible]তিশয়ঃ সুবচঃ, সন্নিহিতা চেৎ সামগ্রী সম্পন্নমেব ফলমিতি সৈবাতিশয়বতী।

ন্যায়মঞ্জরী, ১৩ পৃঃ, চৌখাম্বা সং,

জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার রচিত ন্যায়মঞ্জরী নামক গ্রন্থে এই দৃষ্টিতেই প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ভ্রম এবং সংশয়-ভিন্ন যে জ্ঞান, ঐ জ্ঞানের মুখ্য সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বস্তু এবং জ্ঞান এই উভয় প্রকার পদার্থ-সম্বলিত যে কারণ-সমষ্টি তাহাই প্রমাণ। "বোধাঽবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণম্।"[১] প্রমাণ বা প্রমা-জ্ঞানের যাহা করণ. তাহা জয়ন্তের মতে জ্ঞান এবং জ্ঞান-ভিন্ন (জড়বস্তু), এই উভয় প্রকার পদার্থের সমবায়ে গঠিত। কেবল জ্ঞানও প্রমাণ নহে, কেবল ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বস্তু ও প্রমাণ পদবাচ্য নহে; উক্ত উভয় প্রকার বস্তুকে লইয়া গঠিত যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ-সমষ্টি, সেই সমষ্টিই প্রমাণ বা প্রমা-জ্ঞানের সাধন বলিয়া জানিবে। জয়ন্তের মতে এক রকমের বস্তু লইয়া প্রমাণের ব্যবহার হইবে না এবং প্রমার কারণ-সমূহের মধ্যে কোন একটিকেও প্রমাণ বলা চলিবে না। কারণ-বস্তুর সমষ্টিকে লইয়া প্রমাণের ব্যবহার করিতে হইবে। এই কারণ-সমষ্টিকে জয়ন্ত বলিয়াছেন 'কারণ-সামগ্রী'। সামগ্রী শব্দে এখানে মিলিত কারকগুলিকে বুঝায়। কারণ-সামগ্রী উপস্থিত থাকিলে, কার্য্যোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জয়ন্ত কারণ-সমষ্টিকেই মুখ্য "করণ" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সমষ্টির অন্তর্গত কারণগুলি তাহাদের স্বীয় স্বীয় ব্যাপার সম্পাদন করতঃ কার্য্যের জনক হয় বলিয়া তাহাও জয়ন্তের মতে করণই বটে, তবে উহা সমষ্টির মত মুখ্য করণ নহে, অপেক্ষাকৃত গৌণ করণ,—সামগ্রী নাম সমুদিতানি কারকাণি, ন্যায়মঞ্জরী, ১৩ পৃঃ, জয়ন্তোক্ত এই কারণ-সমষ্টি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই সমষ্টির মধ্যে জ্ঞানও আছে, জ্ঞান-ভিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় বস্তুও আছে। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা গেল, এই অনুমান-জ্ঞানের কারণ-সমষ্টি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এখানে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্ত-জ্ঞান যেমন অনুমানের কারণ হইবে, সেইরূপ পর্ব্বত, ধূম প্রভৃতিও অনুমানের কারণ-সমষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িবে। ফলে, অনুমানের কারণ-সমষ্টি (ব্যাপ্তি) জ্ঞান এবং জ্ঞান-ভিন্ন (পর্ব্বত, ধূম প্রভৃতি), এই উভয় প্রকার পদার্থ সম্বলিতই হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ উপমান জ্ঞানে সাদৃশ্য-জ্ঞান, শব্দ-জ্ঞানে

১। অব্যভিচারিণীমসন্দিগ্ধামর্থোপলব্ধিং
বিদধতী বোধাঽবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণম্।
ন্যায়মঞ্জরী, ১২ পৃঃ, চৌখাম্বা সং,

পদ ও পদার্থের শক্তি-জ্ঞান প্রভৃতি যেমন কারণ হইবে, সেইরূপ উপমেয় বা জ্ঞেয় বস্তু প্রভৃতিও কারণ-পর্য্যায়েপড়িবে, এবং ঐ সকল কারণসমষ্টিও যে জ্ঞান এবং জ্ঞান-ভিন্ন, এই উভয় শ্রেণীর বস্তু-দ্বারাই গঠিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 70085

জয়ন্ত ভট্টের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, অনুমান, উপমান প্রভৃতির স্থলে আলোচ্য রীতিতে উহাদের কারণ-সমষ্টি যে জ্ঞান এবং জড়, এই উভয় প্রকার বস্তু-দ্বারায় গঠিত, তাহা বরং বুঝা গেল; কিন্তু প্রত্যক্ষের কারণ-সামগ্রীকে তো কোনমতেই জ্ঞান ও জড়, এই উভয় প্রকার বস্তুর দ্বারায় গঠিত বলা চলে না। আমি যখন আমার টেবিলের উপরের বইখানিকে দেখি, সে-ক্ষেত্রে দ্রষ্টা আমি, আমার মনঃ, ইন্দ্রিয়, মনঃ-সংযোগ, দৃষ্ট পুস্তকের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ, পুস্তক, পুস্তকাধার, আলোক, দেশ, কাল প্রভৃতি সমস্ত কারণগুলি সমবেতভাবে আমার পুস্তক-প্রত্যক্ষের জনক হয় সত্য, কিন্তু ঐ কারণগুলির কোনটিই তো "বোধস্বভাব" বা জ্ঞানরূপ কারণ নহে, সকল কারণই "অবোধস্বভাব" বা জড়স্বভাব। এখানে জয়ন্ত ভট্টের উল্লিখিত "বোধাঽবোধস্বভাবা" সামগ্রী প্রমাণম্; অর্থাৎ জ্ঞান ও জড় এই উভয় প্রকার বস্তু-ঘটিত কারণ সামগ্রী বা মিলিত কারকসমূহই প্রমাণ, এইরূপ প্রমাণের লক্ষণের সঙ্গতি হইবে কিরূপে? নব্য নৈয়ায়িকগণের প্রত্যক্ষের স্বরূপ-আলোচনায় দেখা যায় যে, যে জ্ঞানের মূলে আর কোনরূপ জ্ঞান কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে না, তাহাই তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, ইহাই নব্য ন্যায়-মতে প্রত্যক্ষের সাধারণ লক্ষণ। স্থূল বস্তু-প্রত্যক্ষে কোনরূপ জ্ঞান করণ হয় না, ইন্দ্রিয়ই হয় করণ, এবং ইন্দ্রিয়-সংযোগ ঐ করণের ব্যাপার বা মধ্যবর্ত্তী কার্য্য। ফলে, দেখা যাইতেছে যে, জয়ন্ত ভট্টের কথিত প্রমাণের লক্ষণটি স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অচল হইয়া পড়িতেছে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষের কারণগুলি যদি ধীর ভাবে পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষের মূলেও যে কোন-না-কোন প্রকারের জ্ঞান কারণরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা নব্য নৈয়ায়িকগণও স্বীকার না করিয়া পারেন না। প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ জ্ঞানোদয়ের ফলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে যাহা তাঁহার কল্যাণকর মনে করে, তাহা সে গ্রহণ করে, যাহা অনিষ্টকর বুঝে, তাহা পরিত্যাগ করে,

যাহা নিষ্প্রয়োজন, তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। মানুষের জীবনের যাত্রা-পথে কতকগুলিকে গ্রহণ করিবার বুদ্ধি, কতকগুলিকে ত্যাগ করিবার বুদ্ধি এবং কতকগুলিকে উপেক্ষা করিবার বুদ্ধি, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার ফল। ঐরূপ প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার মূলে রহিয়াছে, অশুভকে পরিহার এবং কল্যাণকরকে গ্রহণ করিবার দীপ্ত চেতনা। এই চেতনা-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই জীবন-যুদ্ধে জয়েচ্ছু মানব জাগতিক বস্তু-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ে যত্নশীল হইয়া থাকে; সুতরাং কোন-না-কোন-রূপ জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অন্যতম কারণ হয়, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তারপর, স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষ এক শ্রেণীর বিশেষ প্রত্যক্ষ, ইহাকে বলে সবিকল্প প্রত্যক্ষ। এই সবিকল্প প্রত্যক্ষটি বিশেষ্য, বিশেষণ এবং বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ প্রভৃতিকে লইয়া উদিত হইয়া থাকে। এইরূপ বোধের পূর্ব্ব স্তরে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের প্রথম সম্বন্ধ হইবামাত্র বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতির স্বরূপকে লইয়া বিশ্লিষ্ট যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই হইল নির্ব্বিকল্প জ্ঞান (Non-relational knowledge)। এইরূপ জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি কোনরূপ সম্বন্ধ-বোধের স্ফুরণ হয় না। এই জাতীয় নির্ব্বিকল্পক বোধ যে সবিকল্পক বোধের কারণ, তাহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ফলে, প্রত্যেক সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মূলেই যে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান কারণরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আলোচিত নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান নহে, ঐ শ্রেণীর জ্ঞান প্রমাও নহে, অপ্রমাও নহে, নপ্রমা, নাপি ভ্রমঃ স্যান্নির্ব্বিকল্পকম্। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৫ কারিকা, উক্ত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান নৈয়ায়িকের মতে অতীন্দ্রিয়, উহা প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে।[১] এইজন্য ঐরূপ অতীন্দ্রিয় নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের মূলে অন্য কোন জ্ঞান কারণরূপে বিদ্যমান আছে কি না, এ-প্রশ্ন আসে না। নৈয়ায়িক শিবাদিত্য তাঁহার সপ্তপদার্থী গ্রন্থে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে প্রমা-জ্ঞান বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিবাদিত্যের মতানুসারে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে প্রমা-জ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইলে ঐ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে জয়ন্ত ভট্টোক্ত প্রমা-লক্ষণের সঙ্গতি হয় কিরূপে, তাহাও দেখা আবশ্যক। তারপর, ঐ নির্ব্বিকল্পক প্রমা-জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ কি? সেই প্রমাণও জ্ঞান এবং জড় (জ্ঞান-ভিন্ন,) এই উভয় প্রকার বস্তুঘটিত কিনা? এই সব

১। জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে। ভাষাপরিঃ, ৫৮ কাঃ,

সমস্যাও জয়ন্ত ভট্টের মতে অবশ্য বিচার্য্য। সে-ক্ষেত্রে বলিতে পারা যায় যে, ন্যায়-মতে যাহা কিছু জন্য বস্তু, তাহার সমস্তের মূলেই রহিয়াছে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও যখন জন্য, তখন তাহার মূলেও যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আছে, ইহা মানিতেই হইবে। ফলে, নির্ব্বিকল্পক প্রমা-জ্ঞানের কারণ সমষ্টির বা প্রমাণের মধ্যেও জ্ঞান আসিয়া পড়িবে; অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রমার কারণ-সমষ্টিও জ্ঞান এবং জড় (বোধাঽবোধস্বভাব) এই উভয় প্রকার বস্তু দ্বারাই গঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিত সামগ্রীর প্রমাণত্ব-বাদ জয়ন্তের আবিষ্কৃত নহে। মীমাংসক শিরোমণি কুমারিল ভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকগ্রন্থে সামগ্রীর প্রমাণত্ব-বাদ আলোচনা করিয়াছেন। শ্লোকবার্ত্তিকের প্রত্যক্ষ-সূত্রে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সম্বন্ধ, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ, এবং আত্মার সহিত মনের যোগ, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে, কিংবা সকলেই একযোগে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।[১] শ্লোকবার্ত্তিকের আলোচনার সূত্র ধরিয়াই মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রাচীন এবং নব্য-নৈয়ায়িকগণের সেবিত পথ পরিত্যাগ করিয়া সামগ্রীর প্রমাণতা-বাদ নানাবিধ যুক্তিমূলে তাঁহার ন্যায়মঞ্জুরীতে সমর্থন করিয়াছেন; এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া সামগ্রীর প্রমাণতা-বাদই যে সমধিক যুক্তিসহ, ইহা উপপাদন করিয়াছেন। জয়ন্তের উক্তির সারমর্ম্ম এই যে, যাহা উপস্থিত থাকিলে প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, তাহাকেইতো প্রমার করণ বা সাধকতম বলিতে হইবে। প্রমার সমস্ত কারণগুলি মিলিতভাবে উপস্থিত হইলেই প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। কারণগুলির মধ্যে কোন একটি কারণ অনুপস্থিত থাকিলেই কার্য্যোৎপত্তি হয় না। এই অবস্থায় কোন একটি কারণকে সাধকতম না বলিয়া কারণ-সমষ্টিকে প্রমার করণ বা প্রমাণ বলাই যুক্তিযুক্ত নহে কি?[২]

১। যদ্বেন্দ্রিয়ং প্রমাণংস্যাৎ তস্যবার্থেন সঙ্গতিঃ।
মনসোবেন্দ্রিয়ৈর্যোগ আত্মনা সর্ব্ব এব বা ॥ শ্লোকবার্ত্তিক,প্রত্যক্ষসূত্র, ৬০ শ্লোক,

২। যতএব সাধকতমং করণং করণসাধনশ্চ প্রমাণশব্দঃ। ততএব সামগ্র্যাঃ প্রমাণত্বং যুক্তম্, তদ্‌ব্যতিরেকেণ কারকান্তরে কচিদপি তমবর্থসংস্পর্শানুপপত্তেঃ। অনেককারকসন্নিধানে কার্য্যং ঘটমানমন্যতরব্যপগমেচ বিঘটমানং কস্মৈ অতিশয়ং প্রযচ্ছেৎ। ন্যায়মঞ্জরী, ১২ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ,

জয়ন্তোক্ত সামগ্রীর প্রমাণতা-বাদ জৈন দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, প্রমাণমাত্রই অজ্ঞান-বিরোধী, সুতরাং প্রমাণ জ্ঞান-পদার্থই বটে, জ্ঞানভিন্ন আর কিছু নহে। কেননা, জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। কারণের সমষ্টি বা সামগ্রী যখন জ্ঞান নহে, তখন তাহা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অজ্ঞানের বিরোধীও নহে, অতএব প্রমাণও নহে। জৈন পণ্ডিতগণের মতে সবিকল্পক যথার্থ-জ্ঞানই প্রমাণ। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান নিরাকার বলিয়া তাহা প্রমাণ নহে। প্রাচীন জৈন দার্শনিক সিদ্ধসেন দিবাকর তাঁহার ন্যায়াবতার গ্রন্থে এইরূপে জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী-কালে প্রভাচন্দ্র তৎকৃত প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড নামক গ্রন্থে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া সামগ্রীর প্রমাণতা-বাদ খণ্ডন করিয়া জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ, এই মতবাদ (জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দীপিকাকার ধর্ম্মভূষণও তদীয় দীপিকায় অজ্ঞান-নিবৃত্তিকেই প্রমা বা যথার্থ বোধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জৈন তার্কিকগণের যুক্তিলহরী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জৈন দার্শনিকগণ জ্ঞানকে প্রমাণ বলিতে গিয়া প্রমাণ এবং প্রমাণ-ফলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা স্বীকার করেন নাই।

বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনিকগণের মতেও জ্ঞানই প্রমাণ। প্রমাণ এবং প্রমা একই জ্ঞান; প্রমাণ এবং প্রমাণ-ফলের পার্থক্য তাঁহারাও মানেন না। কারণ, তাঁহাদের মতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক; বস্তুগুলি প্রথম-ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয়-ক্ষণে নষ্ট হইয়া যায়। উৎপদ্য বিনশ্যতি, ইহাই বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিক-বাদের রহস্য। সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তবে প্রমাণ, প্রমা, প্রমেয় প্রভৃতিও ক্ষণিকই হইবে। ক্ষণস্থায়ী প্রমাণের সহিত প্রমা এবং প্রমাণ-ফলের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ক্ষণিকবাদীর সিদ্ধান্তে কোনমতেই উপপাদন করা যায় না। পদার্থমাত্রই ক্ষণিক হইলেও পদার্থগুলি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে নিজের অনুরূপ ক্ষণ-ধারার সৃষ্টি করিরা থাকে। এইরূপে সৃষ্টির প্রবাহ চলে। ফলে, সংসার শূন্যময় হইয়া যায় না। জ্ঞানও জ্ঞানের অনুরূপ ক্ষণ-ধারা সৃষ্টি করে, বিষয়ও বিষয়ের অনুরূপ ক্ষণ-ধারা সৃষ্টি করে। এই ধারাকেই বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় বলে "সন্তান"। উল্লিখিত জ্ঞান-সন্তান ও বিষয়-সন্তান-সৃষ্টির কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের উৎপত্তির পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটি হয় উপাদান-কারণ, আর বিষয় হয় সহকারী-কারণ; বিষয়ের উৎপত্তিতে পূর্ব্ব বিষয়টি উপাদান কারণ,

জ্ঞান সহকারী কারণ। জ্ঞানও জ্ঞান এবং বিষয়-জন্য, বিষয়ও বিষয় এবং জ্ঞান-জন্য। এইরূপে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞান অর্থ বা জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে। জ্ঞান এ-ক্ষেত্রে প্রকাশক, অর্থ বা বিষয় প্রকাশ্য। জ্ঞানও বিষয়ের মধ্যে প্রকাশ্য-প্রকাশক-ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে বলিয়াই বিষয়ের দিক হইতে জ্ঞানকে প্রমাণ বলা হইয়া থাকে।

প্রমাণ বলিলে বৌদ্ধমতে কি বুঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধদার্শনিক-গণ বলেন যে, জ্ঞান যখন জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় বিষয়টি পাওয়াইয়া দেয়, তখন সেই জ্ঞানকে "অবিসংবাদী" অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এইরূপ অবিসংবাদী জ্ঞানই প্রমাণ। জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞেয় বস্তুটি জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হইল, জ্ঞাতা বস্তুটি ধরিতে চেষ্টা করিল, সেই বস্তুটি সেখানে না থাকায় বস্তুটি পাওয়া গেলনা। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ জ্ঞানকে প্রমাণ বলা চলিবে না। ঐরূপ জ্ঞান হইবে "বিসংবাদী" বা মিথ্যা-জ্ঞান। উহা অবিসংবাদী বা সত্য-জ্ঞান নহে বলিয়া প্রমাণ নহে। বিষয় দেখার পর বিষয় পাওয়ার মধ্যে দ্রষ্টার একটা চেষ্টা দেখা যায়। বিষয় পাওয়ার জন্য জ্ঞাতার এই চেষ্টার নামই "প্রবৃত্তি"। যথার্থ-জ্ঞানের ফলে বিষয়-দর্শন হইলে তবেই ঐ বিষয় পাওয়ার জন্য চেষ্টা হয় এবং বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ বিষয়-প্রাপ্তির পক্ষে বিষয়-দর্শনই হয় ব্যাপার। প্রমাণ যদি বিষয়টি জ্ঞাতাকে না জানাইত, তাহা হইলে বিষয়কে পাওয়ার জন্য চেষ্টাও হইত না, বিষয়-প্রাপ্তিও ঘটিত না। প্রমাণ বিষয়-প্রাপ্তিরূপ ফলের সাক্ষাৎ কর্ত্তা না হইলেও বিষয়কে পাওয়াইবার পক্ষে সে প্রধান বলিয়া তাহাকেই বিষয়ের "প্রাপক" বলা হইয়া থাকে। প্রমাণের জ্ঞেয় বিষয়কে পাওয়াইবার এই ক্ষমতাকেই প্রাপণ-শক্তি বা প্রামাণ্য বলে। এই প্রামাণ্য বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রকার জ্ঞানেই আছে, সুতরাং ঐ দুই প্রকার জ্ঞানই প্রমাণ।[১] প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার ন্যায়বিন্দুতে এই দৃষ্টিতেই প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়ের স্বরূপ-জ্ঞাপনের দ্বারা

১। প্রাপণ-শক্তিঃ প্রামাণ্যমিতি,...তচ্চপ্রাপকত্বং প্রত্যক্ষানুমানয়োরুভয়োরপ্যস্তীতি প্রমাণ-সামান্যলক্ষণম্। ন্যায়মঞ্জরী, ২২ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ,

জ্ঞাতার প্রবৃত্তি-সম্পাদনই প্রমাণের কার্য্য। এইভাবেই প্রমাণকে 'প্রাপক' বলা হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি-বিষয়-প্রদর্শকত্বমেব প্রাপকত্বম্। ন্যায়বিন্দু-টীকা, ৩ পৃষ্ঠা, প্রমাণ যদি বাস্তবিকই বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটাইত, এবং বিষয়-প্রাপ্তি ঘটাইয়াই প্রমাণ "প্রমাণ" আখ্যা লাভ করিত, তবে আকাশে চাঁদ দেখার পর ঐ চাঁদকেও হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়া যাইত। অতএব বিষয়-প্রদর্শন-দ্বারা বিষয়-প্রাপ্তির প্রবৃত্তি সম্পাদন পর্য্যন্তই প্রমাণের কার্য্য বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বৌদ্ধমতে সমস্তই ক্ষণিক বিধায় একমাত্র নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষই প্রমাণ। সবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর নাম, জাতি, রূপ, গুণ প্রভৃতিরও জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। পরিদৃষ্ট বিষয়টি ক্ষণিকমাত্র ; জ্ঞেয় বিষয়ের নাম, জাতি প্রভৃতির যখন স্ফুরণ হয়, তখনতো সেই ক্ষণিক বিষয়টি থাকিতে পারেনা, বিষয়ের অনুরূপ ক্ষণ-ধারা বা সন্তানই কেবল থাকে। ঐ চির-চঞ্চল সন্তানের উপরই নাম, জাতি, রূপ, গুণ প্রভৃতি আরোপিত হয়। ঐ আরোপ মিথ্যা, সুতরাং ঐরূপ মিথ্যা-আরোপমূলক সবিকল্প প্রত্যক্ষ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে মিথ্যাই বটে।

জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদ এবং বিষয়-প্রদর্শনদ্বারা প্রমাণের বিষয়-প্রাপ্তির প্রবৃত্তি-সম্পাদন প্রভৃতি অতি নিপুণতার সহিত প্রবীণ বৌদ্ধতার্কিক ধর্ম্ম-কীর্ত্তি তাঁহার ন্যায়বিন্দুতে এবং দিঙ্নাগ তাঁহার রচিত প্রমাণসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে উপপাদন করিয়াছেন। জৈন এবং বৌদ্ধ-তার্কিকগণের অনুমোদিত জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদ নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক পণ্ডিতগণ খণ্ডন করিয়াছেন। জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদে আমরা দেখিয়াছি যে, এই মতে প্রমাণ এবং প্রমাণ-ফলের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় নাই। প্রমাণ এবং তাহার ফল প্রমাকে অভেদের দৃষ্টিতেই বিচার করা হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের যাহা সাক্ষাৎজনক, তাহাই হইল প্রমাণ, প্রমা প্রমাণের ফল, সুতরাং এই দুই পদার্থকে কোনমতেই এক বা অভিন্ন বলা চলে না। উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়-বার্ত্তিকে, বাচস্পতি মিশ্র তদীয় তাৎপর্য্য-টীকায়, উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলিতে প্রমার করণকে প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রমাণ এবং প্রমাণের ফল কোন প্রকারেই এক ও অভিন্ন হইতে পারে না, এই যুক্তিতেই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ উল্লিখিত জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ন্যায়-মঞ্জরীতে ঐ সকল যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রমাণ শব্দটি করণ-বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

অর্থ অনুসারে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ, জ্ঞান প্রমাণের ফল, ইহারা অভিন্ন হইবে কিরূপে? কেবল জ্ঞানকে কেন? ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকেও লোকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে। মাত্রজ্ঞানকে প্রমাণ বলিলে ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে প্রমাণের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দিতে হয় নাকি? সুতরাং উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, জ্ঞানও যেমন প্রমাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও সেইরূপ প্রমাণ। কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও কোন্‌টি যে বেশী এবং কোন্‌টি কম প্রমাণ, তাহা বলা কঠিন। এই জন্য দেখিতে পাই, কারণ-সমষ্টির মধ্যে কোন একটি প্রমাণকে করণ বা সাধকতম বলিয়া না বুঝিয়া কারণ-সমষ্টি বা সামগ্রীকেই জয়ন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[১] আলোচ্য বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও বক্তব্য এই যে, এইমতে জ্ঞান-ধারা যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান নিজের অনুরূপ পরবর্ত্তী জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, অন্য কোন প্রকার জ্ঞান উৎপাদন করে না। এই পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী ক্ষণিক জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যেও কোনরূপ কার্য্য-কারণভাব নাই বা থাকিতে পাবে না। ইহা আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান পরবর্ত্তী প্রমা-ফলের অজনক হওয়ায় কোনমতেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। জ্ঞান স্বীয় ব্যাপার বা কার্য্যদ্বারাই প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করে। কোনরূপ ব্যাপার না থাকিলে জ্ঞানকে সেক্ষেত্রে প্রমাণ বলাই চলে না। জ্ঞানের কার্য্যই জ্ঞানের ব্যাপার। কারণকে কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্য থাকিতে হয়। কার্য্যের যাহা নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকেই ঐকার্য্যের কারণ বলা হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানের সমকালীন ক্ষণিক অর্থ বা জ্ঞেয় বিষয়কে, অর্থের সমকালীন ক্ষণিক জ্ঞানের কার্য্য বলা কিছুতেই চলে না। বর্ত্তমান কালীন ক্ষণিক অর্থ, পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক জ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে বটে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও (বর্ত্তমান কালীন অর্থ, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের কার্য্য হইলেও) সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অতীত জ্ঞানকে বর্ত্তমান কালীন অর্থের প্রকাশক বলা যায় না। কেননা, বর্ত্তমান জ্ঞানই বর্ত্তমান অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ক্ষণিক অর্থ যে বর্ত্তমান ক্ষণিক জ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলে দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান নিজের কোনরূপ ব্যাপার বা কার্য্যদ্বারাই এইমতে প্রমাণের স্থান লাভ

১। ন্যায়মঞ্জরী, ১৩ পৃঃ,

করিতে পারে না। তারপর, বৌদ্ধোক্ত প্রমাণ-লক্ষণটিও গ্রহণযোগ্য নহে। জ্ঞান তাহার বিষয়কে যে পাওয়াইয়া দেয়, এই "প্রাপণ-শক্তি"ই (জ্ঞানের "অবিসংবাদকত্ব" বা) প্রামাণ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ব্যবহারেও দেখা যায়, যে-বস্তু লাভের যাহা প্রধান সহায়, তাহাকেই লোকে প্রমাণ বলে। জ্ঞানের সাহায্যে বস্তু প্রকাশিত হইলেও সেই বস্তুটি যদি সেখানে পাওয়া না যায়, তবে সে-ক্ষেত্রে জ্ঞান বিসংবাদী হইবে, (অবিসংবাদী হইবে না), সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান প্রমাণ হইবে না, উহা হইবে অপ্রমাণ। শাদা শঙ্খটিকে চক্ষুর দোষে কামলা রোগী হলুদ বর্ণের বলিয়া দেখিলেও শঙ্খটি যখন সে হাতের কাছে পায়, তখন দেখা যায় যে, শঙ্খটিকে সে পূর্ব্বে যে-ভাবে দেখিয়াছিল সে-ভাবে উহা পাওয়া গেল না। দেখিল হলুদ বর্ণের, পাইল শাদা শঙ্খ ; তাহার দেখার সহিত পাওয়ার এখানে মিল রহিল না বলিয়া এইরূপ জ্ঞান হইল মিথ্যা-জ্ঞান। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে যে-রূপ সেই রূপেই যদি বিষয়টিকে পাওয়া যায়, তবে ঐ ভাবের পাওয়াই যথার্থ পাওয়া হইবে, এবং প্রমাণ বলিয়া বুঝা যাইবে। এইরূপ বৌদ্ধোক্ত প্রমাণের লক্ষণটিও নির্দ্দোষ নহে। প্রমাণের ফলে প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের উদয় হয়। যথার্থ-জ্ঞানোদয়ের ফলে মানুষ সংসার-জীবনে যে-বস্তুটিকে তাহার কল্যাণকর মনে করে, তাহা গ্রহণ করে, অশুভকে বর্জ্জন করে, উপেক্ষণীয় বস্তুকে উপেক্ষা করে। প্রাপ্ত বস্তুকে যে-ক্ষেত্রে মানুষ গ্রহণ বা বর্জ্জন করে, সেখানে অবশ্যই বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু উপেক্ষণীয় বস্তুর স্থলে তো বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে না। বিষয়কে তো সেখানে উপেক্ষাই করা হইয়া থাকে। উপেক্ষণীয় বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটিলে কিংবা উপেক্ষণীয় বিষয়কে পাওয়ার জন্য চেষ্টা থাকিলে, তাহাকে তো আর উপেক্ষণীয় বিষয় বলা যায় না। উপেক্ষাই সেখানে প্রমাণের ফল। উপেক্ষণীয় বস্তুকে উপেক্ষণীয় বস্তুরূপে যে-বোধ, তাহা ভ্রমও নহে, সংশয়ও নহে, উহাতো প্রমা জ্ঞানই বটে। কিন্তু বৌদ্ধোক্ত প্রমাণ-লক্ষণ অনুসারে বিষয়-প্রাপ্তিকে প্রমাণের নিশ্চায়ক বলিয়া মানিয়া লইলে বস্তুর উপেক্ষার ক্ষেত্রে ঐ প্রমাণ লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই উল্লিখিত বৌদ্ধ লক্ষণটিকে প্রমাণের যথার্থ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।[১]

১। অব্যাপকশ্চেদং লক্ষণম্, উপেক্ষণীয়বিষয়বোধস্যাব্যভিচারাদিবিশেষণযোগেন লব্ধপ্রমাণভাবস্যাপ্যনেনাসংগ্রহাৎ। ন্যায়মঞ্জরী, ২২ পৃঃ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ,

জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে নানারূপ দোষ প্রদর্শন করতঃ আলোচিত জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদ এবং বৌদ্ধোক্ত প্রমাণ-লক্ষণ খণ্ডন করিয়া জয়ন্তোক্ত সামগ্রীর প্রমাণতা-বাদ উপপাদন করিয়াছেন।

প্রাচীন মীমাংসাচার্য্য শবরস্বামী বলিয়াছেন যে, প্রমাণ এবং প্রমাণের ফলের মধ্যে স্পষ্টতঃ ভেদ থাকিলেও জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদী জৈন এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রমাণ এবং প্রমাণ-ফলের অভেদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তাঁহাদের মতের খণ্ডন একান্ত আবশ্যক। মীমাংসক আচার্য্যগণের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ বিধায় ইঁহারাও জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদী বটেন, কিন্তু তাঁহারা প্রমাণ এবং প্রমাণ-ফলের অভেদ বা ঐক্য কোনমতেই স্বীকার করেন না। প্রমাণের প্রমাণত্ব বজায় রাখিবার জন্য উহাদের ভেদই মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞান মীমাংসকগণের মতে একটি মানস ক্রিয়া। ক্রিয়া কোনও একটি কারণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় না, সমস্ত কারণের সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। চাউল জল, আগুন, চুলা, হাড়ী প্রভৃতি পাকক্রিয়ার সাধক বস্তুগুলি মিলিতভাবে পাকক্রিয়া সম্পাদন করে। জ্ঞানক্রিয়াও আত্মা, বহিরিন্দ্রিয়, মনঃ, মনের সহিত আত্মার, বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত বহিরিন্দ্রিয় প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধবশে, সমস্ত জ্ঞান-কারণের সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে, ক্রিয়ামাত্রই অপ্রত্যক্ষ; এবং ক্রিয়া সর্ব্বদাই উহার ফলের দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। জ্ঞান-ক্রিয়াও যে-হেতু ক্রিয়া, সুতরাং উহাও অপ্রত্যক্ষ। ঐ জ্ঞান-ক্রিয়ার ফলে বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান-ক্রিয়ার দ্বারা বিষয়ে "জ্ঞাততা" নামক ক্রিয়া-ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞাততা-রূপ জ্ঞান-ফলের দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয়। বহিরিন্দ্রিয় কেবল বহিঃস্থিত অর্থ বা বিষয়ই গ্রহণ করে, অন্তরস্থিত জ্ঞানকে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যই এই মতে জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, অপ্রত্যক্ষ এবং ফলানুমেয়। "বিষয়গত জ্ঞাততারূপ ফলের দ্বারা অনুমেয় জ্ঞানশব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমাণ"—তদেষ ফলানুমেয়ো জ্ঞানব্যাপারো জ্ঞানাদিশব্দ-বাচ্যঃ প্রমাণম্, ন্যায়মঞ্জরী, ১৬ পৃঃ, ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানাদিশব্দের বাচ্য নহে বলিয়া তাহা প্রমাণ নহে, জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ, ইহাই শবর স্বামীর সিদ্ধান্ত। আচার্য্য কুমারিল বলেন যে, জ্ঞানই মুখ্য প্রমাণ, ইহা সত্য

কথা। ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি গৌণ প্রমাণ। জ্ঞানের উৎপাদক ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানশব্দের মুখ্য অর্থ না হইলেও ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানপদের উপচার অর্থাৎ গৌণ প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। কুমারিল ভট্টের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিলে কোন বিষয়কেই জানা সম্ভবপর হয় না, অতএব জ্ঞান যে পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিঃসন্দেহ। ঐ জ্ঞানটি প্রমা, না অপ্রমা, সত্য, না মিথ্যা, এই সকল প্রশ্ন পরে মনে আসে। যেহেতু জ্ঞেয় বিষয়টিকে ঠিক ঠিক ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, সুতরাং জ্ঞানটি অবশ্যই যথার্থ এবং প্রমাণ। এইরূপে জ্ঞানের প্রামাণ্য এইমতেও জ্ঞানের ফলের দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে।[১] জ্ঞানমাত্রই অপ্রত্যক্ষ, এই মত নৈয়ায়িক প্রভৃতি অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন না। এক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ভিন্ন, উৎপন্ন জ্ঞান সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর হইয়া থাকে। জ্ঞান উৎপন্ন হইল, অথচ তাহা প্রত্যক্ষের গোচর হইল না, ইহা অসম্ভব কথা। অতএব আলোচ্য মীমাংসক মত গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান একটি ক্রিয়া, সমস্ত ক্রিয়াই অপ্রত্যক্ষ, জ্ঞানও যেহেতু ক্রিয়া, সুতরাং উহাও প্রত্যক্ষ গোচর হইতে পারে না, মীমাংসকদিগের এই যুক্তিরই বা মূল্য কতটুকু, তাহা বিচার করা আবশ্যক। মীমাংসকদিগের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নৈয়ায়িক-গণ বলেন যে, জ্ঞানতো ক্রিয়া নহে, উঁহাতো প্রমাণের ফল। প্রমাণের ফল জ্ঞান এবং পাক প্রভৃতি ক্রিয়াকে এক জাতীয় বলা যায় কি? ক্রিয়া করা-না-করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন, জ্ঞানতো সেরূপ নহে। জ্ঞানের কারণ ঘটিলে জ্ঞানোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, জ্ঞানকে সেরূপ ক্ষেত্রে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। জ্ঞান হওয়া-না-হওয়া কর্ত্তার ইচ্ছাধীন নহে। উহা প্রমাণ-তন্ত্র বা প্রমাণের অধীন। এই অবস্থায় জ্ঞানকে পাক-ক্রিয়া প্রভৃতির ন্যায় একপ্রকার ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় কি? আর এক কথা, প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য কোন দ্রব্যে ক্রিয়া থাকিলে ঐ ক্রিয়াও যে প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে, ইহাতো ভট্ট-মীমাংসকগণও অস্বীকার করেন না। জীবাত্মাকে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, জীবাত্মায় জ্ঞানরূপ ক্রিয়া থাকিলে তাহারই

১। নান্যথাহ্যর্থসদ্‌ভাবো দৃষ্টঃ সন্নুপপদ্যতে।
জ্ঞানং চেন্নেত্যতঃ পশ্চাৎ প্রমাণমুপজায়তে॥
শ্লোকবার্ত্তিক, শূন্যবাদ. ১৮ শ্লোক,

বা প্রত্যক্ষ হইবে না কেন? ক্রিয়া বলিলে পরিস্পন্দকে বুঝায়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর স্পন্দনরূপ ক্রিয়া যে প্রত্যক্ষ-গম্য; তাহাতো কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং ক্রিয়ামাত্রই অপ্রত্যক্ষ, জ্ঞান-ক্রিয়াও যেহেতু ক্রিয়া, অতএব উহাও অপ্রত্যক্ষই হইবে, এইরূপ মীমাংসক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত কোনমতেই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা চলে না।

প্রমাণ-সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মত আলোচনা করা গেল এবং দেখা গেল যে, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের যাহা মুখ্য সাধন, তাহাই প্রমাণ। প্রমার কারণগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে মুখ্য কারণ বলিবে, ইহা লইয়াই দার্শনিকগণের যত মত-ভেদ। সাংখ্য, বেদান্তপ্রভৃতি দর্শনে প্রমার সাক্ষাৎ সাধনকে প্রমাণ বলা হইয়াছে। কোন কোন সাংখ্য দার্শনিক পুরুষের বোধকে "প্রমা" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই মতে বুদ্ধি বিষয়ের আকারে আকার প্রাপ্ত হইলেই ঐ বিষয়-সম্পর্কে পুরুষের বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অর্থ বা বিষয়ের আকারে আকার প্রাপ্ত বুদ্ধি, যাহা "বুদ্ধি-বৃত্তি" বলিয়া সাংখ্য দর্শনে কথিত হইয়াছে, সেই বুদ্ধি-বৃত্তিই প্রমার সাক্ষাৎ সাধন বা প্রমাণ। বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-পথে দীর্ঘ আলোক-রেখার মত বিচ্ছুরিত হইয়া অদূরস্থিত বিষয়ের নিকট গমন করে এবং বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। জ্ঞেয় বিষয়গুলি সাংখ্যের মতে এক একটি ছাঁচের মত, আর আলোক-রেখার ন্যায় বিচ্ছুরিত অন্তঃকরণ গলিত তামা স্থানীয়। গলিত তামা যেমন যেই ছাঁচে ঢালা যায়, ঠিক তদনুরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও সেইরূপ যে-জ্ঞেয় বিষয়কে প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেই বিষয়ের অনুরূপ আকার লাভ করে। মনে করুন, আমি টেবিলের উপর বইখানি দেখিতেছি। এখানে আমার অন্তঃকরণ নেত্র-পথে বহির্গত হইয়া বইখানি যেখানে টেবিলের উপর আছে, সেইখানে গমন করিয়া বইখানির ছাঁচে পড়িয়া ঠিক বইখানির মত হইয়া যাইবে। ইহাই বুদ্ধি-বৃত্তি; অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির দৃশ্য বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হওয়ার নামই বুদ্ধি-বৃত্তি বা অন্তঃকরণ-বৃত্তি। বুদ্ধি সাংখ্যের মতে জড় পদার্থ, জড় বুদ্ধির বৃত্তিও সুতরাং জড়ই বটে। জড় বুদ্ধি-বৃত্তিতে যখন চৈতন্যময় পুরুষের ছায়া পড়ে, তখন বুদ্ধি-বৃত্তিও চিদালোকে আলোকিত হইয়া ভাস্বর এবং জ্ঞানময় বলিয়া প্রতিভাত হয়;[১]

১। অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদ'ধিষ্ঠাতৃত্বম্। সাংখ্যসূত্র, ১।৯৯,
অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবচ্চেতনেনোজ্জ্বলিতং ভবতি। অতস্তস্য চেতনায়মানতয়াঽধিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিব্যাবৃত্তমুপপদ্যতে। সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ১।৯৯,

এবং চৈতন্যময় পুরুষে অর্থ বা দৃশ্য বিষয়ের আকারে আকার প্রাপ্ত বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পড়ায় পুরুষের ঐ বিষয়ে জ্ঞানোদয় হয়। ইহাকেই সাংখ্যের পরিভাষায় পৌরুষেয় বোধ, পুরুষোপরাগ বা প্রমা-জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। চিদ্‌ঘন, সর্ব্বব্যাপী পুরুষের সঙ্গে জগতের নিখিল বস্তুরই সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সকল পুরুষেরই সব সময় সকল বস্তু-সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হয়না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে, পুরুষের বিষয়-দর্শন বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন; যে-বিষয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি উদিত হইবে, সেই বিষয়েই পুরুষের জ্ঞানোদয় হইবে। বুদ্ধি-বৃত্তিই এই মতে পুরুষের জ্ঞানের (পৌরুষেয় বোধের) মুখ্য সাধন বা করণ।[১] কোন কোন সাংখ্য দার্শনিক আবার বুদ্ধি-বৃত্তিকেই প্রমা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। পুরুষ এই মতে প্রমাতা বা জ্ঞাতা নহে, পুরুষ প্রমার সাক্ষীমাত্র। বুদ্ধি-বৃত্তির উদয়ে চক্ষুপ্রমুখ ইন্দ্রিয়গুলিই হয় মুখ্য সাধন; সুতরাং বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রমা বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয়কেই সে-ক্ষেত্রে ঐ প্রমার সাক্ষাৎ সাধন বা প্রমাণ বলিতে হয়।[২] প্রত্যক্ষ-প্রমার স্বরূপ-বিচারে অদ্বৈতবেদান্তীও অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে গৌণভাবে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। চৈতন্য বা জ্ঞান তো অদ্বৈতবেদান্তের মতে পরম ব্রহ্ম, তাহা অনাদি ও নিত্য। নিত্য জ্ঞানের সাধন বা করণের প্রশ্ন আসে কিরূপে?

১। (ক) যৎসম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্।

সাংখ্যসূত্র, ১।৮৯,

সম্বদ্ধং ভবৎ সম্বদ্ধবস্ত্বাকারধারি ভবতি যদ্ বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিত্যর্থঃ।

সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ১।৮৯,

(খ) চেতনে তাবৎ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বমবশ্যংস্বীকার্য্যম্। অন্যথাকূটস্থনিত্যবিভুচৈতন্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ সদৈব সর্ব্বং বস্তু সর্ব্বৈর্জ্ঞায়েত।......অতোঽর্থভানস্য কাদাচিৎকত্বাদ্যুপপত্তয়েঽর্থাকারতৈবার্থগ্রহণং বাচ্যং বুদ্ধৌ তথা দৃষ্টত্বাৎ, যোগ-বার্ত্তিক, ১।১।৪,

২। অসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকতমং ত্রিবিধং প্রমাণম্। সাংখ্যসূত্র, ১।৮৭, অত্র যদি প্রমারূপং ফলং পুরুষনিষ্ঠমাত্রমুচ্যতে তদা বুদ্ধিবৃত্তিরেব প্রমাণম্। যদিচ বুদ্ধিনিষ্ঠমাত্রমুচ্যতে তদাতূক্তেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরেব প্রমাণম্। পুরুষস্তু প্রমা-সাক্ষী, ন প্রমাতেতি। যদিচ পৌরুষেয়বোধোবুদ্ধিবৃত্তিশ্চোভয়মপি প্রমোচ্যতে, তদাতূক্তমুভয়মেব প্রমা-ভেদেন প্রমাণং ভবতি। সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ১।৮৭, সাংখ্য-কারিকা, ৪-৫, ও তাহাদের তত্ত্বকৌমুদী দ্রষ্টব্য,

আর, জ্ঞানকে অদ্বৈতবেদান্তী ইন্দ্রিয়-জন্য বলেনই বা কি হিসাবে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, চৈতন্য স্বরূপতঃ ভূমা এবং নিত্য হইলেও দৃশ্যমান ঘটাদি বস্তু-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, ঐ জ্ঞানতো অখণ্ড নহে, সখণ্ড, অনাদি নহে, সাদি। ঘটাদি দৃশ্য বস্তু যখন দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তখন দ্রষ্টা পুরুষের স্বচ্ছ অন্তঃকরণ চক্ষুরিন্দ্রিয়-পথে বহির্গত হইয়া আলোক রেখার ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়, এবং অদূরে ঘটপ্রভৃতি দৃশ্য বস্তু যেখানে থাকে, সেখানে ধাবিত হইয়া দৃশ্য বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের এইরূপ ইন্দ্রিয়-পথে বহির্গমন এবং দৃশ্য বিষয়ের রূপ-গ্রহণই অন্তঃকরণের পরিনাম বা বৃত্তি। এইরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তির ফলে দ্রষ্টার ঘটাদি দৃশ্য বস্তু-সম্পর্কে যে অজ্ঞতা থাকে, তাহা অন্তর্হিত হয়, এবং ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বস্তু সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাই ঘট-প্রত্যক্ষ। ঘটের এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান একটি বিশেষ প্রকারের বোধ। চৈতন্য অদ্বৈতবেদান্তের মতে স্বতঃ অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অন্তঃকরণ-বৃত্তির ফলে উদিত ঘটপ্রভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনাদি নহে, সাদি, অজন্য নহে, ইন্দ্রিয়-জন্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্তঃকরণের দৃশ্য বিষয়ের আকারে পরিণাম বা বৃত্তি মুখ্যতঃ দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে অবশ্য ইন্দ্রিয়-জন্য বলা যায়, কিন্তু জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়-জন্য বলা হয় কি হিসাবে? দ্বিতীয়তঃ, অন্তঃকরণের বৃত্তি জড় অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সুতরাং তাহাও যে জড়, ইহা নিঃসন্দেহ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড় অন্তঃকরণ-বৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জড় অন্তঃকরণ-বৃত্তির কারণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অদ্বৈতবেদান্তী প্রমাণ, অর্থাৎ প্রমা-জ্ঞানের করণ বা মুখ্য সাধন বলেন কিরূপে? অন্তঃকরণ-বৃত্তিতো আর প্রমা নহে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে ঘটাদির প্রত্যক্ষ-প্রমার প্রকাশক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকেও অদ্বৈতবেদান্তী গৌণভাবে জ্ঞান বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। জড় অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে তো জ্ঞান বলা চলে না, জ্ঞান তো বস্তুতঃ অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্য; তবে, যেখানে ঘট প্রভৃতি বিশেষ প্রত্যক্ষের উদয় হয়, সেখানে অন্তঃকরণ-বৃত্তিই ক্রিয়াশীলা হইয়া জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে; অন্তঃকরণ-বৃত্তির লয়ে এবং উদয়ে ঘটাদি-জ্ঞানেরও লয়োদয় হয়। বৃত্তি ও জ্ঞান এইরূপে অভিন্নভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া বৃত্তি মুখ্যতঃ জ্ঞান না হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের

মতে গৌণভাবে ঐ অন্তঃকরণ-বৃত্তিকেও জ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়, এবং ঐ বৃত্তির জনক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হইয়া থাকে।[১] সুতরাংদেখা যাইতেছে যে, প্রমাণের বিচারে সাংখ্য, বেদান্তের দৃষ্টি-ভঙ্গি অনেকাংশেই তুল্য। করণের সংখ্যা এবং স্বরূপ-সম্বন্ধে মত-ভেদ থাকিলেও প্রমার করণ বা মুখ্য সাধনই প্রমাণ, এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তোক্ত প্রমার স্বরূপ-বিচার-প্রসঙ্গে এই প্রমাণের বিষয়েও আমরা পূর্ব্বেই কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্বৈতবেদান্তের মতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রমার যাহা করণ তাহাই প্রমাণ—প্রমা-করণম্ প্রমাণম্। বেদান্তপরিভাষা, ১৫ পৃঃ, শুধু "করণকে" প্রমাণ বলিলে বৃক্ষ-চ্ছেদনের পক্ষে উপযোগী কুঠার প্রভৃতি করণকেও প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এইজন্য উল্লিখিত লক্ষণে "প্রমা" পদের অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "মা" পদের অর্থ জ্ঞান; মা ধাতুর পর করণ-বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করায় জ্ঞানের যাহা করণ বা মুখ্য সাধন তাহাই কেবল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে, কুঠার প্রভৃতি জ্ঞানের করণ নহে বলিয়া প্রমাণ হইবে না। জ্ঞানের যাহা সাধন তাহাই যদি প্রমাণ হয়, তবে ভ্রম-জ্ঞানও তো ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে জ্ঞানই বটে। (জ্ঞান বলিলে ভারতীয় দর্শনে সত্যও মিথ্যা, প্রমা ও ভ্রম, এই উভয়বিধ জ্ঞানকেই বুঝায়)। অতএব ঐ ভ্রম জ্ঞানের করণ দোষ-যুক্ত চক্ষুঃ (defective eye) প্রভৃতিকেও প্রমাণ বলা উচিত। এইরূপ আপত্তি খণ্ডের জন্য "মা" পদের দ্বারা এখানে সত্য জ্ঞানকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে "মা"র পূর্ব্বে মা বা জ্ঞানের সত্যতার সূচক 'প্র' উপসর্গের প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ফলে, ভ্রম জ্ঞানের সাধনকে আর প্রমাণ বলা চলিবে না। প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞান যে প্রমাণের ফল, ইহা বুঝাইবার জন্য আলোচিত লক্ষণে "করণ" শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে। (করণের স্বরূপ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি)

১। নন্বু চৈতন্যমনাদি, তৎকথং চক্ষুরাদেস্তৎকরণত্বেন প্রমাণত্বমিতি? উচ্যতে, চৈতন্যস্য অনাদিত্বেঽপি তদভিব্যঞ্জকান্তঃকরণবৃত্তিরিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিনা জায়ত ইতি বৃত্তিবিশিষ্টং চৈতন্যমাদিমদিত্যুচ্যতে। জ্ঞানাবচ্ছেদকত্বাদ্ বৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারঃ। তদুক্তং বিবরণে—"অন্তঃকরণবৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারাদি"তি ॥

বেদান্তপরিভাষা, ২৮—৩১ পৃষ্ঠা, কলিঃ বিশ্ববিঃ সং,

দ্বৈতবেদান্তের প্রমাণ-রহস্যবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণ-পদ্ধতিতে যথার্থ-জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধনকে "অনুপ্রমাণ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথার্থ-জ্ঞান-সাধনমনুপ্রমাণম্। প্রমাণপদ্ধতি, ২০ পৃঃ, প্রমাণ কথাটিই এখানে লক্ষ্য, আর, যথার্থ-জ্ঞানের সাধন, এইটুকু প্রমাণের লক্ষণ। লক্ষ্য "প্রমাণ" শব্দটির বিভিন্ন প্রকার অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্র পূর্ব্বক মা ধাতুর পর অধিকরণ-বাচ্যেও ল্যুট্ প্রত্যয়ের বিধান দেখা যায়। ভাব-বাচ্যে এবং করণ-বাচ্যেও ল্যুট্ প্রত্যয় হইতে পারে। প্রথম অর্থে প্রমাণশব্দে প্রমার অধিকরণকে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থে যথাক্রমে যথার্থ-জ্ঞান এবং তাহার সাধনকে বুঝায়। এই অবস্থায় তো প্রমাণের কোনরূপ লক্ষণ নিরূপণ করাই সম্ভবপর হয় না। কেননা, লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই লক্ষ্য বস্তুটির দ্বারা কি বুঝায়, তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক হয়। লক্ষ্য বস্তুটির অর্থেরই যদি ঠিক না থাকে, তবে লক্ষণ নির্ণয় করিবে কাহার? এইরূপ আপত্তির উত্তরে জয়তীর্থ বলেন যে, লক্ষ্য বস্তুর বিভিন্ন অর্থ থাকিলেও ঐ বিভিন্ন প্রকার অর্থ বিচার করিয়া যদি দেখা যায় যে, একটি অর্থের সহিত অপর অর্থটির কোনরূপই মিল নাই, ঐ দুইটি অর্থের একত্র প্রতীতি হওয়াও একেবারেই অসম্ভব, এই অবস্থায় লক্ষ্য বস্তুটির প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত, লক্ষ্য (প্রমাণ) পদার্থের কোনরূপ লক্ষণ নিরূপণ করা চলে না, ইহা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার অর্থ বুঝাইলেও ঐ বিভিন্ন অর্থের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ অতি অল্পই আছে; এবং ঐ সকল বিভিন্ন অর্থের একত্র ধ্রুব ও সম্ভবপর, সে-রূপ ক্ষেত্রে মৌলিক অভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লক্ষ্য বস্তুটির একটি সর্ব্ব-সম্মত লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অসম্ভবও নহে, দোষাবহও নহে। প্রমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ বিচার করলে দেখা যাইবে যে, প্র পূর্ব্বক "মা" ধাতুর পর অধিকরণ-বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের বিধান থাকিলেও "মা" বা জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়, এই অর্থে প্রমাণশব্দের সচরাচর কোন প্রয়োগ দেখা যায় না, সুতরাং প্রমাণ শব্দের অধিকরণ অর্থ গ্রহণ করা চলে না।[১] এখন রহিল প্রমাণ-

মাধ্ব-মতে প্রমাণ কাহাকে বলে?

১। প্রমাণশব্দস্য অধিকরণে প্রয়োগাভাবাত্তদসংগ্রহঃ। প্রমাণপদ্ধতি, ২১ পৃঃ, দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থ "মা" বা জ্ঞানের অধিকরণ অর্থাৎ আশ্রয়, এই অর্থে প্রমাণ শব্দের কোন প্রয়োগ পাওয়া যায় না, এই কথা তাঁহার প্রমাণপদ্ধতি নামক

শব্দের ভাব-বোধক এবং করণ-বাধক অর্থ। এই অর্থ দ্বয়কে পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী বলা যায় না। ভাব-বোধক অর্থে প্রমাণশব্দে প্রমারূপ ফলকে বুঝায়, প্রমাই প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়; করণ-বোধক অর্থে প্রমাণ-শব্দের দ্বারা প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের মুখ্য সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বুঝায়। প্রমার সাধন এবং প্রমা-ফলের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও তাহাকে তত মারাত্মক বলা যায় না। কেননা, প্রমাণের রহস্য আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় (জৈন এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ) প্রমারূপ ফলকেই প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। (এই মত আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।) পণ্ডিত জয়তীর্থ প্রমার সাধন এবং প্রমাণ-ফলের সর্ব্ব-সম্মত পার্থক্য মানিয়া নিয়াও বলিয়াছেন যে, প্র পূর্ব্বক 'মা' ধাতুর পর ভাব-বাচ্যেই ল্যুট্ প্রত্যয় কর, কি করণ-বাচ্যেই ল্যুট্ প্রত্যয় কর, কোন ক্ষেত্রেই 'মা', ধাতুর মৌলিক অর্থটির কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। এই অবস্থায় মূল ধাতুর অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রমাণের লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইবে—[১]

গ্রন্থে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু জয়তীর্থের এইরূপ উক্তিকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া নেওয়া চলে না। নৈয়ায়িক এবং বৈয়াকরণ আচার্য্যগণের মতে প্রমার অধিকরণ অর্থেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমার আশ্রয়কেও স্থল-বিশেষে প্রমাণ বলা হইয়া থাকে, প্রমাতাকে ক্ষেত্র-বিশেষে প্রমাণপুরুষ বলা হয়। দেবদত্তঃ প্রমাণম্. দেবদত্তই প্রমাণ, এইরূপ অধিকরণ অর্থ বুঝাইতেও প্রমাণশব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পণ্ডিত জয়তীর্থ এবং জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতির টীকাকার জনার্দ্দন ভট্টের মতে উল্লিখিত "দেবদত্তঃ প্রমাণম্" এইরূপ প্রয়োগে প্রমাণ-শব্দে অধিকরণ অর্থ বুঝায় না। দেবদত্তঃ প্রমাণম, এইরূপ উক্তির অর্থ দেবদত্তই জানেন, এইমাত্র। নৈয়ায়িকগণের মতে সর্ব্ববিধ প্রমার আশ্রয় পরমেশ্বরকে যে "প্রমাণপুরুষ" বলা হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। ফলে, ন্যায়-মতে অধিকরণ অর্থেও ল্যুটের প্রয়োগ অবশ্য স্বীকার্য্য।

অত্রার্থে জ্ঞানং প্রমাণমিতিবদত্রার্থে দেবদত্তঃ প্রমাণমিতি প্রমাণশব্দস্য অধিকরণে প্রয়োগাভাবাদিত্যর্থঃ। অত্রার্থে বিপ্রাঃপ্রমাণমিতি প্রয়োগস্তু তজ্ জ্ঞানবিষয় ইতি প্রতিপাদিতমধস্তাৎ। প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দনভট্ট-কৃত টীকা, ২০ পৃষ্ঠা,

১। তথাপি প্রমাণশব্দো ভাবসাধনঃ করণসাধনশ্চেত্যনেকার্থঃ। তত্র কিমনুগতলক্ষণকথনেনেতি। উচ্যতে, নায়মক্ষাদিশব্দবদত্যন্তভিন্নার্থঃ, কিন্তু ধাত্বর্থানুগমস্তূভয়ত্র সম ইত্যেকার্থত্বমাশ্রিত্য অনুগতলক্ষণোক্তিরিত্যদোষঃ।

প্রমাণপদ্ধতি, ২০-২১ পৃষ্ঠা,

যথার্থ-জ্ঞানসাধনমনুপ্রমাণম্।[১] যাহা "যথার্থ" তাহাই অনুপ্রমাণ হইলে, ঈশ্বর প্রভৃতির নিত্য যথার্থ জ্ঞান, যাহা মাধ্ব-বেদান্তের পরিভাষায় "কেবল-প্রমাণ" বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাহা যথার্থ ব্যতীত কস্মিন্-কালেও অযথার্থ বা মিথ্যা হয় না, সেই ঈশ্বর, যোগি প্রভৃতির জ্ঞানও (কেবল-প্রমাণও) অনুপ্রমাণই হইয়া পড়ে; অর্থাৎ কেবল-প্রমাণে অনুপ্রমাণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হয়। "জ্ঞানং প্রমাণম্" এইরূপে জ্ঞানমাত্রকে প্রমাণ বলিলে উল্লিখিত কেবল-প্রমাণে প্রমাণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্নতো আছেই, তা'ছাড়া ভ্রম, সংশয় প্রভৃতিও জ্ঞান বলিয়া তাহাও প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞান নহে বলিয়া, উহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যথার্থ-জ্ঞানং প্রমাণম্, এইরূপ বলিলে ভ্রম এবং সংশয় জ্ঞানে প্রমাণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হয় বটে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও উল্লিখিত কেবল-প্রমাণে অতিব্যাপ্তি, আর বাহ্য প্রত্যক্ষের সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। সাধনং প্রমাণম্, এইরূপে সাধনমাত্রকে প্রমাণ বলিলে বৃক্ষ-চ্ছেদনের সাক্ষাৎ সাধন কুঠার প্রভৃতিও প্রমাণ হইয়া পড়ে। জ্ঞানের যাহা সাধন তাহাই প্রমাণ, এই কথা বলিলে ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি জ্ঞানের সাধন দুষ্ট চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইজন্যই আলোচ্য লক্ষণে জ্ঞানের অংশে 'যথার্থ' বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধনশব্দে এখানে প্রমা বা জ্ঞানের কারণমাত্রকে বুঝায় না, করণ বা সাক্ষাৎ সাধনকে বুঝায়। যেই কারণটি উপস্থিত হইলে কার্য্যোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী সেই মুখ্য কারণ বা করণকেই এখানে সাধনশব্দে বুঝিতে হইবে।[২] যজ্জাতীয়ানন্তরং নিয়মেন কার্য্যোৎপত্তিস্তদত্র সাধনং বিবক্ষিতম্, জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ২০ পৃঃ,

১। প্রমাণ মাধ্ব-মতে দুই প্রকার, কেবল-প্রমাণ ও অনুপ্রমাণ, ঈশ্বর, যোগি প্রভৃতির জ্ঞান কেবল-প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি মাধ্ব-মতে অনুপ্রমাণ। মাধ্ব-মতের প্রমার স্বরূপ-বিচার দেখুন,

২। সতি চ দাত্রাদৌ কারণে যদভাবাৎ কার্য্যাভাবো যস্মিন্ সত্যপ্রতিবন্ধে ভবত্যেব কার্য্যং তদুচ্যতে সাধনমিতি, যথা ব্যাপারবান্ কুঠারঃ, প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩৮ পৃঃ,

ইহা হইতে মাধ্ব-মতে ব্যাপারশালী অসাধারণ কারণই যে করণ, তাহা লক্ষণস্থ "সাধন" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। জ্ঞানের কারণ প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি প্রমার কারণ হইলেও (প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসংযোগ প্রভৃতির ন্যায়) প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে বলিয়া প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি প্রমার করণ বা প্রমাণ হইল না। অনুপ্রমাণ মাধ্ব-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার।

রামানুজ-মতে প্রমাণের স্বরূপ

রামানুজ-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে, প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের উৎপাদক কারণ-সমষ্টির মধ্যে যাহা বিশেষভাবে প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের উৎপত্তির সহায়তা করে, প্রমার কারণগুলির মধ্যে তাহাই শ্রেষ্ঠ কারণ বা করণ আখ্যা লাভ করে।[১] জয়ন্ত ভট্টের মতের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, প্রমার কারণ-সমষ্টির মধ্যে যে-কোন-একটি কারণ অনুপস্থিত থাকিলেই যথার্থ-জ্ঞানোদয় হয় না, কারণ-সমষ্টি উপস্থিত থাকিলেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, কারণ-সমষ্টির মধ্যে কোন্‌টি যে প্রধান, আর, কোন্‌টি যে অপ্রধান, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, অতএব প্রমার কোন নির্দ্দিষ্ট একটি কারণকে প্রমাণ না বলিয়া কারণ-সমষ্টিকে প্রমাণ বলাই যুক্তিসঙ্গত। জয়ন্তের এই মত কোন বৈদান্তিক আচার্য্যই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, যেই কারণের ব্যাপারের (Function) পরই কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কারণ বা করণ। আমার চক্ষুও আছে, টেবিলের উপর বইখানাও আছে। এই অবস্থায় যে-পর্য্যন্ত-না বইখানির সহিত আমার চক্ষুর সংযোগ ঘটিবে, সেই পর্য্যন্ত বইখানি আমার দৃষ্টি-গোচর হইবে না চক্ষুর সহিত বইখানির সংযোগ হইবামাত্রই বইখানি আমার প্রত্যক্ষের গোচর হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চক্ষু এবং টেবিলের উপরিস্থিত দৃশ্য পুস্তক, এই দুইএর মধ্যে আর একটি কার্য্য ঘটিয়াছে, যাহার ফলে বইখানি আমার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে। সেই কার্য্যটিই হইল এ-ক্ষেত্রে বইখানির সহিত চক্ষুর সংযোগ। চক্ষুর সংযোগের কারণ চক্ষুই বটে, সংযোগ চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য হইয়াও চক্ষুরিন্দ্রিয়-

১। তৎকারণানাং মধ্যে যদতিশয়েন কার্য্যোৎপাদকং তৎকরণম্। রামানুজ-কৃত সিদ্ধান্তসংগ্রহ, Govt. Oriental Ms. No. 4988

জন্য পুস্তক-প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎজনক হইয়া থাকে। এখানে চক্ষুর বইখানির সহিত সংযোগই হইল "ব্যাপার" বা মধ্যবর্ত্তী কার্য্য। এইরূপ ব্যাপার বা কার্য্যের মধ্যদিয়াই চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ সংজ্ঞা লাভ করে।[১] চক্ষুঃসংযোগের পরই দৃশ্য বস্তু প্রত্যক্ষের গোচর হয় বলিয়া কেহ কেহ চক্ষুঃসংযোগকেই প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বা করণ বলিয়া থাকেন ; কোন কোন দার্শনিক আবার সংযোগের মধ্যদিয়া (সংযোগ-দ্বারা) চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। জয়তীর্থের প্রমাণপদ্ধতি, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বেদান্তপরিভাষা, রামকৃষ্ণাধ্বরির বেদান্ত-পরিভাষার টীকা শিখামণি, বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, রামানুজের সিদ্ধান্তসংগ্রহ এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পরপক্ষগিরিবজ্র প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণের স্বরূপ-বিচারের শৈলী দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রমাণের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মত-ভেদ থাকিলেও বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সকলেই প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের করণকে অর্থাৎ "ব্যাপারশালী অসাধারণ কারণকে"ই প্রমাণ বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-বিশেষজ্ঞ আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, প্র পূর্ব্বক "মা" ধাতুর পর ভাব-বাচ্যে কিংবা করণ-বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া "প্রমাণ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিচার করিলে যথার্থ-জ্ঞান এবং তাঁহার সাধন, এই উভয়কেই প্রমাণ বলা যায়।[২] যথার্থ-জ্ঞান যেখানে নির্দ্দোষ প্রমাণমূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেখানে সেই জ্ঞানটি যে সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? দ্বিতীয়তঃ, প্রমার যাহা আশ্রয় তাহার সত্যতা-সম্পর্কে যেখানে কোনরূপ সন্দেহ আসে না, সে-রূপ ক্ষেত্রে আশ্রয়ের প্রামাণ্য-নিবন্ধন জ্ঞানেরও সত্যতা নির্ণয় করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে পরমেশ্বরের

১। প্রমাকরণং প্রমাণমিত্যুক্তমাচার্য্যৈঃ সিদ্ধান্তসারে প্রমোৎপাদকসামগ্রী-মধ্যে যদ্ অতিশয়েন প্রমাগুণকং তত্তস্যাঃ কারণম্, অতিশয়শ্চ ব্যাপারঃ, যদ্ধি যজ্জনয়িত্বৈব যজ্জনয়েৎ তৎ তত্র তস্য অবান্তরব্যাপারঃ ; সাক্ষাৎকারি প্রমায়া ইন্দ্রিয়ং করণম্, ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগোঽবান্তরব্যাপারঃ। রামানুজ-কৃত সিদ্ধান্তসংগ্রহ, Govt. Oriental Ms. No. 4988,

২। প্রমাণশব্দস্য ভাবে করণেচ ব্যুৎপত্তিঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৫ পৃঃ, তত্র ব্যুৎপত্তিবিবক্ষাভেদাৎ প্রমিতিস্তৎকরণঞ্চ যথেচ্ছং প্রমাণমাহুরিত্যবোচাম। ন্যায়-পরিশুদ্ধি, ৩০ পৃঃ,

সর্ব্বদা সকল বস্তু-সম্পর্কে যে নিত্য, সত্য-জ্ঞান আছে, ঐ জ্ঞানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ জ্ঞান নিত্য বিধায় উহা কোনও প্রমাণমূলে উৎপন্ন জ্ঞান নহে। সুতরাং প্রমাণের সত্যতা-দৃষ্টে ঐ জ্ঞানের সত্যতা নিশ্চয় করা চলে না। যে-হেতু উহা পরমেশ্বরের জ্ঞান, সেইজন্যই তাহা সত্য। পরমেশ্বরের ভ্রান্তি বা সংশয় নাই। ফলে, ঈশ্বরের জ্ঞানেও ভ্রম এবং সংশয় প্রভৃতির প্রশ্ন আসে না। আলোচ্য রীতিতে প্রমাণের কিংবা প্রমাতার সত্যতা নিবন্ধন জ্ঞানের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা সকল ক্ষেত্রে চলে না। স্থলবিশেষে অসত্য প্রমাণমূলেও সত্য জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায়। পর্ব্বত-শিখর হইতে সমুত্থিত ধূলিজালকে ধূম মনে করিয়া কোন ভ্রান্তদর্শী যদি পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করেন, এবং দৈবাৎ যদি সেখানে পর্ব্বতে বহ্নি পাওয়া যায়, তবে, অনুমানের হেতু মিথ্যা হইলেও তাঁহার বহ্নির অনুমান সে-ক্ষেত্রে সত্যই হইবে। সংসার-জীবনে যে-সকল অভিজ্ঞ সংসারী ব্যক্তির কথা শুনিয়া আমরা ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি; ঐ সকল ব্যক্তির সত্যানুবর্ত্তিতা, সত্য-ভাষণ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া, তবে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করি কি? সাংসারিক উপদেষ্টাকে কেহই অভ্রান্ত পুরুষ মনে করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করে, এমন নহে।[১] তারপর, নির্দ্দোষ প্রমাণকে কিংবা প্রমার আশ্রয় বা প্রমাতাকে জানিতে হইলেও তাহার পূর্ব্বে প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহাই জানা আবশ্যক হয়। যথার্থ-জ্ঞানকে না জানিয়া ঐ জ্ঞানের মুখ্য সাধন বা আশ্রয়কে কোনমতেই জানা যায় না। সুতরাং প্রমাণ আলোচনার প্রারম্ভেই যথার্থ-জ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য।[২] ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাহাই করিয়াছেন। দ্বৈতবেদান্তের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তের মতেও প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রকার। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি, এই

১। নহি বক্তৃপ্রামাণ্যং বাক্যপ্রামাণ্যে উপযুজ্যতে লৌকিকবাক্যেষু। কিন্তু করণদোষাভাবঃ। দ্বিধাপি প্রমিতিরেব শোধ্যা। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৫ পৃষ্ঠা,

২। করণপ্রামাণ্যস্য আশ্রয়প্রামাণ্যস্য চ জ্ঞানপ্রামাণ্যাধীনজ্ঞানত্বাৎ তদুভয়-প্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানপ্রামাণ্যমেব বিচারণীয়মিতি প্রমায়া এব লক্ষ্যত্বপরিগ্রহো যুক্ত ইতি ভাবঃ। ন্যায়সার, ৩৫ পৃষ্ঠা,

ছয় প্রকার।[১] সকল প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণই সর্ব্ববাদি-সম্মত, এবং অপরাপর প্রমাণের মূলও বটে। অতএব প্রমাণ-বিচারের মুখে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা দার্শনিক তত্ত্ব-পরীক্ষায় প্রত্যক্ষের স্থান, বেদান্তোক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও শৈলী বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

১। ভারতীয় দর্শনে প্রমাণের সংখ্যা-সম্পর্কে নানাপ্রকার মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। চার্ব্বাক দর্শনে একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ দর্শনের মতে প্রমাণ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুই প্রকার। সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে। এক শ্রেণীর নৈয়ায়িকও উক্ত প্রমাণত্রয়েরই পক্ষপাতী। উহাদিগকে ন্যায়ৈকদেশী বলা হইয়া থাকে। অপরাপর ন্যায়াচার্য্যগণের মতে প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এবং উপমান, এই চার প্রকার। কথিত চারপ্রকার প্রমাণের সহিত অর্থাপত্তি প্রমাণকে যোগ করিয়া প্রভাকর-মীমাংসক-সম্প্রদায় পাঁচ প্রকার প্রমাণ মানিয়া নিয়াছেন। ভট্ট-মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তীর মতে প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অভাব বা অনুপলব্ধি, এই ছয় প্রকার। পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রমাণের সহিত সম্ভব এবং ঐতিহ্য নামে আরও নূতন দুইটি প্রমাণ যোগ করিয়া প্রমাণকে আট প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌপুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাথ, সাংখ্যাঃ শব্দশ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিন স্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥

বরদরাজ-কৃত তার্কিকরক্ষা, ৫৬ পৃষ্ঠা, কাশী সং,

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষ

দার্শনিক তত্ত্ব-পরীক্ষার পথে প্রত্যক্ষ যে অপরিহার্য্য পাথেয়, তাহা কোন মনীষীই অস্বীকার করিতে পারেন না। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতির জাতীয় আদর্শ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্য-নিবন্ধন তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তা-ধারার গতি এবং প্রকৃতি যে ভিন্নমুখী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। নানামুখে নানাভাবে প্রবাহিত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের (Metaphysics) দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্যই দর্শন-চিন্তায় ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণের (different sources of knowledge) স্বরূপ ও শৈলীর পর্য্যাপ্ত আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রমাণের মধ্যে উপমান, শব্দ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের মূলহিসাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। দার্শনিক চিন্তার গতি এবং প্রকৃতি-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে সেই দর্শনোক্ত প্রত্যক্ষের স্বরূপও যে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যেই দার্শনিক তত্ত্বসকল পরীক্ষিত এবং সুদৃঢ় হইয়া থাকে। ফলে, দেখা যায় যে, জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্ত্বের (Epistemology) সহিত দর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের (Metaphysics) যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। এই যোগ ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, দর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক না হইলে, সেই প্রমাণের কোনই অর্থ হয় না; আবার, প্রমাণের ভিত্তিতে গঠিত না হইলে, সেই তত্ত্বকে তত্ত্বের মর্য্যাদা দেওয়াও চলে না। এইরূপে প্রমাণ এবং প্রমেয়-তত্ত্ব যে পরস্পর সাপেক্ষ, তাহা মানিতেই হইবে। ভারতীয় নৈয়ায়িক সম্প্রদায় "মানাধীনামেয়সিদ্ধিঃ" এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে গিয়া দার্শনিক পরীক্ষায় প্রমাণের স্থান যে বহু ঊর্দ্ধে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং প্রমাণমূলে প্রমেয়-তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে ক্যাণ্টের (Kant) আবির্ভাবের পর হইতে দার্শনিক চিন্তার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানও প্রমাণ-তত্ত্বের বিচারে ক্যাণ্টের যে অপূর্ব্ব মনীষা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই

দার্শনিক পরীক্ষায় প্রত্যক্ষের স্থান

মনীষালোকে আলোকিত হইয়াই দার্শনিক তত্ত্ব-বিদ্যা (Metaphysics) পূর্ণতররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই অবস্থায় দার্শনিক তত্ত্ব-পরীক্ষায় জ্ঞান ও প্রমাণের আলোচনা যে প্রধান স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই শ্রেণীর আলোচনার প্রাধান্য আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।[১] দার্শনিক পরীক্ষায় জ্ঞান ও প্রমাণের স্বরূপ-পর্য্যালোচনার প্রাধান্য দিলেও, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দর্শনোক্ত তত্ত্বের সাধন এবং শোধনই প্রমাণ-জিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্ব সকল ভিন্ন স্বভাবের হইলে, ঐ তত্ত্বের সাধক প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের স্বরূপও বিভিন্ন হইবে; তত্ত্বের প্রকৃতিই প্রমাণের স্বরূপ এবং শৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ভারতীয় দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করিলে আমরা এই রহস্যই স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্ম-বিদ্যাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া তত্ত্ব-পরীক্ষার অনুকূলভাবে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন-সম্পর্কে আরও একটি কথা এই যে, ভারতের প্রধান দার্শনিক মতগুলি সমস্তই শ্রুতিমূলক। নিগূঢ় বেদ-বিদ্যার স্বরূপ-বিশ্লেষণই দার্শনিক পরীক্ষার প্রধান অঙ্গ। এই অবস্থায় সেই দর্শনের জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্ত্বের আলোচনা যে বৈদিক সত্যের অনুসরণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ভারতের প্রধান দর্শনগুলি বৈদিক ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে বলিয়া সে-ক্ষেত্রে ক্যাণ্ট (Kant) প্রভৃতির দর্শনের ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিতে, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্ত্বের আলোচনার বিকাশ সম্ভবপর হয় নাই। ভারতীয় দার্শনিকগণের ক্ষুরধার মনীষাও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তুঙ্গশৃঙ্গ বেদ-শৈলে প্রতিহত হইয়া পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে এক শ্রেণীর সমালোচক ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা-বাণ বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, ভারতীয় ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মৌলিক গ্রন্থরাজি আলোচনা করিলে, সুধী সমালোচক তর্কের গভীরতা, বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তর্কের আলোক-সম্পাতে সত্য-জিজ্ঞাসার পথ যতদূর সুগম করা যাইতে পারে, ভারতীয় দার্শনিকগণ

১। D. O. Makintosh : The Problem of knowledge, P. 7.

তাহা করিয়াছেন। সেই নিশিতবুদ্ধি-ভেদ্য তর্কের কণ্টক-বনে প্রবেশ করিয়া অক্ষত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, এমন চিন্তাশীল মনীষী খুব অল্পই আছেন। তারপর, বৈদিক ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তার গতি মন্থর হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা আপত্তি তোলেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বৈদিক ভিত্তিতে সুগঠিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতের ষড়্দর্শন সন্দেহ-বাদ বা অজ্ঞেয়তা-বাদে (Agnosticism) পর্য্যবসিত হয় নাই। পাশ্চাত্যের মধ্য যুগের চার্চ্চের (Church) প্রভাবে প্রভাবিত দর্শন-চিন্তাকে (dogmatic) গোঁড়া অভিমত বলিয়া যতই নিন্দা করা হউক না কেন; এবং ক্যাণ্টের দর্শনের স্বাধীন চিন্তাকে যতই উচ্চ স্তরে স্থান দেও না কেন? শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, ক্যাণ্ট অজ্ঞেয়তা-বাদের মধ্যেই ডুবিয়া গেলেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বৌদ্ধ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ-দর্শন বেদের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে নাই। বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ-দর্শনও শেষ পর্য্যন্ত "শূন্যে"ই মিলাইয়া গেল। এই অবস্থায় ভারতীয় প্রধান দর্শন-গুলির বৈদিক ভিত্তি, ইহাদের দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতির পথে অন্তরায় হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় কি? বেদান্ত-সম্পর্কে এইরূপ কথা কোনমতেই খাটে না। কেননা, বেদান্ত বেদেরই সার-নির্য্যাস বা শিরোভাগ। উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। উপনিষদের ভিত্তিতে বিচার করিলেই বেদান্তকে বেদান্ত বলা চলিবে, নতুবা তাহা হইবে অনর্থক কোলাহল। বেদান্তের প্রত্যক্ষের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, বেদান্তোক্ত প্রত্যক্ষ-প্রক্রিয়ার সহিত উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার যোগ অতিঘনিষ্ঠ। এইজন্য বেদান্তের সিদ্ধান্তে তত্ত্ব-বিদ্যার (Metaphysics) সহিত জড়িতভাবে প্রমাণ-তত্ত্বের (Epistemology) আলোচনাকে কোনমতেই অসঙ্গত বলা চলে না। কারণ, জ্ঞান-তত্ত্ব, প্রমাণ-তত্ত্ব (Epistemology) এবং তত্ত্ব-বিদ্যা (Metaphysics) তাহাদের স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিকাশ পাইলেও, ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ নহে, পরস্পর সাপেক্ষ, (mutually inter-dependent) ইহা ভুলিলে চলিবে না। তারপর, বৈদান্তিকের মতে যখন জ্ঞানই পরম ও চরম তত্ত্ব, তখন বেদান্তের ব্যাখ্যায় তত্ত্ব-পরীক্ষাকে ছাড়িয়া, প্রমাণ-তত্ত্বের আলোচনা চলিবে কিরূপে?

উপনিষদুক্ত চরম জ্ঞানকে প্রত্যক্ষের অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভবের (Immediate apprehension) ভিত্তিতে বিচার করার জন্যই বেদের সর্ব্বোত্তম অংশ বেদান্তকে শ্রেষ্ঠ দর্শনের মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ বলিলে কি বুঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, "অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্"। ন্যায়-ভাষ্য, ১।১।৩, "অক্ষ" শব্দে এখানে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে বুঝায়; অক্ষস্য অক্ষস্য অর্থাৎ চক্ষুপ্রমুখ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের, তাহার নিজ নিজ রূপ, রস প্রভৃতি গ্রাহ্য বিষয়ে বৃত্তিই প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে। প্রত্যক্ষ শব্দদ্বারা এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কাহাকে বলে? যাহা ইন্দ্রিয়-জন্য হইয়াও ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ জনক হইয়া থাকে, তাহাকেই ইন্দ্রিয়ের "ব্যাপার" বা কার্য্য বলা হইয়া থাকে। স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বস্তুর সংযোগই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার (function); দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুর সংযোগরূপ এই ব্যাপার চক্ষুরিন্দ্রিয় জন্যও বটে, চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ জনকও বটে। কেননা, দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ না ঘটিলে, দৃশ্য বস্তু কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না, চক্ষুর সহিত সংযোগ ঘটিবামাত্রই বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণের মতে স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগরূপ ব্যাপার বা কার্য্যই হয়, ঐ বস্তু-প্রত্যক্ষের চরম কারণ (final cause) বা করণ। নব্য-নৈয়ায়িকদিগের মতে ইন্দ্রিয়ের ঐ ব্যাপার ব্যাপার-শূন্য বলিয়া, উহা ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের করণ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের ঐ ব্যাপারকে দ্বার করিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষের করণ বা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলা হইয়া থাকে। ইহা আমরা পুর্ব্বেই প্রমাণের স্বরূপ-বিচার প্রসঙ্গে ২৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ যেমন "ব্যাপার" হইয়া থাকে, সেইরূপ এমন কতকগুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞানও দেখা যায়, যে-সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞান তন্মূলে অপরাপর প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া, ব্যাপারের স্থান এবং আখ্যা লাভ করে। আমি পথে চলিতে চলিতে পথের উপর কতকগুলি টাকা দেখিতে

প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ কি?

পাইলাম এবং উহাদ্বারা আমার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া টাকাগুলি আমি পকেটে পুরিলাম; পায়ের কাছে কতকগুলি তীক্ষ্ণধার কাঁটা দেখিয়া, তাহা পায়ে বিঁধিতে পারে বুঝিয়া দূর দিয়া চলিয়া গেলাম। পথের পাশে একচাকা পাথর দেখিয়া উহা আমার কোনও প্রয়োজনে আসিবে না মনে করিয়া উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। এ-সকল ক্ষেত্রে টাকাগুলিকে আমার পকেটস্থ করিবার, ধারাল কাঁটা পরিহার করিবার, এবং পাথরের চাকাকে উপেক্ষা করিবার যে জ্ঞান জন্মিল, ঐ জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়-লব্ধ না হইলেও, উহাও যে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা নিঃসন্দেহ। আলোচ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে আছে, ঐ সকল বস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। প্রথমতঃ আমি ঐ সকল জিনিষ নিজের চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছি, তারপর, টাকার তোড়া কল্যাণকর মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, কাঁটাগুলিকে বেদনা-দায়ক বুঝিয়া পরিহার করিয়াছি, পাথরের চাকা আমার কোনও প্রয়োজনে আসিবে না মনে করিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। পথে পাওয়া টাকার তোড়া প্রভৃতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্যতো বটেই, এবং ঐ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ফলে ইহা ভাল, উহা মন্দ, ইহা গ্রাহ্য, উহা ত্যাজ্য, এইরূপে ঐ সকল বস্তু-সম্পর্কে যে ভাল-মন্দ-বোধের উদয় হইয়া থাকে, তাহার সাক্ষাৎ জনকও বটে। অতএব আলোচ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে, স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ন্যায়, ব্যাপার এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্যই ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁহার ভাষ্যে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থে, চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ, এবং ঐ সংযোগের ফলে উৎপন্ন ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ, এই উভয়কেই বুঝিয়াছেন—বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা, বাৎস্যায়ন-ভাষ্য, ১৷১৷৩, স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি শব্দের অর্থ হইবে, দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ। এই সংযোগই এ-ক্ষেত্রে ব্যাপার; বস্তুর স্থূল প্রত্যক্ষ ঐ ব্যাপারের ফল। যেখানে ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ঐ জ্ঞানের ফলে (অনিষ্টকরকে পরিহার করিবার, কল্যাণকরকে গ্রহণ করিবার বোধ প্রভৃতি) জ্ঞানান্তর উৎপাদন করে, সে-ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ব্যাপারের স্থান লাভ করে; এবং ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানান্তরের সাক্ষাৎ সাধন বা প্রমাণ হইয়া থাকে। আলোচ্য জ্ঞানান্তর এ-স্থলে ঐ ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। ন্যায়-মতে একমাত্র

ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগই ব্যাপার বা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নহে। ইন্দ্রিয়-সংযোগ এবং ক্ষেত্র-বিশেষে ইন্দ্রিয়-সংযোগের ফলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই উভয়ই অবস্থা-বিশেষে ব্যাপার এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়।[১] প্রত্যক্ষ শব্দের উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া, কোন কোন মনীষী "প্রতিগতমক্ষম্" এইরূপ "প্রাদি-সমাসের" অর্থ গ্রহণ করিতে চাহেন। এই অর্থে "প্রতিগতম্" অর্থাৎ দৃশ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত "অক্ষ" বা ইন্দ্রিয়ই একমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই মতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে-ক্ষেত্রে অশুভকে বর্জ্জন এবং কল্যাণকরকে বরণ করার বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানান্তর উৎপাদন করে, ঐ জ্ঞানান্তর প্রত্যক্ষ বোধ নহে, উহা এক প্রকার অনুমান। দ্বৈতবেদান্তের অন্যতম প্রধান আচার্য্য জয়তীর্থের মতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানান্তর এক জাতীয় অনুমানই বটে। পথে চলিতে চলিতে পথের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণধার কাঁটা দেখা গেল। কাঁটা পায়ে ফুটিলে তাহা বিশেষ যন্ত্রণা-দায়ক হয়, এইরূপে পূর্ব্বের কাঁটা ফোটার স্মৃতি, কাঁটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের মনের মধ্যে উদিত হইল। এই কাঁটাও সেই জাতীয় যন্ত্রণাদায়ক তীক্ষ্ণধার কাঁটা, এইরূপ বুঝিয়াই সুধী দর্শক কাঁটা পরিহার করিয়া যান। একটি সুপক্ক কদলী দেখিয়া উহার মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া, এই কদলীও সেই জাতীয় মধুর কদলী, এইরূপ মনে করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহা গ্রহণ করেন। আচার্য্য জয়তীর্থ বলেন যে, এই সমস্ত বোধ অনুমান-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।[২] নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি শব্দে দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং ক্ষেত্র-বিশেষে ঐ সংযোগের ফলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই উভয়কেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার এবং সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া গ্রহণ করিলেও মাধ্ব-বেদান্তের মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, মাধ্ব পণ্ডিতগণ একমাত্র দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুপ্রমুখ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগকেই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের ফলে উৎপন্ন (গ্রহণ, বর্জ্জন, উপেক্ষা প্রভৃতি) জ্ঞানান্তর জয়তীর্থ প্রভৃতির মতে এক জাতীয় অনুমান বিধায় বৃত্তি শব্দের ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান অর্থে গ্রহণ করার

১। বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা, যদি সন্নিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ। যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলম্। ন্যায়-ভাষ্য, ১।১।৩,

২। হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ প্রত্যক্ষস্য ফলমিতি কেচিদাহুঃ, তদপ্যসৎ তাসামনুমানফলত্বাৎ। প্রমাণপদ্ধতি, ২৭ পৃঃ,

অনুকূলে কোন যুক্তি নাই; ঐরূপ অর্থ স্বাভাবিকও নহে, এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। "প্রতিগতমক্ষম্" অর্থাৎ বিষয়-সন্নিকৃষ্ট বা বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এইরূপে প্রত্যক্ষ শব্দের প্রাদি-সমাসের অর্থ গ্রহণ করিলে, দৃশ্য বস্তুর গ্রহণ বা বর্জ্জনের মূলে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহা কোনমতেই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, এই উভয়কেই ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বলিয়া মানিয়া লওয়ায় তাঁহাদের মতে আলোচিত প্রাদি-সমাসের অর্থ গ্রহণের অযোগ্য হইলেও, জয়তীর্থ প্রভৃতি যে সকল আচার্য্য একমাত্র ইন্দ্রিয়-সংযোগকেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ শব্দের উল্লিখিত "প্রাদি-সমাসের" অর্থ গ্রহণ করিলেও কোন দোষ দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, প্রত্যক্ষ শব্দের "প্রাদি-সমাসের" অর্থ গ্রহণ করিলে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ই যে প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ সাধন এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, এই অর্থটি তেমন পরিস্ফুট হয় না। "অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতিবর্ত্ততে" এইরূপ অব্যয়ীভাব-সমাসের অর্থ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইবে, এই তাৎপর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়। এরূপ ক্ষেত্রে "প্রাদি-সমাসের" অর্থ গ্রহণ না করিয়া "অব্যয়ীভাব সমাসের" অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ পরীক্ষা করা গেল। সম্প্রতি ন্যায়ের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।

ন্যায়-মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ

ন্যায়-দর্শনে মহামুনি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থ বা দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধের ফলে, ভ্রম ও সংশয়-রহিত, সত্য এবং নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ঐরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা মুখ্য সাধন, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ন্যায়-সূত্র, ১।১।৪, উল্লিখিত সূত্রে "অব্যপদেশ্যম্" এবং "ব্যবসায়াত্মকম্" এই যে দুইটি পদের প্রয়োগ দেখা যায়, ঐ পদদ্বয় বস্তুতঃ আলোচ্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহাদ্বারা প্রত্যক্ষের নির্ব্বিকল্প (Indeterminate) এবং সবিকল্প (Determinate) এই দুই প্রকার বিভাগ সূচিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রত্যক্ষের এইরূপ বিভাগ-সূচনার

তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মকীর্ত্তি, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ক্ষণিকবাদ গ্রহণ করায় তাঁহাদের মতে দৃশ্যমান বিশ্বের ক্ষণিক বস্তুরাজি-সম্পর্কে নির্ব্বিকল্প (Indeterminate cognition not apprehending any relation what soever), অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তুর নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিকল্প বা বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত, বস্তুর স্বরূপমাত্রের বোধক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই একমাত্র সত্য; নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষ ভাবের বোধক বস্তুর সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অসত্য। প্রাচীন বৈয়াকরণ এবং দার্শনিক আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির মতে পদার্থমাত্রেরই কোন-না-কোন নাম আছে। নাম-শূন্য কোন পদার্থ নাই; নাম এবং পদার্থ বস্তুতঃ অভিন্ন। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয় পদার্থের অন্ততঃ নাম বা সংজ্ঞা যে সূচনা করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ফলে, এইমতে সকল প্রত্যক্ষই হইবে সবিকল্পক (Detominate cognition), নির্ব্বিকল্পক বা সর্ব্বপ্রকার বিকল্প-রহিত প্রত্যক্ষ অসম্ভব কথা। এইরূপ সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ-সম্পর্কে দার্শনিক পণ্ডিতসমাজে গুরুতর মত-ভেদ থাকিলেও নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষের উল্লিখিত দুই প্রকার বিভাগই যুক্তিযুক্ত মনে করেন; এবং ইহা বুঝাইবার জন্যই প্রত্যক্ষ-সূত্রে উক্ত দ্বিবিধ বিভাগের সূচক "অব্যপদেশ্যম্" এবং "ব্যবসায়াত্মকম্" এই দুইটি পদের অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে প্রত্যক্ষে কোনরূপ নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পের (বিশেষ ধর্ম্মের) স্ফুরণ হয় না; দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুর সংযোগ হইবামাত্র চক্ষুঃ-সংযুক্ত বস্তুর নাম, জাতি প্রভৃতির "ব্যপদেশ" অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের বোধরহিত, (শব্দার্থ-জ্ঞানবিহীন বালকের, কিংবা শব্দ উচ্চারণ করিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ মূক ব্যক্তির জ্ঞানের ন্যায়—বালমূকাদিসদৃশম্), ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য, পদার্থের স্বরূপমাত্রের সূচক নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের কথাই "অব্যপদেশ্যম্" শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়াছে; "ব্যবসায়াত্মকম্" পদের দ্বারা নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান-সংবলিত সবিকল্প প্রত্যক্ষের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সূত্রোক্ত "অব্যভিচারী" কথার অর্থ ব্যভিচারী বা ভ্রম-ভিন্ন। সংশয়-জ্ঞানও এক প্রকার ভ্রম-জ্ঞানই বটে; সুতরাং আলোচ্য স্থলে "অব্যভিচারী" কথার দ্বারা ভ্রম এবং সংশয়-ভিন্ন জ্ঞান পাওয়া গেল। সূত্রস্থ "উৎপন্ন"

কথার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর যে-রূপ সন্নিকর্ষ বা সংযোগ থাকিলে দৃশ্য বস্তু-সম্পর্কে লোকের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার সন্নিকর্ষই এখানে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে, ঐ সম্মুখস্থ দেয়ালের অপর পিঠে দেয়ালের সহিত সংযুক্ত যে বইখানি আছে, দেয়ালের সহিত চক্ষুর সংযোগ হইলে "সংযুক্ত-সংযোগ" সম্বন্ধে (চক্ষুর সহিত সংযুক্ত দেয়াল, তাহাতে সংযোগ আছে বইখানির এইরূপে) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত (পরম্পরা-সম্বন্ধে) বইখানিরও সন্নিকর্ষ বা সংযোগ আছে ধরিয়া লইয়া দেয়ালের ব্যবধানে অবস্থিত পুস্তকখানির প্রত্যক্ষ হইবার আপত্তি করা চলিবে না। কেননা, ঐ জাতীয় সংযুক্ত-সংযোগ সম্বন্ধকে কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপাদন করিতে দেখা যায় নাই, বরং দেয়াল প্রভৃতির দ্বারা ব্যবধান হওয়ায় ঐ প্রকার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের অন্তরায়ই হইয়া থাকে। সূত্রস্থ "অর্থ" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, যে-বস্তু যেই ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা গ্রাহ্য, (যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ, কর্ণের শব্দ প্রভৃতি), সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-যোগ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ বা সংযোগ ঘটিলেই, সেই সকল প্রত্যক্ষ-যোগ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হইবে। নীরূপ আকাশের সহিত চক্ষুর যোগ থাকিলেও, রূপ না থাকায় আকাশ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য নহে, এইজন্য আকাশের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার প্রশ্ন আসে না।

আলোচিত ন্যায়-মতের প্রতিধ্বনি করিয়া দ্বৈতবেদান্তের প্রমাণ-রহস্যবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতি নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে-ইন্দ্রিয়ের যেইটি গ্রাহ্য বিষয় (যেমন চক্ষুর রূপ, কর্ণের শব্দ প্রভৃতি), সেই নির্দ্দোষ গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা বিশেষ সম্বন্ধের ফলে, গ্রাহ্য বস্তু-সম্পর্কে সাক্ষাৎ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং ঐ জ্ঞানের মুখ্য সাধন, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ—নির্দ্দোষার্থেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্। প্রমাণপদ্ধতি, ২১ পৃষ্ঠা, প্রত্যক্ষে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই হয় "করণ," দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ এ-ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের (করণের) "ব্যাপার" বা মধ্যবর্ত্তী কার্য্য। এই ব্যাপারটি (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ) না ঘটা পর্য্যন্ত দৃশ্য বিষয়ের

মাধ্ব-মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ

কিছুতেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা বিশেষ সম্বন্ধ হইলেই (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সংযোগরূপ কার্য্যটি ঘটিলেই) বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আলোচ্য ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষের মুখ্য সাধন বা "করণ" সংজ্ঞা লাভ করে। ব্যাপারটি করণের ধর্ম্ম বা কার্য্য; আর, প্রত্যক্ষের করণ চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি ধর্ম্মী। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগরূপ ব্যাপার বা ধর্ম্মের প্রাধান্য কল্পনা করিয়াই "অর্থেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্," এইরূপে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মী ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে প্রধানভাবে লক্ষ্য করিলে স্বীয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত অদুষ্ট ইন্দ্রিয়কেই সে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিতে হইবে, স্বস্ব-বিষয়-সংযুক্তমদুষ্টমিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষম্, প্রমাণপদ্ধতি, ২৫ পৃষ্ঠা; ইন্দ্রিয় শব্দে এখানে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উহাদের পরিচালক মনঃ, এই ছয়টিকে বুঝায়। চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বস্তু বিভিন্ন। চক্ষুর দ্বারা বস্তুর রূপই দেখা যায়, শব্দ শুনা যায় না। কাণের সাহায্যে শব্দই শুনা যায়, রূপ দেখা চলে না। সুতরাং দেখা যায় যে, সকল বস্তু সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। যেই বস্তু যেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, সেই বস্তুর সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়-সংযোগের ফলে সেই বস্তু-সম্পর্কে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন" প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্ কিংবা অর্থ-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্, এইরূপে কেবল সন্নিকর্ষকে, অথবা দৃশ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ বলিলে টেবিলের সহিত আমার এই বইখানির যে সন্নিকর্ষ বা সংযোগ আছে তাহাতে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্, এইরূপে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত আকাশের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ আছে তাহার বলে আকাশেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আলোচ্য প্রত্যক্ষের লক্ষণে গ্রাহ্য বিষয়ের সূচক "অর্থ" পদ দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, যেই বস্তু যেই ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা গ্রাহ্য বিষয়, তাহাই কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে, রূপহীন আকাশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে বলিয়া চক্ষুর সহিত আকাশের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ থাকিলেও চক্ষুর দ্বারা আকাশের প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইবে না। ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণেও

"অর্থ" পদের দ্বারা এই রহস্যই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মাধ্ব-কথিত প্রত্যক্ষের লক্ষণে "নির্দ্দোষ" কথাটিকে, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই দুইএরই বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে, ইন্দ্রিয়ের কিংবা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের কোনরূপ দোষ থাকিলে ঐ সকল দুষ্ট ইন্দ্রিয় এবং দূষিত বিষয়-সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে না, ইহাই সূচিত হইল। প্রত্যক্ষের অন্তরায় ইন্দ্রিয়-দোষ কাহাকে বলে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়-মতের প্রতিধ্বনি করিয়া দ্বৈত-বেদান্তী পণ্ডিত জয়তীর্থ বলিয়াছেন যে, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উহাদের পরিচালক মনের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে। মনের সহিত যোগ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াশীল হয় না। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক মনের সহিত যোগের অভাব ইন্দ্রিয়মাত্রের পক্ষেই দোষ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়-শক্তির বিলোপ, কামলা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-রোগও ইন্দ্রিয়ের পক্ষে দোষই বটে। মনের পক্ষে কোনও বিষয়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি, মনের শক্তি-লোপ প্রভৃতিই দোষ। বিষয়ের দোষ কি কি? যে-সকল দোষ থাকিলে বিষয়টিকে আদৌ জানাই যায় না, জানা গেলেও ঠিকভাবে জানা যায় না, বিষয়ের পক্ষে তাহাই দোষ বলিয়া অভিহিত হয়। দৃশ্য বিষয়টি যদি অতি দূরে কিংবা খুব কাছে থাকে, বিষয়টি যদি পরমাণুর মত অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু হয়, অথবা, কোন কিছুর দ্বারা ঢাকা পড়িয়া থাকে, প্রকাশিত না হয়; কিংবা একই জাতীয় বস্তুর সহিত মিশিয়া থাকে, (যেমন গরুর দুধ যদি মহিষের দুধের সহিত মিশিয়া যায়), তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষেত্রে দৃশ্য বিষয়টিকে চিনিবার কোনই উপায় থাকে না। এইজন্য জ্ঞেয় বস্তুকে চিনিবার অন্তরায় উল্লিখিত দোষগুলিকে "বিষয়ের দোষ" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।[১] কি ইন্দ্রিয়ের, কি বিষয়ের দোষমাত্রই প্রত্যক্ষের অন্তরায়;

১। অতি দূরত্বমতি সামীপ্যং সৌক্ষ্ম্যং ব্যবধানং সমানদ্রব্যাভিঘাতোঽনভিব্যক্তত্বং সাদৃশ্যঞ্চেত্যাদয়ঃ। তেষু সৎসু ক্বচিৎ জ্ঞানমেব ন জায়তে। ক্বচিদ্ বিপরীত-জ্ঞানমুৎপদ্যতে। প্রমাণপদ্ধতি, ২১ পৃষ্ঠা,

ইহার সহিত ঈশ্বর কৃষ্ণের নিম্নলিখিত সাংখ্য-কারিকার তুলনা করুন,

অতিদূরাৎসামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥

সাংখ্য-কারিকা, ৭,

দোষ-মুক্ত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নির্দোষ বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের মুখ্য সাধন।

ন্যায় এবং দ্বৈতবেদান্ত এই উভয় মতের ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষে একমাত্র ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষই কারণ নহে। আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের-গ্রাহ্য বস্তু, এই চারটি পদার্থের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই মিলিতভাবে প্রত্যক্ষের কারণ হইয়া থাকে। আত্মার সহিত মনের যোগ হয়, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত উহাদের স্ব স্ব গ্রাহ্য বস্তুর সংযোগ ঘটে, এবং এইরূপ ক্রম-সংযোগের ফলে দৃশ্য বিষয় জ্ঞাতার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। অবশ্য দ্বৈতবেদান্তে যাহাকে "সাক্ষী প্রত্যক্ষ" বলা হইয়া থাকে, ঐ সাক্ষী প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় কিংবা মনের অপেক্ষা নাই। মনেরও যাহা অগম্য, এইরূপ আত্মা, আত্মার ধর্ম্মপ্রভৃতি অতিশয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব "সাক্ষী প্রত্যক্ষের" বিষয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাক্ষী প্রত্যক্ষে আত্ম-মনঃ-সংযোগ প্রভৃতিকে কারণের মধ্যে গণনা করার প্রশ্নই আসে না। এই প্রসঙ্গে আরও বিবেচ্য এই যে, ন্যায়-বৈশেষিক ও দ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের লক্ষণে একমাত্র ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষকেই কারণ বলা হইয়াছে। আত্মার সহিত মনের এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগকে আলোচ্য লক্ষণে প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার ফলে ন্যায় ও মাধ্বোক্ত ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের লক্ষণ অসম্পূর্ণ মনে হইবে না কি? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, যেই বস্তুর যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহাদ্বারাই সেই লক্ষ্য বস্তুর লক্ষণ নির্ণীত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণেও প্রত্যক্ষের যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম (uncommon or specific attribute), সেই ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষ বা সংযোগেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আত্ম-মনঃ-সংযোগ, ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগ প্রভৃতি জ্ঞানমাত্রেরই সাধারণ কারণ। প্রত্যক্ষেরও উহা যেমন কারণ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি জ্ঞানেরও তাহা সেইরূপ কারণ। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া প্রত্যক্ষের যাহা সাধারণ কারণ তাহার উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না। প্রত্যক্ষের যাহা অসাধারণ কারণ বা মুখ্য সাধন, সেই চক্ষুপ্রমুখ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থের সন্নিকর্ষ বা সংযোগেরই উল্লেখ করিতে

হয়।[১] ভাল কথা, আত্মার সহিত মনের সংযোগ জ্ঞানমাত্রেরই সাধারণ কারণ বলিয়া আত্ম-মনঃ-সংযোগের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ যেমন প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বা মুখ্য সাধন, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগও তো প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণই বটে। কেননা, মনঃ পিছনে না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াশীল হয় না, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগও ঘটিতে পারে না। ফলে দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ না থাকিলে কোনরূপ প্রত্যক্ষই সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগকে প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বা মুখ্য সাধনই বলিতে হইবে, সাধারণ কারণ বলা চলিবে না; এবং অসাধারণ কারণ-মূলে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গেলে, ইন্দ্রিয় এবং দৃশ্য বিষয়ের সংযোগের ন্যায়, ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযোগকেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে জুড়িয়া দিতে হইবে, শুধু ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষ বলা চলিবে না; ঐ প্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ অসঙ্গত এবং অসম্পূর্ণই হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, রূপ-প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি শব্দদ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষকে রূপাদির অনুমান প্রভৃতি হইতে যে পৃথক্ করিয়া বুঝায়, ইহা নিঃসন্দেহ। প্রত্যক্ষের এই পার্থক্যের মূল অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, রূপের প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত রূপের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই চরম কারণ (final cause)। রূপ এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়, এই উভয়ই হইবে. রূপ-প্রত্যক্ষের যাহা চরম কারণ সেই সন্নিকর্ষের আধার বা আশ্রয়। ঐ আশ্রয়ের নামানুসারেই উক্ত প্রত্যক্ষের রূপ-প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ, এইরূপ বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ আলোচ্য রূপ-প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ হইলেও দৃশ্য রূপের দ্বারা, কিংবা চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষের (রূপ-প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) যেমন নাম-করণ হয়, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষের সেইরূপ কোন নামোল্লেখ হইতে দেখা যায় না। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে রূপের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ, আত্মার সহিত মনের সংযোগের ন্যায়, সাধারণ কারণ-

---

১। নেদং কারণতাবধারণমেতাবৎ প্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্ট কারণতা-বচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টং কারণং তদুচ্যতে। যত্তু সমানমনুমানাদি-জ্ঞানস্য তন্নিবর্ত্ত্যতে। বাৎস্যায়ন-ভাষ্য, ১।১।৪,

স্থানীয়ই হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই মহর্ষি গৌতম, বাৎস্যায়ন প্রমুখ ন্যায়াচার্য্যগণ আলোচ্য রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষের মুখ্য কারণের নিরূপণ করিতে গিয়া আত্ম-মনঃ-সংযোগের ন্যায় ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযোগকে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। চরম কারণ ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সন্নিকর্ষকেই রূপ প্রভৃতি বিশেষ প্রত্যক্ষের মুখ্য সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই ভাবেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণের নির্ব্বচন করিয়াছেন।[১] প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ সাধন যে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের কথা বলা হইল, এই সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ ন্যায়-মতে বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে দেখা যায়। নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় আলোচ্য সন্নিকর্ষকে নিম্নলিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত-সমবায় এবং (৬) বিশেষণতা। চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইলেই দৃশ্য-বস্তু প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে, সুতরাং দ্রব্যের প্রত্যক্ষে "সংযোগ"ই সন্নিকর্ষ বলিয়া জানিবে। কোন পদার্থের গুণ, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতির প্রত্যক্ষে চক্ষুর সহিত সংযুক্ত দ্রব্যে গুণ, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতি সমবায়-সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, সেখানে "সংযুক্ত-সমবায়"ই হয় সন্নিকর্ষ। শাদা ফুলটিকে সংযোগ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করা গেল, ফুলের শাদা রঙ্‌টি ফুলে সমবায় সম্বন্ধে আছে, অতএব শাদা রঙ্‌টি সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। শাদা রঙ্‌-এ যে শুভ্রতা আছে, ঐ শুভ্রতা সমবায়-সম্বন্ধে শাদা রঙ্‌-এ বর্ত্তমান আছে, সুতরাং সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সম্বন্ধে ঐ শুভ্রতা প্রত্যক্ষ-গম্য হয়। (চক্ষুঃ-সংযুক্ত হইবে শাদা ফুলটি, সেই ফুলে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে শাদা রঙ্‌, ঐ রঙ্‌-এ সমবায় সম্বন্ধে আছে, শাদা রঙ্‌-এর ধর্ম্ম শুভ্রতা)। শ্রবণেন্দ্রিয় ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতির মতে আকাশ পদার্থ (কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রম্, কাণের ছিদ্রের মধ্যে অবস্থিত আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ)। শব্দ এই মতে আকাশের গুণ; আকাশে তাহার গুণ শব্দ সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সুতরাং কাণের সাহায্যে শব্দের প্রত্যক্ষে "সমবায়"ই হয় সন্নিকর্ষ। শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্বপ্রভৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে, সেখানে শব্দত্ব শব্দে সমবায়-সম্বন্ধে আছে, শব্দও

১। বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১।১।৪ সূত্র ; প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,

আবার শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, অতএব শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্বের প্রত্যক্ষে "সমবেত-সমবায়"ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বলিয়া জানিবে। কোন কোন দার্শনিকের মতে অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। অভাবের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হইতে পারে না। কেননা, অভাবের তো কোন রূপ নাই, অতএব অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে অভাবের প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন যে, অভাবের যাহা অধিকরণ সেই ভূতল প্রভৃতির বিশেষণরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইজন্যই "ঘটাভাবদ্ ভূতলম্", "ঘটাভাব-বিশিষ্ট ভূতল", এইরূপ বোধ উৎপন্ন হয়। এখানে চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হয় ভূতল, সেই চক্ষুঃ-সংযুক্ত ভূতলের বিশেষণরূপে ঘটাভাবের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আলোচ্য "সংযুক্ত-বিশেষণতাই" হইবে ঘটাভাব প্রভৃতির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। উল্লিখিত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ-বলেই বিভিন্ন প্রকার দৃশ্য বস্তু প্রত্যক্ষ-গম্য হইয়া থাকে; কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয় না। এই রহস্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই নৈয়ায়িক-সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণে "সংযোগ" শব্দের ব্যবহার না করিয়া "সন্নিকর্ষ" পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ন্যায়োক্ত ষড়্‌বিধ সন্নিকর্ষ-বাদ কোন বেদান্ত-সম্প্রদায়ই অনুমোদন করেন নাই। বৈদান্তিকগণ নৈয়ায়িকের বড় আদরের "সমবায়" সম্বন্ধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা মহামুনি বাদরায়ণ (সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ। ব্রহ্মসূত্র, ২।২।১৩, এই সকল সূত্রে) অনবস্থা প্রভৃতি দোষ প্রদর্শনকরতঃ ন্যায়োক্ত সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়া তাহার স্থলে তাদাত্ম্য বা অভেদ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি বৈদান্তিকের মতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহারা বস্তুতঃ অভিন্ন। গুণ ও গুণী প্রভৃতি অভিন্ন বিধায় গুণীর প্রত্যক্ষ হইলে বৈদান্তিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে অভেদ বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে গুণেরও অবশ্য প্রত্যক্ষ হইবে। এই অবস্থায় গুণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষের জন্য বেদান্ত-মতে "সংযুক্ত-তাদাত্ম্য" সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই চলে; "সংযুক্ত-সমবায়" নামক সম্বন্ধ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তারপর, শব্দ আকাশের গুণ বিধায় শব্দের প্রত্যক্ষে নৈয়ায়িকগণ যে সমবায়-সম্বন্ধের আশ্রয় লইয়াছেন, সে-ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, শব্দ দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক, তন্মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ আকাশের গুণ হইলেও

কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণাত্মক শব্দ কিন্তু আকাশের গুণ নহে, উহা দ্রব্য পদার্থ,—বর্ণাত্মকশব্দস্য দ্রব্যত্বেন আকাশ-বিশেষগুণত্বাভাবাৎ। প্রমাণপদ্ধতি, ২৬ পৃষ্ঠা, সমবায়-সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না, শব্দ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ আকাশের গুণ হইলেও গুণ ও গুণী বস্তুতঃ অভিন্ন বিধায় আকাশের প্রত্যক্ষ হইলেই আকাশ-গুণেরও প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। গুণের প্রত্যক্ষের জন্য "সমবায়"-সম্বন্ধের আশ্রয় লইবার কোন হেতু নাই। ইন্দ্রিয় সকল আলোক-রেখার মত বিচ্ছুরিত হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি যে-স্থানে থাকে, সেই স্থানে গমনকরতঃ স্ব স্ব গ্রাহ্য বস্তুকে, গ্রাহ্য বস্তু না পাইলে ঐ সকল গ্রাহ্য বস্তুর অভাবকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই গ্রহণ করে। অভাবের প্রত্যক্ষের জন্য কোনরূপ পরম্পরা-সম্বন্ধের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ।[১] এই প্রত্যক্ষ চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মনঃ, এই ষড়িন্দ্রিয়-ভেদে প্রথমতঃ ছয় প্রকার। ইন্দ্রিয়ের পিছনে ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক সক্রিয় মনঃ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। মনের অধ্যক্ষতায় ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে। এইজন্য চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই মনেরও বিষয় হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মনঃ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবেও জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। অতীত বস্তু-সম্পর্কে মনের সাহায্যে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে মনঃই একমাত্র প্রমাণ বটে। ঐ জ্ঞান মানস-প্রত্যক্ষ। স্মৃতি ঐরূপ মানস-প্রত্যক্ষেরই ফল,—স্মৃতিঃ ফলং মানস-প্রত্যক্ষজা স্মৃতিরিত্যুক্তেঃ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪০ পৃষ্ঠা, মনঃ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দুই ভাবে জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। চক্ষুপ্রমুখ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষতায় চাক্ষুষ জ্ঞান প্রভৃতি উৎপাদন করে;

মাধ্ব-মতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষের স্বরূপ

১। (ক) ইন্দ্রিয়াণাং বস্তু প্রাপ্য প্রকাশকারিত্বনিয়মাৎ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং স্ব স্ববিষয়ৈঃ স্বস্ববিষয়প্রতিযোগিকাভাবেন চ সাক্ষাদেব সন্নিকর্ষঃ কারণম্। নতু ক্বচিৎ পরম্পরয়েতি জ্ঞাতব্যম্। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪০ পৃষ্ঠা,

(খ) সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং স্ব স্ব বিষয়ৈঃ স্ববিষয়প্রতিযোগিকাভাবেন চ সাক্ষাদেব রশ্মিদ্বারা সন্নিকর্ষঃ। প্রমাণপদ্ধতি, ২৬ পৃষ্ঠা,

আবার বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া, অতীত বস্তু-সম্পর্কে স্মৃতি জন্মায়।[১] স্মৃতি-জ্ঞান মাধ্ব-সিদ্ধান্তে এক শ্রেণীর প্রমা-জ্ঞান; সুতরাং স্মৃতি-সাধন মনঃও প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ন্যায় অন্যতম প্রমাণই বটে। বিশ্বনাথের মুক্তাবলীর আলোচনায় আমরা (৭ পৃষ্ঠায়) দেখিয়াছি যে, বিশ্বনাথ স্মৃতিকে প্রমার মধ্যে গণনা করিয়াও স্মৃতির কারণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। জয়তীর্থ প্রভৃতি মাধ্ব পণ্ডিতগণ স্মৃতির কারণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। স্মৃতি এই মতে মানস-প্রত্যক্ষ-স্থানীয়। মনঃ মনের কোণের সুপ্ত সংস্কারকে জাগাইয়া তুলিয়া অতীত বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। অতীত বস্তুর সংস্কার স্মৃতির কারণ মনঃ ও স্মৃত বিষয়ের মধ্যে যোগ-স্থাপন করিয়া সন্নিকর্ষ-স্থানীয় হইয়া দাঁড়ায়; এবং মনঃ ঐ সংস্কারকে দ্বার করিয়া স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করে। প্রমাণ এই মতে স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই চার প্রকারই বটে। স্মৃতি মনোরূপ ইন্দ্রিয়-জন্য বলিয়া ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের মধ্যেই স্মৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ফলে, প্রমাণকে মাধ্ব-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রকারই বলা চলে। জয়তীর্থের প্রমাণপদ্ধতির টীকাকার জনার্দ্দন ভট্ট তাঁহার টীকায় স্মৃতির সাক্ষাৎ সাধন মনঃ যে অন্যতম ইন্দ্রিয়, তাহা অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। অনুমানের প্রয়োগ করিতে গিয়া জনার্দ্দন বলিয়াছেন যে, স্মৃতিকে কোনমতেই বাহ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-জন্য বলা যায় না। কেননা, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল ক্রিয়াশীল না হইলেও বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে স্মৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্মৃতিও এক জাতীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান; প্রত্যক্ষ জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয়-জন্য, ইহা নিঃসন্দেহ। বাহ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্মৃতি উৎপাদন করে না, স্বতন্ত্রভাবে মনঃই স্মৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় স্মৃতি-জ্ঞানের সাক্ষাৎ-সাধন মনঃ যে অন্যতম ইন্দ্রিয়, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।[২] স্মৃতি-জ্ঞানের মুখ্য সাধন মনঃ একপ্রকার ইন্দ্রিয় ইহা সাব্যস্ত হইলেও

১। দ্বিবিধং হি জ্ঞানং মনো জনয়তি, তত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন তত্তদিন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ স্মরণঞ্চেতি। প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দন ভট্ট-কৃত টীকা, ২২ পৃষ্ঠা,

২। ন স্মরণং বাহ্যেন্দ্রিয়জন্যমসত্যপি বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপারে জায়মানত্বাৎ, স্বপ্নবৎ। স্মরণমিন্দ্রিয়-জন্যং বাহ্য জ্ঞানকরণাজন্যত্বে সতি জন্যজ্ঞানত্বাদিত্যনুমানাভ্যাং তৎসিদ্ধেঃ (মনস ইন্দ্রিয়ত্ব-সিদ্ধেঃ)। প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দন-কৃত টীকা, ২৩ পৃষ্ঠা,

প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, স্মৃতির উৎপাদক মনকে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির ন্যায় "প্রমাণ" বলিয়া গ্রহণ করা চলে কি? প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের যাহা সাক্ষাৎ সাধন তাহাই প্রমাণ হইয়া থাকে। স্মৃতি-জ্ঞানকে তো কোনমতেই যথার্থ-জ্ঞান বলা যায় না। কারণ, কোন বস্তু যখন স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তখন সেই বস্তুটি যেখানে, যে-কালে, যেই পরিবেশের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, সেই দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এ-রূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্বতন জ্ঞেয় বস্তুর স্মৃতিকে যথার্থ-জ্ঞান বলা যাইবে কিরূপে? স্মৃতির সাধন মনকে "যথার্থ-জ্ঞান-সাধনমনুপ্রমাণম্", এইরূপ প্রমাণ-লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়াই বা গ্রহণ করিবে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত জয়তীর্থ বলেন যে, যে-বস্তুটি যে-কালে, যেই দেশে, যে-পরিবেশের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দেশ, সেই কাল ও সেই পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত সেই বস্তুরই স্মৃতি হইয়া থাকে। "সেই সময়ে, সেখানে সেই বস্তুটি ঐরূপ ছিল" ইহাই হইল স্মরণের পরিচয়। পূর্ব্বতন সংস্কারই স্মৃতির একমাত্র কারণ। এই সংস্কার অনুভবেরই ছবি; অনুভবেরও যাহা বিষয় হয়, সংস্কারেরও তাহাই বিষয় হয়। অনুভব এবং অনুভূতি-জাত সংস্কারের মধ্যে কোনরূপ বিষয়-ভেদ নাই। অনুভবে যাহা স্পষ্টতঃ ভাসে, সংস্কারে তাহাই অস্পষ্টভাবে চিত্ত-পটে আঁকা থাকে। স্মৃতির স্থলে পূর্ব্বতন দেশ, কাল এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও পূর্ব্বতন সংস্কার-সহকৃত মনঃ যেই দেশে, যেই কালে, যেই অবস্থায় বস্তুটি অনুভূত হইয়াছিল, বস্তুর পরিচয়ের সহিত সেই দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতিকেও ঠিক ঠিক ভাবেই স্মৃতিতে জাগাইয়া তুলিবে। পূর্ব্বতন বস্তু পূর্ব্বতন রূপেই স্মৃতিতে ভাসিবে, বর্ত্তমান কালীন বস্তুরূপে স্মৃতিতে ভাসিবে না। এই অবস্থায় স্মৃতি-জ্ঞান যে সত্য-জ্ঞানই হইবে, এবং বস্তুর সংস্কারকে সন্নিকর্ষ-স্থানীয় করিয়া স্মৃতির সাক্ষাৎ সাধন মনঃ যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ন্যায় অন্যতম প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইন্দ্রিয়-সকল বর্ত্তমান বস্তুর গ্রাহক হইলেও স্মৃতিতে সংস্কারের সহায়তা থাকার দরুণ স্মৃতি-স্থলে পূর্ব্বতন দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতির স্মরণোদয় হইতে কোন বাধা হয় না। সংস্কার সহকারী কারণ আছে বলিয়াই "সেই এই গরুটি" "সোঽয়ং গৌঃ", এইরূপ "প্রত্যভিজ্ঞা" জ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালেও

অতীত দেশ, কাল প্রভৃতির স্ফুরণ হইতে দেখা যায়। গরুর ঐরূপ অতীত দেশ, কাল ও অবস্থার বোধ চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য নহে। চক্ষুঃ কেবল বর্ত্তমানকেই গ্রহণ করিতে পারে, অতীতকে গ্রহণ করিতে পারে না। অতীতের বিকাশের জন্য পূর্ব্বতন সংস্কারের সহায়তা অবশ্য স্বীকার্য্য। সংস্কারের সহায়তা ব্যতীত অতীত এবং বর্ত্তমান, এই উভয়-কাল-গোচর প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করা কোনমতেই সম্ভবপর হয় না।[১] দ্বৈতবেদান্তী আচার্য্যগণ মনকে অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিলেও অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায় বলিয়াছেন, মনঃ যে ইন্দ্রিয় এ-বিষয়ে কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না—ন তাবদন্তঃকরণমিন্দ্রিয়মিত্যত্র মানমস্তি, বেদান্ত পরিভাষা, ৩৯ পৃষ্ঠা; পণ্ডিত ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র মনঃ যে ইন্দ্রিয় নহে, ইহাই তাঁহার পরিভাষায় প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধ-মতেও মনকে অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এইজন্যই বৌদ্ধ দর্শনে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের এবং মানস প্রত্যক্ষের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে চার প্রকার,—ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ, স্বয়ং বেদন এবং যোগজ প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ-মতে আত্মা জ্ঞানের আশ্রয় নহে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের আশ্রয় ইন্দ্রিয়, মানস-জ্ঞানের আশ্রয় মনঃ, স্বয়ংবেদন এবং যোগজ প্রত্যক্ষের আশ্রয় চিত্ত। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (শারীরক-ভাষ্য, ২।৪।১৭ সূত্রে,) মনকে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির ন্যায় অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—মনোঽপীন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে। ব্রঃ সূঃ ভাষ্য, ২।৪।১৭, উল্লিখিত ভাষ্যের টীকায় পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র স্মৃতির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তপরিভাষার রচয়িতা পণ্ডিত ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র শঙ্কর-বেদান্তের প্রমাণ-রহস্য লিপি-বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

মাধ্ব-মতে আলোচিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যতীত আরও এক প্রকার ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে বলে সাক্ষী-প্রত্যক্ষ (Perception of the Sākṣi or Witnessing Intelligence)।

১। প্রমাণপদ্ধতি, ২৪ পৃষ্ঠা,

দ্বৈত-বেদান্তের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রিয় ও অর্থের (দৃশ্য বিষয়ের) সন্নিকর্ষকে, অথবা স্বীয় স্বীয় গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। সাক্ষী (Witnessing Intelligence) অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেই সাক্ষীর প্রত্যক্ষে আলোচ্য প্রত্যক্ষ লক্ষণের সঙ্গতি সম্ভবপর হয়। ইন্দ্রিয়ও সে-ক্ষেত্রে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূল বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ এবং সাক্ষী, এই তিন প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। অন্য কোন দর্শনে সাক্ষীকে (Witnessing Intelligenceকে) অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়া গ্রহণ না করিলেও মাধ্ব-সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে, সাক্ষী-প্রত্যক্ষে সাক্ষী বা প্রমাতা কোন ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে না, স্বয়ংই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ ইন্দ্রিয়স্থানীয় হইয়া সাক্ষী-প্রত্যক্ষ উপপাদন করিয়া থাকে—তত্র প্রমাতৃস্বরূপমিন্দ্রিয়ং সাক্ষীত্যুচ্যতে। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩৯ পৃষ্ঠা, সাক্ষীর সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্থাৎ দ্রষ্টা সাক্ষী এবং দৃশ্য বিষয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান না রাখিয়া সূক্ষ্মতর দৃশ্য বস্তুরাজি প্রত্যক্ষ করিবার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিই আলোচ্য সাক্ষী প্রত্যক্ষে "সন্নিকর্ষের" স্থান অধিকার করে। সাক্ষাদ্‌ভাবে সূক্ষ্ম বিষয় সকল দর্শন করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই সাক্ষী—আত্মা, আত্মার জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম, মনঃ, বিভিন্ন মনোবৃত্তি, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, অজ্ঞান, কাল, আকাশ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; ইহাকেই সাক্ষী-প্রত্যক্ষ বলে। আলোচিত সাক্ষী-প্রত্যক্ষও মাধ্ব-মতে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষই বটে। মাধ্ব-সিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয় দুই প্রকার (ক) প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও (খ) প্রমাতৃ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়। সাক্ষীই এই প্রমাতৃ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়।[১] পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই ছয়টি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়। এই সাত প্রকার ইন্দ্রিয়ই মাধ্ব-মতে জ্ঞানেন্দ্রিয়; সাতটি জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভেদে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষও এই মতে সাতপ্রকার—প্রত্যক্ষং সপ্তবিধং সাক্ষী ষড়িন্দ্রিয়-ভেদাৎ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩৯ পৃষ্ঠা, কেবল ইন্দ্রিয়-ভেদেই নহে, প্রমাতার শ্রেণী-ভেদেও প্রত্যক্ষের বিভেদ হইতে দেখা যায়। প্রমাতার ভেদবশতঃ প্রত্যক্ষ মাধ্ব-মতে—(১) ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ, (২) লক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ, (৩) যোগীর প্রত্যক্ষ এবং

সাক্ষী-প্রত্যক্ষ

১। ইন্দ্রিয়শব্দেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ং গৃহ্যতে তদ্‌দ্বিবিধং প্রমাতৃস্বরূপং প্রাকৃতঞ্চেতি। তত্র স্বরূপেন্দ্রিয়ং সাক্ষীত্যুচ্যতে। প্রমাণপদ্ধতি, ২১ পৃষ্ঠা,

(৪) অযোগীর প্রত্যক্ষ, এই চার প্রকার। এই চার শ্রেণীর প্রত্যক্ষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ এবং ঈশ্বর-জায়া লক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ, এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগের কোন প্রশ্ন নাই। কেননা, ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-জায়া লক্ষ্মীর সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ বস্তু-সম্পর্কে যে সত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহা ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ নহে, ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ। এইজন্য উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে "নির্দ্দোষার্থেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্," প্রমাণপদ্ধতি, ২১ পৃষ্ঠা, এইরূপ মাধ্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অব্যাপ্তি এবং অসঙ্গতি অবশ্যম্ভাবী। ন্যায়-মতের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জন্য নহে। "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্," এইরূপ ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য বুঝিয়াই নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ঐ প্রকার লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" এইরূপে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেই জ্ঞানের মূলে অন্য কোনপ্রকার জ্ঞান কারণরূপে বিদ্যমান থাকে না, সেই শ্রেণীর জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অনুমান-জ্ঞানে ব্যাপ্তি-জ্ঞান, উপমান-জ্ঞানে সাদৃশ্য-জ্ঞান, শব্দ-জ্ঞানে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-বোধ প্রভৃতি কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং অনুমান প্রভৃতিকে "জ্ঞানাকরণক জ্ঞান" বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। একমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলেই কোন জ্ঞান কারণরূপে বিদ্যমান থাকে না, অতএব প্রত্যক্ষকেই কেবল "জ্ঞানাকরণক জ্ঞান" বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই মর্ম্মে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিলে আমাদের বাহ্য স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষেও যেমন এই লক্ষণটির প্রয়োগ করা যায়, সেইরূপ ঈশ্বর, যোগী প্রভৃতির ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষেও লক্ষণটিকে নির্ব্বিবাদে প্রয়োগ করা চলে। ন্যায়সূত্রে মহামুনি গৌতম ("ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এইরূপে) স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষের লক্ষণই নিরূপণ করিয়াছেন; ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ গৌতমের মতে উক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের লক্ষ্যই নহে; সুতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে উল্লিখিত গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির কোন কথাই উঠিতে পারে না। সাংখ্যসূত্র-রচয়িতা বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সূত্রে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের

সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ফলে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বিষয়ের রূপ প্রাপ্ত হইয়া যে জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান—যৎ সম্বদ্ধং সত্তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্। সাংখ্যসূত্র, ১।৮৯, সাংখ্যদর্শনে আলোচ্য দৃষ্টিতে যে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা স্থূল ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ। ঈশ্বরের বা যোগীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ সাংখ্যোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের লক্ষ্য নহে। এই অবস্থায় যোগী প্রভৃতির প্রত্যক্ষে স্থূল বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষের লক্ষণ না গেলে তাহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। যোগিনাম-বাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ। সাংখ্যসূত্র ১।৯০, দ্বৈতবেদান্তের প্রত্যক্ষের আলোচনায় দেখা যায় যে, সাক্ষী প্রমাতাকে সপ্তম ইন্দ্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া মাধ্ব পণ্ডিতগণ সাক্ষী প্রত্যক্ষকেও ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সাক্ষীর প্রত্যক্ষ-স্থলে ঐ প্রত্যক্ষ-গম্য আত্মা, আত্মার ধর্ম্ম প্রভৃতি সূক্ষ্মতম বিষয়গুলি প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মনের গোচর না হইলেও, ঐ সকল যে সাক্ষাৎসম্বন্ধেই প্রমাতা সাক্ষীর যে গোচরে আসিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? সাক্ষীর প্রত্যক্ষ এক জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষই বটে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ, লক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ প্রভৃতিকেও ঐ মাধ্ব-সিদ্ধান্তে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতিতে আলোচ্য রীতিতেই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে এবং লক্ষ্মীর প্রত্যক্ষে "নির্দোষার্থেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্", এইরূপ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যোগীর এবং অযোগীর প্রত্যক্ষ যখন কোনও স্থূল বস্তু-সম্পর্কে উৎপন্ন হয়, তখন ঐ প্রত্যক্ষ হয় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনোজন্য ("প্রাকৃত" ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়-জন্য) ; আর, উঁহাদের প্রত্যক্ষ যখন ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর সূক্ষ্ম তত্ত্ব-সম্পর্কে উদিত হয়, তখন তাহা হয়, প্রমাতৃস্বরূপ "অপ্রাকৃত" ইন্দ্রিয়-জন্য। এইরূপে যোগীর এবং অযোগীর প্রত্যক্ষ "প্রাকৃত" এবং "অপ্রাকৃত" এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়-জন্যই হইতে দেখা যায়।[১] মাধ্ব-মতে যে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মনঃ, এই ছয়টি "প্রাকৃত" ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দেওয়া গেল,

---

১। তচ্চতুর্ব্বিধং প্রত্যক্ষম্, ঈশ্বর-প্রত্যক্ষম্, লক্ষ্মী-প্রত্যক্ষম্, যোগি-প্রত্যক্ষমযোগি-প্রত্যক্ষঞ্চেতি। তত্রাদ্যদ্বয়ং স্বরূপেন্দ্রিয়াত্মকমেব। উত্তরন্তু দ্বয়ং দ্বিবিধেন্দ্রিয়াত্মকম্। বিষয়স্তু তত্তজ্‌জ্ঞানবিষয়বদ্‌বিবেক্তব্যঃ। প্রমাণপদ্ধতি, ২৫ পৃষ্ঠা,

তাহা আবার (ক) দৈব, (খ) আসুর, (গ) মধ্যম, এই তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল "প্রাকৃত" ইন্দ্রিয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা "দৈব" সংজ্ঞক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়; যাহা প্রায়শঃ অসত্য বা মিথ্যা জ্ঞানই জন্মায়, তাহা "আসুর" এবং যে সমস্ত ইন্দ্রিয় তুল্যমাত্রায় সত্য এবং মিথ্যা-জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা মধ্যম শ্রেণীর ইন্দ্রিয়ের মর্য্যাদা লাভ করে। আলোচ্য দৈব, আসুর এবং মধ্যম, এই তিন প্রকারের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের তারতম্য দেখিয়া ঐরূপ ইন্দ্রিয়শালী জ্ঞাতাও যে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে ত্রিবিধ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এই সকল উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর দর্শকের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ন্যায় অপ্রাকৃত প্রমাতৃস্বরূপ ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানও যে প্রমাতা বা সাক্ষীর গুণের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? প্রত্যক্ষ যখন দৃশ্য বস্তুর কেবল বিশেষ্যাংশকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়, ঐ বিশেষ্যাংশে বা ধর্ম্মীতে কোনরূপ বিশেষ ধর্ম্মের স্ফুরণ হয় না,[১] তখন বিশেষ্য বস্তুর স্বরূপমাত্রের বোধক ঐ জ্ঞান উত্তম, মধ্যম, অধম, এই সকল শ্রেণীর জ্ঞাতার পক্ষেই সত্য হইয়া থাকে। বিশেষ্য বা ধর্ম্মীর স্বরূপের বোধ সত্য-ব্যতীত মিথ্যা হইতেই পারে না—সর্ব্বং জ্ঞানং ধর্ম্মিণি অভ্রান্তং প্রকারেতু বিপর্য্যয়ঃ। এমন কি, শুক্তি-রজতের প্রত্যক্ষ-স্থলেও ধর্ম্মী শুক্তির সহিত চক্ষুর সংযোগ ঘটিবা-মাত্র শুক্তির নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি কোনরূপ বিশেষ ধর্ম্মের বিকাশ না হইয়া, কেবল বিশেষ্যাংশ শুক্তিরূপ ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্রের বোধক যে জ্ঞানোদয় হয়, ধর্ম্মী শুক্তির সেই জ্ঞান তো সত্যই বটে। শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতে যখন শুক্তির ধর্ম্মের (শুক্তিত্বের) প্রতীতি না হইয়া, রজতের ধর্ম্মের (রজত্বের) ভাতি হয়, তখন শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতে রজতত্ব ধর্ম্মের সেই বোধ কোনমতেই সত্য হইতে পারে না, উহা হয় মিথ্যা জ্ঞান। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ধর্ম্মীর জ্ঞান সর্ব্বদাই হয় সত্য, ধর্ম্ম বা বিশেষণ অংশেই জ্ঞান কখনও সত্য, কখনও বা মিথ্যা হইয়া থাকে। সাক্ষীর প্রত্যক্ষ-স্থলেও সাক্ষী যখন উত্তম গুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হন, তখন সেই সাক্ষীর

১। *বস্তুর বিশেষ্যাংশকে ধর্ম্মী এবং বিশেষণাংশকে প্রকার বা ধর্ম্ম বলা* হইয়া থাকে। আমি একখানা পুস্তক দেখিতেছি, এখানে বিশেষ্য অংশ পুস্তক ধর্ম্মী, আর, পুস্তকের ধর্ম্ম পুস্তকত্ব পুস্তকের বিশেষণ বা প্রকার নামে অভিহিত হয়।

প্রত্যক্ষ ধর্ম্মী এবং ধর্ম্ম (বিষয়স্বরূপে প্রকারে চ), এই উভয় অংশেই সত্য হইবে, কখনও মিথ্যা হইবে না। অধম সাক্ষী এবং মধ্যম সাক্ষীর প্রত্যক্ষ ধর্ম্মী অংশে সত্য হইলেও ঐ ধর্ম্মীর বিশেষ ধর্ম্ম-সম্পর্কে যখন সত্যতার বিচার করা হয়, তখন দেখা যায় যে, অধম অধিকারীর ধর্ম্ম-সম্পর্কে জ্ঞান অধিকাংশ স্থলেই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, মধ্যম অধিকারীর বোধ কখনও সত্য, কখনও মিথ্যা, এইরূপ সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত হইয়া থাকে।[১]

মাধ্ব-সিদ্ধান্তে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের স্বরূপ

"ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বস্তুর প্রথম সম্বন্ধ হইবামাত্র ঐ বস্তুর নাম, জাতি, গুণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিকল্প বা বিশেষভাব-শূন্য, বস্তুর স্বরূপমাত্রের বোধক জ্ঞান নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ, আর, নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি কোন-না-কোন বিশেষ ধর্ম্মকে লইয়া যে প্রত্যক্ষ বোধ উৎপন্ন হয়, তাহা সবিকল্প প্রত্যক্ষ।" উল্লিখিত ন্যায়োক্ত নির্ব্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অনুমোদন লাভ করে নাই। ইঁহাদের মতে প্রত্যক্ষমাত্রই এক প্রকার বিশেষ বোধ। জ্ঞেয় বস্তু-সম্পর্কে কোনরূপ বিশেষ ধর্ম্মের ভাতি না হইয়া কখনও কোনরূপ প্রত্যক্ষ বোধই জন্মিতে পারে না। কি বহিরিন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, কি সাক্ষী প্রত্যক্ষ, উভয় প্রকার প্রত্যক্ষ-স্থলেই নাম, জাতি, ক্রিয়া, গুণ প্রভৃতি কোন-না-কোন বিশেষ ধর্ম্মসংবলিত ধর্ম্মীরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোনপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মের বোধ-রহিত নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ অসম্ভব কল্পনা। বিকল্প বা বিশেষ ধর্ম্ম ন্যায়-বৈশেষিকের মতে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, নাম, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব, এই আট প্রকার। দণ্ডী বলিলে দ্রব্যকে, শুক্ল বলিলে শুক্ল গুণকে, গচ্ছতি বলিলে গমন ক্রিয়াকে, গৌঃ বলিলে গোজাতিকে, দেবদত্ত বলিলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামকে, ধানের পরমাণু, এইরূপে কোন বস্তুর

১। বাহ্যেন্দ্রিয়ং ত্রিবিধং, দৈবমাসুরং মধ্যমমিতি। তত্র যথার্থজ্ঞানপ্রচুরং দৈবম্, অযথার্থজ্ঞানপ্রচুরমাসুরং সমজ্ঞানসাধনন্তু মধ্যমম্। স্বরূপেন্দ্রিয়মপি উত্তমানাং বিষয়স্বরূপে প্রকারে চ যথার্থমেব, অধম-মধ্যমানান্তু স্বরূপমাত্রে যথার্থমেব। প্রকারেতু অযথার্থং মিশ্রঞ্চেতি।

প্রমাণপদ্ধতি, ২৫—২৬ পৃষ্ঠা,

পরমাণুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলে ন্যায়োক্ত বিশেষ পদার্থকে, "সূতাগুলি বস্ত্রে সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ" এইরূপ বলিলে সমবায়-সম্বন্ধকে, ঘটাভাব-বিশিষ্ট ভূতল—ঘটাভাবদ্ ভূতলম্, এইরূপে দেখিলে ভূতলের বিশেষণরূপে ঘটের অভাবকে বুঝাইয়া থাকে। উল্লিখিত আটপ্রকার বিকল্প-ভেদে সবিকল্প প্রত্যক্ষও এই মতে আট প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। আলোচিত আট প্রকার সবিকল্প প্রত্যক্ষের সম্পর্কে মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশেষ এবং সমবায় নামে যে দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নৈয়ায়িকগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার মূলে কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ নাই। গুণ-গুণী, জাতি-ব্যক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধ সমবায় নহে, তাদাত্ম্য বা অভেদ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই (৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। সমবায়-সম্বন্ধ যেমন প্রমাণ-বিরুদ্ধ, সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর পরমাণুর পরস্পর বিভেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে "বিশেষ" নামে যে পদার্থ ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার অনুকূলেও কোন যুক্তি দেখা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর স্বরূপকেই পরস্পরের ভেদের সাধক বলা চলে, ঐজন্য "বিশেষ" নামে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ মানার কি প্রয়োজন আছে? ঐ দুইটি পদার্থ প্রমাণ-সিদ্ধ নহে বলিয়া, ঐরূপ প্রমাণ-বিরুদ্ধ পদার্থমূলে সবিকল্প প্রত্যক্ষের সমবায়-বিকল্প ও বিশেষ-বিকল্প নামে যে দুই প্রকার বিকল্প উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও জয়তীর্থ প্রভৃতির মতে যুক্তি-বিরুদ্ধই বটে। নাম-বিকল্প এবং অভাব-বিকল্প নামে যে দুই প্রকার বিকল্প প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ প্রকার বিকল্প-জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর সহিত চক্ষুর সংযোগ ঘটিবামাত্র কোনমতেই উদিত হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ দর্শক বস্তুটি দেখেন, এই বস্তু দেখার পর তাঁহার বস্তুর নামের স্মরণ হয়; নাম-বিকল্প বস্তু-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কোনমতেই জন্মিতে পারে না। অভাবের জ্ঞান, যে-বস্তুর অভাব বোধ হয়, অভাবের সেই প্রতিযোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। (যাহার অভাব হয়, তাহাকে অভাবের প্রতিযোগী বলে), ঘট না চিনিলে ঘটের অভাব বুঝিবে কিরূপে? অভাব-বিকল্পকেও এইজন্য ভূতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ হইবামাত্রই জানিবার উপায় নাই। তারপর, দ্রব্য, গুণ, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল বিকল্পের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল বিকল্প-বোধও দ্রব্য, গুণ, জাতি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ঘটিবার পরই উদিত হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় কোন

প্রত্যক্ষকেই নির্ব্বিকল্প বলা চলে না। সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষই বিশিষ্ট-বোধ বলিয়া জানিবে—অতো বিশিষ্টবিষয়-সাক্ষাৎকার এব প্রত্যক্ষস্য ফলমিতি। প্রমাণপদ্ধতি, ২৮ পৃষ্ঠা, এইরূপে মাধ্ব-প্রমাণবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ দ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষমাত্রই যে কোন-না-কোন প্রকারের বিশেষ বোধ (Determinate Cognition), নির্ব্বিশেষ বোধ নহে, তাহা নানাপ্রকার যুক্তির সাহায্যে উপপাদন করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক আচার্য্য রামানুজের মতে প্রমাণের স্বরূপের আলোচনায় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই (৫০ পৃষ্ঠায়) আমরা দেখিয়াছি যে,

বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তের মতে প্রমাণের সংখ্যা ও প্রত্যক্ষের স্বরূপ

প্র-পূর্ব্বক "মা" ধাতুর পর করণবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া, প্রমাণ শব্দের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান এবং তাহার মুখ্য সাধন, এই উভয়কেই বুঝা যায়। প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের মুখ্য সাধন রামানুজের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম, এই তিন প্রকার। আচার্য্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে শঙ্করোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ যে প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, ইহা প্রদর্শন করিতে গিয়া উল্লিখিত তিন প্রকার প্রমাণই অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রমাণের সংখ্যা-সম্পর্কে দার্শনিকগণের মধ্যে গুরুতর মত-ভেদ থাকিলেও রামানুজের মতে উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণ-ব্যতীত, অন্য কোন প্রকার প্রমাণ মানিবার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। রামানুজ তাঁহার বেদার্থসংগ্রহেও ঐ তিন প্রকার প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুচিত্ত তাঁহার প্রমাণসংগ্রহ নামক গ্রন্থে রামানুজোক্ত ত্রিবিধ প্রমাণ-বাদই সমর্থন করিয়াছেন। মনু, শৌনক প্রমুখ মহর্ষিগণও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে, রামানুজ যদি প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই প্রমাণত্রয়-বাদই অঙ্গীকার করেন, এই ত্রিবিধ প্রমাণ ভিন্ন, অন্য কোন প্রমাণ না মানেন, তবে, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম-মপোহনঞ্চ। গীতা, ১৩।১৫, এই গীতার শ্লোকের জ্ঞান-পদের ব্যাখ্যায় রামানুজ-ভাষ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগমের ন্যায় যোগ-দৃষ্টিকেও যে

১। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ মনু-সংহিতা, ১০৫।১২,
দৃষ্টানুমানাগমজং ধ্যানস্তালম্বনং ত্রিধা। শৌনকের উক্তি বলিয়া বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধিতে উদ্ধৃত, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,

জ্ঞানের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—জ্ঞানমিন্দ্রিয়-লিঙ্গাগম-যোগজো বস্তু-নিশ্চয়ঃ। গীতার রামানুজ-ভাষ্য, ১৩।১৫, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? তারপর, স্মৃতি-জ্ঞান যে-ক্ষেত্রে সত্য হয়, সেই সত্য স্মৃতি মাধ্বের ন্যায় রামানুজের মতেও প্রমাণই বটে। এই অবস্থায় স্মৃতিকে প্রমাণের মধ্যে গণনা না করায় রামানুজের মতে প্রমাণের গণনা যে অসম্পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? "স্মৃতিঃপ্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।" এইরূপ মাধ্বোক্ত প্রমাণ-গণনায়ও দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির সহিত স্মৃতিকে মাধ্ব-মতে অতিরিক্ত চতুর্থ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রজ্ঞাপরিত্রাণ নামক গ্রন্থেও প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব্দের ন্যায়, স্মৃতির কারণ "সংস্কারোন্মেষ" বা সুপ্ত সংস্কারের জাগরণকে অন্যতম প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১] এইরূপ ক্ষেত্রে রামানুজোক্ত প্রমাণত্রয়-বাদ সমর্থন করা যায় কিরূপে? রামানুজের মত সমর্থন করিতে গিয়া আচার্য্য বেঙ্কট বলিয়াছেন যে, গীতা-ভাষ্যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত যোগজ দৃষ্টিকে যে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ যোগ-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যোগ-দৃষ্টিও তো এক প্রকার প্রত্যক্ষই বটে। প্রত্যক্ষের মধ্যে যোগ-দৃষ্টি বা যৌগিক প্রত্যক্ষকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যোগ-দৃষ্টিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণনা করার কোনই সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তারপর, স্মৃতিকে যে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, সেখানেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্রই স্মৃতির মূলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণই বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে অনুভূত বা জ্ঞাত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে। যে-বিষয়ে কোনরূপ পূর্ব্বের অনুভব নাই, সেই বিষয়ে কাহারও কখনও স্মৃতি হইতে দেখা যায় না। জ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যাহা জ্ঞান, পরমুহূর্ত্তে তাহাই সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, এবং ঐ সুপ্ত সংস্কার কোনও বিশেষ কারণে উদ্‌বুদ্ধ বা জাগরিত হইয়া স্মৃতি উৎপাদন করে। এইরূপে স্মৃতির তত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, স্মৃতি অনুভূতি-জাত সংস্কারের ফল বিধায়, স্মৃতির মূলে অনুভবের

১। তত্রেন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধো লিঙ্গাগমগ্রহৌ তথা।
সংস্কারোন্মেষ ইত্যেতে সংবিদাং জন্মহেতবঃ॥ ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭০ পৃষ্ঠা,

খেলাই চলিতেছে। ঐ অনুভব প্রত্যক্ষাত্মক, অনুমানাত্মক বা শব্দমূলক যে জাতীয়ই হউক, ঐ জাতীয় (অনুভবের সজাতীয়) সংস্কারই সে উৎপাদন করিবে; এবং সংস্কারটি যেই জাতীয় হইবে, স্মৃতিও তদনুরূপই হইবে। স্মৃতি-জ্ঞান এইরূপে অনুভূতির অধীন এবং অনুভূতির অধীন বিধায় অনুভূতি হইতে ইহা অবশ্য নিকৃষ্ট স্তরের জ্ঞান। এইজন্যই দেখা যায় যে, কোন কোন দার্শনিক স্মৃতিকে প্রমার মধ্যে গণনা করিতেই প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে "প্রমা" পদের "প্র" এই উপসর্গ দ্বারা "মা" বা জ্ঞানের যে উৎকর্ষতা সূচিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র অনুভবরূপ জ্ঞানই প্রশস্ত জ্ঞান এবং উহাই প্রমা। অনুভূতি-জাত সংস্কারের ফলে উৎপন্ন স্মৃতির স্থলে সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, সংস্কার হইবে এ-ক্ষেত্রে স্মৃতির অবান্তর ব্যাপার বা মধ্যবর্ত্তী কার্য্য। স্মৃতি—প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি যে জাতীয় অনুভব-মূলে উৎপন্ন হইবে, সেই অনুভবের মধ্যেই স্মৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে, পৃথক্ প্রমাণ হিসাবে গণনা করার কোন প্রশ্ন উঠিবে না। ফলে, প্রমাণ এইমতে তিন বৈ আর চার হইবে না।[১] যাঁহারা স্মৃতিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গণনা করার পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বতন সংস্কার না থাকিলে কোন বিষয়েরই কখনও স্মৃতি হইতে পারে না, স্মৃতি অনুভূতি-জাত সংস্কারের ফলে উৎপন্ন হয়, ইহা অবশ্য সত্য কথা। এইভাবে উৎপত্তির জন্য স্মৃতি অনুভূতির অধীন হইলেও সুপ্ত সংস্কারের উন্মেষের ফলে স্মৃতি-জ্ঞান উদিত হইয়া স্মৃতি যখন স্মৃত বিষয়টি স্মরণকর্ত্তার মনের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, সেখানে স্মৃতি যে অনুভবের ন্যায়ই স্বাধীন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এইরূপে মেঘনাদারি তাঁহার নয়দ্যুমণি নামক গ্রন্থে স্মৃতিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার অনুকূলে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলেও বেঙ্কটনাথ প্রমুখ আচার্য্যগণ সত্য বস্তুর স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করিয়াও স্মৃতির করণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; স্মৃতির মূলে যে অনুভব আছে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি যেই জাতীয়

১। যদ্যপি স্মৃতিরপি যথার্থা প্রমাণমিতি বক্ষ্যতে। তথাপি প্রত্যক্ষাদি-মূলতয়া তদবিশেষাৎ পৃথগনুক্তিঃ। উক্তঞ্চ তত্ত্বরত্নাকরে প্রত্যক্ষাদিমূলানাং স্মৃতীনাং স্ব স্বমূলেঽন্তর্ভাব বিবক্ষয়া প্রমাণত্রিত্বাবিরোধঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭০ পৃষ্ঠা,

অনুভূতি-জাত সংস্কারমূলে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জাতীয় অনুভবের মধ্যেই স্মৃতি-প্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া রামানুজোক্ত প্রমাণত্রয়-বাদ উপপাদন ও সমর্থন করিয়াছেন। মধ্ব প্রভৃতির মতের আলোচনায়ও আমরা দেখিয়াছি যে, জয়তীর্থ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সত্য স্মৃতিকে প্রমা-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াও স্মৃতির করণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া সমর্থন করেন নাই। বিশ্বনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের অভিমতও এই যে, অনুভূতির করণই স্বতন্ত্র প্রমাণ, স্মৃতির করণ স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। মেঘনাদারি প্রভৃতি যে-সকল আচার্য্য স্মৃতিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া রামানুজের মতে চারটি প্রমাণ অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছুক, কিংবা প্রজ্ঞা-পরিত্রাণকারের মতানুসারে প্রত্যক্ষের স্বয়ংসিদ্ধ, দিব্য এবং লৌকিক, এই ত্রিবিধ বিভাগকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা দিয়া প্রমাণকে পাঁচ প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের এই সকল মত দুর্ব্বল এবং শ্রীভাষ্যকারের মতের বিরোধী বিধায় ঐরূপ বিভাগ গ্রহণ-যোগ্য নহে। শ্রীভাষ্যকারোক্ত প্রমাণত্রয়-বাদই যুক্তিসহ এবং গ্রহণ-যোগ্য। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-রহস্যজ্ঞ আচার্য্য পরপক্ষগিরিবজ্র-রচয়িতা মাধবমুকুন্দের প্রমাণ-বিচার-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মাধবমুকুন্দও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম, প্রমাণের এই ত্রিবিধ বিভাগই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য্য রামানুজের মতানুসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে গিয়া বেঙ্কট বলিয়াছেন—সাক্ষাৎকারি প্রমা প্রত্যক্ষম্, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭০ পৃঃ; "প্রমা প্রত্যক্ষম্" এইরূপে প্রমামাত্রকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিলে অনুমান বা শব্দ-প্রমাণমূলে যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাও প্রত্যক্ষই হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রত্যক্ষকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত লক্ষণে প্রমার বিশেষণরূপে "সাক্ষাৎকারি" এই পদটির অবতারণা করা হইয়াছে। শুধু "সাক্ষাৎকারি প্রত্যক্ষম্" এইরূপ বলিলে ঝিনুক-খণ্ড যেখানে ভ্রান্ত দর্শকের নিকট রজত-খণ্ড বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই ভ্রান্তিমূলক রজতের সাক্ষাৎকারে যথার্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আসিয়া দাঁড়ায় বলিয়াই আলোচিত লক্ষণে সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের বোধক 'প্রমা' পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে এখন প্রশ্ন আসে এই যে, "সাক্ষাকারি প্রমা"

রামানুজের মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ

বলিয়া প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কি বিশেষত্ব সূচিত হয়, যাহার ফলে যথার্থ প্রত্যক্ষ যথার্থ অনুমান প্রভৃতি হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বেঙ্কট এবং শ্রীনিবাস বলেন যে, "সাক্ষাৎকারি প্রমা" বলিয়া প্রমার এমন একটি বিশেষ স্বভাবের কথা বলা হইয়াছে যেই স্বভাবের বলে দৃশ্য বস্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞাতার গোচর হইয়া থাকে; এবং জ্ঞাতা "অহমিদং সাক্ষাৎকরোমি" আমি এই বস্তুটিকে সাক্ষাদ্‌ভাবে জানিয়াছি, এইরূপে অনুভব করে, এই শ্রেণীর জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। দ্রষ্টা পুরুষের নিজ অনুভবই এই বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, কশ্চিজ্ জ্ঞানস্বভাব-বিশেষঃ স্বাত্মসাক্ষিকঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭০; পক্ষান্তরে, সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ প্রমা বলিয়া স্মৃতি-ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে বুঝিবে, যাহার (যেই প্রমা-জ্ঞানের) মূলে অন্য কোন জ্ঞান করণরূপে বিদ্যমান নাই, এইরূপ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। জ্ঞানকরণজ জ্ঞান-স্মৃতি-রহিতা মতিরপরোক্ষমিতি, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭১ পৃঃ, অনুমানের মূলে ব্যাপ্তি-জ্ঞান এবং শব্দ-জ্ঞানের মূলে পদ ও পদার্থের শক্তি-জ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই করণরূপে বিদ্যমান আছে, এবং থাকিবে। কেননা, ব্যাপ্তি-জ্ঞান এবং পদ ও পদার্থের শক্তি-জ্ঞান না থাকিলে কস্মিন্ কালেও অনুমান বা শব্দ-জ্ঞানের উদয় হয় না, হইতে পারে না: সুতরাং অনুমান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতি দেখা যাইতেছে "জ্ঞান-করণজ" বা জ্ঞানমূলক জ্ঞান; প্রত্যক্ষের মূলে কোনরূপ জ্ঞান করণরূপে পাওয়া যায় না; এইজন্য "জ্ঞানকরণজ জ্ঞান (অনুমান ও শব্দ-জ্ঞান)—ভিন্ন জ্ঞান" বলিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষকে ধরা গেল, অনুমান প্রভৃতিকে ধরা গেল না; এবং উহাই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইল।[১] আলোচিত লক্ষণে "স্মৃতি-রহিতা মতিঃ" অর্থাৎ স্মৃতি-ভিন্ন জ্ঞান, এইরূপ বলায় (প্রত্যক্ষ-জ্ঞানমূলে উৎপন্ন) স্মৃতি যে প্রত্যক্ষ নহে, ইহাই স্পষ্টতঃ সূচনা করা হইল। ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান—ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানত্বং প্রত্যক্ষত্বম্, এইরূপে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিলে যোগীর যোগ-শক্তি প্রভাবে অতীত এবং ভবিষ্যৎ বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে যে-সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, কিংবা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সর্ব্ববিধ বস্তু-সম্পর্কে যে নিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, ঐ যোগীর প্রত্যক্ষ এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-জন্য নহে বলিয়া, ঐ সকল প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এইজন্য

১। জ্ঞানকরণক জ্ঞানান্যত্বে সতি স্মৃতি-ভিন্নত্বং প্রত্যক্ষত্বম্। ন্যায়সার, ৭১ পৃঃ,

ঐরূপ লক্ষণ ত্যাগ করিয়া যে-জ্ঞানের মূলে জ্ঞানরূপ কোন করণ বর্ত্তমান নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান—জ্ঞানাকরণজং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, এইরূপে লক্ষণের নির্ব্বচন করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িকগণও ঐরূপ অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, এইরূপ প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" এইপ্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ঐরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণে কোনরূপ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতির আশঙ্কা দেখা যায় না, সুতরাং ঐরূপ লক্ষণকেই প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষ লক্ষণ বলা চলে। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রমেয়-সংগ্রহ এবং তত্ত্বরত্নাকর নামক গ্রন্থেও প্রত্যক্ষের লক্ষণ-নিরূপণে বেঙ্কটনাথের ন্যায়পরিশুদ্ধির মতেরই পুরাপুরি অনুসরণ করা হইয়াছে দেখা যায়। বেঙ্কটোক্ত "সাক্ষাৎকারি প্রমা প্রত্যক্ষম্" এইরূপ লক্ষণের প্রতিধ্বনি করিয়া প্রমেয়সংগ্রহে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করা হইয়াছে—"সাক্ষাদনুভবঃ প্রত্যক্ষম্"। লক্ষণে উল্লিখিত "সাক্ষাৎ" শব্দের অর্থ উভয় মতেই তুল্য। ন্যায়পরিশুদ্ধিতে—যে-জ্ঞানের মূলে অন্য কোনরূপ জ্ঞান করণরূপে বর্ত্তমান থাকে না, স্মৃতি-ভিন্ন এই শ্রেণীর জ্ঞানই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এইরূপে জ্ঞানের অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা যে-ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তত্ত্বরত্নাকর গ্রন্থেও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই প্রমার অপরোক্ষতার নির্ণয় করা হইয়াছে।[১] তত্ত্বরত্নাকরের মতে বিশেষ দেখা যাইতেছে এই যে, তত্ত্বরত্নাকরের

১। অপরোক্ষ প্রমাধ্যক্ষমাপরোক্ষ্যঞ্চ সংবিদঃ।

ব্যবহার্য্যার্থসম্বন্ধিজ্ঞানজত্ববিবর্জনমিতি। ন্যায়পরিশুদ্ধিতে উদ্ধৃত তত্ত্বরত্নাকরের কারিকা, ন্যায়পরিঃ, ৭১ পৃঃ; উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জ্ঞানের অপরোক্ষতা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীনিবাস তাঁহার ন্যায়সারে বলিয়াছেন—জ্ঞানস্যাপরোক্ষ্যং নাম প্রবৃত্তিবিষয়ার্থসম্বন্ধিজ্ঞানজন্য-ভিন্নত্বম্। প্রবৃত্তি-বিষয়ার্থো বহ্ন্যাদিঃ তৎসম্বন্ধী ধূমাদিঃ শব্দশ্চ তজ্জ্ঞান-জন্য জ্ঞানমনুমিতিঃ শাব্দীচ তদ্‌ভিন্নত্বমিত্যর্থঃ। ন্যায়সার, ৭১ পৃঃ, শ্রীনিবাসের উক্তির মর্ম্ম এই যে, বিষয়-সম্পর্কে জ্ঞাতার জ্ঞানোদয়ের ফলে জ্ঞাতা যে-সকল বিষয় পাইতে অভিলাষ করেন, সেই বহ্নি প্রভৃতি পদার্থই হয় প্রবৃত্তির বিষয় অর্থ, প্রবৃত্তির বিষয় বহ্নি প্রভৃতির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে (ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে) সম্বদ্ধ যে ধূমাদি, কিংবা বহ্নির বাচ্য অর্থের বোধক বহ্নি প্রভৃতি শব্দ, তন্মূলক যে অনুমান এবং শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতি জন্মে, তদ্‌ভিন্ন জ্ঞানই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

সিদ্ধান্তে স্মৃতি যেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণমূলে উৎপন্ন হয়, সেই প্রমাণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রমাণের স্বভাবই প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ স্মৃতি যদি প্রত্যক্ষ-প্রমাণমূলে উৎপন্ন হয়, তবে স্মৃতি-জ্ঞানও সেখানে প্রত্যক্ষই হইবে, যদি পরোক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণমূলে উদিত হয়; তাহা হইলে স্মৃতিও সে-ক্ষেত্রে হইবে পরোক্ষ। এইজন্য এই মতে স্মৃতির অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা বারণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণে স্মৃতির ব্যাবর্ত্তক কোন বিশেষণের প্রয়োগ করার প্রশ্ন উঠে না।[১] বরদবিষ্ণু মিশ্র তাঁহার মান-যাথাত্ম্য-নির্ণয় গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া প্রমার বিশদ বা বিস্পষ্ট অবভাসকে প্রমার অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অপরোক্ষ-প্রমা প্রত্যক্ষম্, প্রমায়া আপরোক্ষ্যং নাম-বিশদাবভাসত্বমিতি ক্রমঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭২ পৃঃ, অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রমার বৈশদ্যটি কিরূপ? অর্থাৎ প্রমার "বিশদাবভাস" বলিলে কি বুঝিব? ইহার উত্তরে বরদবিষ্ণু প্রমার বৈশদ্য যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, যে-ক্ষেত্রে দৃশ্য বস্তুর আকার (অবয়ব-সংস্থান), পরিমাণ, রূপ, গুণ, প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মগুলি অতি স্পষ্টভাবে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হইবে, সেইখানেই জ্ঞানের বৈশদ্য (clearness and vividness) পরিস্ফুট হইবে—বৈশদ্যং নাম অসাধারণা-কারেণ বস্তুবভাসকত্বম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭২; প্রত্যক্ষে দৃশ্য বস্তুর যে-সকল বিশেষ বিশেষ ভাবের স্ফুরণ হয়, অনুমান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতিতে জ্ঞেয় বস্তুর ঐ সকল বিশেষ রূপের স্ফুরণ হয় না। এইজন্য বরদবিষ্ণুর জ্ঞানের "বিশদাভাস" কথা দ্বারা প্রত্যক্ষের স্বভাবই সূচিত হইল; অনুমান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতির স্থলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ন্যায় বস্তুর বিশদ বা বিস্পষ্ট অবভাস নাই বলিয়া অনুমান প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইতে পার্থক্যও প্রদর্শিত হইল।[২] এই প্রসঙ্গে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, বরদবিষ্ণুর মতে "বিশদাবভাস" কথা দ্বারা প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা খুব স্পষ্ট লক্ষণ হইয়াছে, এমন বলা চলে না। কারণ,

---

১। তত্তৎপ্রমাণমূলায়াঃ স্মৃতে স্তত্তৎপ্রমাণান্তর্ভাববিবক্ষয়া তদ্‌ব্যাবর্ত্তকবিশেষণং ন দত্তমিতি বোধ্যম্। ন্যায়সার, ৭১ পৃঃ,

২। অসাধারণাকারেণেতি, ব্যাপকতাবচ্ছেদক-শক্যতাবচ্ছেদক-ব্যতিরিক্ত তদসাধারণ সংস্থান-পরিমাণ-রূপাদি বিশিষ্ট বস্তুগোচরত্বমিত্যর্থঃ। ন্যায়সার, ৭২ পৃঃ,

"বিশদাবভাস" কথা দ্বারা অবভাস বা জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকাশের যে বৈশদ্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক বৈশদ্যেরই সূচনা করে। জ্ঞানমাত্রেরই যে আপেক্ষিক বৈশদ্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, জ্ঞান বিষয়ের অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপের পরিচ্ছেদক এবং প্রকাশক হয়, আর, জ্ঞেয় বিষয়টি হয় প্রকাশ্য ও পরিচ্ছেদ্য। বিষয়ের পরিচ্ছেদক এবং প্রকাশক জ্ঞান যখন জ্ঞাতার নিকট পরিচ্ছেদ্য বিষয়টি প্রকাশ করিবে, তখন সেই বিষয়-ভাসক জ্ঞানমাত্রেরই যে আপেক্ষিক বৈশদ্য থাকিবে, তাহা কোন সুধী দার্শনিকই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফলে, প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান, আগম প্রভৃতিরও আপেক্ষিক বৈশদ্য থাকায় তাহাতে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে। কোন কোন সুধী আবার 'ধী-স্ফুটতা' (clearness of awareness) অর্থাৎ জ্ঞানটি যেখানে অত্যধিক পরিস্ফুট হইবে, সেখানে ঐ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে, এইরূপেও প্রত্যক্ষের লক্ষণ-নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। বরদবিষ্ণুর "বিশদাবভাসকে" যেই যুক্তিতে প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষ লক্ষণ বলা চলে না, "ধী-স্ফুটতা" "স্বরূপ ধী" প্রভৃতিও সেই যুক্তিতেই প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আচার্য্য মেঘনাদারি তাঁহার নয়দ্যুমণি নামক গ্রন্থে উল্লিখিত যুক্তিবলেই বরদবিষ্ণুর "বিশদাবভাস বা প্রমার সুস্পষ্ট প্রকাশই, প্রমার প্রত্যক্ষতা" (প্রমায়া বিশদাবভাসত্বং প্রত্যক্ষত্বম্), এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর পরিচ্ছেদক বা প্রকাশক সাক্ষাৎজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অর্থ-পরিচ্ছেদক সাক্ষাজ্ জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। আচার্য্য মেঘনাদারির এই লক্ষণে "সাক্ষাৎজ্ঞান" বলিতে কি বুঝায়? (অর্থাৎ জ্ঞানের সাক্ষাত্ত্ব কি?) তাহা পরিষ্কার করা আবশ্যক। ন্যায়পরিশুদ্ধি এবং তত্ত্বরত্নাকরের প্রত্যক্ষের স্বরূপ-বিচারে আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, যে-জ্ঞানের উৎপত্তিতে অন্য কোন জ্ঞান করণ হয় না, সেইরূপ "জ্ঞানাকরণজ" জ্ঞানই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। এইভাবে জ্ঞানের সাক্ষাত্ত্ব বা প্রত্যক্ষতা ব্যাখ্যা করিলে কোন প্রকার অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের সম্ভাবনা থাকে না। মেঘনাদারি তাঁহার নয়দ্যুমণিতেও ঐ দৃষ্টিতেই প্রমার সাক্ষাত্ত্ব, অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে প্রথমতঃ দুই

প্রকার – নিত্য প্রত্যক্ষ এবং অনিত্য প্রত্যক্ষ। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ বস্তু-সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাকে বলে নিত্য প্রত্যক্ষ, আর আমাদেরঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষকে বলে অনিত্য প্রত্যক্ষ। ঐ অনিত্য প্রত্যক্ষও আবার দুই প্রকার—(ক) যোগীর প্রত্যক্ষ ও (খ) অযোগীর প্রত্যক্ষ। যোগী যখন যোগযুক্ত বা সমাহিত অবস্থায় সাধারণের ভূমি হইতে উচ্চগ্রামে আরোহণ করেন, তখন যোগীর বহিরিন্দ্রিয় সকল তাহাদের স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে বিরত হয়, মনঃই একমাত্র ক্রিয়াশীল থাকে। এইরূপ অবস্থায় যোগীর নিতান্ত শুভাদৃষ্টবশতঃ যোগশক্তি-প্রভাবে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকেই বলে যোগীর প্রত্যক্ষ বা যোগজ প্রত্যক্ষ। তোমার আমার যে-সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব কখনও প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, হইতে পারে না, ঐ সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব যোগী সমাহিত চিত্তে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে যাহাকে আর্ষ প্রত্যক্ষ বা ঋষির প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, ঐ প্রত্যক্ষও যোগীর প্রত্যক্ষের অনুরূপ বিধায় উল্লিখিত যোগী-প্রত্যক্ষের মধ্যেই উহাকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এইজন্য এই মতে আর্ষ প্রত্যক্ষের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন হয় না। সমাধি ভাঙ্গিয়া গেলে যোগী যখন যোগগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া সাধারণের ভূমিতে আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাঁহার নিরুদ্ধ বহিরিন্দ্রিয় সকল ক্রিয়াশীল হয়, ঐ অবস্থায় বাহ্য চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে যোগী যে দৃষ্টি লাভ করেন, যে-দৃষ্টির সাহায্যে সাধারণ সংসারীর ন্যায় যোগী পুরুষও কল্যাণকরকে গ্রহণ করেন, অনিষ্টকরকে পরিত্যাগ করেন, যোগীর ঐরূপ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ সাধারণ প্রত্যক্ষই বটে। যোগযুক্ত অবস্থার দৃষ্টিই যোগ-দৃষ্টি বা যোগজ প্রত্যক্ষ। ঐরূপ যোগীর প্রত্যক্ষে পরমেশ্বর তত্ত্ব প্রভৃতিও যোগীর দিব্য দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকে। যোগীর এই প্রকার প্রত্যক্ষে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বেঙ্কট এবং শ্রীনিবাস বলেন যে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ জ্ঞেয় বিষয়মাত্রেরই অবভাসক বটে; অবিদ্যার আবরণে মানুষের বিজ্ঞান-চক্ষুঃ আবৃত রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল দেখিতে পায় না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে, কিংবা যোগশক্তি-প্রভাবে মানুষ যদি দিব্য দৃষ্টি লাভ করে, তবে তাঁহার জ্ঞানের আবরণ অজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায়, সে যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয়-সম্পর্কেও সত্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ভগবানের

রামানুজ-মতে প্রত্যক্ষের বিভাগ

দেওয়া চক্ষুতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টি লাভ করতঃ কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যে যুদ্ধ বিবরণ শুনাইয়াছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত নেত্রে শব্দ-ব্রহ্মের যে ছন্দোময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার প্রামাণ্য-সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া ঋষির যোগ-শক্তির প্রভাবে লব্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে কি?[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি যদি যোগ-দৃষ্টির সাহায্যেই প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, তবে, শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩,) এই ব্রহ্মসূত্রে পরব্রহ্মকে জানিবার পক্ষে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, এইরূপে ব্রহ্মকে যে শাস্ত্রযোনি বা শাস্ত্র-গম্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? দ্বিতীয় কথা এই যে, উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম একমাত্র আগম্য-গম্য, ব্রহ্মোপলব্ধিতে যোগজ প্রত্যক্ষও কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেননা, মহোদধির তরঙ্গমালার ন্যায় সতত চঞ্চল চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ, এবং কোনও বস্তু-সম্পর্কে সমুদিত ভাবনা বা চিন্তার চরম ও পরম উৎকর্ষের ফলেই যোগ-দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ যোগ-দৃষ্টিতে পূর্ব্বের অনুভূত বিষয়ের বিশদ অবভাস বা সুস্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব হইলেও পূর্ব্বের অনুভূত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া এই দৃষ্টি স্মৃতি-ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ঐরূপ যোগ-দৃষ্টির পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করাইবার যোগ্যতা কোথায়?[২] এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে যোগ-দৃষ্টির ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়া, পরে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের

১। অত্রেন্দ্রিয়ানপেক্ষং যজ্‌জ্ঞানমর্থাবভাসকম্।
দিব্যং প্রমাণমিত্যেতৎ প্রমাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥
পরমেশ্বর-বিজ্ঞানং মুক্তানাঞ্চধিয়স্তপা।
সঞ্জয়ার্জ্জুন-বাল্মীকি প্রভৃত্যার্ষধিয়োঽপিতৎ॥ বেঙ্কট কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রজ্ঞা-পরিত্রাণ নামক গ্রন্থের শ্লোক, বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭৫ পৃষ্ঠা,
নতুমাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামিতে চক্ষুঃ পশ্যমে রূপমৈশ্বরম্॥ গীতা, ১১।৮,

২। নাপি যোগজন্ম্; ভাবনা-প্রকর্ষজন্মনস্তস্য বিশদাবভাসত্বেঽপি পূর্ব্বানুভূত বিষয়-স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ প্রত্যক্ষতা? শ্রীভাষ্য, ১।১।৩,

পনের শ্লোকের রামানুজ-ভাষ্যে যোগ-দৃষ্টিকে পরমেশ্বর প্রত্যক্ষের সহায়করূপে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা রামানুজের উক্তি পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে নাই কি? তারপর, গীতা-ভাষ্যের উক্তি-অনুসারে পরমেশ্বর-তত্ত্ব প্রভৃতি যদি যোগ-গম্য বলিয়াই সাব্যস্ত হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে আলোচিত ব্রহ্ম সূত্রোক্ত পরব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব সিদ্ধান্ত গীতা-ভাষ্যোক্ত সিদ্ধান্তের অনুবাদ বা পুনরুক্তিই হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বেঙ্কট বলেন, যোগ-দৃষ্টির যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করাইবার সামর্থ্য আছে, তাহা ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হইতেই জানা যায়—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। গীতা ১১।৮, গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ, এই শ্লোকাংশের রামানুজ-ভাষ্যেও যোগ-দৃষ্টির ভগবদ্দর্শন-সামর্থ্যই ভাষ্যকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় সূত্রে (শাস্ত্রযানিত্বাধিকরণে) যোগজ দৃষ্টির যে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্ত্ব-বোধের অসামর্থ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, একই বস্তুর পুনঃ পুনঃ ভাবনাই যোগ, যোগের এইরূপ নির্ব্বচনই যোগ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিতে যোগ-রহস্য বিচার করিলে বিরহী প্রণয়ীর স্বীয় প্রণয়িনী-সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ ভাবনাও (বিধুর-কামিনী-দর্শনও) যোগ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; এবং ঐরূপ পুনঃ পুনঃ ভাবনার ফলে বিরহীর প্রণয়িনী বিষয়ে যে সাক্ষাৎকার হয়, তাহাও যোগজ প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপ যোগ-দৃষ্টি প্রকৃত যোগ-দৃষ্টি নহে, উহা একপ্রকার বিভ্রমমাত্র। (তথাহি তস্য ভ্রমরূপতা, শ্রীভাষ্য ১।১।৩,) ঐরূপ ভ্রমাত্মক, কলুষিত তথাকথিত যোগ-দৃষ্টিরই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব দর্শনের অক্ষমতা বর্ণনা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[১] যোগ-দৃষ্টির সাহায্যে ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর বিধায় "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে যে শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ আগম-গম্য বলা হইয়াছে, তাহা যোগ-দৃষ্টির সাহায্যে লব্ধ সিদ্ধান্তের অনুবাদ বা পুনরুক্তি মাত্র। এইরূপ

১। (ক) ভাবনাবলজমাত্রং জগৎকর্ত্তরি প্রত্যক্ষং প্রতিক্ষিপ্তং শাস্ত্রযোন্যধিকরণে। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭৩ পৃঃ,

(খ) তত্র হি পরিভাবিতকামিনী-সাক্ষাৎকারসদৃশঃ ভাবনাবলমাত্রজঃ সাক্ষাৎকার ঈশ্বরে প্রতিক্ষিপ্তঃ। ন তু প্রকৃষ্টাদৃষ্টসহকৃতেন্দ্রিয়জঃ সাক্ষাৎকার ইত্যর্থঃ। ন্যায়সার, ৭৩ পৃঃ,

আপত্তির উত্তরে বেঙ্কট বলেন যে, আলোচিত যোগ-দৃষ্টিও বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলনের এবং শাস্ত্রাভিনিবেশের ফলেই পণ্ডিতগণ লাভ করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ শাস্ত্র হইতে জানিয়া লইয়া ঐ বিষয়ে মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন প্রভৃতির ফলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সমাধিনিষ্ঠ সাধক যোগ-দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ যোগ-দৃষ্টির মূলে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি তত্ত্ব শাস্ত্রই প্রমাণ বিধায় বেদাদি-লব্ধ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুবাদ বা পুনরুক্তির প্রশ্ন কোনমতেই উঠিতে পারে না। যোগজ দৃষ্টিই বরং বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়া দাঁড়ায়।[১]

যোগীর যোগ-দৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হইল ; এখন অযোগীর প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। অদিব্য চক্ষু, কর্ণ প্রমুখ বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গের রূপ, রস প্রভৃতি স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ফলে কাল, অদৃষ্ট প্রভৃতি সাধারণ কারণের এবং দৃশ্যবস্তুর রূপ, আলোক প্রভৃতি প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের সহায়তায় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অযোগীর প্রত্যক্ষ বা ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে। চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভেদে ঐ বাহ্য প্রত্যক্ষও চাক্ষুষ, শ্রবণেন্দ্রিয়জ, ঘ্রাণজ, রাসন ও ত্বগিন্দ্রিয়জ, এই পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে।[২] এই অযোগীর প্রত্যক্ষকে "অদিব্য বাহ্যেন্দ্রিয়জ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, যোগ-যুক্ত অবস্থায় উক্ত যোগীপুরুষের বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, (মনোমাত্র-জন্য) যে মানস-প্রত্যক্ষের উদয় হয়, সেইরূপ (কেবল মনোজন্য) মানস-প্রত্যক্ষ আমাদের ন্যায় স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন অযোগী ব্যক্তির কস্মিন্‌কালেও জন্মে না, জন্মিতে পারে না, ইহাই প্রাচীন বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। মানসপ্রত্যক্ষমস্মদাদীনাং নাস্ত্যেবেতি বৃদ্ধ-সম্প্রদায়ঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি,

১। নম্বেবং যোগজপ্রত্যক্ষসিদ্ধেশ্বর-বোধকত্বাদেবাগমস্যানুবাদকত্বং স্যাদিত্যত-আহ,...আগমাদীশ্বরমধিগম্য তং প্রপদ্য তৎপ্রসাদেন লব্ধদিব্যেন্দ্রিয়াণাং যোগিনাং জ্ঞানমাগমং স্বসিদ্ধানুবাদীকর্ত্তুং নেষ্টে। আগমাদীশ্বরসিদ্ধ্যভাবে স্বস্যৈবানুদয়াৎ। প্রত্যুত স্বস্যৈবাগমাধিগতার্থগন্তৃত্বাদিত্যর্থঃ। ন্যায়সার, ৭০ পৃষ্ঠা,

২। অদিব্যবাহ্যেন্দ্রিয়-প্রসূতং জ্ঞানমযোগি প্রত্যক্ষং তৎসামান্যাদৃষ্টালোক-বিশেষসহকৃতেন্দ্রিয়জন্যং দৃষ্টসামগ্রীবিশেষাৎ প্রতিনিয়তবিষয়ং তচ্ছ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াসাধারণ-কারণভেদাৎ পঞ্চধা। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭৭ পৃঃ,

৭৬ পৃঃ, প্রশ্ন হইতে পারে যে, অযোগী ব্যক্তির মানস-প্রত্যক্ষ সম্ভবপর না হইলে আত্মার স্বরূপ এবং আত্মার বিবিধপ্রকার গুণরাজিসম্পর্কে অযোগীপুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞানোদয় হইবে কিরূপে? সুখ, দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষই বা সম্ভবপর হইবে কিরূপে? আত্মা, আত্মার বিবিধ ধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কিছুইতো স্থূল বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, ঐ সমস্তইতো মনোগম্য। ইহার উত্তরে স্থূলদর্শী অযোগীর মানস-প্রত্যক্ষ যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা বলেন যে, বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মতে অনন্ত গুণময় আত্মা চিৎস্বরূপও বটে, চৈতন্য গুণময়ও বটে; এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক ইতি। শ্রীভাষ্য, ৯৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং; স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মার কিংবা আত্ম-ধর্ম্ম তেজোময় অনন্ত গুণরাজির প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই। আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ বিধায় আত্মার প্রকাশের জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়েরও যেমন অপেক্ষা নাই, মনেরও সেরূপ অপেক্ষা নাই। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সব সময়েই বোধ-সাপেক্ষ; জ্ঞানে না ভাসিলে সুখ, দুঃখের তো কোনই অর্থ হয় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যে-জ্ঞানের জ্ঞেয়, সেই জ্ঞানের প্রকাশই সুখ, দুঃখের প্রকাশ। জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই জড় এবং পরপ্রকাশ; চৈতন্যই একমাত্র স্বয়ংপ্রকাশ। চৈতন্যের প্রকাশেই জড় বিষয়েরও প্রকাশ সম্ভবপর হয়; বিষয়ের প্রকাশের জন্য বিষয়ের ভাসক চৈতন্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই। সুতরাং সুখ-দুঃখের প্রকাশ সুখ-দুঃখের ভাসক চৈতন্যেরই প্রকাশ বটে; সুখ, দুঃখের প্রকাশের জন্য মনের অধ্যক্ষতা কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া বৃদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায় স্থূলদর্শী অযোগীর মানস-প্রত্যক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। আলোচিত প্রত্যক্ষ-লক্ষণে চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সন্নিকর্ষ নৈয়ায়িকের মতে ছয় প্রকার; ইহা আমরা পূর্ব্বেই (৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায়) বলিয়া আসিয়াছি। রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি সকল বেদান্ত সম্প্রদায়ই নৈয়ায়িক-গণের স্বীকৃত সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়া সমবায়ের স্থলে তাদাত্ম্য বা অভেদ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, ইহাও আমরা মাধ্ব-মতের প্রত্যক্ষের আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি। মাধ্ব-মতে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ অভেদ; ফলে, গুণীর প্রত্যক্ষেই গুণময় দ্রব্যে আশ্রিত গুণরাজিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উক্ত মাধ্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বেঙ্কটনাথও বলিয়াছেন যে, সংযোগ

সম্বন্ধে দ্রব্যের এবং সংযুক্তাশ্রয়তা সম্বন্ধে চক্ষুঃ-সংযুক্ত দ্রব্যে অবস্থিত গুণ-রাজির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।[১]

আলোচ্য প্রত্যক্ষ সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পক ভেদে দুই প্রকার। গৌতম-সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের আলোচনায় (৫৯-৬০ পৃঃ,) আমরা দেখিতে পাই যে, সূত্রে "অব্যপদেশ্যম্" এবং "ব্যবসায়াত্মকম্" এই দুইটি পদের প্রয়োগ করিয়া প্রথম পদটির দ্বারা নির্ব্বিকল্পক ও দ্বিতীয় পদটির দ্বারা সবিকল্পক, প্রত্যক্ষের এইরূপ দুই প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করা হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণের মতে যে-প্রত্যক্ষে কোনরূপ বিকল্প বা বিশেষ ভাবের স্ফূরণ হয় না, পদার্থের স্বরূপমাত্রের বোধক ঐরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক, আর নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান-সংবলিত প্রত্যক্ষ বোধকে সবিকল্পক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মাধ্ব-মতের প্রত্যক্ষের আলোচনায় আমরা (৭৬-৭৭ পৃঃ,) দেখিয়াছি, মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতে সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষই সবিকল্পক বোধ বা বিশিষ্ট বোধ। সর্ব্ববিধ বিকল্প বা বিশেষভাব-রহিত নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব কল্পনা। রামানুজ সম্প্রদায়ও এই মতেরই পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষং দ্বিধা সবিকল্পকং নির্ব্বিকল্পকঞ্চেতি ......উভয়মপ্যেতদ্ বিশিষ্টবিষয়মেব, অবিশিষ্ট বস্তুগ্রাহিণো জ্ঞানস্য অনুপলম্ভাদনুপপত্তেশ্চ। ন্যায়-পরিশুদ্ধি, ৭৭-৭৮ পৃঃ, স্বয়ং শ্রীভাষ্যকারও তাঁহার ভাষ্যে নির্ব্বিকল্পক এবং সবিকল্পকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যেমন দৃশ্য বস্তুর নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সেইরূপ দৃশ্য বস্তুর কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই উদিত হয়। নির্ব্বিকল্পক শব্দের অর্থ কোন-না-কোন বিশেষ ধর্ম্মের ভাতি রহিত বস্তুর জ্ঞান, সর্ব্ববিধ বিশেষ ভাব বা ধর্ম্মরহিত বস্তুর জ্ঞান নহে। সর্ব্বপ্রকার বিশেষভাব-বর্জ্জিত বস্তুর জ্ঞান কস্মিন্ কালেও উদিত হয় না, হইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানমাত্রই "ইহা এই প্রকার" "ইদমিত্থম্" এইরূপে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় ভাব-সংবলিত হইয়াই উদিত হয়; "ইহা" বা "ইদম্" অংশ উদ্দেশ্য, "এই প্রকার" এই প্রকারাংশ বিধেয়।

রামানুজ-মতে নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের স্বরূপ

১। অথ বৃদ্ধা বিদামাসুঃ সংযোগঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংযুক্তাশ্রয়ণঞ্চেতি যথাসম্ভবমূহ্যতাম॥

ন্যায়পরিশুদ্ধির ৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তত্ত্বরত্নাকরের শ্লোক,

এই প্রকারাংশই "ইদম্" অংশকে রূপায়িত করতঃ জ্ঞানের পরিধি বর্দ্ধিত করে। প্রকারাংশ-বিহীন বা বিধেয়ভাব-শূন্য প্রতীতি সম্পূর্ণ অসম্ভব কল্পনা। তবে, কোন বিশেষ-প্রত্যক্ষকে নির্ব্বিকল্পক, আর, কোন বিশেষ বোধকে যে সবিকল্পক বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের যত প্রকার বিশেষ ভাব বা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষে ভাসে, তাহাদের সকলগুলি বিশেষ ভাবের প্রতীতি না হইয়া, যদি কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হয়, তবে সেই প্রত্যক্ষই হইবে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ—নির্ব্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণং, ন সর্ব্ববিশেষরহিতস্য; শ্রীভাষ্য, ৭৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং, উক্ত নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের উদাহরণস্বরূপে শ্রীভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আমরা প্রথমে যখন গরু দেখিতে পাই, তখন তাহার আকৃতি, গুণ প্রভৃতি সমস্তই সেই গরুতে আমরা প্রত্যক্ষ করি; পরে যখন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার গরু দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমার প্রথম-দৃষ্ট গরুতে যে আকার বা গোত্ব আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা কেবল সেই গরুতেই সীমাবদ্ধ নহে, সমস্ত গরুতেই গোত্ব বা গরুর যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রথম গো-দর্শনে গোর ধর্ম্ম গোত্ব জানা গেলেও সকল গরুতেই সেই গোত্বের যে অনুবৃত্তি আছে, এই বিশেষত্বটুকু জানা যায় না। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বারে যখন গরু দেখা যায়, সকল গরুতে গোর ধর্ম্ম গোত্বের অনুবৃত্তিটি তখনই শুধু বোঝা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে (সমস্ত গরুতে গোত্বের অনুবৃত্তির জ্ঞান-রহিত) প্রথম গো-দর্শনকে বলা হয় নির্ব্বিকল্পক, সকল গরুতে গোত্বের অনুবৃত্তির জ্ঞান-সহিত দ্বিতীয়, তৃতীয় বারের গো-দর্শনকে বলা হয় সবিকল্পক।[১] এই মতে গোর বিশেষ আকার বা অবয়বই গোত্ব জাতি। ঐ গোত্ব জাতি গো-ব্যক্তির ন্যায়ই

১। নির্ব্বিকল্পকমেক জাতীয় দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণম্, দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণং সবিকল্পকমিত্যুচ্যতে। তত্র প্রথম পিণ্ড-গ্রহণে গোত্বাদেরনুবৃত্তাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণেষ্বেবানুবৃত্তি প্রতীতিঃ। প্রথম প্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ গোত্বাদেরনুবৃত্তি ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণাসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিকল্পকত্বম্। সাস্নাদিমদ্‌বস্তুসংস্থানরূপ গোত্বাদেরনুবৃত্তি র্ন প্রথম পিণ্ড-গ্রহণে গৃহ্যতে ইতি প্রথম পিণ্ড-গ্রহণস্য নির্ব্বিকল্পকত্বম্, শ্রীভাষ্য, ৭৩ পৃঃ; পরিশুদ্ধি, ৭৭-৮০ পৃঃ;

ইন্দ্রিয়-বেদ্য। গরুর বিশেষ আকার না জানিলে গরুকে চিনিবে কিরূপে? গরুকে জানিতে হইলে উহার আকার বা বিশেষ অবয়ব-বিন্যাস দেখিয়াই ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী হইতে ভিন্নরূপে গরুকে জানা যায়। সুতরাং প্রথম গো-দর্শনেও যে গোত্ব-বিশিষ্ট গোরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম বা বিশেষ ভাব-রহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ কস্মিন্ কালেও সম্ভবপর নহে। এইরূপে আচার্য্য রামানুজ শ্রীভাষ্যে নৈয়ায়িক এবং অদ্বৈতবেদান্তীর স্বীকৃত সর্ব্ববিধ বিশেষভাব-রহিত নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ-বাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ প্রত্যক্ষ-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। রামানুজের উক্ত আলোচনা হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে যে, সমস্ত প্রতীতিই যখন "ইহা এই প্রকার" অর্থাৎ "ইদমিত্থম্" রূপে উৎপন্ন হয়, তখন অদ্বৈতবেদান্তীর অঙ্গীকৃত নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষ-বাদ যুক্তি-এবং অনুভব-বিরুদ্ধ অসম্ভব কল্পনা। গরুকে চেনার অর্থ ই গো-ভিন্ন প্রাণী হইতে গরুর ভেদ উপলব্ধি করা। গরুর বিশেষ অবয়ব-বিন্যাস বা আকার দেখিয়াই ঐ ভেদ লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষের দ্বারা কেবল নির্ব্বিশেষ সত্তারই জ্ঞান হইয়া থাকে, সবিশেষ কোন ভাবের স্ফুরণ হয় না। জ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান-দ্বারা বস্তুর স্বরূপটিমাত্র জানা যায়, এক বস্তুর অপরাপর বস্তু হইতে যে ভেদ আছে, তাহা বুঝা যায় না। অদ্বৈতবেদান্তীর ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামানুজ বলেন যে, দৃশ্যবস্তুর স্বরূপের বোধ অর্থ ইতো সেই বস্তুটি যে অপরাপর বস্তু হইতে ভিন্ন এইটি বোঝা। গোর স্বরূপই এই যে উহা ঘোড়া বা মহিষ নহে। গরুর বিশেষ আকৃতি বা অবয়ব-বিন্যাসই গরুর স্বরূপ; উহা দ্বারাই ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী হইতে গরুর ভেদ বুঝা যায়।[১] গোত্বাদিরেব ভেদঃ, শ্রীভাষ্য, ৮০ পৃঃ; সুতরাং কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝিলেও সেই বস্তুর অপর বস্তু হইতে ভেদ বুঝা যায় না, এইরূপ কল্পনা একান্তই ভিত্তিহীন। তারপর, প্রত্যক্ষে যদি কেবল নির্ব্বিশেষ সত্তারই প্রতীতি হইত, নির্ব্বিশেষ সত্তা ব্যতীত অপর কোন বিশেষ ভাবের স্ফুরণ না হইত, তবে অশ্বের প্রত্যক্ষও মহিষের প্রত্যক্ষ, এই দুইটি প্রত্যক্ষের মধ্যে যে বিভেদ আছে তাহা কিরূপে

১। যদ্‌গ্রহো যত্র যদারোপবিরোধী স হি তস্য তস্মাদ্ ভেদঃ। গোত্বাদিচ গৃহ্যমাণং স্বস্মিন্ স্বাশ্রয়ে চ অশ্বত্বাদ্যারোপং নিরুণদ্ধতি ইতি স্বস্য স্বাশ্রয়স্য স্বয়মেব তস্মাদ্ ভেদঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৮৬ পৃঃ,

বুঝা যাইত? নির্ব্বিশেষ সত্তার মধ্যে তো কোন ভেদ নাই। আর, উল্লিখিত প্রত্যক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদ যদি নাই থাকিত, তবে অশ্বার্থী মহিষের কাছে গিয়া মহিষ দেখিয়া ফিরিয়া আসে কেন? এই ফিরিয়া আসা দ্বারা অশ্ব ও মহিষের আকৃতি, অবয়ব-সংস্থান বা জাতিই যে প্রত্যক্ষের ভাসিতেছে এবং ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের ভেদ সাধন করিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়; এবং নির্ব্বিশেষ সত্তার অতিরিক্ত দৃশ্য বস্তুর আকৃতি বা অবয়ব-বিন্যাস প্রভৃতি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ-গম্য হইয়া প্রত্যক্ষের মধ্যে পরস্পর ভেদ উপপাদন করে, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়। প্রত্যক্ষমাত্রেই এইরূপে দৃশ্য বস্তুর ভেদের প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার ভেদ-সম্পর্ক-বর্জ্জিত কোন প্রত্যক্ষই কখনও সম্ভবপর হয় না। এমন কি বালক ও মূক ব্যক্তির অপরিস্ফুট বস্তু-জ্ঞানও কোন-না-কোন বিশেষ ভাবেরই বোধক বটে, নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষ অসম্ভব কথা।[১] রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-নিরূপণের শৈলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রামানুজ-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ-জন্য জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রথমতঃ প্রমাণের স্বভাব নির্দ্ধারণ করিয়া ঐ প্রমাণ-মূলে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাই নৈয়ায়িকগণেরও শৈলী। নৈয়ায়িকগণের মতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান; পরোক্ষ অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ-মূলে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ প্রমাণ-মূলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন প্রকারেই জন্মিতে পারে না। কারণ, প্রমাণটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেই স্বভাবের হইবে, ঐ প্রমাণ-জন্য জ্ঞানও সেই জাতীয়ই হইবে। কারণের বিরুদ্ধ কার্য্য হয় না, হইতে পারে না। এইজন্য "দশমস্ত্বমসি" এইরূপ সুধী ব্যক্তির উক্তি শুনিয়া "আমি দশম" এইরূপে নিজেকে দশম বলিয়া যে বোধ হয়, পরোক্ষ শব্দ-প্রমাণমূলে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া রামানুজ প্রভৃতির মতে ঐ জ্ঞানও পরোক্ষই হইবে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে না। এইরূপ বেদান্তশাস্ত্র-শ্রবণের ফলে যে ব্রহ্মবোধের উদয় হইবে, তাহাও হইবে এই মতে পরোক্ষ ব্রহ্মবোধ, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। শব্দময় বেদান্ত শাস্ত্রতো পরোক্ষ প্রমাণ, অপরোক্ষ প্রমাণ নহে, তন্মূলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হইবে কিরূপে? ঐ পরোক্ষ ব্রহ্ম বিজ্ঞান

১। শ্রীভাষ্য ৭৩ পৃঃ; ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৭৮ পৃঃ;

নিরন্তর ভাবনা বা নিদিধ্যাসন বলে পরিপক্কাবস্থা লাভ করতঃ পরিণামে প্রত্যক্ষাত্মক হইয়া থাকে। ইহাই হইল বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। এ-সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তের অভিমত আলোচিত বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, প্রমাণের প্রত্যক্ষতা কিংবা পরোক্ষতা দেখিয়া তদনুসারে প্রমা বা প্রমেয়ের প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতা নির্দ্ধারণ করা চলে না। সত্য কথা হইল এই যে, বিষয়টি যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হইবে, সেখানেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে; এই প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হইবে, তাহাই হইল প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এবং এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী প্রথমতঃ বিষয়ের এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিয়া তারপর ঐরূপ প্রত্যক্ষের করণ বা প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রমাণের (প্রমার কারণের) স্বভাব নিরূপণ করিয়া তাহার বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ নির্ব্বচনের চেষ্টা করেন নাই; অর্থাৎ প্রমাণ হইতে প্রমাতে আসেন নাই, প্রমা হইতে প্রমাণে পৌঁছিয়াছেন। ফলে, এইমতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল; নৈয়ায়িক প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল না। প্রমাণ-সম্পর্কে এইরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যবশতঃ সিদ্ধান্তেও গুরুতর পার্থক্য দেখা গেল। "দশমস্ত্বমসি" এইরূপ কথা শুনিয়া নিজেকে দশম বলিয়া যে বোধ জন্মিল, কিংবা বেদান্ত-শাস্ত্র-শ্রবণের ফলে যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উদিত হইল, তাহা অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রত্যক্ষই হইল; পরোক্ষ শব্দ প্রমাণ-জন্য বলিয়া ঐরূপ বোধ পরোক্ষ হইল না। কেননা, "দশমস্ত্বমসি," "তুমি দশমব্যক্তি" এইরূপ সুধী ব্যক্তির উক্তি শুনিয়া শ্রোতার নিজেকে দশম বলিয়া যে বোধ হইল, তাহাতো প্রত্যক্ষ বোধই বটে। এরূপ প্রত্যক্ষ বোধের করণ বা মুখ্য সাধন এ-ক্ষেত্রে "দশমস্ত্বমসি" এইরূপ বাক্যটি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সুতরাং এই বাক্যটিই যে এ-স্থলে "আমি দশম ব্যক্তি" এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে ইহাতে আপত্তি কি? ব্রহ্মদর্শীর ব্রহ্মবোধ অপরোক্ষ জ্ঞান; ঐ জ্ঞানের সাক্ষাৎসাধন বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রও প্রত্যক্ষ প্রমাণই বটে। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী "শব্দাপরোক্ষবাদ" উপপাদন করিয়াছেন। শব্দ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া মানিতে গেলেই নৈয়ায়িক, রামানুজ প্রভৃতির মতানুসারে প্রমাণের স্বভাব-দৃষ্টে প্রমার স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টাকে

অনুমোদন করা চলে না। এ-সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, প্রমাণ পরোক্ষ হউক, কি প্রত্যক্ষ হউক, তাহাতে জ্ঞানের কিছুই আসে যায় না। দেখিতে হইবে যে, যে-বিষয়ে আমাদের জ্ঞানোদয় হইয়াছে ঐ বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হইয়াছে কিনা? যদি বিষয়টি প্রত্যক্ষ-গম্য হইয়া থাকে, তবে ঐ প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হইবে, তাহাই হইবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-জন্যই হউক, কি পরোক্ষ শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ-জন্যই হউক, যে জন্যই হউক না কেন, তাহাতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। এই দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদান্তী শব্দ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া উপপাদন করিলেও রামানুজ-মাধ্ব-নিম্বার্ক প্রভৃতি সকলেই নৈয়ায়িকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শব্দ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ঐ মতের খণ্ডনই করিয়াছেন।[১] নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রমাণবিদ্ আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্র নামক গ্রন্থে পরোক্ষ শব্দ প্রমাণ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা বালকের উক্তি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন বাক্য-জন্য জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষ-হেতুত্বোক্তিস্তু বালভাষৈব। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২০৪ পৃঃ।

রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির ন্যায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণই অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষ-গিরিবজ্রে ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত যেই ইন্দ্রিয়ের যাহা গ্রাহ্য বিষয়, (যেমন চক্ষুর রূপ, কর্ণের শব্দ প্রভৃতি,) সেই বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা বিশেষ সম্বন্ধের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা মুখ্য সাধন, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২০৩ পৃষ্ঠা, ন্যায়াচার্য্য বাৎস্যায়ন তাঁহার ন্যায়-ভাষ্যে প্রত্যক্ষ শব্দের—অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। ন্যায়-ভাষ্য ১।১।৩, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ প্রদর্শন করিতে গিয়া "বৃত্তি" শব্দে ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধকে এবং ঐরূপ সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে, এই উভয়কেই বুঝিয়াছেন, ইহা আমরা

নিম্বার্কের মতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ

১। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৮৮-৮৯ পৃঃ;

পূর্ব্বেই ৫৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। আলোচ্য ন্যায়-মতের অনুসরণ করিয়া মাধবমুকুন্দও ইন্দ্রিয়ের সহিত স্ব স্ব বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয়, এই উভয়কেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং বিষয়-সম্বদ্ধেন্দ্রিয়ং বা প্রত্যক্ষপ্রমাণম্ । পরপক্ষগিরিবজ্র, ২০৩ পৃষ্ঠা ; ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই হয় করণ বা মুখ্য সাধন ; ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও বটে, ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ জনকও বটে ; সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বলিয়া জানিবে। এই ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আর, ইন্দ্রিয় হইল ঐ ব্যাপারের আশ্রয় বা ধর্ম্মী। ধর্ম্মীর প্রাধান্য কল্পনা করিয়াই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ, যাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার এবং যাহা ইন্দ্রিয়েরই ধর্ম্ম ; সেই ধর্ম্মের প্রাধান্য কল্পনা করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গেলে ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাহাদের স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহা আমরা মাধ্ব-বেদান্তোক্ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিবরণেই ৬২ পৃষ্ঠায় দেখিয়া আসিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্যবিষয়ের সংযোগ যেমন স্থূল ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষে ব্যাপার হইয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় ও দৃশ্যবিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেও স্থলবিশেষে অপরাপর প্রত্যক্ষ জ্ঞান (যেমন এই বস্তু অপ্রীতিকর সুতরাং ইহা ত্যাজ্য ; এই বস্তু কল্যাণজনক সুতরাং ইহা গ্রহণ-যোগ্য, ইহা উপেক্ষনীয় ; এই প্রকার প্রত্যক্ষবোধ) উৎপাদন করিতে দেখা যায়। সে-ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ-বলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানই ব্যাপার স্থানীয় হইয়া দাঁড়ায় ; এবং ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই হয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। মাধবোক্ত আলোচ্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণে "জ্ঞান" পদ দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্যবিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞান নহে বলিয়া, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা চলে না।

১। আলোচ্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্য-মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্। এই ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের তুলনা করুন। ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে ৫৯-৬১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

নিম্বার্ক-মতে প্রত্যক্ষের বিভাগ

এই প্রত্যক্ষ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে প্রথমতঃ স্থূল ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ বা বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অন্তর বা মানস প্রত্যক্ষ, এই দুই প্রকার। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন স্থূল প্রত্যক্ষও চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণ, রাসন, ত্বগিন্দ্রিয়জ ভেদে পাঁচ প্রকার। মনই যে-সকল প্রত্যক্ষের একমাত্র মুখ্য সাধন, সেই মানস প্রত্যক্ষকেই বলে আন্তর প্রত্যক্ষ। ঐ মানস প্রত্যক্ষও লৌকিক এবং অলৌকিক, (ordinary and transcendental) এই দুই প্রকার। অহং সুখী, অহং দুঃখী, এইরূপে জাগতিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, তাহা লৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ। পরমাত্মা, পরম-পুরুষের স্বরূপ ও তাঁহার বিবিধ গুণাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাকে অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে। এই অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষও আবার দুই প্রকার। কোন একটি *পদার্থ-সম্পর্কে নিরন্তর* ভাবনার ফলে ঐ বস্তু-বিষয়ে যে মানস-প্রত্যক্ষের উদয় হয়, তাহা এক জাতীয় অলৌকিক মানস-প্রত্যক্ষ। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্; মনের দ্বারাই পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে; ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। তারপর যিনি অনবরত পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনিই পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে দেখিতে পান। এইরূপ শাস্ত্র বা গুরূপদেশ প্রভৃতির সাহায্যে পরব্রহ্ম-সম্পর্কে যে মানস প্রত্যক্ষের উদয় হয়, তাহা আর এক শ্রেণীর অলৌকিক (transcendental) মানস-প্রত্যক্ষ[১]। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আগম-নিগম-গম্য পরমাত্মাকে যদি আলোচ্য মানস-প্রত্যক্ষ-বলেই জানা যায়, তবে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতিতে পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া পরব্রহ্মকে যে, মনের দ্বারাও মনন করা যায় না; যন্মনসা ন মনুতে, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। এইরূপে অবাঙ্মনস-গোচর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এইরূপ আপত্তির উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলেন যে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের সদুপদেশরূপ নির্ম্মল জলে ধুইয়া মুছিয়া যে-মনের মালিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। অনাদিকালের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের

১। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা;

মসী-রেখা নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছে, সেইরূপ সত্যান্বেষী নিষ্কলুষ মনের সাহায্যেই পরব্রহ্মকে জানা যায়; অন্ধসংস্কারের মসী-মলিন চিত্তে তাঁহাকে জানা যায় না। তারপর, মনের সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা গেলেও সসীম মানস-প্রত্যক্ষে অসীম অনন্ত ভূমা ব্রহ্মের সমগ্র-দৃষ্টি (entire vision) ফুটিয়া উঠে না। সমগ্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি লাভ করিতে হইলে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সেবা এবং শ্রীগুরুর অভয়চরণেরই শরণ লইতে হয়। এই সত্যই "ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনস-গোচর", এইরূপ উক্তি-দ্বারা বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতিতে ধ্বনিত হইয়াছে। অনাদি অনন্ত জ্ঞানময় ভূমা ব্রহ্মের জ্ঞানও অসীম এবং অখণ্ডই বটে। ব্রহ্ম-জ্ঞান বস্তুতঃ অসীম—অখণ্ড হইলেও সংসারের নাগপাশে বদ্ধ জীবের জ্ঞান-দৃষ্টি অনাদিকাল-সঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইয়া সসীম সখণ্ডভাবেই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। ঐ সঙ্কুচিত, আবৃত জ্ঞানের বিকাশ চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্পন্ন হয়; এইজন্যই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে গৌণভাবে জ্ঞানের উৎপাদক বলা হইয়া থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় উৎপন্ন জ্ঞানের এবং তাহার ফলে জ্ঞেয় বিষয়েয় যে সসীম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে (জ্ঞানের ঐ সীমাবদ্ধ বিকাশকে) দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে হইলে গৃহের কোণে অবস্থিত ঘটের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপের প্রভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৃহের কোণে অবস্থিত ঘটের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপের প্রভা যেমন প্রথমতঃ ঘটের সঙ্কুচিত মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে; তারপর ঘরের দরজা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া অদূরস্থ প্রকাশ্য বিষয়ের নিকট গমন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে এবং স্বীয় প্রকাশের দ্বারা দৃশ্য-বিষয়কেও উদ্ভাসিত করে; সেইরূপ বদ্ধ জীবের ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের আলোক-রেখা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে অবস্থিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের চালক মনের (বিষয়ের আকারে) পরিণাম বা বৃত্তিবশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-পথে বহির্গত হইয়া বিষয় যেখানে অবস্থান করে, সেইখানে গমন করিয়া বিষয়টিকে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করে, এবং ("আমি জানিয়াছি" এইরূপে) নিজেকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। বদ্ধ জীবের ঐরূপ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ যতটুকু তিরোহিত হইয়াছে, অসীম-অখণ্ড জ্ঞানের ততটুকুই কেবল জীবের

দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়ের নিকট গমন করিয়া বিষয়কে পাওয়ায়, প্রকাশ করায় এবং ঐরূপে প্রকাশ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসায়, অরূপ, অসীম, অখণ্ড জ্ঞানেরও একটা সখণ্ড, সসীম বিশেষভাব ফুটিয়া উঠিল। বিষয় যাহা তাহাই রহিল বটে, তবে ঐ সকল দৃশ্য বিষয় জ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ পাইল; তাহা না হইলে উহা অজ্ঞানের অন্ধকারেরই মধ্যে লোক-লোচনের অন্তরালে যেমন ছিল চিরকাল তেমনই থাকিয়া যাইত। ইহাই হইল ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের বিষয়-প্রকাশের রহস্য।[১] মানস-প্রত্যক্ষের স্থলে মনঃ যখন মনোগম্য সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে প্রকাশ করে, তখন মনঃ বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কারণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতো আর বহিরিন্দ্রিয়-গম্য নহে। পরমাত্মা-পরব্রহ্ম প্রভৃতি চরম ও পরম-তত্ত্ব যখন মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন জ্ঞানময় পরমাত্মা স্ব-প্রকাশ বিধায় নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য অপর কাহারও অপেক্ষা রাখে না, অপর কাহারও অপেক্ষা রাখিলে তাহাকে আর স্বপ্রকাশ বলা চলে না। এইরূপ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা প্রভৃতির প্রত্যক্ষে মনের সাক্ষাৎ কোন ব্যাপার নাই, কেবল স্বভাব-চঞ্চল মনের সংযমাভ্যাসই তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। ধ্যানাভ্যাসের ফলে মনঃ একাগ্র হইলে পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতির প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধির পক্ষে যাহা যাহা প্রতিবন্ধক আছে, তাহার সমূলে নিবৃত্তি হইয়া শ্রীগোবিন্দের প্রসাদে আত্ম-তত্ত্ব সাধকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একাগ্র মনঃ ধ্যানের সাধন; ধ্যান প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তির সহায়ক। প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি পর্য্যন্তই ধ্যানের ব্যাপার বা কার্য্য। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক যাহা কিছু আছে, তাহার নিবৃত্তি হইলে স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে। সেখানে মনের যেমন কোন ব্যাপার নাই, ধ্যানেরও সেইরূপ সাক্ষাৎ কোন ব্যাপার নাই। মনঃ এরূপ ক্ষেত্রে পরব্রহ্ম-প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে, গৌণ কারণ বা সহায়কমাত্র।[২] এই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম-প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষের চরম ও পরম স্তর।

রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতির মতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের স্বরূপ

১। পরপক্ষগিরিবজ্র ২০৪, ২০৫ পৃঃ;

২। পরপক্ষগিরিবজ্র ২০৫, ২০৬ পৃঃ।

যাহা দেখা গেল, তাহাতে বুঝা গেল যে, কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু মত-ভেদ থাকিলেও উহারা সকলেই ন্যায়ানুমোদিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণের অনুকরণেই নিজ নিজ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধের ফলে যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; কিংবা যে-জ্ঞানের মূলে কোন জ্ঞান করণরূপে বর্ত্তমান থাকে না—(জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্,) তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। প্রত্যক্ষ প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমাণ, ইহাই হইল নৈয়ায়িক, মাধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতির মতে প্রত্যক্ষের প্রমাণ-বিচারের সারকথা। ইহারা সকলেই সগুণ-ব্রহ্মবাদী; উহাদের মতে ঐরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণ অচল নহে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-বেদ্যতো নহেই, এমন কি উহা মনোগম্যও নহে। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনস-গোচর। অজ্ঞানের সঙ্কুচিত দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া ভূমা বিজ্ঞান সমুদিত হইলেই ঐরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিবার জন্য মাধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রত্যক্ষের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তী সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির মতের সমালোচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের প্রমাণ-রহস্যজ্ঞ আচার্য্য ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই যদি প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তবে, স্মৃতি অনুমানজ্ঞান প্রভৃতিও (মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে) মনোজন্য বলিয়া ইন্দ্রিয়-জন্যই বটে; সুতরাং স্মৃতি, অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানও প্রত্যক্ষই হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, পরমেশ্বরের সর্ব্বদা সকল বস্তু-সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয়-লব্ধ নহে; ফলে, উহা আর প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না[১]। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে

অদ্বৈত-মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ

১। নহি ইন্দ্রিয়জন্যত্বেন জ্ঞানস্য সাক্ষাত্ত্বম্ অনুমিত্যাদেরপি মনোজন্যতয়া সাক্ষাত্ত্বাপত্তেঃ। ঈশ্বর-জ্ঞানস্য অনিন্দ্রিয়জন্যস্য সাক্ষাত্ত্বানাপত্তেশ্চ।

বেদান্তপরিভাষা, ৪৬ পৃষ্ঠা; বোম্বে সং,

উল্লিখিত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অব্যাপ্তি বা অসঙ্গতি অপরিহার্য্য বুঝিয়াই ঐরূপ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে-জ্ঞানের মূলে কোনরূপ জ্ঞান সাক্ষাৎ সাধনরূপে বর্ত্তমান থাকে না, (জ্ঞানা-করণকং জ্ঞানম্,) তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণকেও নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে-জ্ঞানের মূলে জ্ঞানরূপ কোন করণ বর্ত্তমান নাই, তাহাই যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তবে পূর্ব্বতন সংস্কারের ফলে যে স্মৃতি-জ্ঞান উদিত হয়, তাহাও প্রত্যক্ষই হইয়া পড়ে। কেননা, সংস্কারের ফলে উৎপন্ন স্মৃতির মূলেও কোনরূপ জ্ঞান করণরূপে বিরাজ করে না। স্মৃতি একমাত্র সংস্কার-জন্য। স্মৃতির কারণ সংস্কারতো আর জ্ঞান নহে। যদি বল যে, সংস্কার অনুভূতি হইতেই জন্ম লাভ করে; বর্ত্তমান সময়ে যাহা অনুভব, পর মুহূর্ত্তে তাহাই হয় সংস্কার। অনুভূতি সংস্কার উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইলেও সংস্কারের মূল খুঁজিলে অনুভবকেই পাওয়া যায়। অতএব স্মৃতির স্থলে সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবের মৌলিক কারণতা অস্বীকার করা চলে না। ফলে, (স্মৃতি ও "জ্ঞানকরণক" জ্ঞানই হইল, "জ্ঞানাকরণক" জ্ঞান হইল না,) স্মৃতিকে আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা চলিল না। প্রতিবাদীর এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, স্মৃতিতে প্রত্যক্ষের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য যদি সংস্কারকে দ্বার করিয়া সংস্কারের মৌলিক অনুভবকে কারণ বলিয়া গ্রহণ কর, তবে, "সোঽয়ং গৌঃ" "এই সেই গরুটি" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষের স্থলেও সংস্কারকে দ্বার করিয়া গরুর পূর্ব্বতন অনুভব যে কারণ হইবে, তাহা অস্বীকার করা চলিবে না। সে-ক্ষেত্রে অনুভূতি-জাত সংস্কার-মূলে উৎপন্ন প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান আর প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞা-স্থলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হয়। এইজন্যই আলোচিত "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" এইরূপ

বেদান্তপরিভাষার উদ্ধৃত বাক্যে মনকে অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণে উল্লিখিত দোষের অবতারণা করা হইয়াছে। অথচ ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় ৪৩ পৃঃ, "ন তাবদন্তঃকরণমিন্দ্রিয়মিত্যত্রমানমস্তি"। এই বলিয়া অতি স্পষ্টভাষায় মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। ফলে, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বেদান্ত-পরিভাষার উক্তি যে পরস্পর-বিরোধী হইয়াছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।

প্রত্যক্ষের লক্ষণও গ্রহণ করা যায় না। তারপর, "প্রত্যক্ষপ্রমায়াঃ করণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্" এইরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণে পরস্পর-আশ্রয় দোষ অবশ্যম্ভাবী। কেননা, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা জানিলেই ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ কি, তাহা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ কি, তাহা বুঝিলেই ঐ করণের সাহায্যে প্রত্যক্ষের স্বরূপ-নিরূপণ করা যায়। প্রত্যক্ষের নির্ব্বচনও প্রত্যক্ষের করণ-সাপেক্ষ; আবার প্রত্যক্ষের করণের জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞান-সাপেক্ষ। এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পরাশ্রয় দোষে কোনটিরই নির্ব্বচন করা চলে না। প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষ লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন যে, জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ, "জ্ঞানত্বং প্রত্যক্ষত্বম্,"—যেখানে জ্ঞান সেখানেই তাহা প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষপ্রমাত্বত্র চৈতন্যমেব। বেদান্তপরিভাষা, ৩৫ পৃষ্ঠা; অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞানই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম। এই জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ; ইহা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানই একমাত্র আলোক, জ্ঞানব্যতীত অন্য সমস্তই অন্ধকার। আলোক কখনও অপ্রত্যক্ষ থাকে কি? জ্ঞান থাকিলেই তাহা প্রত্যক্ষই হইবে, ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। শ্রুতিও জ্ঞানকে "সাক্ষাৎ" এবং "অপরোক্ষ" বলিয়া জ্ঞানের এইরূপ স্বভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে "জ্ঞানত্বং প্রত্যক্ষত্বং," জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ, ইহাই যদি প্রত্যক্ষের লক্ষণ হয়, তবে অনুমানপ্রভৃতি জ্ঞানও প্রত্যক্ষই হইয়া দাঁড়ায়; (অর্থাৎ অনুমান, উপমানপ্রভৃতি জ্ঞানেও প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হয়)। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন যে, অনুমানের সাহায্যে বহ্নিপ্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বস্তু-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, ঐ অনুমানপ্রভৃতি জ্ঞানের জ্ঞানাংশতো প্রত্যক্ষই বটে; সেখানে অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন আসে কিরূপে? যেখানেই প্রমাণের সাহায্যে বিশেষ বোধের উদয় হইয়া থাকে (যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বহ্নির অনুমান প্রভৃতি,) সেখানেই ঐ জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞানের স্বভাব সর্ব্বত্রই একরূপ। অখণ্ড-অসীম চিদ্‌বস্তুই জ্ঞানপদ-বাচ্য। ঐ অনন্ত ভূমা জ্ঞান বিষয়ের আবরণে আবৃত হইয়া, বিষয়ের রূপে রূপায়িত হইয়া সসীম-সখণ্ড

ঘট-জ্ঞান প্রভৃতি রূপে আমাদের প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিশিষ্ট বোধেরই দুইটি অংশ আছে; একটি তাহার জ্ঞানাংশ, অপরটি বিষয়াংশ। ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় ঘট; ঘট অরূপ জ্ঞানকে রূপ দিয়াছে। বিষয়াংশ ঘটের সহিত জ্ঞানের মিলনের (অধ্যাসের) ফলে অরূপ, অসীম জ্ঞান ঘটের রূপ নিয়া সসীম, সখণ্ড ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। ঘট জড় বস্তু; ঘট স্বপ্রকাশ নহে, পর-প্রকাশ। স্বপ্রকাশ স্বতঃপ্রমাণ জ্ঞানই ঘটকে প্রকাশ করিতেছে; জ্ঞানের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে (জ্ঞানে অধ্যস্ত) জ্ঞানের বিষয় ঘটেরও প্রত্যক্ষ হইতেছে। জ্ঞানের এই বিষয়াংশই পরিবর্ত্তনশীল; জ্ঞানাংশ অপরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানই পরমার্থসৎ ব্রহ্মবস্তু; এবং সর্ব্বদা সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ। নিত্য চিদ্‌বস্তুর কোন অংশ নাই, উহা নিরংশ, নির্ব্বিশেষ, তত্ত্ব। নিত্য এবং অপ্রমেয় বিধায় ঐরূপ চিৎ বা প্রমা-সম্পর্কে চক্ষুরাদি প্রমাণের (প্রমার করণের) কোন প্রশ্নই উঠে না। জড় বিষয়ের সহিত নিত্য, নিরংশ জ্ঞানের অংশাংশিভাবও নিছক ভ্রান্ত কল্পনা। জ্ঞানের ঐ কল্পিত বিষয়াংশেই চক্ষুরাদি প্রমাণের উপযোগিতা দেখা যায়। নির্ব্বিশেষ চৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের রূপে রূপায়িত হইয়া যখন ঘট-জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়, তখন ঘটাদি বিষয়াংশের প্রত্যক্ষে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় করণ হইয়া "প্রত্যক্ষ-প্রমাণ" সংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপ অনুমানপ্রভৃতি প্রমাণও পরোক্ষ অনুমেয় বহ্নি-প্রভৃতি বিষয়াংশের অস্তিত্ব সাধন করিয়াই প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। প্রত্যক্ষ ঘট-জ্ঞান ও অনুমেয় বহ্নির জ্ঞানের বিষয় ঘট এবং বহ্নির মধ্যে ঘট দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছে, অতএব উহা প্রত্যক্ষ; বহ্নি চক্ষুর গোচর হয় নাই, সুতরাং বহ্নি-জ্ঞান অনুমান। এইরূপে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানজ্ঞানের মধ্যে যে ভেদ দেখা যায়, তাহা পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, বিষয়ের প্রত্যক্ষতা এবং পরোক্ষতা জ্ঞানে আরোপ করিয়াই গৌণভাবে জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বলা হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞান (চিদ্‌বস্তু) কখনও পরোক্ষ হয় না, হইতে পারে না। নিত্য চিদ্‌বস্তু সব সময়ই অপরোক্ষ; (চিত্ত্বং) "জ্ঞানত্বং প্রত্যক্ষত্বম্" ইহাই প্রত্যক্ষের একমাত্র লক্ষণ।[১] "প্রমা-

---

১। জ্ঞপ্তিগতপ্রত্যক্ষত্বস্য সামান্য লক্ষণং চিত্ত্বমেব। পর্ব্বতো বহ্নিমানিত্যাদাবপি

করণং প্রমাণম্” এইরূপে যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের করণ-বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবেদান্তের মতে আরোপিত জন্য জ্ঞানসম্বন্ধেই প্রযুজ্য; নতুবা বেদান্ত-বেদ্য নিত্য আত্ম-প্রত্যক্ষ তো উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত; ঐরূপ নিত্য আত্মজ্ঞান-সম্পর্কে করণের প্রশ্ন উঠিবে কিরূপে? চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে যে প্রত্যক্ষের “প্রমাণ” বলা হইয়াছে, তাহাও জন্য ঘটাদির প্রত্যক্ষ-সম্পর্কেই বুঝিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে নিত্য আত্ম-প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ, আর জন্য ঘটাদির প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ। প্রথমটি মুখ্য প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি আরোপিত অমুখ্য বা গৌণ প্রত্যক্ষ। নিত্য, মুখ্য আত্ম-প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি প্রমাণের কোন ব্যাপার বা কার্য্য (function) নাই; উহা সর্ব্ববিধ প্রমাণের অগম্য। জন্য ঘটাদির প্রত্যক্ষেই কেবল প্রমাণের ব্যাপার বা কার্য্য দেখা যায়। সেখানেও প্রশ্ন আসে এই যে, বিষয়-প্রত্যক্ষে যে জ্ঞানাংশ আছে, তাহাতো অখণ্ড-অসীম জ্ঞানেরই সখণ্ড, সসীম অভিব্যক্তি; ঐ জ্ঞানাংশে চক্ষুরাদি প্রমাণের উপযোগিতা কোথায়? চক্ষুদ্বারা তো জ্ঞান দেখা যায় না, বিষয়টিকেই শুধু দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে যে ঘটাদি বিষয়াংশ আছে, তাহাতো নিছক জড় বস্তু, জ্ঞান পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির; ঐ জড় বিষয়াংশে “প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ” এইরূপ (জ্ঞানাবলম্বী) প্রমাণের লক্ষণের সঙ্গতি হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই (অদ্বৈত-মতের প্রমাণের স্বরূপ-বিচার-প্রসঙ্গে ৪৪ পৃষ্ঠায়) দেখিয়াছি যে, অখণ্ড ভূমা চৈতন্য স্বভাবতঃ অনাদি-অনন্ত হইলেও ঘট প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাতো অখণ্ড নহে, সখণ্ড; অজন্য নহে, ইন্দ্রিয়-জন্য। অসীম চৈতন্যের ঐরূপ সসীম অভিব্যক্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও কারণ হইয়া থাকে। পরিচ্ছিন্ন ঘটাদির জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়-জন্য বলায় কোন বাধা নাই। শুদ্ধ চিদ্ বা জ্ঞান বেদান্তের মতে স্বরূপতঃ ইন্দ্রিয়-জন্য না হইলেও ঘটাদির বিশেষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জন্যই বটে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় ইন্দ্রিয় অন্ধকার স্থানীয়, চৈতন্যই আলোক; এই অবস্থায় জড় ইন্দ্রিয় স্বতঃপ্রমাণ চৈতন্যের কারণ হইবে কিরূপে? অন্ধকার কি

বহ্ন্যাদ্যাকারবৃত্ত্যুপহিতচৈতন্যস্য স্বাত্মাংশে স্বপ্রকাশতয়া প্রত্যক্ষত্বাৎ বেদান্ত-পরিভাষা, ১০৪ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

কোন অবস্থায়ই আলোকের কারণ হয়? ইন্দ্রিয় চৈতন্যের কারণ হইলে চৈতন্যকে যে অদ্বৈতবেদান্তে নিত্য স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? তারপর, অখণ্ড জ্ঞানের সখণ্ড অভিব্যক্তিই বা কিরূপ? এই সকল আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, ঘটপ্রভৃতি জড় বস্তু যখন দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তখন দ্রষ্টার স্বচ্ছ অন্তঃকরণ চক্ষুরিন্দ্রিয়-পথে দূরগামী আলোক-রেখার ন্যায় বহির্গত হইয়া ঘট যেখানে থাকে, সেইস্থানে গমন করে এবং দৃশ্য ঘটাদি বস্তুর আকার গ্রহণ করে। অন্তঃকরণের আলোক-রেখার ন্যায় এইরূপ বিসর্পণ বা গমন এবং বিষয়ের রূপ-গ্রহণকেই অন্তঃকরণের পরিণাম বা বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তির ফলে দ্রষ্টার ঘটাদি দৃশ্য বিষয়-সম্পর্কে যে অজ্ঞান ছিল তাহা বিদূরিত হইয়া ঘট দ্রষ্টার নয়ন- গোচর হইয়া থাকে, ইহাই ঘটের প্রত্যক্ষতা। বহ্নির অনুমান প্রভৃতির স্থলে অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতি জ্ঞাতার দৃষ্টির গোচর হয় না; অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়-পথে বিসর্পিত হইয়া বহ্নি প্রভৃতির আকার প্রাপ্ত হয় না, এইজন্যই বহ্নি-জ্ঞান অনুমান, উহা প্রত্যক্ষ নহে। অন্তঃকরণের ঘটাদি বিষয়ের আকারে পরিণাম বা বৃত্তি দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন হয়; সুতরাং অন্তঃকরণ-বৃত্তি যে ইন্দ্রিয়-জন্য, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ঘট-জ্ঞান প্রভৃতি (ঘটাদি বিষয়ের আকারে আকার-প্রাপ্ত) অন্তঃকরণের বৃত্তির ফল। এই অবস্থায় ঘটাদির জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়-জন্য বলা যায় কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, অন্তঃকরণের বৃত্তি জড় অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুতরাং তাহাও জড়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও (যাহা জড় অন্তঃকরণ-বৃত্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে,) জড়। এই অবস্থায় জড় অন্তঃকরণ-বৃত্তির কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের মুখ্য কারণ বা "প্রমাণ" বলা কি নিতান্তই অশোভন নহে? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাক্ষাৎ করণ; অন্তঃকরণ-বৃত্তি ঘটাদির প্রত্যক্ষের করণ। এই ব্যবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তো কোনমতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের করণ বলা চলে না। ইহার উত্তরে অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন যে, ঘটাদির প্রত্যক্ষে অন্তঃকরণের বৃত্তি ঘটাদির জ্ঞানের আবরণ অজ্ঞান দূর করিয়া অরূপ জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে। বৃত্তির লয়ে এবং উদয়ে জ্ঞানের লয় ও উদয় হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয়।

বৃত্তি ও জ্ঞান এইরূপে অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত হওয়ায় বৃত্তিকেও এইমতে গৌণভাবে জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানাবচ্ছেদকত্বাচ্চ বৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারঃ। বেঃ পরিভাষা, ৩৬ পৃঃ; বৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইয়াই বৃত্তির জনক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে গৌণ-ভাবে প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের জনক বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এই মতে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের করণ হইতে পারে না। জড় ঘটাদি বিষয়াংশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ হইলেও তাহা "প্রমা-করণম্" প্রমাণম্, এইরূপ প্রমাণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের যথার্থ সাধন তাহা হইলে কাহাকে বলিবে? প্রত্যক্ষ-জ্ঞানমাত্রেরই দুইটি অংশ আছে; একটি তাহার জ্ঞানাংশ; অপরটি বিষয়াংশ; ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কখনও বা ঘট মুখ্যতঃ প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, কখনও বা ঘট-জ্ঞান প্রত্যক্ষ-গম্য হয়। প্রথমটিকে বলা হয় বিষয়-প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টিকে বলে জ্ঞান-প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ শব্দটি বিশেষ্য এবং বিশেষণ, এই দুইভাবেই ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ্যরূপে প্রত্যক্ষ-শব্দে কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানকেই বুঝায়; বিশেষণভাবে প্রত্যক্ষশব্দদ্বারা (ক) প্রত্যক্ষজ্ঞানকে, (খ) প্রত্যক্ষের বিষয় ঘট প্রভৃতিকে এবং (গ) প্রত্যক্ষজ্ঞানের মুখ্য সাধন প্রত্যক্ষপ্রমাণকে বুঝা যায়; (১) ইদং প্রত্যক্ষং জ্ঞানম্, কিংবা ইদং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, (২) অয়ং ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ, (৩) ইদং প্রত্যক্ষং প্রমাণম্, বিশেষণহিসাবে প্রত্যক্ষ শব্দের উল্লিখিত তিন প্রকার প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের এবং প্রত্যক্ষ-গম্য বিষয়ের নির্ব্বচনই ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতির মতে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার রহস্য। জ্ঞানের প্রত্যক্ষ এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষ, এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন্‌টি আগে হইবে? জড় বিষয়ের প্রত্যক্ষ, না জ্ঞানের প্রত্যক্ষ? এ-বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিকের এবং অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে গুরুতর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নৈয়ায়িক প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের স্বরূপ নির্ব্বচন করিয়া "মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ" এই পথ অনুসরণ করিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণ-জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান, এইরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়াই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা, এই দৃষ্টিতে বিষয়-প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র

তাঁহার ভামতী টীকায় ন্যায়ের পথ অনুসরণ করিয়া প্রথমতঃ জ্ঞান-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন করিয়া পরে বিষয়-প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভামতীর টীকাকার অমলানন্দ স্বামী, এবং কল্পতরু-পরিমল-রচয়িতা অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানারূপ যুক্তিবলে বাচস্পতির মতের পুষ্টি বিধান করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায়ও প্রথমতঃ জ্ঞান-প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিয়া পরে বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিবরণ-মতের অনুবর্ত্তন করেন নাই। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ-প্রণেতা প্রকাশাত্মযতি এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী বৈদান্তিক আচার্য্যগণ ভামতী-সম্প্রদায়ের উক্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিবরণ-সম্প্রদায় ভামতী-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতির মতে অদ্বৈতবেদান্তে প্রথমতঃ বিষয়ের প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? তাহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। বিষয়ের প্রত্যক্ষতা নিরূপিত হইলে ঐরূপ প্রত্যক্ষবিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হইবে, তাহাই হইবে প্রত্যক্ষজ্ঞান (বা জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা); এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধনই হইবে প্রত্যক্ষপ্রমাণ। এইভাবে বিবরণ-সম্প্রদায় প্রথমতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ-নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন; বিষয় হইতে প্রমাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, প্রমাণ হইতে প্রমেয়ের দিকে যান নাই। এইরূপ নিরূপণ-প্রচেষ্টা ন্যায় প্রভৃতির মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা দেখিয়াছি, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, এবং বাচস্পতি, অমলানন্দ, অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি সকলেই প্রমাণের দিক হইতে প্রমেয়ের দিকে চলিয়াছেন—প্রত্যক্ষপ্রমাণ-জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষজ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাই বিষয়-প্রত্যক্ষ। বিবরণপন্থী অদ্বৈতাচার্য্যগণ এই পথের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হইয়া বিষয়ের প্রত্যক্ষের এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষের স্বরূপ-নিরূপণের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার কারণ এই, অদ্বৈতবেদান্তী শব্দ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।[১] আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের অবতরণিকায় বেদান্ত-

শব্দাপরোক্ষবাদ এবং ঐ সম্পর্কে ভামতী-সম্প্রদায়ও বিবরণ-সম্প্রদায়ের মত-ভেদ

১। শব্দাপরোক্ষবাদ আমরা আমাদের লিখিত বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদের প্রথম খণ্ডে ২১১-২১২, ২৭৩, ২০৪, ৩১৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনা দেখুন।

শাস্ত্রের প্রয়োজন দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, জীব ও ব্রহ্ম যে বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিবার জন্যই বেদান্তশাস্ত্রানুশীলন একান্ত আবশ্যক—আত্মৈকত্ববিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। ব্রহ্মসূত্র, শংভাষ্য, উপক্রমণিকা; আচার্য্যের ঐরূপ উক্তি হইতে জানা যায় যে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ বা অভেদ-সাক্ষাৎকার বেদান্তশাস্ত্র-শ্রবণের ফল; বেদান্তশাস্ত্র ঐরূপ শুভ ফলের জনক। এখানে প্রশ্ন এই যে, শাস্ত্র শব্দময়, শব্দ-প্রমাণতো পরোক্ষ প্রমাণ। ঐরূপ পরোক্ষ শাস্ত্রপ্রমাণ-মূলে যে-ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহা কি প্রত্যক্ষ হইবে? না, পরোক্ষ হইবে? বেদান্ত-গম্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বোধ যে প্রত্যক্ষ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কেননা, ঐ একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীবের সর্ব্ব-প্রকার ভেদ-দৃষ্টি তিরোহিত হয়। ভেদ-জ্ঞান সমূলে বিদূরিত না হইলে তো অভেদ-জ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারে না। ঐ ভেদ-জ্ঞান চরমে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও আমরা ব্যাবহারিক জীবনে উহার সত্যতাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ভ্রমজ্ঞানও যদি প্রত্যক্ষ হয়, তবে প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান বা অভেদ-জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত ঐ মিথ্যা ভেদ-দৃষ্টি বিদূরিত হইতে পারে না। অতএব বেদান্ত-বেদ্য জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধ যে অপরোক্ষ, পরোক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরোক্ষ শব্দপ্রমাণ-মূলে উৎপন্ন (বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনের ফলে উৎপন্ন) জীব ব্রহ্মের একত্ব-বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? প্রমাণের স্বরূপ ও স্বভাব যেরূপ হইবে, ঐ প্রমাণ-গম্য প্রমেয় প্রভৃতিও তো সেইরূপ স্বভাবেরই হইবে। কারণের বিরুদ্ধ কার্য্য কখনই হইতে পারে না। প্রত্যক্ষপ্রমাণ-মূলে যে-জ্ঞানোদয় হইবে, তাহাই প্রত্যক্ষ হইবে। পরোক্ষ-প্রমাণের বলে উৎপন্ন জ্ঞান কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষ হইবে না, তাহা পরোক্ষই হইবে। সুতরাং বেদান্তশাস্ত্রের শ্রবণ প্রভৃতির ফলে যে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইবে, তাহা (পরোক্ষ শাস্ত্রপ্রমাণ-জন্য বলিয়া) পরোক্ষই হইবে, প্রত্যক্ষ হইবে না; তবে পরব্রহ্ম-বিষয়ে নিরন্তর ভাবনা বা নিদিধ্যাসন প্রভৃতির বলে এই ব্রহ্মজ্ঞান পরিণামে প্রত্যক্ষাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপেই ইহা প্রত্যক্ষ। ইহাই হইল শব্দপরোক্ষবাদী মণ্ডনমিশ্র, বাচস্পতি, অমলানন্দ, অপ্যয়দীক্ষিত

প্রভৃতির সিদ্ধান্ত। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে এই যে, প্রিয়া-বিরহী প্রণয়ী একান্তভাবে ভাবিতে ভাবিতে দূরবর্ত্তিনী প্রেম-প্রতিমাকে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই উপস্থিত দেখিতে পান; এই প্রত্যক্ষ কিন্তু তাঁহার সত্য নহে, মিথ্যা। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বেদান্ত-বেদ্য পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা নিরন্তর ভাবনার ফলে পরিণামে প্রত্যক্ষাত্মক হইয়া থাকে, তাহা যে মিথ্যা নহে, সত্য; তাহা তোমাকে কে বলিল? ইহার উত্তরে মণ্ডন-বাচস্পতি প্রভৃতি বলেন যে, বেদান্ত-গম্য ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তিকালে পরোক্ষ হইলেও নিদিধ্যাসন প্রভৃতির ফলে ক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, এই আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান অনাদি অবিদ্যা-বিভ্রমের নিবৃত্তি করতঃ চরমে প্রত্যক্ষাত্মক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে উপনিষদুক্ত আর্ষ বিজ্ঞান; সুতরাং ইহার বিরহীর প্রণয়িণী-সাক্ষাৎকারের ন্যায় মিথ্যা হইবার প্রশ্ন উঠে না। জীবের আত্ম-দর্শন যে-ক্ষেত্রে উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আর্ষ বিজ্ঞানের অনুরূপ হইবে, সে-ক্ষেত্রে ভ্রম ও সংশয়ের অতীত স্বতঃপ্রমাণ উপনিষদুক্ত আত্ম-বিজ্ঞান সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে, জীবের পরমাত্ম-দর্শনও যে সত্যই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?[১] তুল্যরূপ দুইটি জ্ঞানের একটি (উপনিষদুক্ত আত্ম-বিজ্ঞান) সত্য হইলে অপরটিও (জীবের ব্রহ্ম-বোধও) সত্য হইতে বাধ্য। "দশমস্ত্বমসি" প্রভৃতি স্থলে "তুমিই দশম" এইরূপ পার্শ্বস্থিত ব্যক্তির উক্তি শোনার পর, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যেই নিজেকে দশম বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহা চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ, শব্দ-জন্য প্রত্যক্ষ নহে। ঐ ব্যক্তি যদি অন্ধ হইত, তবে "তুমি দশম" এইরূপ শব্দ শুনিয়া অন্ধ ব্যক্তি নিজেকে দশম বলিয়া প্রত্যক্ষ করিত কি? অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু না থাকিলেও কান আছে, শব্দ শুনিয়া বুঝিবার যোগ্যতাও আছে, এরূপক্ষেত্রে শব্দ-জন্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় স্বীকার

১। বেদান্তবাক্যজজ্ঞান-ভাবনাজাঽপরোক্ষধীঃ।
মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ন ভ্রমত্বং প্রপদ্যতে॥ বেদান্তকল্পতরু, ৫৬ পৃষ্ঠা;
যদ্যপি ভাবনাজনিতস্য বিধুরাদিগত কামিনী-সাক্ষাৎকারস্য প্রায়শো বিসংবাদো দৃশ্যত ইতি, অত্রাপিশুদ্ধাত্মসাক্ষাৎকারে ভাবনাবিনিষ্পন্নতারূপসাধারণ্যাদ্ বিসংবাদশঙ্কা ভবেৎ, তথাপি সা শঙ্কা নির্ণীতপ্রামাণ্যস্বসমানাকারৌপনিষদাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধানেনোন্মূলনীয়া। নহি সমানাকারয়োঃ জ্ঞানয়োঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞানং সংবাদি, কিঞ্চিন্নেতি প্রতিপন্নম্। ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৫৮ পৃষ্ঠা, কুম্ভঘোণসং;

করিলে অন্ধেরই বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে বাধা কি? অন্ধ ব্যক্তির জ্ঞান পরোক্ষই হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব শব্দ-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। শব্দস্তু নাপরোক্ষপ্রমাহেতুঃ কঃপ্তঃ; কল্পতরু, ৫৫ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং; শব্দ পরোক্ষ প্রমাণ; পরোক্ষপ্রমাণ-জন্য জ্ঞান কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষ হয় না; প্রত্যক্ষপ্রমাণ-জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। ঐরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাই বিষয়-প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে।

বিবরণ-মতের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিবরণ-পন্থী বৈদান্তিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ-রহস্য বিচার করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণ-মূলে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান; এইরূপে প্রমাণের প্রত্যক্ষতা-নিবন্ধন জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিতে গেলে পরোক্ষ শব্দ বা শাস্ত্রপ্রমাণ-মূলে উদিত বেদান্ত-বেদ্য পরমাত্ম-দর্শন পরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া দাঁড়ায়; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। এইজন্য প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্নপথে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিয়া, প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত বিষয়-সম্পর্কে যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান, ঐরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মুখ্য সাধনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ; এই ভাবে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত বিষয়ের দিক হইতে ক্রমে প্রত্যক্ষজ্ঞানের, এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহারা বাচস্পতি প্রভৃতির ন্যায় কারণ হইতে কার্য্যের দিকে আসেন নাই। কার্য্য দেখিয়া ঐ কার্য্যের কারণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকাশাত্মযতি বলেন যে, জ্ঞেয় বিষয়টি যে-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হইবে, তাহাই বিষয়ের প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে। ঐরূপ প্রত্যক্ষবিষয়-সম্পর্কে যে-জ্ঞানোদয় হইবে, তাহাই হইবে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। এই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃই দেখিতে হইবে, জ্ঞেয় বস্তুটিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতা জানিতে পারিয়াছেন কি না? যদি জ্ঞাতব্য বিষয়টি সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হয়, তবে ঐরূপ বিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হইবে, তাহাকেই বলিব প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের যাহা সাক্ষাৎ সাধন, তাহাই হইবে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ-জন্যই হউক, কি পরোক্ষ অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ-মূলেই উদিত

হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আসল কথাটি হইয়াছে এই যে, জ্ঞেয় বিষয়টিকে জ্ঞাতা সাক্ষাদ্‌ভাবে জানিতে পারিয়াছেন কিনা? বিষয়টিকে যদি সাক্ষাদ্‌ভাবে জ্ঞাতা জানিয়া থাকেন, এবং তাঁহার এই জ্ঞান যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তির কোন কথা শুনিয়া কিংবা শাস্ত্র-আলোচনার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা বা শাস্ত্রও যে সে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন হওয়ায় প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি আচার্য্যগণ উল্লিখিতরূপে বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিয়া তন্মূলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ভামতী-সম্প্রদায় বলেন যে, প্রথমে প্রত্যক্ষজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা না জানিলে দৃশ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করা কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। যদি বল যে, সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, তাহাই বিষয়-প্রত্যক্ষ, আর ঐ সকল প্রত্যক্ষবিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। এইরূপ নিরূপণে পরস্পরাশ্রয়-দোষ অবশ্যম্ভাবী। কেননা, বিষয়-প্রত্যক্ষ বুঝিতে হইলেই এ-ক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বুঝিতে হয়; পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষজ্ঞানকে জানিতে গেলেও প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট বিষয়কেই প্রথমতঃ জানা আবশ্যক হয়। চৈতন্যের সহিত কিংবা অভিব্যক্ত বা অনাবৃত চৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে দৃশ্য বিষয়ের যে উপলব্ধি হইয়া থাকে—তাহাই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা, এইরূপ নির্ব্বচনও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, অপ্রত্যক্ষ দূরবর্ত্তী অনুমেয় বহ্নিপ্রভৃতিও স্বপ্রকাশ চৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া (অদ্বৈতবেদান্তের মতে বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুই চৈতন্যে অধ্যস্ত) চৈতন্যের সহিত অভিন্নই বটে। অতএব এইমতে দূরস্থ অপ্রত্যক্ষ বহ্নি প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ হইবার আপত্তি হইতে পারে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, দূরস্থ অপ্রত্যক্ষ বহ্নি প্রভৃতির সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ (সন্নিকর্ষ) না থাকায় দূরবর্ত্তী বহ্নি প্রভৃতির অন্তরালে অবস্থিত অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতির ভাসক যে চৈতন্য আছে, তাহা দ্রষ্টার নিকট অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয় নাই। এইজন্য অপ্রকাশিত অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণে আবৃত চৈতন্যের সহিত

ভামতীর মতে জ্ঞান-প্রত্যক্ষ এবং বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ

বহ্নি প্রভৃতির আধ্যাসিক অভেদ থাকিলেও দূরবর্ত্তী বহ্নি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবার প্রশ্ন আসে না। আর এক কথা এই, অভিব্যক্ত চৈতন্যের সঙ্গে যে অভেদের কথা বলা হইয়াছে, এখানে যদি বাস্তবিক অভেদ ধরা যায়, তবে চক্ষুর ব্যাপার বা বৃত্তির ফলে অভিব্যক্ত যে পর্ব্বত-চৈতন্য তাহার সহিত অনুমেয় বহ্নি-চৈতন্যের এবং বহ্নি-চৈতন্যে অধ্যস্ত বহ্নিরও বাস্তবিক অভেদ আছে বলিয়া অনুমেয় বহ্নিরও প্রত্যক্ষ হইবার আপত্তি হইয়া পড়ে।[১] বেদান্তের মতে অভেদই তো চৈতন্যের স্বভাব; ভেদ তো সর্ব্বত্রই ঔপাধিক এবং ভ্রান্তি-কল্পিত। উল্লিখিত পর্ব্বত, বহ্নি প্রভৃতি সমস্তই চৈতন্যের উপাধি। ঐ সকল উপাধির সহিত অধ্যাস বা মিলনের ফলেই অখণ্ড, ভূমা চৈতন্য সসীম এবং সখণ্ডভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। চৈতন্যের ঐ সকল উপাধি-অংশ বাদ দিলে চৈতন্য এক, অখণ্ড এবং সর্ব্বদা অভিব্যক্তই হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল, চৈতন্য বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও এই অভেদটি তো আমাদের নিকট ধরা পড়ে না; অনুমেয় দূরবর্ত্তী বহ্নির এবং বহ্নি-চৈতন্যের সহিত পর্ব্বত-চৈতন্যের ভেদই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। যে-ক্ষেত্রে এই ভেদ-দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া অভেদ প্রকাশিত হইবে, সেখানেই চৈতন্যের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টিরও প্রত্যক্ষ হইবে। এইরূপ অভেদ-ব্যাখ্যারও কোন মূল্য দেওয়া চলে না। অন্তঃকরণের ধর্ম্ম শোক, দুঃখ প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হইয়া অহং দুঃখী, শোকাতুরঃ, এইরূপে শোক-দুঃখের যে প্রত্যক্ষ হয়, সে-ক্ষেত্রে শোক, দুঃখ প্রভৃতির সহিত আত্মার অভেদ হয় কি? অভেদ না হইয়া তোমার (প্রতিবাদীর) মতে শোক-দুঃখের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে?[২] তারপর, চৈতন্যের অভেদ বলিতে বিবরণপন্থী বৈদান্তিকগণ যদি সর্ব্বপ্রকার উপাধি-সম্পর্কশূন্য (নিরুপাধি) চৈতন্যের অভেদ বোঝেন, তবে আধ্যাসিক অন্য প্রত্যক্ষ দূরে থাকুক, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপে বেদান্ত-বেদ্য চরম ও

১। স্বরূপসদভেদমাত্রবিবক্ষায়াং চাক্ষুষবৃত্ত্যভিব্যক্ত পর্ব্বতাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেন ব্যবহিতবহ্ন্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্য তেন ব্যবহিতবহ্নেশ্চ স্বাভাবিকাধ্যাসিকাভেদসত্ত্বেন ব্যবহিতবহ্নেরপ্যপরোক্ষত্বাপত্তেঃ; বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

২। বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল, ৫৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং; ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৪৩ পৃষ্ঠা;

পরম যে আত্ম-সাক্ষাৎকার-উদিত হয়, উদয়-মুহূর্ত্তে ঐ আত্ম-প্রত্যক্ষকেও আর প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, অবিদ্যা আত্ম-জ্ঞানোদয়ে নিবর্ত্তনীয় হইলেও অবিদ্যা-উপাধি বর্ত্তমান থাকিয়াই আলোচ্য আত্ম-প্রত্যক্ষ উৎপাদন করিয়া অবিদ্যা বিলীন হইয়া যায়।[১]

এইরূপে বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপাদন এবং বিষয়-প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণের যে প্রয়াস বিবরণ-সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিধ্বস্ত করিয়া অপ্যয়দীক্ষিত তাঁহার বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমলে স্বীয় মতানুসারে প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ নির্ব্বচন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে-জ্ঞান কোনরূপ জ্ঞান-জন্য নহে, তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান—জ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বং জ্ঞানাপরোক্ষ্যমিতি নির্বক্তব্যম্। বেঃ কল্পতরু-পরিমল, ৫৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং; এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণও নির্দোষ নহে। "দণ্ডী পুরুষঃ", দণ্ডধারী পুরুষটি, এইরূপে আমরা যখন কোনও দণ্ডধারী পুরুষকে প্রত্যক্ষ করি, সেখানে দণ্ডী বা দণ্ডধারী এই প্রকার প্রত্যক্ষে দণ্ডটি হয় বিশেষণ। দণ্ডকে না চিনিলে দণ্ডীকে চেনা যায় না; সুতরাং দণ্ডীর প্রত্যক্ষজ্ঞান যে "দণ্ড" এই বিশেষণের জ্ঞান-জন্য জ্ঞান, (জ্ঞানাজন্য জ্ঞান নহে) ইহা নিঃসন্দেহ। এই অবস্থায় দণ্ডীর প্রত্যক্ষে আলোচ্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণটির সঙ্গতি হইবে কিরূপে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, "জ্ঞানাজন্য জ্ঞান" অর্থাৎ যেই জ্ঞান কোনরূপ জ্ঞান-জন্য নহে, এইরূপে প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে "জ্ঞানা"জন্য এই জ্ঞানপদটিকে এই ভাবে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, লক্ষ্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের যাহা বিষয় নহে, এইরূপ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ কোনও জ্ঞান-মূলে উৎপন্ন নহে, এই জাতীয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া জানিবে - স্বাবিষয়-বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বং জ্ঞানে অপরোক্ষত্বম, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৪৬ পৃষ্ঠা; দণ্ডী পুরুষঃ, এই প্রত্যক্ষ "দণ্ড" এইরূপ বিশেষণের জ্ঞান-জন্য হইলেও ঐ বিশেষণটিও (দণ্ডও) এখানে আলোচ্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয়ই হইবে, অবিষয় হইবে না। এই অবস্থায় ঐ বিশেষণের

১। নিরস্তভেদোপাধিকাভেদবিবক্ষায়াং চরমসাক্ষাৎকারনিবর্ত্ত্যাবিদ্যোপাধেঃ চরমসাক্ষাৎকারোৎপত্তিদশায়ামপি সত্ত্বেন ব্রহ্মণস্তদানীমাপরোক্ষ্যাভাবাপত্তেঃ,

বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল, ৪৬ পৃষ্ঠা. নির্ণয়সাগর সং;

জ্ঞানকে লক্ষ্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যাহা বিষয় নহে, এইরূপ কোনও বিষয়-সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞান-জন্য জ্ঞান বলা কোন মতেই চলে না। (স্বাবিষয়-বিষয়ক জ্ঞানাজন্য জ্ঞানই বলিতে হয়) এই জন্য "দণ্ডী পুরুষঃ" প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে বাধা কি? অপ্যয়দীক্ষিত বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমলে এবং শ্রীমদদ্বৈতানন্দ তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যাভরণে উল্লিখিতরূপেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন; ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া যাহা ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সকল জ্ঞেয় বিষয়ও প্রত্যক্ষ বলিয়াই অভিহিত হয়। এই দৃষ্টিতেই উঁহারা বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন।[১]

ভামতী-কল্পতরু-পরিমলের মত-খণ্ডনে এবং স্বীয় মতের পোষণে বিবরণপন্থীরা বলেন, প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ না করিয়া বিষয়-প্রত্যক্ষ-নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া ভামতী-সম্প্রদায় যে-সকল দোষ উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, তাহা আদৌ গ্রহণ-যোগ্য নহে। বিষয়-প্রত্যক্ষ উপপাদন অসম্ভব হইবে কেন? অদ্বৈতবেদান্তের মতে এক-মাত্র সাক্ষীকেই সর্ব্বদা সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ বলা হয়।

বিবরণ-সম্প্রদায়ের মতে বিষয়-প্রত্যক্ষ ও জ্ঞান-প্রত্যক্ষের স্বরূপ

নিত্য, স্বপ্রকাশ চিদ্ বা ব্রহ্ম শ্রুতির ভাষায় "সাক্ষাৎ" এবং "অপরোক্ষ" হইলেও পরব্রহ্ম অনাদি অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকেন বলিয়া সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ-গোচর হন না। সাক্ষী-চৈতন্য কিন্তু কখনও আবৃত থাকে না, সাক্ষী সর্ব্বদাই অনাবৃত। জীব নিজেকে "অহং" বা "আমি" বলিয়া যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, ইহাই সাক্ষী-প্রত্যক্ষ। "অহম্"ভাবে স্বীয় আত্মার প্রত্যক্ষ বা সাক্ষী-প্রত্যক্ষ সকল জীবেরই উদিত হইয়া থাকে। সাক্ষীপ্রত্যক্ষ-সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ মতানৈক্য নাই। এ-বিষয়ে সন্দেহ বা ভ্রমেরও কোন অবকাশ নাই। অহং বা সাক্ষীসম্বন্ধে আমি, আমি কিনা, কিংবা আমি, আমি না, এইরূপ সন্দেহ বা ভ্রম কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিরই উদয় হইতে দেখা যায় না। "আমি" আমার নিকট সর্ব্বদাই প্রকাশশীল। নিখিল বিশ্ব আমার নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারে, আমি আমার নিকট কখনও

১। অপরোক্ষজ্ঞানজন্যব্যবহারবিষয়যোগ্যত্বঞ্চ অর্থস্যাপরোক্ষত্বম্। ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৪৭ পৃষ্ঠা; কল্পতরু-পরিমল, ৫৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

অপ্রকাশিত থাকিতে পারি কি? তাহা পারি না বলিয়াই আমার আমিত্ব সম্বন্ধে আমি সর্ব্বদাই সচেতন। আচার্য্য শঙ্করও এই সদা-ভাস্বর সাক্ষী আত্মার বিষয় উল্লেখ করিয়া শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, সকলেই "আমি আছি" এইরূপে আত্মার (সাক্ষীর) অস্তিত্ব প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকে। আত্মা যদি সর্ব্বদা সকলের প্রত্যক্ষ-গম্য না হইত, তবে "আমি নাই", এইরূপে আত্মার অনস্তিত্বও লোকে প্রত্যক্ষ করিত; [১] তাহা তো করেনা, সুতরাং সাক্ষী আত্মার সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সদা প্রকাশমান সাক্ষী-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যে-বিষয়টি প্রকাশিত হইবে, তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাই বিবরণ-সম্প্রদায়ের মতে বিষয়-প্রত্যক্ষের স্থূল কথা। সাক্ষী-চৈতন্য বা অহংরূপে প্রকাশিত জীব-চৈতন্যের সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই; সুতরাং পরব্রহ্মও যে সাক্ষী-প্রত্যক্ষের গোচর হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঘট প্রভৃতি জড় বস্তু সাক্ষী-চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া যখন সাক্ষী-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখন জড় বস্তুও প্রত্যক্ষ-গম্য হয়। দূরবর্ত্তী ঘট বা অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতি চৈতন্যে অধ্যস্ত বিধায় চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইলেও অপ্রত্যক্ষ ঘট ও অনুমেয় বহ্নির ভাসক যে চৈতন্য, তাহা অভিব্যক্ত বা অনাবৃত চৈতন্য নহে, আবৃত চৈতন্য। বিষয়ের অভিমুখে অন্তঃকরণের বৃত্তি নির্গত হইলেই ঐ বৃত্তির সাহায্যে ঘটাদি বিষয়-চৈতন্যে যে অজ্ঞানের আবরণ আছে, তাহা তিরোহিত হয়। ফলে, ঘটাদি বিষয়ও প্রকাশিত হয়। আলোচিত লক্ষণে শুধু "চৈতন্যাভিন্ন" এইরূপ না বলিয়া "অভিব্যক্ত বা অনাবৃত চৈতন্যাভিন্ন" বলায় অনুমেয় বহ্নি কিংবা দূরস্থ ঘট প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির কথা উঠিল না। অজ্ঞানের আবরণে আবৃত চৈতন্য এবং অনাবৃত চৈতন্য অদ্বৈত-বেদান্তের মতে বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও, দৃশ্য বিষয় যখন অনাবৃত চৈতন্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তখনই দৃশ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে, লক্ষণে এইরূপে স্পষ্টতঃ উল্লেখ থাকায় অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবার প্রশ্নই আসে না। কেননা, দূরবর্ত্তী ঘট, অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোচর না হওয়ায়

১। ব্রহ্মসূত্র-শংভাষ্য, ৮১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং;

ঐ সকল দূরস্থ বিষয়-সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বৃত্তির নির্গম সম্ভবপর হয় না; সুতরাং অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতির ভাসক চৈতন্যের অজ্ঞান-আবরণ থাকিয়াই যায়, তিরোহিত হয় না। এই অবস্থায় অনাবৃত চৈতন্যের সহিত দূরস্থ ঘট, বহ্নি প্রভৃতির অভেদ প্রতিভাত না হওয়ায় দূরস্থ ঘট, বহ্নি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? বিষয়ের প্রত্যক্ষ-স্থলে দৃশ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষী-চৈতন্যের যে অভেদের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, অহং সুখী, অহং দুঃখী, এইরূপে সুখ-দুঃখের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, সেক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি তো "আমি সুখ," "আমি দুঃখ" এইরূপে অহং বা সাক্ষী-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রতিভাত হয় না। আত্মাতে সুখ-দুঃখের কল্পিত সম্বন্ধই সূচিত হয়। এই অবস্থায় সুখ-দুঃখকে সাক্ষীর সহিত অভিন্ন বলা যায় কিরূপে? আর সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষই বা হয় কিরূপে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, অহং সুখী, অহং দুঃখী প্রভৃতি বোধের দ্বারা আত্মাকে সুখ-দুঃখ প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া মনে হইলেও আত্মা যখন নিজেকে সুখময়, দুঃখাতুর, এইভাবে উপলব্ধি করে, তখন সুখ-দুঃখের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আত্মার সহিত সুখ-দুঃখের যে অভেদ বা তাদাত্ম্যাধ্যাস হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; এবং সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ হইবার পক্ষেও কোন বাধা হয় না। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাই বিষয়-প্রত্যক্ষ; আর ঐরূপ প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; এইভাবে বিষয়-প্রত্যক্ষ ও জ্ঞান-প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ব্বচন-করিতে গেলে পরস্পরাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হয় বলিয়াই, বিবরণ-সম্প্রদায় ঐভাবে লক্ষণ-নিরূপণ না করিয়া উল্লিখিতরূপে বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন করিয়াছেন। ঐরূপ অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত বিষয়ের ব্যবহার-সম্পাদনযোগ্য জ্ঞানই এই মতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা বা প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া জানিবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্র-অনুশীলনের ফলে নিরুপাধি, ভূমা ব্রহ্ম সম্পর্কে যে সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, তাহা দৃশ্য জড় বস্তুর এবং ব্যাবহারিক খণ্ড জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। চিন্ময় পরব্রহ্ম যখন কোনরূপ

অজ্ঞানের আবরণে আবৃত না হইয়া স্বীয় চিদানন্দরূপে অবস্থান করিবে, তখনই উহাকে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। চিত্ঃ অপরোক্ষত্বম্ অজ্ঞানাবিষয়চিদ্রূপত্বম্। সিদ্ধান্তবিন্দু-টীকা, ২৭৮ পৃঃ, রাজেন্দ্র ঘোষ সং; বিবরণপন্থী বেদান্তিগণের মতে পরব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়ও বটে বিষয়ও বটে—আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-ভাগিনী নির্ব্বিভাগ-চিতিরেব কেবলা। সংক্ষেপশারীরক, ১।৩১৯, ব্রহ্ম-বিষয়ে জীবের অনাদি অজ্ঞান চলিতেছে, ঐ অজ্ঞানই ব্রহ্মের তিরস্করণী। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের যবনিকা সরিয়া গেলেই স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় হইবে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, সদা অপরোক্ষ, এইরূপ চিত্ত-বৃত্তি দৃঢ় হইলেই ব্রহ্মের অজ্ঞানাবরণ চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। অজ্ঞানাবরণের বিলোপ-সাধনেই এক্ষেত্রে চিত্ত-বৃত্তির সার্থকতা। কেননা, আবরণের উচ্ছেদ ভিন্ন পরব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তির আর কিছুই করিবার নাই। দৃষ্টির তিরস্করণী অবিদ্যা বিলুপ্ত হইলে স্বয়ং-জ্যোতিঃ ব্রহ্ম স্বতঃই প্রত্যক্ষ হইবেন। নিত্য চিদ্বস্তুর স্বতঃ অপরোক্ষ হওয়াই তো স্বভাব, অজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় অর্থাৎ জীবের ব্রহ্ম-সম্পর্কে অনাদি অজ্ঞান চলিতে থাকায়, ব্রহ্মের স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাবটি জীবের দৃষ্টিতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম অজ্ঞানের অবিষয় হইলেই অর্থাৎ ব্রহ্ম-সম্পর্কে জীবের অনাদি অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলেই, পরব্রহ্মের নিত্য চিদ্রূপতার আর ঢাকা পড়িবার কোন কারণ থাকে না। নিত্য চিদ্রূপের বিলুপ্তি না হইয়া এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থানই ব্রহ্মের অপরোক্ষতা। ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়কে কিন্তু এই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বলা চলে না। কেননা, জড় ঘট প্রভৃতি পদার্থ তো সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানের বিষয় হয় না। চিদ্ বা জ্ঞানই কেবল অজ্ঞানের বিষয় হয়। দৃশ্য বস্তু সকল অজ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞান, তাহার উপাধি বা পরিচ্ছেদক মাত্র। দৃশ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্য বস্তুগুলি অজ্ঞানের বিষয় এবং অজ্ঞানের আবরণে আবৃত চৈতন্যের উপাধি বা পরিচ্ছেদক নহে; অজ্ঞানের অবিষয়, অনাবৃত ভাসক চৈতন্যেরই উহা উপাধি। এইরূপে অভিব্যক্ত বা ভাসক চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়াই দৃশ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। মধুসূদন সরস্বতীর সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর ব্রহ্মানন্দের যে টীকা আছে,

ঐ টীকায় ব্রহ্মানন্দ উল্লিখিতরূপেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষতা এবং জড় ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের মধ্যে বিভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।[১]

অহংরূপে প্রকাশিত সাক্ষী-চৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে দৃশ্য ঘট প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশই বিষয়-প্রত্যক্ষ; এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষ-বিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। এইভাবে বিবরণ-মতে বিষয়-প্রত্যক্ষ প্রভৃতির স্বরূপ যে দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায়ও সেই দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রমাতা বা জ্ঞাতার সহিত ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়ের অভেদ হওয়ার ফলেই ঘট প্রভৃতি জ্ঞেয় বিষয় প্রত্যক্ষ-গোচর হয়; ঘটাদে-র্বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বন্তু প্রমাত্রভিন্নত্বম্। বেঃ পরিভাষা, ৬৫ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং; প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় ঘট প্রভৃতি বস্তুর সহিত চেতন প্রমাতার যে অভেদের কথা বলা হইল, তাহা সম্ভব হয় কিরূপে? "আমি ঘট দেখিতেছি," "এইটি ঘট" এইরূপে সকল জ্ঞাতাই নিজ হইতে ভিন্নরূপেই ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। অয়ং ঘটঃ, এইটি ঘট, ইহার পরিবর্ত্তে অহং ঘটঃ, আমি ঘট, এইরূপে কোন সুধী ব্যক্তিই স্বীয় আত্মার সহিত ঘট প্রভৃতির অভেদ প্রত্যক্ষ করেন না। এই অবস্থায় প্রমাতার সহিত ঘট প্রভৃতির অভেদ হইলেই ঘট প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপে বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন সঙ্গত হয় কি? এই আপত্তির উত্তরে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন, প্রমাতার সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের যে অভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই নহে যে, চেতন প্রমাতা ও জড় বিষয়, এই উভয়ই এক বা অভিন্ন। প্রমাতার অস্তিত্ব ব্যতীত জড় ঘট প্রভৃতি বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নাই, প্রমাতা ও দৃশ্য বিষয়ের অভেদ-উক্তির দ্বারা ইহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রমাত্রভেদো নাম ন তাবদৈক্যং কিন্তু প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বাভাবঃ। বেঃ পরিভাষা, ৬৭ পৃঃ; পরিভাষার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়াই জড় বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘট ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন খণ্ড চৈতন্যে অধ্যস্ত। ঘট ও ঘট-চৈতন্যের অধ্যাস বা মিলনের ফলে এই দুইএর মধ্যে কোনই ভেদ রহিল না, দুইই মিলিয়া মিশিয়া

১। সিদ্ধান্তবিন্দুর ব্রহ্মানন্দ-কৃত টীকা, ২৭৯ পৃষ্ঠা, রাজেন্দ্র ঘোষ সং;

অভিন্ন হইয়া গেল। চৈতন্যের সত্তা ঘটে আরোপিত হইয়া (ঘটঃ সন্) ঘট সত্য, এইরূপ বোধ হইল ; চৈতন্মের অস্তিত্ব ও ঘটের অস্তিত্বের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ রহিল না। চৈতন্মের প্রকাশে ঘটেরও প্রকাশ সাধিত হইল। চৈতন্মের সহিত বিষয়ের অভেদ-ব্যাখ্যার ইহাই রহস্য ; এবং এইরূপ অভেদ-বোধই বিষয়-প্রত্যক্ষের নিয়ামক। ভাল, চৈতন্যে ঘটের অধ্যাসের ফলে ঘট-চৈতন্য ও ঘট, চৈতন্য-সত্তা এবং ঘট-সত্তা যে অভিন্ন হইবে, তাহা বরং বুঝা গেল, কিন্তু বহিঃস্থিত জড় ঘট এবং অদূরস্থ চেতন প্রমাতা বা জ্ঞাতা যে অভিন্ন, তাহা তোমাকে কে বলিল ? চৈতন্যই তো বিষয়ের প্রকাশক, ঘট প্রমাতার কাছেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিষয় প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিতে হইলে জ্ঞাতৃ-চৈতন্মের সহিত বিষয়ের অভেদ প্রদর্শনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিষয়-চৈতন্য এবং বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত ঘট প্রভৃতি বিষয় যে অভিন্ন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাতৃ-চৈতন্য যে ভিন্ন নহে, তাহা উপপাদন করিলেই প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদের দৃষ্টিতে বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন করা সম্ভবপর হয়। আমি যখন কোনও অদূরবর্ত্তী দৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন আমিই জ্ঞাতা ; অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বা (প্রমাতৃ-চৈতন্যই) আমার আমিত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব। আমার অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়-পথে দীর্ঘ আলোক-রেখার ন্যায় বিসর্পিত হইয়া বিষয় যেইস্থানে অবস্থান করে, সেইস্থানে গমন করিয়া বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। অন্তঃকরণের এই বিষয়-দেশে গমন এবং বিষয়ের আকার-ধারণকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণাম বলা হইয়া থাকে। এই অন্তঃকরণ-বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বলে প্রমাণ-চৈতন্য ; আর ঘটাদি বিষয়ের অন্তরালে ঐ সকল বিষয়ের ভাসক যে চৈতন্য আছে, তাহার নাম বিষয়-চৈতন্য। বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাণ-চৈতন্য (বিষয়ের আকারের অনুরূপ আকারপ্রাপ্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-চৈতন্য) একই ঘটরূপ দৃশ্য বিষয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলে, বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাণ-চৈতন্মের অভেদও সাধিত হইয়াছে। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা প্রমাতৃ-চৈতন্যও অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে দ্বার করিয়া দৃশ্য বিষয়ের (অর্থাৎ ঘটাদির) স্থানবর্ত্তীই হইয়াছে ; এবং এইজন্যই দৃশ্য বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমাতৃ চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য এবং বিষয়-চৈতন্য, এই ত্রিবিধ চৈতন্যই এক দেশস্থ হওয়ায় (একই ঘটাদি দৃশ্য বিষয়রূপ আধারে অবস্থান

করায়) এই চৈতন্যত্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন উপাধিবশতঃ পরস্পর যে কল্পিত ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়া চৈতন্যত্রয় এক বা অভিন্ন হইয়া গেল। কারণ, দেখা যায়, বিভাজক বস্তু সকল তুল্যদেশবর্ত্তী হইলে ঐ সকল বিভাজক পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে বিভাজ্য বস্তুর ভেদ সাধন করে না। গৃহের মধ্যে অবস্থিত ঘটে যে আকাশ আছে, ঐ ঘটাকাশের সহিত গৃহাকাশ একদেশস্থ হইয়াছে; অর্থাৎ ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ যেমন আছে, সেইরূপ গৃহাকাশও আছে। এই অবস্থায় ঘটাকাশকে গৃহাকাশ হইতে বিভিন্ন করা চলে না। এখন কথা এই যে, বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাতৃ চৈতন্য যদি এক বা অভিন্নই হয়, তবে বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত, সুতরাং বিষয়-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন যে ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়, তাহা প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিতও অভিন্নই হইবে। ঘটঃ সন্, এইরূপে ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়ের যে অস্তিত্ব বুদ্ধি জন্মে, তাহাও বস্তুতঃ ঘটের নিজস্ব নহে। ঘটের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, (যাহাকে বিষয়-চৈতন্য বলা হইয়াছে) সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সহিত ঘটাদি বিষয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ-অধ্যাসের ফলে অধিষ্ঠান-চৈতন্য বা বিষয়-চৈতন্যের নিজস্ব সত্তাই ঘটাদি বিষয়-গত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। অসত্য ঘট সত্য বলিয়া বোধ হয়। চৈতন্যের সত্তা বা অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। চৈতন্যের ন্যায় ঘটাদির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে ঘট প্রভৃতিও চৈতন্যের ন্যায় সত্যই হয়, মিথ্যা হয় না। বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাতৃ-চৈতন্য যে অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহা আমরা ইতঃ-পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বিষয়-চৈতন্যের সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত ঘট প্রভৃতি বিষয়কে প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা দ্বারাও অনুপ্রাণিত বলা যায়। সে-ক্ষেত্রে প্রমাতার অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিষয়ের আহৃত অস্তিত্ব প্রমাতার অস্তিত্বের মধ্যে নিলীন হইয়া, প্রমাতার সহিত অভিন্ন হইয়াই বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রভৃতির মতে বিষয়-প্রত্যক্ষের রহস্য।[1] প্রশ্ন হইতে

১। ঘটাদেঃ স্বাবচ্ছিন্নচৈতন্যাধ্যস্ততয়া বিষয়-চৈতন্যসত্তৈব ঘটাদিসত্তা অধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তায়া আরোপিতসত্তায়া অনঙ্গীকারাৎ। বিষয়-চৈতন্যঞ্চ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ প্রমাতৃ-চৈতন্যমেবেতি প্রমাতৃ-চৈতন্যস্যৈব ঘটাদ্যধিষ্ঠানতয়া প্রমাতৃ-সত্তৈব ঘটাদি-সত্তা নান্যেতি সিদ্ধং ঘটাদেরপরোক্ষত্বম্।

বেদান্তপরিভাষা, ৬৭ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

পারে যে, প্রমাতার সহিত অভিন্ন হইয়াই যদি দৃশ্য বিষয় সকল প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, তবে অহং ঘটঃ, আমি ঘট, এইরূপে 'আমি'র সহিত ঘটের অভেদ-প্রতীতি না হইয়া, অয়ং ঘটঃ, এইটি ঘট, এই ভাবে আমা হইতে ভিন্ন রূপে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, যেই বস্তু-সম্পর্কে যে-প্রকারের অনুভব পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপেই ঐ বস্তুর সংস্কার দর্শকের চিত্তপটে আঁকা আছে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি উদিত হইয়া মনের কোণে সুপ্ত সেই সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ করতঃ পূর্ব্বজ অনুভবের আকারের অনুরূপেই দৃশ্য বিষয়কে প্রমাতার নিকট উপস্থিত করিয়া প্রমাতাকে বিষয়-প্রত্যক্ষ করাইবে। যেই বস্তু "ইদম্" রূপে পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে এবং ঐরূপই অনুভূতিজাত সংস্কার আছে, সেখানে "ইদম্" রূপেই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হইবে। "অহম্" আকারে পূর্ব্ব-সংস্কার থাকিলে অহং ভাবেই সে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হইবে, অন্য কোন ভাবে হইবে না। অয়ং ঘটঃ, এইরূপে ঘটের প্রত্যক্ষে "ইদম্" আকারে অন্তঃকরণের বৃত্তি উদিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ প্রকার বৃত্তিমূলে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঘট "ইদং" রূপেই প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে, অহংরূপে হইবে না। বিষয়ের প্রত্যক্ষে অন্তঃকরণ-বৃত্তির আকারের উপর অধিক জোর দেওয়ার কারণই এই, যেখানে অন্তঃকরণ-বৃত্তি যেই আকারে উৎপন্ন হইবে, সেইরূপেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইবে, অন্য কোনও রূপে হইবে না। ফলে, "রূপবান্ ঘটঃ" এইভাবে ঘটের রূপটির যেখানে প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেখানে অন্তঃকরণ-বৃত্তি ঘটের রূপের আকারে উদিত হইয়া ঘটের রূপেরই প্রত্যক্ষতা সাধন করিবে। ঘটের পরিমাণ প্রভৃতি অন্য কোনও বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মের সে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ, সেখানে তো পরিমাণের আকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তি উদিত হয় নাই, পরিমাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? যদি পরিমাণের আকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তবে সে-স্থলে ঘটের পরিমাণেরই কেবল প্রত্যক্ষ হইবে, রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবে না। দৃশ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তি যখন যে আকার ধারণ করিবে, তখন সেই আকারেরই শুধু প্রত্যক্ষ হইবে, অন্য কোন আকারের প্রত্যক্ষ হইবে না। অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তিই দেখা যাইতেছে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষের নিয়ামক। ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তিও প্রত্যক্ষ-গম্য হইতে পারে। অন্তঃকরণ-

বৃত্তিটি যখন প্রত্যক্ষের গোচর হয়, তখন বৃত্তি নিজেই নিজের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। বৃত্তির প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিবার জন্য বৃত্তি-বিষয়ে আর একটি দ্বিতীয় বৃত্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রথম উৎপন্ন বৃত্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দ্বিতীয় বৃত্তি স্বীকার করিতে গেলে, ঐ দ্বিতীয় বৃত্তির প্রত্যক্ষের জন্য তৃতীয় বৃত্তি, তৃতীয় বৃত্তির জন্য চতুর্থ বৃত্তি, এইরূপে বৃত্তির পর বৃত্তি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অনবস্থা-দোষই আসিয়া পড়ে। বিষয়ের প্রত্যক্ষে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেই বিষয়ের প্রত্যক্ষের কথা বলা হইতেছে, সেই বিষয়টি আদৌ প্রত্যক্ষ-যোগ্য কিনা? বিষয়টি যদি প্রত্যক্ষের যোগ্য না হয়, তবে সেই প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়-সম্পর্কে অন্তঃকরণের বৃত্তি উদিত হইলেও ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে না। সুখ-দুঃখ যেমন অন্তঃকরণের গুণ, ধর্ম্ম-অধর্ম্মও সেইরূপই অন্তঃকরণের গুণ। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সুখ-দুঃখের ন্যায় অন্তঃকরণের গুণ হইলেও সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষ-যোগ্য বলিয়া সুখ-দুঃখেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, এইজন্য কি ন্যায়-মতে, কি বেদান্ত-মতে, কোন মতেই ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। এই যোগ্যতার বা অযোগ্যতার মাপকাঠি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইলেও সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, ইহার কারণ ঐ সকল বস্তুর স্বভাব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?—ফলবলকল্প্যঃ স্বভাব এব শরণম্। বেদান্তপরিভাষা, ৫৪ পৃষ্ঠা, বোম্বেসং; সুখ-দুঃখ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রভৃতি ন্যায়-মতে আত্মার ধর্ম্ম, আর বেদান্তের মতে ঐ সকল অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। বেদান্তের ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ স্বীয় পক্ষের সমর্থনে বলেন, অহং সুখী, অহং দুঃখী, এইরূপে আমাদের যে সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা তো আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই উদিত হয়, এই অবস্থায় সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে বৈদান্তিক অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলেন কিরূপে? সুখ-দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইলে "আমার মনে সুখ হইয়াছে" এইরূপেই সুখ প্রভৃতির উপলব্ধি হইত, "আমি সুখী" এইরূপে স্বীয় আত্মাকে সুখাদির আশ্রয় বলিয়া

প্রত্যক্ষ হইত না। এই আপত্তির উত্তরে বেদান্তী বলেন যে, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বাস্তবিক পক্ষে অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। অন্তঃকরণেই সুখ-দুঃখ প্রভৃতির উদয় হয়, তবে সেই সুখ-দুঃখময় অন্তঃকরণের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য বা অভেদ-অধ্যাসের ফলে অন্তঃকরণস্থ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আত্মস্থ হইয়া অহং সুখী, অহং দুঃখী, এইরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মার কাছে ঐরূপে সুখ-দুঃখ প্রভৃতির স্ফুরণই সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে। প্রতিবাদীর সর্ব্বপ্রকার আপত্তির সমাধান করিয়া বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষের যোগ্য দৃশ্য বস্তু সকল স্ব স্ব আকারের অনুরূপ আকার-প্রাপ্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে দ্বার করিয়া যখন প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশিত হইবে; ফলে, প্রমাতৃ-চৈতন্যের অস্তিত্ব ব্যতীত দৃশ্য বিষয়ের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে না, তখন সেই সকল বিষয় প্রমাতার প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে।[১]

বিষয় জ্ঞাতার নিকটই প্রকাশিত হয়, সুতরাং জ্ঞাতার বা জ্ঞাতৃ-চৈতন্যের সহিত বিষয়ের অর্থাৎ বিষয়-চৈতন্যের অভেদ উপপাদনই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা-সাধনের জন্য অদ্বৈতবেদান্তীর সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রমাণ-চৈতন্য বা অন্তঃকরণ-বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেও অবশ্য প্রত্যক্ষে বাদ দেওয়া চলে না। যেই বিষয়-সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গত হইবে, সেই অদূরস্থ বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হইবে। দূরবর্ত্তী বিষয়-সম্পর্কে অন্তকরণ-বৃত্তির নির্গমনও সম্ভব নহে, সুতরাং দূরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়াও সম্ভবপর নহে। অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে বিষয়-প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎসাধন বা প্রমাণ বলা হয়। অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা প্রমাণ-চৈতন্যের বিষয় হইলেই দৃশ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিষয়-সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গমনের ফলে বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাণ-চৈতন্যও অভিন্নই হইবে। বিষয়-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন যে প্রমাণ-চৈতন্য, তাহার বিষয় হওয়াই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা—যোগ্যত্বে সতি বিষয়-চৈতন্যাভিন্ন প্রমাণ-চৈতন্য-বিষয়ত্বং ঘটাদে র্বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্। শিখামণি, ৬৫ পৃঃ; এইরূপেই বেদান্তপরিভাষার টীকাকার রামকৃষ্ণাধ্বরি

১। স্বাকারবৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্যসত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বশূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্; বেদান্তপরিভাষা, ৭৫ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

তাঁহার শিখামণি টীকায় বিষয়-প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ব্বচন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণাধ্বরির পিতৃদেব ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ (প্রমাত্রভিন্নত্বম্) হইলেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। পিতা ও পুত্রের, গ্রন্থকার ও ঐ গ্রন্থের টীকাকারের এইরূপ মতভেদ এক্ষেত্রে মারাত্মক কিছু নহে, শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদমাত্র। দ্রষ্টা না থাকিলে বিষয়-দর্শনের কোন অর্থ হয় না। জ্ঞাতার নিকটই জ্ঞেয় বিষয়ের স্ফুরণ হইয়া থাকে। জড় বিষয়ের স্ফুরণ জ্ঞাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইলেই কেবল হওয়া সম্ভবপর। বিবরণ প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের আকর গ্রন্থেও জ্ঞাতার অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভেদের দৃষ্টিতেই বিষয়-প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে। আকর গ্রন্থের সেই নির্ব্বচন-শৈলী অনুসরণ করিয়াই পণ্ডিত ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায় বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন করিয়াছেন। বিষয় সকল প্রমাতার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রমাতাকে যেমন বিষয়ের প্রত্যক্ষে প্রধান স্থান দেওয়া হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষে প্রমাণকেও প্রধান স্থান দেওয়া চলে। প্রত্যক্ষ বিষয় সকল যেমন জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হয়, অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতিও সেইরূপ জ্ঞাতা অর্থাৎ অনুমানকারীর নিকটই অনুমানের ফলে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গত হয়, দূরস্থ বহ্নি প্রভৃতি বিষয়-সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গত হয় না। এই জন্য প্রথমটিকে বলা হয় প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টিকে বলে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিষয়ের প্রত্যক্ষের স্থলে অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা প্রমাণ-চৈতন্যই প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বা করণ। প্রমাতা প্রমাণের ন্যায় সাক্ষাৎ সাধন বা করণ নহে, অন্যতম কারণমাত্র। রামকৃষ্ণ তাঁহার শিখামণি টীকায় স্থূল বিষয়ের প্রত্যক্ষের যাহা অসাধারণ কারণ, সেই প্রমাণ বা প্রমাণ-চৈতন্যের উপর জোর দিয়াই বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিষয়-প্রত্যক্ষে প্রমাণের সাক্ষাৎ সাধনতা স্বীকার করিয়াও যাঁহার নিকট বিষয় প্রকাশিত হয়, প্রমাণের ব্যাপার বা কার্য্য যাঁহার ইচ্ছার অধীন, সেই স্বতন্ত্র প্রমাতার বা প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত দৃশ্য বিষয়ের বা বিষয়-চৈতন্যের অভেদ-দৃষ্টিকেই বিষয়-প্রত্যক্ষের নিয়ামক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঘট প্রভৃতি জ্ঞেয় বিষয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের প্রত্যক্ষের নির্দোষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন যে, বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের (প্রমাণ-চৈতন্যের) সহিত ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ-যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদই ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়ের ভাসক জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা বলিয়া জানিবে।[১] বিষয়ের অংশে এখানে (১) "ইন্দ্রিয়-যোগ্য" এবং (২) "বর্ত্তমান", এই দুইটি বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম বিশেষণটি দেওয়ার ফলে যাহা প্রত্যক্ষতঃ গ্রহণ-যোগ্য নহে, এইরূপ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রভৃতির জ্ঞান যে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে না, ইহাই স্পষ্টতঃ সূচিত হইল। অদ্বৈতবেদান্তের মতে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, তাহা আমরা বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ-বিচার-প্রসঙ্গেই পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান বিশেষণটির দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়টি বর্ত্তমান হওয়া আবশ্যক, অতীত হইলে চলিবে না, ইহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ফলে, "আমি পূর্ব্বে সুখী ছিলাম" এইরূপে আমার অতীত কালীন সুখ-সম্পর্কে যে স্মৃতি-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, (অতীত কালীন সুখ প্রভৃতিকে লইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া) তাহা স্মৃতিই হইবে, প্রত্যক্ষ হইবে না, ইহা বুঝা গেল। উল্লিখিত প্রত্যক্ষের লক্ষণটিকে সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষের ন্যায় ভ্রান্ত রজতাদির প্রত্যক্ষেও প্রয়োগ করার কোন বাধা নাই। যদি ভ্রম-প্রত্যক্ষকে বাদ দিয়া শুধু যথার্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণ-নির্ব্বচনই অভিপ্রেত হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে আলোচিত লক্ষণে বিষয়ের অংশে 'অবাধিত' বিশেষণের প্রয়োগ করিলেই চলিবে। ভ্রম-প্রত্যক্ষের বিষয় শুক্তি-রজত-প্রভৃতি বাধিত হইয়া থাকে বলিয়া, ভ্রম-প্রত্যক্ষ আর তখন এই লক্ষণের লক্ষ্য হইবে না। এখানে জ্ঞান-প্রত্যক্ষের (অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহারই) লক্ষণ করা হইয়াছে, সুতরাং লক্ষণটি যে চৈতন্যঘটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের আলোচনায় প্রমাতৃ-চৈতন্যকে বাদ দিয়া শুধু বিষয়-চৈতন্যের সহিত প্রমাণ-

ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে জ্ঞান-প্রত্যক্ষের স্বরূপ

১। তত্তদিন্দ্রিয়যোগ্য বর্ত্তমানবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাভিন্নত্বম্ তত্তদাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন জ্ঞানস্য তত্তদংশে প্রত্যক্ষত্বম্।

বেদান্তপরিভাষা, ৬৪ পৃষ্ঠা, বো সং;

চৈতন্যের (অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের) অভেদকে যে জ্ঞান-প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি? ইহার উত্তরে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান জ্ঞাতার নিকটই বিষয়টিকে প্রকাশ করে, অন্তঃকরণ-বৃত্তি এক্ষেত্রে জ্ঞাতার বিষয়-প্রত্যক্ষের দ্বারমাত্র। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণে জ্ঞাতাকে অর্থাৎ প্রমাতৃ-চৈতন্যকে বাদ দেওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। আলোচিত লক্ষণে বস্তুতঃ জ্ঞাতাকে বাদ দেওয়াও হয় নাই; প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদের ব্যাখ্যা করায় প্রমাতৃ-চৈতন্যও ফলতঃ আসিয়াই পড়িয়াছে। কেননা, এই মতে অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতৃ-চৈতন্য, অন্তঃকরণবৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রামাণ-চৈতন্য, অন্তঃকরণ-বৃত্তি তো অন্তঃকরণকে বাদ দিয়া উদিত হইতে পারে না! সুতরাং প্রমাণ-চৈতন্যের অন্তরালে প্রমাতৃ-চৈতন্যও যে অবস্থিত আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। অতএব প্রমাতৃ-চৈতন্যকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। আলোচ্য লক্ষণে প্রমাতৃ-চৈতন্যকে যে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, তাহার কারণ এই মনে হয় যে, নৈয়ায়িকগণের মতে যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-সংযোগের উপযোগিতা অধিক বলিয়া ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা হইয়াছে, সেইরূপ অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যায় প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-জন্য অন্তঃকরণ-বৃত্তির উপযোগিতা অত্যধিক বিধায়, ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়াই বেদান্তপরিভাষায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ নির্ব্বচন করা হইয়াছে। প্রদর্শিত লক্ষণে বর্ত্তমান বিষয়ের উপরও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নির্ব্বচন যে প্রত্যক্ষ বিষয়-সাপেক্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনের ফলে উদিত ব্রহ্ম-বোধের অপরোক্ষতা উপপাদনের জন্য শব্দ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রথমতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ কি তাহা নিরূপণ করিয়া, ঐরূপ প্রত্যক্ষ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান, এই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা আমরা বিবরণোক্ত প্রত্যক্ষের আলোচনায়ই দেখিয়া আসিয়াছি। ঐরূপ নির্ব্বচনই যে অদ্বৈতচিন্তার অনুকূল তাহাতেও সত্য জিজ্ঞাসুর কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিবরণ-মতের প্রতিধ্বনি করিয়া শব্দ-

জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া মানিয়া লইয়া বিবরণের দৃষ্টিতে বিষয়-প্রত্যক্ষ ও জ্ঞান-প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ব্বচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও বিষয় প্রত্যক্ষের প্রথমতঃ নিরূপণ না করিয়া প্রথমে (প্রত্যক্ষ বিষয়-সাপেক্ষ) জ্ঞান-প্রত্যক্ষেরই নির্ব্বচন করিলেন। তারপর বিষয়-প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। এইরূপে প্রথমতঃ জ্ঞান-প্রত্যক্ষের এবং তৎপর বিষয়-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন যে সামঞ্জস্য বিহীন এবং বিবরণ-সিদ্ধান্তের বিরোধী, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। বিবরণ-মতের অনুবর্ত্তন করিয়াও ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিষয়-প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞান-প্রত্যক্ষের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্পর্কে কেন যে বিবরণ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, প্রথমতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের নিরূপণ না করিয়া জ্ঞান-প্রত্যক্ষের নির্ব্বচন করিলেন, তাহার উত্তর করা কঠিন।

অদ্বৈত-মতে আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানই একমাত্র প্রত্যক্ষ, সর্ব্বদা অপরোক্ষ চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়াই দৃশ্য বিষয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের, এবং প্রমাতার বা প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত বিষয়ের অভেদই যথাক্রমে জ্ঞান-প্রত্যক্ষ এবং বিষয়-প্রত্যক্ষের প্রযোজক। কি জ্ঞান-প্রত্যক্ষ, কি বিষয়-প্রত্যক্ষ, কোন প্রত্যক্ষেই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিংবা ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রভৃতির যে কোনরূপ উপযোগিতা আছে, তাহা এই মতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে, তাহা তো অস্বীকার করা যায় না। কেননা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষের সর্ব্ব-সম্মত পার্থক্যই এই যে, প্রত্যক্ষের বিষয় সকল দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, পরোক্ষ অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোচরে আসে না। ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না বলিয়াই অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতিকে পরোক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত বলা হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের এই প্রকার মৌলিক বিভেদ অদ্বৈতবেদান্তীও অস্বীকার করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার মতেও প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের, এবং ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ প্রভৃতির উপযোগিতা মানিতেই হইবে। অন্তঃকরণ-বৃত্তির জনক ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ বা প্রমাণ বলা হইয়া থাকে, তাহা উপপাদনের জন্য অদ্বৈত-বেদান্তী প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উৎপাদক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকেও গৌণভাবে জ্ঞান বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,

ইহা আমরা পূর্ব্বেই (১০৬-১০৭ পৃষ্ঠায়) বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। আলোচ্য অন্তঃকরণ-বৃত্তি (১) সংশয়াত্মক, (২) নিশ্চয়াত্মক, (৩) অভিমানাত্মক এবং (৪) স্মৃত্যাত্মক, এই চার প্রকারের উদয় হইতে দেখা যায়। এক অন্তঃকরণই উল্লিখিত চার প্রকার বৃত্তি-ভেদে যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত, এই চতুর্বিধ আখ্যা লাভ করে।[১] দৃশ্য বিষয়ের রূপে রূপায়িত অন্তঃকরণ-বৃত্তির জনক চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

বিভিন্ন দৃশ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ এবং তন্মূলে ঐ সকল বস্তুর ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ উপপাদন করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় প্রভৃতি ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা মাধ্ব-মতের প্রত্যক্ষের স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে (৬৬ পৃঃ,) আলোচনা করিয়াছি। মাধ্ব, রামানুজ, শঙ্কর প্রভৃতি কোন বৈদান্তিক আচার্য্যই "সমবায়" নামে কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। ন্যায়োক্ত সমবায়ের খণ্ডন করিয়া তাহার স্থলে বৈদান্তিকগণ অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তের সিদ্ধান্তে গুণ-কর্ম্ম প্রভৃতির সহিত দ্রব্যের কোন ভেদ নাই। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ বা তাদাত্ম্যই সম্বন্ধ। অন্তঃকরণ-বৃত্তির নির্গম এবং ঐ বৃত্তির বিষয়াকারে পরিণামের ফলেই অদ্বৈতবেদান্তের মতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেইরূপে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হয়, সেইরূপেই কেবল বিষয়টির প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কোনও রূপে হয় না। ইহা দ্বারা অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত দৃশ্য বিষয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি বা অন্তঃকরণের বিষয়ের আকারে পরিণাম ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন হয়, ইহা

১। সা চ বৃত্তিশ্চতুর্ধা—সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণমিতি। এবঞ্চ সতি বৃত্তিভেদেন একমপ্যন্তঃকরণং মন ইতি বুদ্ধিরিতি অহঙ্কার ইতি চিত্তমিতি চাখ্যায়তে। তদুক্তম্—

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কার শ্চিত্তং করণমন্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥"

বেদান্তপরিভাষা, ৭৬ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি। ঘটের আকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তি উদিত হইয়া ঘটের যখন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তখন ঐরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি-উৎপাদনের জন্য ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগই যথেষ্ট। ঘটের নীল-লাল প্রভৃতি যে রূপ আছে, কিংবা ঘটে যে ঘটত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাদের প্রত্যক্ষের জন্য নীল প্রভৃতির আকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হওয়া আবশ্যক; এবং ঐরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তির জন্য নীল-রূপ প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগও আবশ্যক। চক্ষুর সহিত সংযুক্ত ঘটের সহিত উহার নীল-রূপ কিংবা ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অভিন্ন বলিয়া (ন্যায়োক্ত সংযুক্ত-সমবায়ের স্থলে) সংযুক্ত-তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে (চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইল ঘট, ঐ ঘটে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত হইল ঘটের নীল-রূপ, ঘটত্ব প্রভৃতি এই ভাবে) নীল-রূপ প্রভৃতির সহিত চক্ষু রিন্দ্রিয়ের যোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি সকল বৈদান্তিক আচার্য্যই এই দৃষ্টিতেই নীল-রূপ প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঘটের নীল-রূপে যে নীলত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাও এই মতে নীলের সহিত অভিন্ন, সুতরাং নীলত্বের প্রত্যক্ষের জন্য নৈয়ায়িকের অভিপ্রেত "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ের" পরিবর্ত্তে বেদান্তী "সংযুক্তাভিন্ন-তাদাত্ম্য" সম্বন্ধে নীলত্বের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ উপপাদন করিয়া থাকেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দের যেখানে প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে দেখা যায়, শব্দ আকাশেরই গুণ; গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ অভিন্ন বিধায় আকাশের সহিত তাহার গুণ শব্দের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদই বটে। সুতরাং শব্দের আকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হইয়া শব্দের যেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের তাদাত্ম্যই সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িকদিগের মতে শব্দের সহিত আকাশের সম্বন্ধ সমবায়, এইজন্য ন্যায়-মতে সমবায়-সম্বন্ধেই শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। শব্দে যে শব্দত্ব রূপ ধর্ম্ম আছে, তাহাও বেদান্তের মতে শব্দ হইতে ভিন্ন নহে। আকাশের গুণ শব্দও আবার আকাশ হইতে অভিন্ন; ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর সম্বন্ধ অভেদই বটে। অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্তে শব্দত্বের আকারে অন্তঃকরণের বৃত্তি উৎপাদন করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দত্বের প্রত্যক্ষ উপপাদন করিতে গেলে, শব্দত্বের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের

"তাদাত্ম্যবদভিন্ন"ই সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে। নৈয়ায়িকের মতে শব্দত্বের প্রত্যক্ষে "সমবেত-সমবায়"ই সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে। নৈয়ায়িক-মতে শব্দ আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। আকাশে সমবেত অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত যে শব্দ, তাহাতে শব্দত্ব জাতি সমবায়-সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, শব্দত্বের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবেত-সমবায়ই হয় সম্বন্ধ। ভূতলে চক্ষুর সংযোগ হইবার পর ভূতলে যে ঘট নাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঘটাভাবটি ভূতলের বিশেষণ, আর ভূতল বিশেষ্য। এই জন্যই "ঘটাভাবদ্ ভূতলম্", এইরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। ন্যায়-মতে আমরা দেখিতে পাই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত ভূতলের বিশেষণরূপে অন্বিত এই ঘটাভাবটি "সংযুক্ত-বিশেষণতা" সম্বন্ধেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপ সংযুক্ত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেত-বিশেষণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দ্রব্যস্থ গুণ, জাতি প্রভৃতির অভাব, এবং আকাশের গুণ শব্দের অভাব প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। অদ্বৈতবেদান্তের মতেও ভূতলে ঘটাভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে; এবং চক্ষুর সহিত সংযুক্ত ভূতলের বিশেষণরূপে ঘটাভাব অবস্থান করে বলিয়া, "সংযুক্ত-বিশেষণতা" সম্বন্ধেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ন্যায়-মতের সহিত অদ্বৈত-বেদান্তের মতের পার্থক্য এই যে, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে ভূতলে ঘটাভাবের এই প্রত্যক্ষজ্ঞান্ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে উদয় হয় না। অনুপলব্ধি নামে যে স্বতন্ত্র ষষ্ঠ প্রমাণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, ঐ অনুপলব্ধি-প্রমাণের সাহায্যেই ভূতলে ঘটাভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।[১] ন্যায় এবং মাধ্ব-মতে আমরা দেখিতে পাই, চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের ন্যায়, ঐ সকল গ্রাহ্য বিষয়ের অভাবেরও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। (প্রমাণ-পদ্ধতি, ২৬ পৃঃ;) অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, ভূতলে ঘটাভাবের মূলে দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে সংযোগ আছে, তাহা ভূতলেই নিবদ্ধ, সুতরাং ভূতলের আকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপাদন করতঃ ভূতলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিয়-সংযোগ কারণ হইবে। ঘটের অভাবের সহিত চক্ষু-

১। অভাবপ্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎকরণস্য অনুপলব্ধের্মানান্তরত্বাৎ।
বেদান্তপরিভাষা, ২৮২ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

রিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ যোগ না থাকায়, ভূতলে ঘটের অভাবের প্রত্যক্ষে উহা কারণ হইবে না। ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে যোগ্য অনুপলব্ধিকেই কারণ বলিয়া জানিবে। অভাবের প্রত্যক্ষ হইলে ঐ অভাব-প্রত্যক্ষের প্রমাণকেও যে প্রত্যক্ষই হইতে হইবে, এইরূপ যুক্তির অদ্বৈত-বেদান্তের মতে কোন মূল্য নাই। কারণ, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত বিষয়-সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধনই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। অদ্বৈত-মতে পরোক্ষ শব্দপ্রমাণ-মূলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইতেও যেমন কোন আপত্তি নাই, সেইরূপ পরোক্ষ অনুপলব্ধি প্রমাণ-বলে অভাবের প্রত্যক্ষ হইতেও কোন বাধা নাই।

সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প, এই দুই প্রকার; আবার জীব-সাক্ষী এবং ঈশ্বর-সাক্ষী ভেদেও প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। বিভিন্ন দৃশ্য বিষয়ে জীবের যে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকে বলে জীব-সাক্ষী প্রত্যক্ষ বা জৈব প্রত্যক্ষ; আর পরমেশ্বরের সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ বস্তু-সম্পর্কে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, তাহাকে ঈশ্বর-সাক্ষী প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় ধর্ম্মরাজা-ধ্বরীন্দ্র বলেন যে, বিকল্প শব্দের অর্থ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের জ্ঞান, বা কোনরূপ বিশেষ প্রকারের বোধ। যে প্রত্যক্ষে কোন-না-কোন বিশেষ ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে, তাহাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলে—সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানম্। বেদান্তপরিভাষা, ৭৭ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং; আর যে প্রত্যক্ষে কোনরূপ বিশেষ ভাবের স্ফুরণ হয় না, কোন প্রকার সম্বন্ধেরও ভান হয় না, বস্তুর স্বরূপমাত্রের বোধক এইরূপ নিঃসম্বন্ধ জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে—নির্ব্বিকল্পকং তু সংসর্গা-নবগাহি জ্ঞানম্। বেঃ পরিভাষা, ৭৭ পৃষ্ঠা; সবিকল্পক জ্ঞানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গরূপে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত নির্ব্বিকল্প জ্ঞান যে মানিতেই হইবে, তাহা ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ নানাপ্রকার যুক্তিমূলে তাঁহাদের দর্শনে উপপাদন করিয়াছেন। একটি গরু বা ঘোড়া দেখিয়া এইটি একটি গরু, এইটি ঘোড়া, এইরূপে যে বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে,

সেই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, সম্মুখস্থিত চতুষ্পদ প্রাণীটিকে গরু বলিয়া চিনিবার পূর্ব্বেই গরুর যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম বা গোত্ব, সেই গোত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক হয়। গোত্ব বা গোর ধর্ম্ম দিয়া বিচার করিয়াই যে গরুকে গরু বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গোত্ব বা গরুর ঐ অসাধারণ ধর্ম্মটি বিশেষণ, এবং গো-শরীর এক্ষেত্রে বিশেষ্য। গরুকে চিনিবার জন্য এখানে গোত্ববিশিষ্ট গোরই জ্ঞান হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞান সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। এই সবিকল্প প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, গোর ধর্ম্ম গোত্ব এবং গো, এই দুইএর মধ্যে (অবস্থিত বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রভৃতি) কোনরূপ সম্বন্ধের স্ফুরণ না হইয়া, গোত্ব এবং গো, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপমাত্রের বোধক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে। সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি কোন কোন প্রাচীন দর্শনে এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে "আলোচনা জ্ঞান" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আলোচনা জ্ঞান বালক-মূক প্রভৃতির জ্ঞানের ন্যায় ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য, বস্তুর প্রথমদর্শন-সঞ্জাত নিঃসম্বন্ধ জ্ঞান।[১] ইহা বস্তুতঃ অস্ফুট জ্ঞান। এইরূপ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ভর্তৃহরি প্রমুখ প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এবং মাধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্ত-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। ইহা আমরা নৈয়ায়িক, মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির মতের প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোচনায়ই দেখিয়া আসিয়াছি। আচার্য্য ভর্তৃহরি তাঁহার মতের সমর্থনে বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয় বিষয়ের নাম অবশ্যই সূচনা করিবে, নামশূন্য কোন পদার্থ নাই; সুতরাং জ্ঞান যে সংজ্ঞাকারে উৎপন্ন হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধবোধ না থাকিলে কোনরূপ জ্ঞানেরই উদয় হইতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষমাত্রই হইবে সবিকল্পক। নিঃসম্বন্ধ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কথার কথামাত্র।[২] বৈয়াকরণাচার্য্য ভর্তৃহরির এই মত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তদীয় ন্যায়-

---

১। অস্তি হ্যালোচনা জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্।
বাল-মূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্॥ শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষসূত্র, ১১২ শ্লোক ;

২। ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে॥
বাক্যপদীয়, ১।১২৪ কারিকা ;

বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, এবং নানারূপ যুক্তিবলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য উপপাদন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-বেদান্তিগণের সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়া নৈয়ায়িক-বৈশেষিকগণ নির্ব্বিকল্পক এবং সবিকল্পক, এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষই যে যুক্তিসিদ্ধ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পক, এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষ মানিলেও ধর্ম্মকীর্ত্তি, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু প্রভৃতি ধুরন্ধর বৌদ্ধ তার্কিকগণ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাই মানুষের বুদ্ধির খেলা। নাম, জাতি প্রভৃতি কিছুরই বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই। ঐ সকল বুদ্ধি-প্রসূত কল্পনা মিথ্যা। সর্ব্ববিধ কল্পনা-রহিত একমাত্র নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই সত্য। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ মিথ্যা কল্পনা-প্রসূত বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জন্যই হউক, কি শব্দ বা অনুমান-প্রমাণমূলেই উদিত হউক, তাহা কোন প্রকারেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িক-গণের মতে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একমাত্র ক্ষণস্থায়ী বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের মুহূর্ত্তে সেই বস্তু-সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা-রহিত, বস্তুর স্বরূপমাত্রের বোধক যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই সত্য।[১] এইরূপ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া নির্ব্বিকল্পক এবং সবিকল্পক, এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যেই ন্যায়গুরু গৌতম তাঁহার ন্যায়-সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণে (১) "অব্যপদেশ্যম্" এবং (২) "ব্যবসায়াত্মকম্", এই দুইটি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা আমরা ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বেই (৫৯-৬০ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করিয়াছি।

ন্যায়-মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের যেরূপ লক্ষণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, অদ্বৈতবেদান্তেও সেইভাবে ন্যায়োক্ত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণের অনুরূপই লক্ষণ নির্ব্বচন করা হইয়াছে।[২] কিন্তু তাহা হইলেও

১। কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্।
বিকল্পোঽবস্তুনির্ভাসাদসংবাদাদুপপ্লবঃ ॥
গ্রাহ্যং বস্তু প্রমাণংহি গ্রহণং যদিতোঽন্যথা।
ন তদ্‌বস্তু নতন্মানং শব্দ-লিঙ্গেন্দ্রিয়াদিজম্ ॥

মাধবাচার্য্যকর্ত্তৃক সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি ধর্ম্মকীর্ত্তির বলিয়া প্রসিদ্ধ ;

২। নৈয়ায়িক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

একথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধ তার্কিকগণের মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের অতীত বা অতীন্দ্রিয়।[১] তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান নৈয়ায়িকগণের মতে প্রমাও নহে, ভ্রমও নহে; সত্য জ্ঞানও নহে, মিথ্যা-জ্ঞানও নহে; ন প্রমা নাপি ভ্রমঃ স্যান্নির্ব্বিকল্পকম্। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৫ কারিকা; নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান

ন্যায়-সম্মত নির্ব্বিকল্প এবং অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পার্থক্য

ন্যায়ের মতে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা; অপরিস্ফুট জ্ঞান, পরিস্ফুট জ্ঞান নহে। নৈয়ায়িকগণ তর্কের খাতিরেই উহা মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধ-তার্কিকগণের মতে অনুব্যবসায়ের[২] সাহায্যেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞান ইহাদের মতে স্বপ্রকাশ নহে, অনুব্যবসায়-প্রকাশ্য। সুতরাং যে-জ্ঞানের অনুব্যবসায় নাই, সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। নিঃসম্বন্ধ, ঘটত্ব প্রভৃতি বিশেষণ-সম্পর্কশূন্য ঘট প্রভৃতির জ্ঞান অনুব্যবসায়ে ভাসে না। এইজন্য নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের এই মতে প্রত্যক্ষ হয় না, হইতে পারে না। ইহাকে অতীন্দ্রিয় বলিয়াই ধরা হয়। অদ্বৈতবেদান্তী কিন্তু নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিতে বাধ্য, নতুবা, অদ্বৈতবেদান্তের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা জ্ঞানের চরম ও পরম স্তর এবং বেদান্ত-জিজ্ঞাসার একমাত্র লক্ষ্য

প্রকারতাদি শূন্যং হি, সম্বন্ধানবগাহি তৎ। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৬ কারিকা; এই ন্যায়োক্ত লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি করিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায় বলিয়াছেন—নির্বিকল্পকন্তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্।

বেদান্তপরিভাষা, ৭৭ পৃষ্ঠা,

১। জ্ঞানং যন্নির্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে।

ভাষাপরিচ্ছেদ, ৫৮ কারিকা;

২। ব্যবসায়-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়-জ্ঞানের প্রকাশক যে দ্বিতীয় জ্ঞানোদয় হয়, তাহা ব্যবসায়-জ্ঞানের অনু বা পশ্চাৎ উদিত হইয়া থাকে বলিয়া "অনুব্যবসায়" নামে অভিহিত হয়। অয়ং ঘটঃ, এইটি ব্যবসায়-জ্ঞান। অয়ংঘটঃ, এইরূপ ব্যবসায়-জ্ঞানোদয়ের পর ঐ ব্যবসায়-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া, ঘটজ্ঞানবানহম্, এইরূপে ঘট-জ্ঞান বা ব্যবসায়জ্ঞান-সম্পর্কে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যাহার ফলে ঘট-জ্ঞানটি জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বলে অনুব্যবসায়-জ্ঞান।

বলিয়া বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে, নির্ব্বিকল্পক বিধায় তাহা কোনমতেই প্রত্যক্ষ-গম্য হইতে পারে না। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য-জন্য জীব-ব্রহ্মের একত্ববোধ প্রত্যক্ষ না হইলে, ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত মিথ্যা দ্বৈতবোধ বা ভেদজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিতে পারে না। ভ্রমজ্ঞানও যেখানে প্রত্যক্ষাত্মক হয়, সেখানে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান বা প্রমাজ্ঞানই কেবল সেই মিথ্যা ভেদ-বুদ্ধিকে দূর করিতে পারে। পরোক্ষ সত্যজ্ঞানের দ্বারাও প্রত্যক্ষ-ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। এই অবস্থায় সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ মিথ্যা ভেদ-দৃষ্টিকে সমূলে নিবৃত্তি করিয়া সর্ব্বত্র এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই যে আবশ্যক, ইহা অদ্বৈতবেদান্তীর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শ্রুতিও ব্রহ্মকে "সাক্ষাৎ" এবং "অপরোক্ষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়া নির্ব্বিশেষ চিদ্ বা ব্রহ্মের অপরোক্ষতাই স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। ঐরূপ অপরোক্ষ নির্ব্বিশেষ বোধই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে একমাত্র যথার্থ বোধ। ইহা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ। ইহার তুলনায় অপর সমস্তই মিথ্যা। নৈয়ায়িকগণ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে ভ্রমও নহে, প্রমাও নহে; মিথ্যাও নহে, সত্যও নহে, এইরূপে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে নিতান্তই অসঙ্গত বর্ণনা।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন প্রভৃতির ফলে যে জ্ঞানোদয় হয়, ঐ জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক বলিবে কিরূপে? বাক্য তো পদের সমষ্টিমাত্র। পদগুলি প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সমবায়েই গঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং বাক্য-জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহা বাক্যের অঙ্গ প্রত্যেক পদ এবং পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধের বোধক হইতে বাধ্য। ফলে, ঐ জ্ঞান সবিকল্পকই হইবে, নির্ব্বিকল্পক হইবে না। "গামানয়", এই বাক্যজ জ্ঞান যেমন গরু, আনয়ন ক্রিয়া, এবং আনয়ন ক্রিয়ার কর্ত্তা, এই তিনটি পদার্থের জ্ঞান এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য-জন্য জ্ঞানও তৎ, ত্বম্, অসি, এই পদত্রয়ের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞানই হইবে, নির্ব্বিকল্পক হইতে পারে না। যেহেতু, নিঃসম্বন্ধ জ্ঞানকেই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে, পরস্পর-সাপেক্ষ বাক্যজ জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক

জ্ঞান বলিবে কিরূপে? এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, কোনও বাক্য-জন্য জ্ঞান হইতে হইলে, ঐ বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান যে পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই; বরং ঐরূপ সম্বন্ধ মানিতে গেলেই মুস্কিল দাঁড়াইবে এই, যে-বাক্যের যেই অর্থ স্থান, কাল এবং পাত্র প্রভৃতির বিবেচনায় অভিপ্রেত নহে, সেইরূপ অনভিপ্রেত অর্থেরও পদ ও পদার্থের সম্বন্ধমূলে সেক্ষেত্রে জ্ঞানোদয় হইতে পারে। কোন ব্যক্তি আহার করিতে গিয়া "সৈন্ধব আন" বলিলে, লবণের পরিবর্ত্তে সিন্ধু-দেশের ঘোড়া আনিয়াও উপস্থিত করা যাইতে পারে। কারণ, সৈন্ধব শব্দে লবণকে যেমন বুঝায়, সিন্ধুদেশে উৎপন্ন ঘোড়াকেও সেইরূপ বুঝায়। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, বাক্যজ জ্ঞানে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ প্রভৃতি মুখ্যতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে; যেই তাৎপর্য্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সেই বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, সেই তাৎপর্য্যার্থই প্রধানভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। উপনিষদের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে উপনিষদুক্ত 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বা অভেদ-বোধই যে মুখ্য তাৎপর্য্য, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ঐ সকল উপনিষদুক্ত মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির ফলে জীবাত্মৈক্য-বিজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। ঐ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান শ্রুতির ভাষায় সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ। এইরূপ নির্ব্বিকল্প অপরোক্ষ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানই উপনিষদুক্ত মহাবাক্য সমূহের মর্ম্ম। ইহাকে অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় "অখণ্ডার্থ" বোধ বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার বোধ অখণ্ড বলিয়াই, ইহাকে বাক্যের অঙ্গ প্রত্যেক পদ ও পদার্থের খণ্ড জ্ঞান-জন্য বলা চলে না। উক্ত অখণ্ডার্থ-বোধের বিশ্লেষণে চিৎসুখ বলিয়াছেন, বাক্যাঙ্গ পদসমূহের সম্বন্ধজ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াও যে বাক্যটি যথার্থ জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, তাহাই বাক্য-গম্য "অখণ্ডার্থ"-বোধ বলিয়া জানিবে। অপর কথায়, প্রত্যয়ের অর্থ বা পদান্তরের অর্থ প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক-বিহীন, কেবল প্রাতিপদিকের বা মূল শব্দের মর্ম্মার্থ গ্রহণকেই অখণ্ডার্থতা বোধ বলা যায়।[১] নিত্য, নির্ব্বিশেষ

১। সংসর্গাসঙ্গি সম্যগ্‌ধীহেতুতা যা গিরামিয়ম্।
উক্তাখণ্ডার্থতা যদ্বা তৎপ্রাদিপদিকার্থতা॥
চিৎসুখ-কৃত তত্ত্বপ্রদীপিকা, ১০৯ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

অখণ্ড, ভূমা পরব্রহ্ম-বিজ্ঞানই বেদান্ত-জিজ্ঞাসার একমাত্র লক্ষ্য। এইরূপ বেদান্তের তাৎপর্য্য-বোধ নিঃসংশয়রূপে দৃঢ় হইলে বাক্য-জন্য জ্ঞানও বাক্য-তাৎপর্য্যের অবিষয় বাক্যাঙ্গ-সমূহের পরস্পর সম্বন্ধকে না বুঝাইয়া অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মকেই বুঝায়। নির্ব্বিকল্প অপরোক্ষ ব্রহ্ম-বোধই প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার শেষ কথা। অদ্বৈতবেদান্তোক্ত প্রত্যক্ষ-বাদ ব্যাবহারিক বিষয়-প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞান-প্রত্যক্ষকে দ্বার করিয়া ঐ চরম ও পরম অপরোক্ষ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের কথাই বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমান

অনু পূর্ব্বক "মা" ধাতু অনট্ প্রত্যয় করিয়া অনুমানপদটি সাধিত হয়। "অনু" এই উপসর্গটি এখানে "পশ্চাৎ" অর্থ দ্যোতনা করে; "মা" ধাতুর অর্থ জ্ঞান। হেতু-জ্ঞান, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতির পর যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুমান। হেতু-জ্ঞান এবং হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান; ঐ প্রত্যক্ষমূলক হেতু প্রভৃতির জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে-জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই অনুমান, অনুমা বা অনুমিতি বলা হইয়া থাকে। অনুমান শব্দে যেখানে অনুমান জ্ঞানকে বুঝায়, অনট্ প্রত্যয়টি সেখানে ভাব-বাচ্যে করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে; অনট্ প্রত্যয়টি যদি করণ-বাচ্যে করা হয়, তবে অনুমান বলিলে সেক্ষেত্রে অনুমান-জ্ঞানের করণকে অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণকে বুঝা যায়। তর্ক বা যুক্তি অর্থেও অনুমান শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে (যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৮,) যুক্তি বলিতে অনুমানকে বুঝিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী-টীকায় যুক্তি-শব্দে অনুমান এবং অর্থাপত্তি-প্রমাণকে[১] গ্রহণ করিয়াছেন— যুক্তিশ্চার্থাপত্তিরনুমানং বা। ভামতী, ১।১।২ সূত্র; চরক-সংহিতার রচয়িতা মহামুনি চরকের অভিমত এই যে, যুক্তি বস্তুতঃ অনুমান নহে, যুক্তি অনুমান হইতে পৃথক্ আর একটি প্রমাণ।[২] যুক্তি অনুমান কিনা, এ-বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে বিলক্ষণ মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৮ম শতকের পরার্দ্ধে নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধনৈয়ায়িক শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহে চরক-সংহিতার

১। অদ্বৈতবেদান্ত ও মীমাংসা দর্শনে অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতির মতে অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, উহা একপ্রকার অনুমানই বটে।

২। চতুর্ব্বিধা পরীক্ষা, আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানং যুক্তিশ্চেতি। চরক সংহিতা, সূত্রস্থান, ১১শ অধ্যায়;

মত খণ্ডন করিয়া যুক্তি যে অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১] চরক-সংহিতার বিমানস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে যুক্তি-সাপেক্ষ তর্ককে অনুমান বলা হইয়াছে। তর্ক বাস্তবিক পক্ষে অনুমান নহে, তবে প্রমাণের সাহায্যে যেখানে বস্তু-তত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে, সেই নির্ণয়ের পথে তর্ক যে অপরিহার্য্য পাথেয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইভাবে প্রমাণের সহায়করূপেই ন্যায়দর্শনে ন্যায়োক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্যতম পদার্থ তর্ক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রমাণ হিসাবে নহে। দার্শনিক পরীক্ষার সূচনাতেই অনুমান-প্রমাণ সত্য-নির্ণয়ের সহায়ক হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বেদে এবং বেদমূলক ধর্ম্ম-শাস্ত্রে দুর্জ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের পরই অনুমানের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[২]

অনুমান-সম্পর্কে চার্ব্বাকের বক্তব্য

অনুমান-প্রমাণ চার্ব্বাক ব্যতীত অপর সকল দার্শনিকই নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। চার্ব্বাক প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষকেই মানিয়া লইয়া অনুমান প্রভৃতি প্রমাণকে খণ্ডন করিয়াছেন। চার্ব্বাক বলেন, ধূম দেখিয়া যেখানে বহ্নির অনুমান করা হইয়া থাকে, সেখানে ঐ অনুমানের মূলে যত্র ধূমস্তত্র বহ্নিঃ, যেখানে ধূম আছে, সেখানেই বহ্নি আছে, এইরূপ ধূম ও বহ্নির নিয়তসম্বন্ধ-বোধ বা ব্যাপ্তি-জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে; নতুবা ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা চলিবে না। এখন কথা এই, ধূম থাকিলেই যে বহ্নি থাকিবেই এইরূপ ধূমও বহ্নির ব্যাপ্তির নিশ্চয় করা যাইবে কিরূপে? দেশ ও কাল অনন্ত। সকল

১। শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীল তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকায় শান্ত-রক্ষিতের মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া চরক-সংহিতার মত খণ্ডন করিয়াছেন।

তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা, ৪৮২ পৃষ্ঠা, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ,

২। স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।
এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১ম প্রঃ ৩য় অনুঃ,

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।

মনুসংহিতা, ১২।১০৫, শ্লোক

দেশে এবং সকল কালে ধূম ও বহ্নির নিয়ত সাহচর্য্য বা ব্যাপ্তি কাহারও প্রত্যক্ষ-গোচর হইতে পারে না। কেননা, প্রত্যক্ষদ্বারা কেবল বর্ত্তমানকেই জানা যায়, অতীত ও ভবিষ্যৎকে জানা যায় না। এই অবস্থায় সকল দেশে সকল কালেই ধূম থাকিলেই যে বহ্নি থাকিবেই, কালক্রমেও কোন দেশে যে এই নিয়মের ভঙ্গ হইবে না; অর্থাৎ ধূম আছে, অথচ বহ্নি নাই, ইহা যে দেখা যাইবে না, তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া কে বলিতে পারে? ফলে, বহ্নির অনুমানের হেতু যে ধূম তাহাতেই অনুমেয় বহ্নির ব্যভিচারের আশঙ্কা অর্থাৎ ধূম থাকিলেও বহ্নি নাও থাকিতে পারে, এইরূপ সন্দেহের উদয় অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ আশঙ্কার নিবৃত্তির কোন সঙ্গত কারণও দেখা যায় না। সুতরাং (ব্যভিচারের আশঙ্কাবশতঃ) ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি-নিশ্চয় কোন মতেই সম্ভবপর হয় না, অনুমানের প্রামাণ্য কথার কথামাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

অনুমানের বিরুদ্ধে চার্ব্বাকের আপত্তির খণ্ডন

চার্ব্বাকের উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে আচার্য্য উদয়ন বলেন, চার্ব্বাক যে ধূম ও বহ্নির ব্যভিচারের আশঙ্কা উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপ আশঙ্কাদ্বারাই অনুমান যে প্রত্যক্ষের ন্যায় আর একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। অনুমান স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নির ব্যভিচারের আশঙ্কার (অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়াও ধূম থাকিতে পারে, এইরূপ অলীক সন্দেহের) কথা না তুলিয়া চার্ব্বাকের উপায় নাই। কেননা, অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের কোন আশঙ্কা যদি নাই থাকে, তবে ঐ অব্যভিচারী হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলে যে অনুমানের উদয় হইবে তাহার প্রামাণ্য কে রোধ করিবে? ব্যভিচারের আশঙ্কার কথা তুলিলেও সেখানে জিজ্ঞাস্য এই, চার্ব্বাক যে অনন্ত দেশ ও কালের প্রশ্ন তুলিয়া বহ্নি-অনুমানের হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নির ব্যভিচারের আশঙ্কার উদ্‌ভাবন করিলেন, সেই নিখিল দেশ ও কাল কি চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়? অনন্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেশ, কাল প্রভৃতি তো কাহারও প্রত্যক্ষ-গোচর হইতে পারে না। চার্ব্বাকের মতে

যখন প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ নাই, তখন চার্ব্বাক অপ্রত্যক্ষ অনন্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ দেশ এবং কালের কথা তুলিয়া অনুমানে (ধূম আছে, বহ্নি নাই, এইরূপে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির) ব্যভিচারের আশঙ্কা উদ্‌ভাবন করিবেন কিরূপে? তারপর ঐরূপ ব্যভিচারের প্রশ্ন তুলিতে গেলে, অতীত ও ভবিষ্যৎ দেশ-কাল প্রভৃতির বাস্তবতাও চার্ব্বাককে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে হইবে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেশ ও কাল প্রভৃতি চার্ব্বাকের মতে কোন্ প্রমাণ-গম্য? উহা তো প্রত্যক্ষ-গম্য হইতে পারে না। কেননা, ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমানকেই জানিতে পারে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে অনন্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ দেশ, কাল প্রভৃতিকে জানা যায় না। এই অবস্থায় অতীত ও ভবিষ্যৎ দেশ-কাল প্রভৃতিকে অনুমান-গম্যই বলিতে হইবে। অনুমান-খণ্ডন-প্রয়াসী চার্ব্বাককেও অনুমান প্রমাণ মানিতেই হইবে। চার্ব্বাকোক্ত ব্যভিচারের আশঙ্কাই অনুমানের প্রামাণ্য-সাধনে সহায়ক হইয়া দাঁড়াইবে।[১] দ্বিতীয় কথা এই, চার্ব্বাক যে অনুমানকে অপ্রমাণ বলিতেছেন, এ-সম্পর্কে চার্ব্বাকের মতে প্রমাণ কি? চার্ব্বাক যখন প্রত্যক্ষ-ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ মানেন না, তখন অনুমানের অপ্রমাণ্যও চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষ-গম্য বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অনুমানের অপ্রমাণ্য ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের গোচর হইতে পারে না। চার্ব্বাকের সিদ্ধান্তে অনুমানের অপ্রামাণ্যকে মানসপ্রত্যক্ষ-গম্যই বলিতে হইবে। চার্ব্বাক ব্যতীত অন্য কোন দার্শনিকই অনুমানের অপ্রামাণ্য যে প্রত্যক্ষের গোচর হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দার্শনিকের নিকট অনুমানের অপ্রামাণ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ-প্রমাণের কথা তুলিতেই পারেন না। ফলে, অনুমানের অপ্রামাণ্য যে প্রমাণ-সিদ্ধ, এমন কথাই চার্ব্বাক বলিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে আরও বিচার্য্য এই যে, অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা না দিলে চার্ব্বাক-কথিত একমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদই সিদ্ধ হইতে

১। শঙ্কাচেদনুমাস্ত্যেব নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাঽবধির্মতঃ॥

উদয়ন-কৃত কুসুমাঞ্জলি, ৩।৭,

পারে কি? প্রত্যক্ষের সাধন চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের যে প্রামাণ্য, তাহাতো প্রত্যক্ষ-গম্য নহে, অনুমান-সিদ্ধ। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষকে মানিতে গেলেই অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করা চলে না। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী-টীকায় কয়েকটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্তের সাহায্যে চার্ব্বাকোক্ত একমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদ খণ্ডন করিয়া অনুমানের প্রামাণ্য উপপাদন করিয়াছেন। বাচস্পতি বলেন যে, কোনও বিষয়ে কাহারও অজ্ঞতা, ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি দেখিলে, সুধী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করেন। নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া অজ্ঞ-জনের ভ্রান্তি অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। চার্ব্বাকও অবশ্য এরূপ করিয়া থাকেন। চার্ব্বাক যে প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণের মতের প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেক্ষেত্রেও প্রতিবাদী দার্শনিকগণের অভিমত ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ এইরূপ. বুঝিয়াই যে চার্ব্বাক অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রতিপক্ষের অজ্ঞতা, ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি চার্ব্বাক বুঝিলেন কিরূপে? তিনি তো প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ মানেন না। প্রতিবাদীর অজ্ঞতা, ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি প্রতিবাদীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেও চার্ব্বাকের তো উহা কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ-গম্য হইতে পারে না। প্রতিবাদীর কথা-বার্ত্তা শুনিয়া, হাব-ভাব দেখিয়া, চার্ব্বাক শুধু প্রতিবাদীর অজ্ঞতা-ভ্রম প্রভৃতির অনুমানই করিতে পারেন। এই অবস্থায় পরমত-খণ্ডন-প্রয়াসী চার্ব্বাকের অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া উপায় কি? চার্ব্বাক যখন তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যকে স্বীয় দর্শন অধ্যাপনা করেন, তখন শিষ্যের কথা শুনিয়া কিংবা মুখের হাব-ভাব দেখিয়া, শিষ্যের কোথায় ভুল রহিয়াছে তাহা বুঝিয়াই ঐ ভ্রান্তি-নিরাসের জন্য চার্ব্বাক যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া থাকেন, ইহা নিঃসন্দেহ। শিষ্যের মানস-সঞ্চারী ভ্রম তো চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষের গোচর নহে, অনুমান-প্রমাণ না মানিলে চার্ব্বাক কেমন করিয়া বুঝিবেন যে, তাঁহার শিষ্যের মনে এইরূপ ভ্রম বা সংশয়ের কাল মেঘ জমাট বাঁধিতেছে। বুদ্ধিমান্ শিষ্য যে গুরুর নিকট অধ্যয়নার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, সেস্থলেও গুরুর বিদ্যাবত্তা, অধ্যাপন-কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াই শিষ্য গুরুর অভয়-চরণে শরণ লইয়া থাকে। গুরুর বিদ্যাবত্তা, অধ্যাপন-নৈপুণ্য প্রভৃতি

গুরুর উপদেশ শুনিয়া কিংবা অন্য কোনও কারণে ধীমান্ শিষ্য অনুমানই করিয়া থাকেন। গুরুর জ্ঞান গুরুর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেও শিষ্যের তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, অনুমানেরই কেবল বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপে জীবনের যাত্রা-পথে প্রতিপদক্ষেপেই যাহার সাহায্য অপরিহার্য্য, কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই সেই অনুমানকে অপ্রমাণ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না।

বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ

তারপর, ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অসম্ভব বলিয়া চার্ব্বাক যে আপত্তি তুলিয়াছেন, ঐ আপত্তি যে নিতান্তই ভিত্তিহীন তাহা বৌদ্ধ তার্কিকগণ ও অন্যান্য দার্শনিকগণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন যে, হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নির অবিনাভাবই ব্যাপ্তি। অবিনাভাব কাহাকে বলে? যে-পদার্থ ব্যতীত (বিনা) যে-পদার্থের ভাব বা অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না, সেই পদার্থের সহিত সেই পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাই "অবিনাভাব-সম্বন্ধ"। বহ্নি ভিন্ন ধূমের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং বহ্নির সহিত ধূমের যে সম্বন্ধ, তাহাই অবিনাভাব-সম্বন্ধ। ফল কথা, কারণ ব্যতীত (বিনা) কার্য্যের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, অতএব কার্য্য-কারণের সম্বন্ধই অবিনাভাব-সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে। উল্লিখিত অবিনাভাব-সম্বন্ধবশতঃই কার্য্য ও কারণ এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়া থাকে; এবং ঐ ব্যাপ্তিমূলে বহ্নি-কার্য্য ধূম প্রভৃতি হেতু দ্বারা কারণ বহ্নি প্রভৃতির অনুমানও হইয়া থাকে। অনেক অনুমানের প্রয়োগে আলোচ্য কার্য্য-কারণসম্বন্ধ ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক হয় না, তাদাত্ম্য বা অভেদ-সম্বন্ধবলেই ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক-গণের মতে এইরূপ হেতুকে "স্বভাব" হেতু বলা হয়। উক্ত স্বভাব-হেতুর দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, বট ও বৃক্ষ অভিন্ন অর্থাৎ বটের সহিত বৃক্ষের তাদাত্ম্য বা অভেদ আছে, যখন আমি জানি যে, বট বৃক্ষ-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, যেই বট, সেই বৃক্ষ, তখন "এইটি বৃক্ষ, যেহেতু এইটি বট" এইরূপে বট(ত্ব)কে হেতু করিয়া অনায়াসেই বৃক্ষত্বের অনুমান করা যায়। কার্য্য-কারণভাব ও তাদাত্ম্য, এই দুইপ্রকার সম্বন্ধমূলেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ 'অবিনাভাব' বা ব্যাপ্তির নির্ণয় করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত হেতু ও সাধ্যের সহচার-দর্শন ও ব্যভিচারের অদর্শনকে ব্যাপ্তির

নিশ্চায়ক বলিয়া বৌদ্ধ তার্কিকগণ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে কোনও দেশে, কোনও কালে ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে, চার্ব্বাকের এইরূপ আপত্তির কিছুমাত্র মূল্য নাই।[১]

বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তির খণ্ডন

বৌদ্ধ তার্কিকগণের উল্লিখিত দ্বিবিধ অবিনাভাব-সম্বন্ধ জৈন নৈয়ায়িকগণ এবং অপরাপর তার্কিকগণ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, যেই দুইটি পদার্থের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব কিংবা তাদাত্ম্য বা অভেদ নাই, এইরূপ পদার্থদ্বয়ের মধ্যেও ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়া অনুমানের উদয় হইতে দেখা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নক্ষত্রখচিত আকাশে কৃত্তিকা-নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে দেখিয়া, কৃত্তিকার পর যে রোহিণী-নক্ষত্রের উদয় হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এখানে কৃত্তিকার উদয় এবং তারপর রোহিণী-নক্ষত্রের উদয়ের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নাই। কৃত্তিকা এবং রোহিণীর অভেদ বা তাদাত্ম্যও অসম্ভব। অথচ উল্লিখিত রোহিণী-নক্ষত্রের উদয়ের অনুমান অসম্ভবও নহে, অযৌক্তিকও নহে। এই অনুমানের মূলেও যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বৌদ্ধোক্ত দ্বিবিধ অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি, এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ফলে, বৌদ্ধ প্রদর্শিত ব্যাপ্তির লক্ষণ যে অসম্পূর্ণ, তাহা না মানিয়া উপায় নাই। আর এক কথা এই, যেই পদার্থদ্বয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ হইবে, তাহাদের মধ্যে হেতু-সাধ্যভাব থাকিবে কিরূপে? হেতু ও সাধ্যরূপে যাহাদের মধ্যে ভেদ অতিস্পষ্ট, তাহাদের তাদাত্ম্য বা অভেদের কথা উঠিতেই পারে না। ধূম ও বহ্নির অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্ভবপর হয় কি? বৃক্ষোঽয়ং বটত্বাৎ, এইটি একটি বৃক্ষ, যেহেতু এইটি বট, এইরূপ অনুমানের স্থলে বটত্বকে হেতু করিয়া বৃক্ষত্বের যে অনুমান হইয়া থাকে,

---

১। কার্য্য-কারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ॥

মাধবাচার্য্য-কর্ত্তৃক সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত এই কারিকাটি বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিকের ১ম পরিচ্ছেদের ৩২ কারিকা;

সেক্ষেত্রে বট ও বৃক্ষের তাদাত্ম্য বা অভেদ স্বীকার করিয়া লইলে সকল বৃক্ষই বট হইয়া দাঁড়ায় নাকি?[১] এইজন্যই বৌদ্ধোক্ত দ্বিবিধ অবিনাভাবকে ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক বলিয়া নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যায় না। হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নির (ক) সহচার-জ্ঞান, এবং (খ) ধূম ও বহ্নির ব্যভিচার-জ্ঞানের অভাব, এই দুই কারণেই কেবল ব্যাপ্তির নিশ্চয় করা যাইতে পারে। এই ভাবে ব্যাপ্তির নির্ণয়ে বহ্নির অনুমাপক ধূম হেতুটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। নিম্নোক্ত তিনটি কারণে অনুমানের হেতুটি যে নির্দ্দোষ, এবং সাধ্যের অনুমানের যথার্থ সহায়ক

অনুমানের হেতুটি যে নির্দ্দোষ তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে?

তাহা বুঝা যায়—(ক) পক্ষে সত্তা, (খ) সপক্ষে সত্তা, এবং (গ) বিপক্ষে-অসত্তা। যে সকল স্থানে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যের অনুমান করা হইয়া থাকে, সাধ্যের আধার সেই পর্ব্বত প্রভৃতিকে "পক্ষ" বলে। বহ্নির অনুমানের হেতু ধূম পর্ব্বতে দেখা যাইতেছে, সুতরাং হেতু ধূমের যে পক্ষে সত্তা আছে, তাহা বুঝা গেল। যে যে স্থলে অনুমানের সাধ্য বহ্নি প্রভৃতির অবস্থান সুনিশ্চিত, তাহার নাম "সপক্ষ", যেমন পাকঘর প্রভৃতি। পাকঘরে বহ্নি নিশ্চয়ই আছে, এবং সেখানে হেতু ধূমও আছে। অতএব হেতু ধূমের সপক্ষ-সত্তাও পাওয়া গেল। সাধ্য বহ্নি প্রভৃতির অভাব যেখানে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়, তাহাকে "বিপক্ষ" বলে। বহ্নির অনুমানে জলহ্রদ প্রভৃতি বিপক্ষ। কেননা, জলহ্রদে যে বহ্নি থাকিতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিত। বহ্নি অনুমানের বিপক্ষ জলহ্রদে বহ্নিও নাই, সুতরাং বহ্নির অনুমাপক হেতু ধূমও নাই। বিপক্ষ জলহ্রদে ধূমের অসত্তাই আছে। আলোচিত ত্রিবিধ লক্ষণসম্পন্ন ধূমই পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের নির্দ্দোষ হেতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ নির্দ্দোষ

১। তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিভ্যামেবাবিনাভাব ইতি সৌগতাঃ।………… …… …………………………………… …তদসৎ, অকার্যানাত্মভূতকৃত্তিকোদয়াদিনা অকারণানাত্মভূতরোহিণ্যুদয়াদ্যনুমানাৎ। কথঞ্চ তাদাত্ম্যে লিঙ্গলিঙ্গিভাবঃ। তথাত্বেন বা ভেদে কথং তৎ। যদিচ শিংশুপাত্ব-বৃক্ষত্বয়োরৈক্যং সর্বোঽপি বৃক্ষঃ শিংশুপৈব স্যাৎ।

বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা;

হেতুকেই লিঙ্গ বলে। লিঙ্গের উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই বৈশেষিক, মীমাংসক, অদ্বৈতবেদান্তী এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনুমোদিত।[১] নৈয়ায়িকগণ কিন্তু উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নির্দ্দোষ লিঙ্গ বা হেতুর পরিচায়ক আরও দুইটি নূতন লক্ষণ পূর্ব্বের আলোচিত তিনটি লক্ষণের সহিত যোগ করিয়াছেন। সেই দুইটি লক্ষণ হইল (১) অসৎপ্রতিপক্ষতা ও (২) অবাধিতত্ব। নৈয়ায়িকের মতে অনুমানের যাহা নির্দ্দোষ হেতু বা লিঙ্গ, তাহা ত্রিলক্ষণ নহে, পঞ্চলক্ষণ। নৈয়ায়িকের ঐ দুইটি অতিরিক্ত হেতুর লক্ষণ যোগ করিবার উদ্দেশ্য এই, অনুমানের তথ্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, এমনও অনেক অনুমান-বাক্যের প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যেখানে একই পক্ষে বিভিন্ন হেতুর দ্বারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ দুইটি সাধ্যের অনুমান করা চলে। একই পক্ষে বিরুদ্ধ সাধ্যের এইরূপ অনুমানকে ন্যায়ের পরিভাষায় "সৎপ্রতিপক্ষ" অনুমান বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীকে পক্ষ করিয়া "পৃথিবী সকর্ত্তৃকা, জন্যত্বাৎ" এইরূপে পৃথিবীর যে একজন কর্ত্তা আছে তাহার যেমন অনুমান করা যাইতে পারে, সেইরূপ নিত্য পার্থিব পরমাণুতেও পৃথিবী থাকায় উহাকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া "পৃথিবী অকর্ত্তৃকা নিত্যত্বাৎ" পৃথিবীর অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুর কর্ত্তা নাই, যেহেতু তাহা নিত্য, এইরূপে একই পৃথিবীরূপ পক্ষে জন্যত্ব এবং নিত্যত্ব এই দুইটি হেতুর দ্বারা সকর্ত্তৃকত্ব এবং অকর্ত্তৃকত্ব বা নিত্যত্ব, এইরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ দুইটি সাধ্যের অনুমান সম্ভবপর হয়। এইজন্য "পৃথিবী সকর্ত্তৃকা জন্যত্বাৎ" এই অনুমানটিকে

১। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তাঁহার ন্যায়প্রবেশ নামক গ্রন্থে (৭ম পৃষ্ঠা, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ,) লিখিয়াছেন—লিঙ্গং পুনস্ত্রিরূপমুক্তম্। তস্মাদ্ যদনুমেয়েঽর্থে জ্ঞানমুৎপদ্যতে তদনুমানম্। ভামহ প্রমুখ প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও হেতুর ঐ তিন প্রকার লক্ষণেরই অনুমোদন করিয়াছেন—

সন্‌পক্ষেসদৃশে সিদ্ধোব্যাবৃত্তস্তদ্‌বিপক্ষতঃ।
হেতুস্ত্রিলক্ষণোজ্ঞেয়োহেত্বাভাসোবিপর্য্যয়াৎ॥

কাব্যালঙ্কার, ৫ম পরিচ্ছেদ;

কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মট ভট্ট, সাহিত্যদর্পণ-রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতিও আলোচিত মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহিম ভট্টের মত খণ্ডন করিতে গিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—
অনুমানং নাম পক্ষসত্ত্ব-সপক্ষসত্ত্ব-বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ববিশিষ্টাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিনো জ্ঞানম্।

সাহিত্যদর্পণ, ৫ম পরিচ্ছেদ, ২০৮পৃষ্ঠা, কলিকাতা সং;

বলে সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান। সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের স্থলে দুইটি অনুমানের হেতুদ্বয়ই তুল্যবল বিধায় উহাদের কোন একটি হেতুকেই সদোষ বা নির্দ্দোষ বলিয়া নিশ্চয় করা চলে না। অথচ একই পক্ষে বা ধর্ম্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি অনুমান যে সত্য হইবে না, দুইটির একটি যে মিথ্যা হইবেই তাহা নিঃসন্দেহ। সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের কোন্‌টি সত্য, আর কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। এইজন্য যেই হেতুর ঐরূপ তুল্যবল সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বন্তর থাকা সম্ভব নহে, সেইরূপ হেতুকেই প্রকৃত সাধ্যের অনুমাপক হেতু বা লিঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ নির্দ্দোষ হেতুর সম্পর্কে আলোচিত পক্ষে সত্তা, সপক্ষ-সত্তা ও বিপক্ষে অসত্তা, এই ত্রিবিধ লক্ষণের অতিরিক্ত "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" এইরূপও একটি লক্ষণ বা হেতুর পরিচায়ক বিশেষণের প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রবলতর প্রমাণের সাহায্যে পক্ষে (পর্ব্বত প্রভৃতিতে) সাধ্যের (বহ্নি প্রভৃতির) অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেখানে হেতু (প্রবলতর প্রমাণের দ্বারা) বাধিত হয় বলিয়া ঐরূপ বাধিত হেতুকে সাধ্য সিদ্ধির অনুকূল প্রকৃত হেতু বলিয়া গ্রহণ যায় না। সুতরাং ঐরূপ বাধিত হেতুকে অনুমাপক লিঙ্গের গণ্ডী হইতে বাদ দিবার জন্য হেতুর অংশে "অবাধিত" এইরূপ একটি বিশেষণেরও প্রয়োগ করা আবশ্যক। ফলে, নৈয়ায়িকগণের মতে (১) পক্ষে সত্তা, (২) সপক্ষ-সত্তা, (৩) বিপক্ষে অসত্তা, (৩) অসৎপ্রতিপক্ষতা এবং (৫) অবাধিতত্ব, নির্দ্দোষ হেতুর এই পাঁচটিই লক্ষণ বা পরিচায়ক চিহ্ন পাওয়া গেল।[১]

১। পঞ্চলক্ষণকাল্লিঙ্গাদ্ গৃহীতান্নিয়মস্মৃতেঃ।
পরোক্ষে লিঙ্গিনি জ্ঞানমনুমানং প্রচক্ষতে॥

ন্যায়মঞ্জরী, ১০০ পৃঃ, বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ ;

অবশ্যই নৈয়ায়িকগণ প্রদর্শিত পাঁচটি লক্ষণের দ্বারা অনুমাপক নির্দ্দোষ হেতুর পরিচয় নির্দ্দেশ করিলেও ন্যায়-মতে সব সময়েই উক্ত পাঁচটি লক্ষণই যে হেতুতে পাওয়া যাইবে, এমন কথা বলা চলে না। কেননা, কতকগুলি অনুমান এমন আছে যে তাহাদের সপক্ষই পাওয়া যায় না। ঐরূপ অনুমানে সপক্ষ-সত্তাকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট চারটি লক্ষণ দ্বারাই নির্দ্দোষ হেতু বা লিঙ্গের নির্ণয় করিতে হইবে। এইরূপ যেই অনুমানের বিপক্ষ নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্তাকে বাদ দিতে হইবে। সুতরাং স্থলবিশেষে পাঁচটি, স্থলবিশেষে চারিটিকেই যথার্থ হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ন্যায়োক্ত এই পঞ্চবিধ হেতু-লক্ষণকে সংক্ষেপ করিয়া জৈন নৈয়ায়িকগণ হেতুর কেবল একটি লক্ষণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জৈন নৈয়ায়িকগণের মতে "অন্যথা অনুপপত্তি"ই হেতুর একমাত্র লক্ষণ।[১] বহ্নি ব্যতীত ধূমের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে বলিয়াই বহ্নির অনুমানে ধূমকে হেতু করা হইয়াছে। এই মতে সাধ্যের যাহা বিপক্ষ সেই জলহ্রদ প্রভৃতিতে বহ্নি-লিঙ্গ ধূমের অসত্তাই ব্যাপ্তির সাধক হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। জৈন তার্কিকগণের এইরূপ অনুভবের মূল এই যে, হেতুর পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ লক্ষণ থাকিলেও তৃতীয় লক্ষণটিই অর্থাৎ বিপক্ষে হেতুর অসত্তাই মুখ্যতঃ হেতুর সাধ্য-ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক। ব্যাপ্য হেতুটিকে লিঙ্গ, ব্যাপক বহ্নি প্রভৃতিকে লিঙ্গী বা সাধ্য বলে। লিঙ্গ ও লিঙ্গীর, হেতু ও সাধ্যের নিয়ত-সম্বন্ধই ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি বলিয়া পরিচিত। যে-পদার্থের (বহ্নি প্রভৃতির) সকল আধারেই যে-পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সেই ধূম প্রভৃতি আধেয় পদার্থকেই আধার বহ্নি প্রভৃতি পদার্থের ব্যাপ্য বলে, আধার বহ্নি প্রভৃতিকে বলা হয় ব্যাপক। বহ্নিশূন্য কোন স্থানেই ধূমের উৎপত্তি অসম্ভব বিধায় ধূমের উৎপত্তি-স্থানমাত্রেই বহ্নি অবশ্যই থাকিবে। ধূম হইবে এক্ষেত্রে ব্যাপ্য, বহ্নি হইবে ব্যাপক। ধূম ও বহ্নির এইরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবের জ্ঞানোদয় হইলে, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যতার বা ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়া বহ্নির অনুমান হইবে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য বেঙ্কটনাথ বলেন, (ক) সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তি এবং (খ) হেতুটি পক্ষে বিদ্যমান থাকা (হেতুর পক্ষ-ধর্ম্মতা), হেতুর এই দুইটি লক্ষণই অনুমান-উদয়ের পক্ষে যথেষ্ট। ন্যায়োক্ত পাঁচপ্রকার হেতু-লক্ষণ উক্ত লক্ষণদ্বয়েরই বিবরণ ছাড়া অন্য কিছু নহে।[২] পাশ্চাত্য-ন্যায়ের

১। নিশ্চিতান্যথাঽনুপপত্ত্যেকলক্ষণো হেতুঃ। ৩য় পরিঃ ১১ সূঃ; নতু ত্রিলক্ষণাদিঃ। ৩য় পরিঃ ১২ সূঃ, বাদিদেব সূরি-কৃত প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার; জৈন পণ্ডিত কুমারনন্দীও বলিয়াছেন, অন্যথাঽনুপপত্ত্যেকলক্ষণং লিঙ্গমিষ্যতে।

২। ব্যাপ্যং সাধনমিত্যর্থান্তরম্। তস্য দ্বে রূপে অনুমিত্যঙ্গভূতে। ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্ম্মতা চেতি; তয়োরেব প্রপঞ্চনাৎ পঞ্চ রূপাণি। পক্ষব্যাপকত্বং সপক্ষে সত্ত্বং বিপক্ষবৃত্তিরহিতত্বমবাধিতবিষয়ত্বমসৎপ্রতিপক্ষঞ্চেতি।

ন্যায়পরিশুদ্ধি ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা;

অনুমান-শৈলী পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য-ন্যায়ে অনুমান-বাক্যের (Syllogism এর) তিনটিমাত্র অবয়ব স্বীকৃত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে দুইটি প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমনের সাহায্যে একটি তৃতীয় প্রতিজ্ঞা বাহির হইয়া আসে। নিগমনাত্মক এই তৃতীয় প্রতিজ্ঞাই অনুমানের ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে,

(ক) সকল মানব নশ্বর,

(খ) দার্শনিকগণ মানব,

(গ) সুতরাং দার্শনিকগণ নশ্বর।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে দার্শনিকগণ নশ্বর ইহাই হইল নিগমন। এখানে নশ্বরত্ব অধিকতর ব্যাপক ধর্ম্ম। নশ্বরত্বের তুলনায় মানবত্ব ব্যাপ্য ধর্ম্ম। কেননা, মানবই কেবল নশ্বর নহে, মানবভিন্নও অসংখ্য নশ্বর পদার্থ আছে। সকল মানবই কিছু দার্শনিক নহে, দার্শনিকগণ বৃহত্তর মানব-সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশমাত্র। সুতরাং দার্শনিকগণ মানবের ব্যাপ্য ধর্ম্ম। এই ব্যাপ্য ধর্ম্মের দ্বারা অধিকতর ব্যাপক নশ্বরত্বের অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে; এবং দার্শনিকগণ নশ্বর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। আলোচ্য প্রতিজ্ঞা বাক্যটিকে যদি বৃত্ত আঁকিয়া বুঝাইতে হয়, তবে নিম্নে অঙ্কিত বৃত্তত্রয়কেই উক্ত আনুমানিক তথ্য প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলা যাইতে পারে। প্রদর্শিত পাশ্চাত্য-ন্যায়োক্ত

অনুমান-বাক্যটিকে ভারতীয় নব্যন্যায়ের ভাষায় বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, নশ্বরত্বের ব্যাপ্য হইতেছে এক্ষেত্রে মানবত্ব এবং মানবত্বের ব্যাপ্য

হইতেছে দার্শনিকগণ; সুতরাং দার্শনিকগণ যে নশ্বরত্বের ব্যাপ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক সেখানে অবশ্যই থাকিবে। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমানই অনুমানের রহস্য। এই রহস্য কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, এই উভয় ন্যায়ের প্রয়োগেই সমানভাবে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

অনুমানের মূল "ব্যাপ্তি" কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সাধ্য বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম না থাকা, এবং যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সাধ্য বহ্নি থাকাই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি বলিয়া জানিবে। আলোচ্য ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন, সাধ্য বহ্নির হেতু বা লিঙ্গ ধূমের আধার যেই

ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে ব্যাপ্তির স্বরূপ

যেই বস্তু হইবে, সেই সেই বস্তুই যদি সাধ্য বহ্নি প্রভৃতিরও আধার হয়; অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতু ধূম থাকে, সেখানেই যদি সাধ্য বহ্নিও থাকে এইরূপে হেতু এবং সাধ্য যদি একস্থানবর্ত্তী বা সমানাধিকরণ হয়, তবে হেতু ও সাধ্যের ঐরূপ সামানাধিকরণ্যকেই ব্যাপ্তি বলিয়া জানিবে।[১] আচার্য্য বেঙ্কটনাথ বাপ্যের, ব্যাপকের, এবং বাপ্য-ব্যাপকের সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ন্যায়পরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন,

রামানুজের মতে ব্যাপ্তির লক্ষণ

যাহা সমান দেশে সমান কালে কিংবা ন্যূন দেশে এবং ন্যূন কালে নিয়তই বিদ্যমান থাকে, (কোন ক্রমেই ব্যাপক অপেক্ষায় যাহা অধিকস্থানবর্ত্তী হইতে পারে না) তাহাকে ব্যাপ্য বলা হয়, আর যাহা অধিক দেশে অধিক কালে কিংবা সমান দেশে এবং সমান কালে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে ব্যাপক বলে।[২] যেই দেশে এবং যেই কালে অবস্থিত যেই বস্তুর (ধূম

১। ব্যাপ্তিশ্চাশেষসাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যসামাধিকরণ্যরূপা।

বেদান্তপরিভাষা, ১৭২ পৃঃ, বোম্বে সং;

যাবৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিতং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ॥ শিখামণি, ১৭৪ পৃঃ;

২। দেশতঃ কালতো বাপি সমো ন্যূনোঽপি বা ভবেৎ।
স্বব্যাপ্যো ব্যাপকস্তস্য সমোবাপ্যধিকোঽপিবা॥

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১০০ পৃঃ;

প্রভৃতির) যেই দেশে এবং যেই কালে বর্ত্তমান যেই বস্তুর (বহ্নি প্রভৃতির) সহিত অবিনাভাব সুনিশ্চিত, সেই অবিনাভূত বা ব্যাপ্য-বস্তুর, এবং ঐ ব্যাপ্য বস্তুর সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ ব্যাপক বস্তুর আলোচ্য ব্যাপ্য ব্যাপক-সম্বন্ধের বোধই ব্যাপ্তি।[১] এইরূপ ব্যাপ্তি বোধের উদয় হইলেই ব্যাপ্য লিঙ্গ ধূম প্রভৃতি দেখিয়া ব্যাপক সাধ্য বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে ব্যাপ্তির নিরূপণ

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বলেন যে, যেখানে সাধ্য বহ্নি প্রভৃতি নাই, সেই (সাধ্যবদ্‌ভিন্ন) জলহ্রদ প্রভৃতি পদার্থে বিদ্যমান না থাকিয়া, যেখানে নিশ্চিতই সাধ্য আছে, সেইখানে সাধ্যের সহিত একই আধারে যেই হেতু বা লিঙ্গটি বর্ত্তমান থাকিবে, সেইরূপ হেতু ধূমাদির সহিত সাধ্য বহ্নি প্রভৃতির সামানাধিকরণ্য বা তুল্যাশ্রয়তা দেখিয়াই সাধ্য বহ্নি প্রভৃতির সহিত হেতু ধূম প্রভৃতির ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে।[২] মাধ্ব-প্রমাণবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ প্রমাণপদ্ধতি নামক গ্রন্থে অবিনাভাবকেই ব্যাপ্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মাধ্ব-মতে ব্যাপ্তির নির্ব্বচন

অবশ্যই জয়তীর্থের মতে "অবিনাভাব" কথাদ্বারা বৌদ্ধোক্ত দ্বিবিধ অবিনাভাবই বুঝায় না। যে (ধূম প্রভৃতি) যাহার (বহ্নি প্রভৃতির) নিয়ত সহচর ; অর্থাৎ যাহাকে (বহ্নিকে) বাদ দিয়া যে পদার্থ (ধূম প্রভৃতি) থাকিতেই পারে না, সেই ধূম প্রভৃতির সহিত বহ্নি প্রভৃতির অব্যভিচারী সম্বন্ধই ব্যাপ্তি।[৩] সাহচর্য্যনিয়ম ইত্যেব ব্যাপ্তি-লক্ষণম্। প্রমাণ-চন্দ্রিকা,

১। অত্রেদং তত্ত্বম্। যাদৃগ্রূপস্য যদ্দেশকালবর্তিনো যস্য যাদৃগ্রূপেণ যদ্দেশ-কালবর্তিনা যেনাবিনাভাবঃ তদিদমবিনাভূতং ব্যাপ্যম্। তৎ প্রতিসম্বন্ধিব্যাপকমিতি। তেন নিরূপাধিকতয়া নিয়তঃ সম্বন্ধোব্যাপ্তিরিত্যুক্তং ভবতি।

ন্যায়পরিশুদ্ধি ১০১—৩ পৃঃ ;

২। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ, ভবতি হি ধূমস্য হেতোঃ সাধ্যবদ্‌ভ্যো মহানসাদিভ্যোঽন্যেষু হ্রদাদিষু অবৃত্তিত্বং সাধ্যেন বহ্নিনা সামানাধিকরণ্যমিতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। ঈদৃগ্‌ব্যাপ্তিগ্রহণেএব ধূমোঽগ্নিংগময়তিনান্যথেতি। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২০৭ পৃষ্ঠা ;

৩। অবিনাভাবোব্যাপ্তিঃ সাহচর্য্যনিয়মইতিযাবৎ। ব্যাপ্তেঃ কর্ম্মব্যাপ্যং, তস্যাঃ কর্ত্তৃ ব্যাপকম্। যথা ধূমস্য অগ্নিনা ব্যাপ্তিঃ অব্যভিচরিতঃ সম্বন্ধঃ, যত্র ধূমস্তত্রাগ্নি রিতি নিয়মাৎ। জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা ;

১৬৩ পৃঃ ; আলোচিত লক্ষণে "সাহচর্য্য" কথার দ্বারা সাধ্যের সহিত হেতুর নিয়ত বা অব্যভিচারী-সম্বন্ধই যে ব্যাপ্তির মূল তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। এই মতে ব্যাপ্তি বুঝাইতে হইলে সাধ্যের সহিত একই অধিকরণে হেতুকে যে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে, এবং সাধ্যের সহিত হেতুর সম্বন্ধ বলিতে যে ঐরূপ সম্বন্ধই (হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই) বুঝায়, অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ বুঝায় না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। কেননা, কোন কোন অনুমানের প্রয়োগে দেখা যায় যে, সাধ্যের আধিকরণে অর্থাৎ পক্ষে বর্ত্তমান না থাকিয়াও হেতু সাধ্যের নিয়ত-সহচর হইয়া থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে সাধ্যের অধিকরণে অবর্ত্তমান হেতুদ্বারাও অনায়াসেই সাধ্যের অনুমান করা চলে। পর্ব্বতের পাদতল-বিহারিণী শীর্ণকায়া তটিনীর অকস্মাৎ জল-বৃদ্ধি দেখিয়া পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে কোথায়ও অবশ্য বৃষ্টি হইয়াছে, "ঊর্দ্ধদেশো বৃষ্টিমান্ অধোদেশে নদীপূরাৎ" এইরূপ অনুমান সুধীমাত্রেই করিয়া থাকেন। উক্ত অনুমানের হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এইরূপ অনুমানের প্রয়োগে সাধ্যের অধিকরণে, পর্ব্বতের শিখর প্রভৃতিতে, নিম্নদেশস্থ নদীর জল-বৃদ্ধিরূপ হেতু তো বর্ত্তমান নাইই, অধিকন্তু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের অভাব যেখানে (অধোদেশে) আছে, সেইখানেই উল্লিখিত অনুমানের হেতুটি (নদীর জল-বৃদ্ধি) বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধ্যের অভাবের অধিকরণে (অধোদেশে) হেতুটি বর্ত্তমান থাকায়, হেতুর যে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য নাই, হেতু ও সাধ্যের অধিকরণ যে বিভিন্ন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব সাধ্যের সহিত একই অধিকরণে হেতু বর্ত্তমান থাকিলেই, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য থাকিলেই যে কেবল ব্যাপ্তি থাকিবে, হেতু ও সাধ্যের অধিকরণ ভিন্ন হইলে যে সেক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিবে না, এমন কথা কোন মতেই বলা চলে না; বরং ন্যায়-বৈশেষিক, অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি যে সকল দর্শনে সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সকল দর্শনের ব্যাখ্যায় অধোদেশে জল-বৃদ্ধি দেখিয়া ঊর্দ্ধদেশে বৃষ্টির অনুমানের স্থলে হেতু ও সাধ্যের অধিকরণ ভিন্ন হওয়ায় ব্যাপ্তির লক্ষণের অব্যাপ্তিই অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই মাধ্ব-প্রমাণবিৎ পণ্ডিতগণ ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ গ্রহণ

করেন নাই, খণ্ডনই করিয়াছেন। মাধ্ব-পণ্ডিতগণের মতে সাধ্যের সহিত হেতু এক অধিকরণে থাকিলে ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় হইতে যেরূপ কোন বাধা নাই, সেইরূপ স্থলবিশেষে হেতু ও সাধ্য এক অধিকরণে না থাকিলেও, ভিন্ন অধিকরণে থাকিলেও (সামানাধিকরণ্যের ন্যায় বৈয়ধিকরণ্যেও) হেতুটি সাধ্যের অবিচ্ছেদ্য সহচর এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে, ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় হইতে এবং ঐ ব্যাপ্তিমূলে অনুমানের উদয় হইতে কোন বাধা নাই। হেতু ও সাধ্যের অধিকরণ যে সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন, সেই সকল স্থলেও ব্যাপ্তির লক্ষণের সঙ্গতি প্রদর্শন করিতে গিয়া তর্কতাণ্ডব-পণ্ডিত ব্যাসরাজ বলিয়াছেন যে, হেতু ও সাধ্যের অবিনাভাবই (সামানাধিকরণ্য নহে) ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক। যেই দেশে এবং যেই কালে অবস্থিত যেই বস্তু (বহ্নি প্রভৃতি) ব্যতীত যেই দেশে এবং যেই কালে নিয়ত বর্ত্তমান যেই বস্তুর (ধূম প্রভৃতির) উৎপত্তি সম্ভব হয় না, সেই ধূম প্রভৃতির বহ্নি প্রভৃতির সহিত অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি আছে বুঝিতে হইবে।[১] অনুপপত্তিই যে ব্যাপ্তি-বোধের এবং ঐ ব্যাপ্তি-জন্য অনুমানের মূল, তাহা ব্যাসরাজ তাঁহার তর্কতাণ্ডব নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। ব্যাসরাজের মতে অনুপপত্তি কেবল অর্থাপত্তিরই মূল নহে, অনুমান, উপমান প্রভৃতিরও অনুপপত্তিই মূল। অনুপ-পত্তি বলিতে কি বুঝায় ? ইহার উত্তরে জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণ-পদ্ধতির টীকাকার জনার্দ্দন ভট্ট বলিয়াছেন যে, সাধ্য বহ্নি প্রভৃতি ব্যতীত সাধন ধূম প্রভৃতির অভাবই অনুপপত্তি বলিয়া জানিবে। সাধ্যেন বিনা সাধনস্যাভাবোঽনুপপত্তিরিতি। প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দন-কৃত টীকা, ২৯ পৃষ্ঠা; সাধন ধূম প্রভৃতির দিক হইতে বিচার করিলে "যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নিও থাকে" এইরূপ ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্যের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এইজন্যই মাধ্ব-মতে নিয়ত-সাহচর্য্যকে ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেই ধূম প্রভৃতির অনুপপত্তি হয় তাহাকে ব্যাপ্য, এবং যেই বহ্নি

১। যদ্দেশকালসম্বন্ধস্য যস্য যদ্দেশকালসম্বন্ধেন যেন বিনা অনুপপত্তিঃ, তস্য তেন সা ব্যাপ্তিঃ। জনার্দ্দন ভট্ট কর্ত্তৃক প্রমাণপদ্ধতির টীকার ২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তর্কতাণ্ডবের উক্তি;

প্রভৃতি ব্যতীত ধূম প্রভৃতির উৎপত্তি সম্ভব হয় না, সেই বহ্নি প্রভৃতিকে ব্যাপক বলে।[১] মোটা কথায়, বহ্নি ধূমকে ব্যাপিয়া থাকে, কখনও ছাড়িয়া থাকে না; যে ব্যাপিয়া থাকে (ব্যাপ্তির কর্ত্তা) সেই বহ্নি প্রভৃতিকে ব্যাপক, এবং যাহাকে ব্যাপিয়া থাকে (ব্যাপ্তির কর্ম্ম) সেই ধূম প্রভৃতিকে ব্যাপ্য বলে। ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক সেখানে অবশ্যই থাকিবে, ইহার নাম অন্বয়-ব্যাপ্তি। পক্ষান্তরে, ব্যাপকের অভাব ঘটিলে ব্যাপ্যেরও অভাব সেখানে অবশ্যই ঘটিবে, (ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ) এইরূপ ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি বলা হইয়া থাকে। অন্বয়-ব্যাপ্তিস্থলে সাধনটি ব্যাপ্য, আর সাধ্য, অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতি ব্যাপক হইয়া থাকে। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিস্থলে সাধ্যের অভাবটি হয় ব্যাপ্য, সাধনের অভাবটি হয় ব্যাপক। উভয় স্থলেই ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে।[২]

এই ব্যাপ্তিকে জৈন নৈয়ায়িকগণ "অন্তর্ব্যাপ্তি" ও "বহির্ব্যাপ্তি" এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন; এবং অন্তর্ব্যাপ্তিকেই জৈন পণ্ডিতগণ সাধ্য-সিদ্ধির সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; বহির্ব্যাপ্তিকে অনাবশ্যক বুঝিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যেই অনুমানে যেই বস্তুকে পক্ষ করা হয়, অনুমানের সেই ধর্ম্মী বা পক্ষে অবস্থিত সাধ্যের সহিত হেতুর যে ব্যাপ্তি তাহাকে অন্তর্ব্যাপ্তি, আর পক্ষ ভিন্ন, সপক্ষ-দৃষ্টান্ত প্রভৃতিতে হেতুর যে ব্যাপ্তি তাহাকে বহির্ব্যাপ্তি বলা হইয়া থাকে।[৩] পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া

১। যস্যানুপপত্তিঃ স ব্যাপ্যঃ, যেন বিনা অনুপপত্তিঃ স ব্যাপকঃ। প্রমাণ-পদ্ধতির জনার্দ্দন-কৃত টীকা, ২৯ পৃষ্ঠা;

২। ব্যাপ্তি দ্বিবিধা। অন্বয়তো ব্যতিরেকতশ্চেতি। সাধনস্য সাধ্যেন ব্যাপ্তিরন্বয়-ব্যাপ্তিঃ। সাধ্যাভাবস্য সাধনাভাবেন ব্যাপ্তি র্ব্যতিরেকঃ। তত্র চ অন্বয়ব্যাপ্তৌ সাধনং ব্যাপ্যং সাধ্যং ব্যাপকম্। ব্যতিরেকব্যাপ্তৌ তু সাধ্যাভাবো ব্যাপ্যঃ সাধনাভাবো-ব্যাপকঃ। সর্ব্বত্র ব্যাপ্যপুরস্কারেণৈব ব্যাপ্তি র্গ্রাহ্যা।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৭ পৃষ্ঠা;

৩। অন্তর্ব্যাপ্ত্যা হেতোঃ সাধ্যপ্রত্যায়নে
শক্তাবশক্তৌ চ বহির্ব্যাপ্তেরুদ্ভাবনং ব্যর্থম্।
পক্ষীকৃত এব বিষয়ে সাধনস্য সাধ্যেন
ব্যাপ্তিরন্তর্ব্যাপ্তিরন্যত্রতু বহির্ব্যাপ্তিঃ॥

বাদিদেবসূরি-কৃত প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৩৭-৩৮ সূত্র;

যখন বহ্নির অনুমান করা হয়, সে-ক্ষেত্রে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের জন্য পাক-ঘর প্রভৃতিতে ধূম ও বহ্নির যে ব্যাপ্তি-বোধ তাহা বহির্ব্যাপ্তি। ঐ ব্যাপ্তি পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত ধূমে না থাকায়, পর্ব্বতস্থ সেই ধূমের দ্বারা পর্ব্বতে অবস্থিত বহ্নির অনুমান কখনই হইতে পারে না। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের জন্য পর্ব্বতোত্থিত ধূমের সহিত পর্ব্বত-মধ্যস্থ বহ্নির ব্যাপ্তি-জ্ঞানই আবশ্যক; এবং ঐরূপ ব্যাপ্তি-বোধের দ্বারাই পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। আলোচিত স্থলে অনুমানের পক্ষ যে পর্ব্বত তাহাতে মনের সাহায্যেই কেবল ব্যাপ্তি-জ্ঞানের উদয় হওয়ায়, এইরূপ ব্যাপ্তি "অন্তর্ব্যাপ্তি" আখ্যা লাভ করে। জৈনরা বলেন, অন্তর্ব্যাপ্তির সাহায্যেই যখন অনুমানের উদয় হওয়া সম্ভবপর হয়, তখন পাকশালা প্রভৃতিতে বহ্নির ব্যাপ্তি-প্রদর্শন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হইবে না কি? জৈন-নৈয়ায়িকদিগের উল্লিখিত যুক্তি অনুসরণ করিয়া অনেক বৌদ্ধ নৈয়ায়িকও আলোচিত অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন করিয়াছেন এবং বহির্ব্যাপ্তিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।[১] ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণ অন্তর্ব্যাপ্তি, বহির্ব্যাপ্তি বলিয়া ব্যাপ্তির বিভাগ সমর্থন করেন নাই। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়-মঞ্জরীতে বহির্ব্যাপ্তি হইতে অন্তর্ব্যাপ্তি যে কোন প্রকার পৃথক্ ব্যাপ্তি নহে, ইহা বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠককে আমরা ন্যায়মঞ্জরী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় সামান্য-ব্যাপ্তি এবং বিশেষ-ব্যাপ্তি, এই ভাবে ব্যাপ্তির বিভাগ অনুমোদন করিয়াছেন। যেখানে ধূম থাকে, সেখানেই বহ্নিও থাকে, এইরূপে ধূম ও বহ্নির যে ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় হয়, তাহা সামান্য-ব্যাপ্তি। কেননা, ধূম বলিতে এক্ষেত্রে ধূমত্বরূপে নিখিল ধূমকে (ধূম-সামান্যকে), বহ্নি বলিতেও (বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নরূপে) সকল বহ্নিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। হেতু ও সাধ্যের সামান্য ধর্ম্মকে লইয়া ব্যাপ্তি-বোধের উদয় হইয়াছে বলিয়া, এই প্রকার ব্যাপ্তিকে "সামান্য-ব্যাপ্তি" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আলোচ্য সামান্য-ব্যাপ্তির গ্রাহক উদাহরণ-বাক্যও 'যো যো ধূমবান্, স স বহ্নিমান্', এইরূপে যৎ এবং তৎ শব্দের দ্বারা গঠিত হইতে দেখা যায়।

১। এসেয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত বৌদ্ধ পণ্ডিত রত্নাকরশান্তি-কৃত অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন গ্রন্থ দেখুন।

বিশেষ-ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির লক্ষণ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকেই লক্ষ্য করে বলিয়া হেতু ও সাধ্যকে সামান্য ভাবে গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না। বিশেষ ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হেতু ও সাধ্য গৃহীত হইয়া থাকে। কুইনাইনের বর্ণ অতিশয় শুভ্র এবং উহা অত্যন্ত তিক্তরস, ইহা যিনি জানেন, তিনি কুইনাইনের উগ্র তিক্ত রসকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া অনায়াসেই উহার শুভ্র রূপের অনুমান করিতে পারেন—(তদ্‌রূপবান্ তদ্‌রসাৎ)। কুইনাইনের সেই তিক্ত রসের পরিচয় যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন এখানে ঐ শুভ্র রূপও যে মিলিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কোনও বস্তুর বিশেষ রসকে হেতু করিয়া ঐ বস্তুর বিশেষ রূপের যে অনুমান করা হইয়া থাকে, ইহা সামান্য-অনুমান নহে, বিশেষ-অনুমান। এই জাতীয় অনুমানের মূল ব্যাপ্তিও সামান্য-ব্যাপ্তি নহে, বিশেষ-ব্যাপ্তি। যে-অনুমানের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি, সেখানে হেতু ও সাধ্যের সামান্য ধর্ম্ম লইয়া ব্যাপ্তির নিরূপণ করার কোন অর্থ হয় না; "যৎ" "তৎ" পদের দ্বারা অনির্দ্দিষ্টভাবে উদাহরণ বাক্যের পরিচয় দেওয়াও চলে না।

আলোচ্য ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করিবার উপায়

আলোচিত ব্যাপ্তির নির্ণয় কিরূপে করা যাইবে? হেতু ও সাধ্যের সহচার-দর্শন ও ব্যভিচারের অদর্শন হইতেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের জন্য বহুক্ষেত্রে বহুবার হেতু ও সাধ্যের একত্র দর্শন বা ভূয়োদর্শন আবশ্যক কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে ভূয়োদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য বেঙ্কট-নাথও ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন—যথোপলম্ভং ভূয়োদর্শনৈর্গম্যতেতু সা, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১০৩ পৃষ্ঠা; মীমাংসক প্রভাকর, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, অদ্বৈতবেদান্তী প্রভৃতি কেহই ব্যাপ্তির নির্ণয়ে ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের জ্ঞান না থাকিলে, কোন একটিমাত্র স্থলে হেতু-সাধ্যের সহচার দর্শন থাকিলেও ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে কোনরূপ বাধা হয় না। পক্ষান্তরে, বহুক্ষেত্রে বহুবার সহচার-দর্শন

১। ভূয়োদর্শনগম্যাচব্যাপ্তিঃ সামান্যধর্ম্ময়োঃ। শ্লোকবার্ত্তিক, অনুমান পরিঃ, ১২ শ্লোক;

বা ভূয়োদর্শন থাকিলেও যদি কোন একটি স্থলেও হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচার দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞানোদয় হয় না, হইতে পারে না। এই অবস্থায় ব্যাপ্তির নিশ্চয়ে ভূয়োদর্শনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার কোন অর্থ হয় কি?[১] মাধ্ব পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম, এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই অনুমানের মূল ব্যাপ্তির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। ধূমের সহিত বহ্নির ব্যাপ্তি পাকঘরে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, ব্যাপ্তি যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-গম্য, সে-ক্ষেত্রে ভূয়োদর্শন এবং ব্যভিচারের অদর্শনকে ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের সহকারীই বলিতে হয়।[২]

এইরূপে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে ঐ ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলে যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাকেই বলে অনুমান। এইরূপ অনুমানের যাহা সাধন, তাহাই অনুমান প্রমাণ। অনুমান-সম্পর্কে নৈয়ায়িক বলেন যে, পর্ব্বতে

অনুমান

ধূম দেখার পর, যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নিও থাকে, (ধূমোবহ্নিব্যাপ্যঃ) এইভাবে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির স্মৃতি দর্শকের মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। তারপর, বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু ধূমই পর্ব্বতে (পক্ষে) দেখা যাইতেছে, এই প্রকার বোধ দৃঢ় হয়, এবং তাহারই বলে পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত ধূমে "বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া, অপ্রত্যক্ষ বহ্নি-সম্পর্কে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম অনুমান। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ। উল্লিখিত নৈয়ায়িকের মতের সমালোচনা করিয়া মীমাংসক ও বেদান্তী বলেন যে, ব্যাপ্তি-জ্ঞানটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই উদিত হইয়া থাকে। পাকশালা প্রভৃতিতে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হইলেও পাকশালা-স্থিত ধূম বা বহ্নিতো পর্ব্বতে থাকিবে না। এই অবস্থায় পাকশালায় ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়া পর্ব্বতস্থ ধূম ও বহ্নিতে উহার প্রয়োগ করিতে হইলে, ধূম ও বহ্নির পাকশালা প্রভৃতি আশ্রয় বা অধিকরণকে বাদ দিয়া, যেখানে যেখানে ধূম

১। সা চ ব্যভিচারাজ্ঞানে সতি সহচারদর্শনেন গৃহ্যতে। তচ্চ সহচারদর্শনং ভূয়োদর্শনং সকৃদ্দর্শনং বেতি বিশেষোনাদরণীয়ঃ, বেঃ পরিভাষা, ১৭৫ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

২। নমু ব্যাপ্তিজ্ঞানং কেন প্রমাণেন জায়তে। যথাযথং প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরিতিক্রমঃ। তত্র তাবদ্ধূমস্য অগ্নিনা ব্যাপ্তি র্মহানসাদৌ প্রত্যক্ষগম্যা। তত্র ভূয়োদর্শন-ব্যভিচারাদর্শনে সহকারিণী। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা ;

থাকিবে, সেই সেই স্থলেই বহ্নিও থাকিবে, ধূমের সর্ব্বপ্রকার আধারই বহ্নিরও আধার হইবে, এইরূপে ব্যাপকভাবেই অবশ্য ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির নিশ্চয় করিতে হইবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়াইবে এই যে, উল্লিখিত ব্যাপক ব্যাপ্তিটির কোনও বিশেষ আধারে অবস্থিত পর্ব্বতস্থ ধূম বা বহ্নিতে কেমন করিয়া প্রয়োগ করিবে? সামান্যভাবে (ধূমত্বরূপে) ধূমমাত্রেই (বহ্নিত্বরূপে) বহ্নির যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়াছে তাহা (সেই ব্যাপক ব্যাপ্তি) পর্ব্বতস্থ ধূমে নাই বলিয়া, ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পক্ষই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে নাকি? ফলে, (ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞান অনুমান, এইরূপ) ন্যায়োক্ত অনুমানের লক্ষণকে কোনমতেই সঙ্গত বলা চলিবে না। বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু ধূমটি পক্ষে (পর্ব্বতে) আছে, এইরূপ হেতুর পক্ষধর্ম্মতা পর্য্যন্ত অনুসরণ প্রদর্শিত প্রকারে দোষাবহ বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র ব্যাপ্তি-জ্ঞান ব্যাপ্তি-জ্ঞানরূপে কারণ হইয়া যে-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, ঐ জ্ঞানকে অনুমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন— অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যা। বেঃ পরিভাষা, ১৬১ পৃষ্ঠা; ব্যাপ্তি-জ্ঞানরূপে ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে কারণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ("ব্যাপ্তিজ্ঞানবান্ অহম্" এইরূপে) যে অনুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য হইলেও অনুমান হইবে না। কেননা, সেখানে ব্যাপ্তি-জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হিসাবেই কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, ব্যাপ্তি-জ্ঞান হিসাবে নহে। অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, প্রথমতঃ পর্ব্বতে ধূম দেখা দেয়, তারপর "ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ", এইরূপে পাকশালা প্রভৃতিতে ধূম ও বহ্নির যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়াছিল, সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হইয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। পর্ব্বতে ধূম-দর্শন ও ব্যাপ্তি-স্মরণ, এই দুইই কেবল অনুমানের সাধন। ইহাদের মধ্যে "যেখানে ধূম থাকে, সেইখানেই বহ্নিও থাকে" এই ব্যাপ্তি-জ্ঞান পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্যাপ্তি-বোধ পূর্ব্বে না থাকিলে পর্ব্বতে ধূম দেখিলেও বহ্নির অনুমান জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। এইজন্যই ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে প্রথমলিঙ্গ-পরামর্শ এবং পর্ব্বতরূপ পক্ষে ধূম-দর্শনকে দ্বিতীয়লিঙ্গ-পরামর্শ বলা হইয়া থাকে। আলোচ্য দ্বিবিধ লিঙ্গ-পরামর্শই অদ্বৈতবেদান্তীর মতে অনুমান-জ্ঞানোদয়ের পক্ষে যথেষ্ট। নৈয়ায়িকগণ উল্লিখিত দুই প্রকার পরামর্শের পর, পর্ব্বতটি বহ্নির ব্যাপ্য যে

ধূম সেই ধূমধূসর (বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ং পর্ব্বতঃ), এইরূপে একটি তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে উল্লিখিত তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শই অনুমানের চরম কারণ বা করণ। অবশ্যই ইহা প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের অভিমত। নব্য-মতে আলোচিত পরামর্শকে দ্বার করিয়া ব্যাপ্তি-জ্ঞানকেই অনুমানের করণ বলা হইয়া থাকে। মীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, পর্ব্বতে বহ্নি-লিঙ্গ ধূম প্রভৃতির দর্শন এবং ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির স্মরণ, এই দুই কারণ হইতেই অনুমিতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ন্যায়োক্ত তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমানের করণই হইতে পারে না, ইহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে লিঙ্গ ধূম-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ পরামর্শ পর্য্যন্ত সমস্তই অনুমানের কারণ; তন্মধ্যে পরামর্শের পরই অনুমানের উদয় হইয়া থাকে বলিয়া পরামর্শকেই চরম কারণ, করণ বা অনুমান-প্রমাণ বলা হয়। এই মত প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের টীকা কিরণাবলীতে উদয়নাচার্য্যও সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের অপর টীকাকার শ্রীধর ভট্ট তদীয় ন্যায়কন্দলীতে উক্ত মত সমর্থন করেন নাই। শ্রীধর ভট্টের মত এবিষয়ে অনেক অংশে বেদান্ত ও মীমাংসার অনুরূপ। তিনি বলেন, লিঙ্গ ধূম-দর্শন এবং ব্যাপ্তির স্মরণ, এই দ্বিবিধ উপায়ের সাহায্যেই যখন অনুমানের উদয় হইতে পারে, তখন আলোচ্য তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমানের কারণের মধ্যে টানিয়া আনা কেবল অনাবশ্যক নহে, অসঙ্গতও বটে। নব্য-নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁহারা উল্লিখিত লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমানের করণ না বলিয়া ব্যাপ্তি-জ্ঞানকেই অনুমানের করণ এবং পরামর্শকে ঐ করণের ব্যাপার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নব্যন্যায়-গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণির পরামর্শ-গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, করণ কোনও ব্যাপার (Function) সম্পাদন করিয়াই কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। আলোচ্য লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমানের চরম কারণ হইলেও, উহা ব্যাপার-বিহীন বিধায় অনুমানের 'করণ' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, পরামর্শরূপ ব্যাপারকে দ্বার করিয়া ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমানের করণ হইয়া থাকে।

মাধ্ব-মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, মাধ্ব-পণ্ডিতগণ ন্যায়-

বৈশেষিকের অনুকরণে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি-বোধকে পর্ব্বতে বহ্নি অনুমানের করণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, পর্ব্বত গাত্রোত্থিত বহ্নি-লিঙ্গ ধূমকেই অনুমানের করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পর্ব্বতটি বহ্নিব্যাপ্য-ধূমশালী, (বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বতঃ) এইরূপ পরামর্শ নব্যন্যায়-মতেও যেমন ব্যাপার মাধ্ব-মতেও সেইরূপ ব্যাপার। পর্ব্বত মধ্যস্থ বহ্নির অনুমানকে প্রমাণের- ফল বলা হইয়া থাকে।[১] মাধ্ব-মতে ব্যাপ্তির নির্ব্বচনে আমরা দেখিয়াছি যে, সাধ্য বহ্নি প্রভৃতি ব্যতীত হেতু ধূম প্রভৃতির অভাবকেই অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] আলোচ্য অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি সাধ্যের আধারে হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও যেমন বুঝা যায়, না থাকিলেও সেইরূপ বুঝা যায়। সুতরাং সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য থাকুক, কিংবা নাই থাকুক, তাহাতে ব্যাপ্তি-বোধের কিছুই আসে যায় না। মাধ্ব-মতে সাধ্যের আধারে বা পক্ষে হেতু না থাকিলেও, ঐরূপ পক্ষে অবৃত্তি হেতু-বলেও অনুমান হইতে কোন বাধা হয় না। এইজন্যই মাধ্ব-মতে ব্যাপ্তির নির্ব্বচনে সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যকে (হেতু ও সাধ্যের তুল্যাধিকরণবর্ত্তিতা বা একই আধারে অবস্থিতিকে) ব্যাপ্তির বোধক না বলিয়া, সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাব বা অব্যভিচারী সম্বন্ধমাত্রকেই ব্যাপ্তির গ্রাহক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ফলে, উর্দ্ধদেশো বৃষ্টিমান্ অধোদেশে নদীপূরাৎ, এইরূপ অনুমানে উর্দ্ধদেশস্থ বৃষ্টির সহিত নিম্নদেশস্থ জল-বৃদ্ধির সামানাধিকরণ্য না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অব্যাহত কার্য্য-কারণসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলিয়া, ঐরূপ ক্ষেত্রেও ব্যাপ্তির নিশ্চয়ে এবং তন্মূলে অনুমানের উদয় হইতে কোন বাধা হয় না। হেতু ও সাধ্যকে একাধিকরণবর্ত্তী না হইয়া, বিভিন্ন আধারে অবস্থিত থাকিয়াও নির্দ্দোষ ব্যাপ্তি-বোধ এবং অনুমান উৎপাদন করিতে দেখা যায় বলিয়াই হেতুকে যে সাধ্যের অধিকরণে অর্থাৎ পক্ষে সকল ক্ষেত্রে বর্ত্তমান

১। অত্র লিঙ্গং করণম্, পরামর্শো ব্যাপারঃ, অনুমিতিঃ ফলম্। ব্যাপ্তি-প্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়মিতিজ্ঞানম্, তজ্জন্যং পর্বতোঽগ্নিমানিতিজ্ঞানমনুমিতিঃ।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৩ পৃষ্ঠা ;

২। ইয়মেব ব্যাপ্তিঃ সাধ্যেন বিনা সাধনস্যাভাবোঽনুপপত্তিরিতি অবিনাভাব ইতি সাহচর্যনিয়মইতিচোচ্যতে। প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দন-কৃত টীকা, ২৯ পৃষ্ঠা :

থাকিতেই হইবে, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। হেতুর পক্ষে (পর্ব্বত প্রভৃতিতে) অবস্থিতিকে (হেতুর পক্ষ-বৃত্তিত্বকে) নির্দ্দোষ অনুমানের অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ মানিয়া লইলেও মাধ্ব-পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। মাধ্ব-সম্প্রদায় হেতুর পক্ষ-ধর্ম্মতা (হেতুর পক্ষে বর্ত্তমান থাকা) কথাদ্বারা যেই দেশে হেতু বর্ত্তমান থাকিলে হেতু ও সাধ্যের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি-বোধের কোনরূপ অসুবিধা হয় না এইরূপ যথোপযুক্ত দেশে হেতুর অবস্থিতি বুঝিয়াছেন।[১] অনুপপত্তি বা অবিনাভাবকে ব্যাপ্তি বলিয়া গ্রহণ করায় এবং হেতুর পক্ষে অর্থাৎ সাধ্যের আধারে বিদ্যমান থাকাকে (পক্ষ-ধর্ম্মতাকে) অনুমানের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করায়, মাধ্বোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণটি পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান, নিম্নদেশস্থ জল-বৃদ্ধি দেখিয়া ঊর্দ্ধদেশে বৃষ্টির অনুমান, কেবল-ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী প্রভৃতি যত প্রকার অনুমান আছে সেই সর্ব্ববিধ অনুমানের ক্ষেত্রেই নির্ব্বিবাদে প্রয়োগ করা চলে।[২] অনুমানের প্রয়োগে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্য-ধর্ম্মদ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে। চার প্রকারের ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন স্থলে ধর্ম্ম সকল (সমব্যাপ্ত) সমান সমান স্থান জুড়িয়া থাকে। সেই সকল স্থলে যে-কোন ধর্ম্ম বা লিঙ্গকে হেতু করিয়া, ঐ লিঙ্গের সহিত সমব্যাপ্ত যে-কোন ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা পাপের সাধন, আর যাহার বিধান করা হইয়াছে তাহাই ধর্ম্মের সোপান, এইরূপ বৈদিক নির্দ্দেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থলে নিষিদ্ধত্ব হেতুমূলে যেমন পাপ-সাধনত্বের, কিংবা বিহিতত্ব হেতু-বলে ধর্ম্ম-সাধনত্বের অনুমান করা চলে, সেই-

---

১। (ক) ব্যাপ্যস্য পক্ষধর্ম্মত্বং নাম সমুচিতদেশবৃত্তিত্বং বিবক্ষিতম্। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৩ পৃষ্ঠা ;

(খ) ততশ্চ অনুমানস্য দ্বে অঙ্গে, ব্যাপ্তিঃ সমুচিত দেশাদৌ বৃত্তিশ্চেতি। নতু পক্ষধর্মতানিয়মঃ।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৫ পৃষ্ঠা ;

২। ইয়ঞ্চ ব্যাপ্তিঃ প্রসিদ্ধেষু ধূমাদ্যনুমানেষু, অধোদেশে নদীপূরাদ্যনুমিতিষু ………কেবল ব্যতিরেকিষু সর্বত্র কেবলান্বয়িষু চানুগতা আবশ্যকী চ। প্রমাণ-পদ্ধতির জনার্দ্দন ভট্ট-কৃত টীকা, ২৯ পৃষ্ঠা ;

রূপ পাপ-সাধনত্ব এবং ধর্ম্ম-সাধনত্বকে হেতু করিয়া, নিষিদ্ধত্ব এবং বিহিতত্বেরও অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা নিষিদ্ধ তাহা যেমন পাপের সাধন, সেইরূপ যাহা পাপের সাধন তাহা নিষিদ্ধ, এইভাবে নিষিদ্ধত্ব এবং পাপ-সাধনত্ব, এই ধর্ম্ম দুইটিকে সমব্যাপ্ত এবং পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপক বলা যায়। কোন কোন ধর্ম্ম আছে যাহা সমব্যাপ্ত নহে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের একটি থাকিলে অপরটি অবশ্যই থাকিবে। যেমন যাহা ধূমবান্, তাহাই বহ্নিমান্ বটে, কিন্তু যাহা বহ্নিমান্, তাহাই ধূমবান্ নহে। অগ্নি-তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি আছে বটে, কিন্তু ধূম নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ধূমবত্তা-ধর্ম্মের দ্বারা বহ্নিমত্ত্বের অনুমান সহজেই করা চলে, কিন্তু ইহার উল্টাটি অর্থাৎ বহ্নিমত্ত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা ধূমবত্তার অনুমান করা চলে না। বহ্নি অপেক্ষায় কম জায়গায় বর্ত্তমান ধূমটি ব্যাপ্য, আর ধূম হইতে অধিক স্থানে, তপ্ত লৌহপিণ্ড প্রভৃতিতে বর্ত্তমান বহ্নিটি ব্যাপক। ব্যাপক বহ্নি কখনও ব্যাপ্য হইতে পারে না। আবার কতকগুলি ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাদের একটি থাকিলেই অপরটি কোনমতেই থাকিতে পারে না। ঐ ধর্ম্মগুলির মধ্যে পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবতো নাইই, এমনকি কোনরূপ সম্বন্ধই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে গোত্ব, অশ্বত্ব, গজত্ব, সিংহত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উল্লেখ করা যায়। যেখানে গোত্ব থাকে, সেখানে অশ্বত্ব, গজত্ব প্রভৃতি কোনমতেই থাকিবে না, আবার যেখানে অশ্বত্ব, গজত্ব থাকিবে, সেখানে গোত্ব প্রভৃতি থাকিবে না; অর্থাৎ একটি ধর্ম্ম থাকিলে অন্যান্য ধর্ম্মের অভাব সেখানে নিশ্চিতই থাকিবে, অপরাপর ধর্ম্মের অভাবের অনুমান করাও চলিবে। গোত্বাভাববান্ অশ্বত্বাৎ, কিংবা অশ্বত্বাভাববান্ গোত্বাৎ, এইরূপ অনুমান হইতে কোন বাধা নাই। অশ্বত্ব, গোত্ব কেবল অশ্বে বা গরুতেই আছে, অন্যত্র নাই। অতএব এই সকল ধর্ম্ম ব্যাপ্য-ধর্ম্ম, আর গোত্বাভাব এবং অশ্বত্বাভাব গরু এবং অশ্ব ভিন্ন নিখিল পদার্থেই বিদ্যমান আছে, সুতরাং উহারা যে ব্যাপক তাহাতে সন্দেহ কি? ব্যাপ্য-ধর্ম্মের দ্বারা ব্যাপকের অনুমানইতো অনুমানের রহস্য। উক্ত তিন প্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত চতুর্থ আর এক প্রকার ধর্ম্ম দেখা যায়, যাহা ক্ষেত্রবিশেষে একত্র থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে বাদ দিয়াও থাকিতে পারে, যেমন পাচকত্ব এবং পুরুষত্ব। এই দুইটি ধর্ম্ম একই পাচক-পুরুষে বর্ত্তমান

থাকিলেও, পাচকত্ব ধর্ম্মটি পুরুষত্ব ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, পাচিকা রমণীতেও থাকিতে পারে; আবার পুরুষত্ব ধর্ম্মটিকেও অপাচক পুরুষে থাকিতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় পাচকত্ব ধর্ম্মের দ্বারা পুরুষত্বের অনুমান হয় না, পুরুষত্ব ধর্ম্মের দ্বারাও পাচকত্বের অনুমান করা চলে না। অনুমানের স্থলে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্য-ধর্ম্মকে অনুমানের লিঙ্গ, আর ব্যাপক-ধর্ম্মকে অনুমেয় বা সাধ্য বলা হইয়া থাকে। ব্যাপ্য-লিঙ্গ ব্যাপকের অনুমান উৎপাদন করিয়া অনুমান-প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করে।[১]

ব্যাপ্য-লিঙ্গই মধ্ব-মতে অনুমানের করণ। বহ্নির লিঙ্গ ধূম প্রভৃতি অপরিজ্ঞাত থাকিয়া, অনুমানকারীর জ্ঞানের গোচর না হইয়া লিঙ্গীর অর্থাৎ ব্যাপক অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতির অনুমান উৎপাদন করিতে পারে না। হেতুটি জ্ঞানের গোচর হইয়াই সাধ্যের অনুমাপক হইয়া থাকে। (প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান অজ্ঞাতকরণক নহে, জ্ঞাতকরণকই বটে) এইজন্যই পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত ধূম, ঐ ধূম যিনি দেখিতে পান না, গৃহের মধ্যে অবস্থিত এইরূপ ব্যক্তির বহ্নি-অনুমান উৎপাদন করিতে পারে না। ব্যাপ্য-লিঙ্গ বা হেতুকেই যদি অনুমানের করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে বিনষ্ট কিংবা ভাবী লিঙ্গের (হেতুর) সাহায্যে অনুমান-জ্ঞানোদয় কোনক্রমেই হইতে পারে না। কেননা, অনুমানের যাহা করণ হইবে তাহাকে তো অনুমানের অব্যবহিত পূর্ব্বে অবশ্যই বিদ্যমান থাকিতে হইবে। বিনষ্ট বা ভাবী লিঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই যুক্তিতেই নব্য-নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্য-লিঙ্গের করণতাবাদ খণ্ডন করিয়া ব্যাপ্তি-জ্ঞানকেই অনুমানের করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় কিন্তু জ্ঞায়মান ব্যাপ্য-লিঙ্গকেই অনুমানের করণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মাধ্ব-পণ্ডিতগণ এখানে প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।[২] পরামর্শ যে করণের ব্যাপার এবিষয়ে সকলেই

১। তত্র ব্যাপ্যোধর্মোব্যাপকপ্রমিতিং জনয়ন্ননুমানমিত্যুচ্যতে। ব্যাপকশ্চানুমেয় ইতি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৫ পৃষ্ঠা; প্রমাণপদ্ধতি, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা দেখুন;

২। ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ॥
অনুমায়াং, জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং নহি।
অনাগতাদি লিঙ্গেন নস্তাদনুমিতিস্তদা॥

ভাষাপরিচ্ছেদ, ৬৬-৬৭ কারিকা; প্রাচীনাস্তু ব্যাপ্যত্বেন জ্ঞায়মানং ধূমাদিকমনুমিতি করণমিতি বদন্তি। মুক্তাবলী, ৬৬।৬৭ কারিকা;

একমত। অনুমানের ক্ষেত্রে কেবল ব্যাপ্য-লিঙ্গ বা হেতুটিকে জানিলেই চলিবে না। ঐ হেতু-ধূম প্রভৃতির সহিত অনুমেয়-বহ্নি প্রভৃতির যে ব্যাপ্তি বা নিয়ত-সাহচর্য্য আছে, ধূম-দর্শনমাত্র মনের মধ্যে ঐ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের স্ফুরণও অত্যাবশ্যক। ধূম-দর্শন প্রভৃতির ফলে ধূমের বহ্নি-ব্যাপ্তি স্মৃতিতে জাগরূক হইলেই, বহ্নি-লিঙ্গ ধূম বহ্নির উপযুক্ত আধার পর্ব্বত প্রভৃতিতে বহ্নির অনুমান উৎপাদন করিবে।[১] বহ্নির জ্ঞান এবং ধূমের সহিত বহ্নির ব্যাপ্তি-বোধ প্রভৃতি অনুমানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেও, পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব-বোধ অনুমানের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না। অনুমানের সাহায্যেই পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে তাহা আমরা জানিতে পারি। ইহাই অনুমানের ফল[২]।

মহামুনি গৌতম তাঁহার ন্যায়সূত্রে অনুমানকে (ক) পূর্ব্ববৎ (খ) শেষবৎ এবং (গ) সামন্যতোদৃষ্ট, এই তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন।

অনুমানের বিভাগ

গৌতমোক্ত ত্রিবিধ অনুমান নব্য-ন্যায়ে (i) কেবলান্বয়ী, (ii) কেবল-ব্যতিরেকী ও (iii) অন্বয়-ব্যতিরেকী আখ্যা লাভ করিয়াছে। নব্য-নৈয়ায়িকগণ গৌতমের পূর্ব্ববৎ অনুমানকে কেবলান্বয়ী, শেষবৎ অনুমানকে কেবল-ব্যতিরেকী, এবং সামান্যতোদৃষ্ট-অনুমানকে অন্বয়-ব্যতিরেকী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ অভিনব সংজ্ঞা নির্দ্দেশের হেতু কি তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ দেখিয়া যেমন কার্য্যের অনুমান করা যায়, সেইরূপ কার্য্য দেখিয়াও কারণের অনুমান করা চলে। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী, কার্য্য পরবর্ত্তী। এইজন্যই কারণ হইতে কার্য্যের অনুমানকে

১। (ক) তথাচ ব্যাপ্তিস্মরণসহিতং সম্যগ্ জ্ঞাতং লিঙ্গং সমচিত দেশাদৌ লিঙ্গি-প্রমাং জনয়দমুমানমিত্যুক্তং ভবতি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৫ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব-বিঃ সং;

(খ) ব্যাপ্তিজ্ঞান-তৎস্মরণসহিতং লিঙ্গস্য সম্যগ্জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞাতং বা লিঙ্গং ব্যাপ্তিপ্রকারানুসারেণ সমুচিতদেশাদৌ লিঙ্গিপ্রমাং জনয়দমুমানমিত্যুক্তং ভবতি। প্রমাণপদ্ধতি. ৩১ পৃষ্ঠা;

২। অতএব লিঙ্গস্বরূপস্য জ্ঞাতত্বেহপি দেশবিশেষাদিসংসৃষ্টতয়া জ্ঞাপকত্বান্নানুমানবৈয়র্থ্যম্। ততশ্চ অনুমানস্য স্বয়ং সামর্থ্যং ব্যাপ্তিঃ সমুচিতদেশাদৌ সিদ্ধিশ্চেতি। প্রমাণপদ্ধতি, ৩১-৩২ পৃষ্ঠা;

পূর্ব্ববৎ এবং কার্য্য হইতে কারণের অনুমানকে শেষবৎ বলা হইয়া থাকে। মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান, দুরারোগ্য রোগ দেখিয়া রোগীর মৃত্যুর অনুমান, গৌতমের পরিভাষায় পূর্ব্ববৎ অনুমান; ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান প্রভৃতি শেষবৎ অনুমান। মাধ্ব-পণ্ডিতগণ ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান প্রভৃতিকে "কার্য্যানুমান" এবং মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমানকে "কারণানুমান" নামে অভিহিত করিয়াছেন। মাধ্ব-পণ্ডিতগণের মতেও অনুমান প্রথমতঃ তিন প্রকার, (ক) কার্য্যানুমান, (খ) কারণানুমান এবং (গ) অকার্য্য-কারণানুমান। অকার্য্য-কারণানুমানের ব্যাখ্যায় শ্রীমচ্ছলারিশেষাচার্য্য বলিয়াছেন, অনুমানের যাহা সাধ্য, সেই সাধ্যের যাহা কারণও নহে, কার্য্যও নহে, এইরূপ কোনও হেতু-বলে যখন সাধ্যের অনুমান করা হয়, তখন সেই অনুমানকে "অকার্য্য-কারণানুমান" বলা যায়। রস যে-ক্ষেত্রে রূপের অনুমাপক হইয়া থাকে, সেখানে রস অনুমেয় রূপের কারণও নহে, কার্য্যও নহে। এইজন্য এই জাতীয় অনুমান মাধ্ব-পণ্ডিতগণের ভাষায় "অকার্য্য-কারণানুমান" আখ্যা লাভ করে।[১] কার্য্য ও কারণ ভিন্ন যে হেতু সেই হেতুমূলে যে অনুমানের উদয় হয়, তাহাই গৌতমোক্ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। সামান্যতোদৃষ্ট-অনুমানের ক্ষেত্রে পূর্ব্বে কোন এক স্থলেও এই অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ হয় না। কেবল অন্য কোনও পদার্থে সাধারণভাবে কোনও ধর্ম্মের ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া, সে জাতীয় অপর পদার্থেও সেইরূপ ধর্ম্মের ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়া থাকে; এবং তাহার বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থেরও অনুমানের উদয় হইতে দেখা যায়; যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষে করণ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয়, সুতরাং কোনস্থলেই ইন্দ্রিয় যে রূপ প্রভৃতির জ্ঞানের করণ, তাহা প্রত্যক্ষতঃ জানা যায় না; অর্থাৎ কোন এক স্থলেও ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয় না। কেবল ছেদনাদি ক্রিয়ায় কুঠার প্রভৃতি করণের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, ক্রিয়ামাত্রেরই করণ থাকিবে, এইরূপে সাধারণভাবে যে ব্যাপ্তি-বোধ জন্মে, তাহারই বলে চক্ষুর সাহায্যে রূপ-দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়াও যেহেতু ক্রিয়া, সুতরাং তাহারও কোন-না-কোন করণ অবশ্যই থাকিবে, এইভাবে রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষে অতীন্দ্রিয় চক্ষুরাদি করণের যে

১। যৎ স্বসাধ্যস্য কারণং ন ভবতি কার্য্যঞ্চ ন ভবতি অথচ তদনুমাপকং তদকার্যকারণানুমানং যথা রসোরূপস্যানুমাপকঃ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৬ পৃষ্ঠা;

অনুমান করা হয়, ইহা সামান্যতোদৃষ্ট-অনুমান বলিয়া জানিবে। আলোচিত সামান্যতোদৃষ্ট-অনুমান মাধ্ব-পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যে-বস্তু প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বস্তুর অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট-অনুমান, এবং প্রত্যক্ষ-যোগ্য ধূম ও বহ্নির অনুমানকে দৃষ্ট-অনুমান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] গৌতমোক্ত ত্রিবিধ অনুমানকে অন্বয়ী, ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী এইরূপ নামে উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিকে অভিহিত করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের এই নামানুসারেই নব্য-ন্যায়গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় অনুমানকে পরবর্ত্তীকালে কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া, ইহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাপ্তি দুই প্রকার, অন্বয়-ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। যেখানে ধূম থাকে সেইখানেই বহ্নিও থাকে, এইরূপে হেতু-ধূম এবং সাধ্য-বহ্নির ব্যাপ্তিকে "অন্বয়-ব্যাপ্তি" বলে। পক্ষান্তরে, সাধ্য-বহ্নির অভাব-জ্ঞানমূলে হেতু-ধূমের যে অভাব-জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে, তাহাকে বলে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। অন্বয়-ব্যাপ্তি-স্থলে সাধন বা হেতুটি ব্যাপ্য, আর সাধ্যটি হয় ব্যাপক। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-স্থলে সাধ্যাভাবটি ব্যাপ্য, আর সাধনের অভাবটি ব্যাপক হইয়া থাকে। অনুমানে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয়। অন্বয়-ব্যাপ্তিতে হেতু-ধূম প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপক অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতির, এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-স্থলে সাধ্য-বহ্নির অভাবের দ্বারা ব্যাপক সাধনের অভাবের (ধূমের অভাবের) অনুমান করা চলে। যে-অনুমানের কোনরূপ বিপক্ষ নাই, সমস্তই পক্ষ বা সপক্ষই বটে, সুতরাং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞানোদয় যে-ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে, কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলেই যে-অনুমান উৎপন্ন হয় তাহার নাম কেবলান্বয়ী অনুমান।[২] অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞান না থাকিয়া, কেবল ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যে অনুমান জন্মে, তাহাই ব্যতিরেকী বা কেবল-ব্যতিরেকী

১। পুনর্দ্বিবিধমনুমানম্। দৃষ্টং সামান্যতোদৃষ্টঞ্চেতি। তত্র প্রত্যক্ষযোগ্যার্থানুমাপকং দৃষ্টম্। যথা ধূমোঽগ্নেঃ। প্রত্যক্ষাযোগ্যার্থানুমাপকং সামান্যতোদৃষ্টম্। যথা রূপাদিজ্ঞানং চক্ষুরাদেরিতি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৬ পৃষ্ঠা; প্রমাণ-পদ্ধতি, ৩৫ পৃষ্ঠা;

২। পক্ষব্যাপকং সপক্ষবৃত্তি অবিদ্যমান বিপক্ষং কেবলান্বয়ি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৭ পৃষ্ঠা; সর্বপক্ষবৃত্তিত্বে সতি, সপক্ষবৃত্তিত্বে সতি বিপক্ষাবৃত্তিত্বং কেবলান্বয়িনো লক্ষণমিতিনিষ্কর্ষঃ। প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দন ভট্ট-কৃত টীকা, ৪০ পৃষ্ঠা;

অনুমান। অন্বয়-ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি, এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তি-জ্ঞান-বলে যে অনুমান উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান বলে। পর্ব্বত-গাত্রে ধূম দেখিয়া যে বহ্নির অনুমান হয়, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান কেননা, এইরূপ অনুমান-স্থলে যেখানে ধূম, সেইখানেই বহ্নি, এইরূপ হেতু-ধূমও সাধ্য-বহ্নির অন্বয়-ব্যাপ্তিও যেমন সম্ভব; সেইরূপ যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই, যেমন জলপূর্ণ হ্রদ, এই প্রকার ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিও সম্ভবপর।[১] 'শব্দঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ ঘটবৎ', শব্দমাত্রই অভিধেয়, (nameable) যেহেতু ইহা প্রমেয়, (knowable) যেমন ঘট। জগতের সমস্ত বস্তুই ন্যায়-বৈশেষিক, মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির মতে অভিধেয়ও বটে, প্রমেয়ও বটে; অনভিধেয় এবং অপ্রমেয় বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং আলোচিত অনুমানের প্রয়োগে যাহা অভিধেয়, (nameable) তাহাই প্রমেয়, (knowble) এইরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞানই কেবল সম্ভবপর। আলোচ্য অনুমানের সাধ্য 'অভিধেয়ের' অভাব কোথায়ও দেখা যায় না, ঐরূপ সাধ্যের অভাব অপ্রসিদ্ধ বিধায়, যাহা অভিধেয় নহে, তাহা প্রমেয়ও নহে, (যেমন অমুক বস্তু) এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান কোনক্রমেই এখানে সম্ভব-পর নহে। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান না থাকিয়া, কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞান-মূলে উল্লিখিত অনুমান জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, এইজন্যই ইহাকে কেবলান্বয়ী-অনুমান বলা হয়। যেই অনুমানে কেবল ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞানই সম্ভব আছে, যেই অনুমানের সপক্ষ বলিয়া কিছুই নাই, সমস্তই পক্ষান্তর্গত বটে, এইরূপ অনুমান কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলিয়া জানিবে।[২] ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু ঈশ্বরই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ', এইরূপ অনুমান কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান। এ-ক্ষেত্রে যে সর্ব্বজ্ঞ নহে, সে নিখিল জগতের কর্ত্তা বা রচয়িতাও নহে, যেমন শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিই কেবল

১। পক্ষব্যাপকং সপক্ষবৃত্তি সর্ব্ববিপক্ষব্যাবৃত্তমন্বয়ব্যতিরেকি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৮ পৃষ্ঠা;

২। পক্ষব্যাপকমবিদ্যমানসপক্ষং সর্বস্মাদ্ বিপক্ষাদ্ ব্যাবৃত্তং কেবলব্যতিরেকি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৭ পৃষ্ঠা; সর্বপক্ষবৃত্তিত্বে সতি অবিদ্যমান সপক্ষত্বে সতি সর্ববিপক্ষ-ব্যাবৃত্তত্বং কেবলব্যতিরেকিণোলক্ষণমিতি নিষ্কর্ষঃ। জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতির জনার্দ্দন ভট্ট-কৃত টীকা, ৪১ পৃষ্ঠা;

সম্ভবপর। যিনি অখিল জগতের কর্ত্তা তিনি সর্ব্বজ্ঞও বটেন, এইরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তি আলোচ্য ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। কেননা, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহ তো সর্ব্বকর্ত্তাও নহেন, সর্ব্বজ্ঞও নহেন। রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি তো ঈশ্বরেরই অবতার, সুতরাং রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরাবতার তো পক্ষের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। যাহা পক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যাপ্তি-প্রদর্শন কোনমতেই চলিতে পারে না। রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি পক্ষান্তর্ভুক্ত বিধায় সেই সকল স্থলেও আলোচিত অনুমানের সাধ্য "সর্ব্বজ্ঞত্ব" সন্দিগ্ধই বটে, নিশ্চিত নহে। উল্লিখিত অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অবতার রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতিরও সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-বলেই নির্ণীত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত না থাকায় অন্বয়-ব্যাপ্তির অবসর কোথায়? অসর্ব্বজ্ঞ জীবের সর্ব্বকর্তৃত্ব নাই, সুতরাং একমাত্র ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিমূলেই প্রদর্শিত অনুমান উপপাদন সম্ভবপর হয়। এই জাতীয় অনুমানই কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলিয়া প্রসিদ্ধ।[১] মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তী অর্থাপত্তি নামে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করায়, ন্যায়োক্ত ব্যতিরেকী-অনুমানকে অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে সকল স্থলেই অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলেই উদিত হইয়া থাকে। কোন স্থলেই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-বলে অনুমান জন্মে না। এইজন্য সকল অনুমানই মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তীর সিদ্ধান্তে "অন্বয়ী" অনুমান। ধূম দেখিয়া যেখানে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে, সেখানে অনুমানের সাধ্য-বহ্নির অভাব দেখিয়া হেতু ধূমের অভাবের যে ব্যাপ্তি-বোধ জন্মে, সেই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে অনুমানের কারণ বলিয়াই মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যেখানে ধূম থাকে, সেইখানেই বহ্নিও থাকে, এইরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞান যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই, এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-বোধ কিছুতেই জন্মিতে পারে না। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির মূলে সর্ব্বত্রই অন্বয়-ব্যাপ্তি অবশ্যই থাকিবে এবং সেই অন্বয়-ব্যাপ্তি-

---

১। উদাহরণন্তু ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তৃত্বাদিতি। অত্র যঃ সর্বজ্ঞো ন ভবতি যথা দেবদত্ত ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিরেবাস্তি। নতু যঃ সর্বকর্তা স সর্বজ্ঞইত্যন্বয়ব্যাপ্তিঃ। ঈশ্বরাবতারাণাং রামকৃষ্ণাদীনাং পক্ষত্বাৎ অন্যেষাং জীবানামসর্বজ্ঞত্বাৎ। তেনৈতৎ কেবলব্যতিরেকীত্যুচ্যতে। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৮ পৃষ্ঠা;

মূলেই অনুমানের উদয় হইবে। সাধনের সাহায্যে সাধ্যের অনুমানে আলোচ্য ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির কোনরূপ উপযোগিতা নাই বলিয়া, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের কারণই বলা চলে না। মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তীর মতে অর্থাপত্তি-প্রমাণের সাহায্যেই উক্ত ব্যতিরেক-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, উহা অনুমান নহে।[১] মাধ্ব-পণ্ডিতগণ অবশ্যই অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা দান করেন নাই। অর্থাপত্তিকে এক জাতীয় অনুমান (অর্থাপত্তি-অনুমান) বলিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও মাধ্ব-সম্প্রদায় অদ্বৈতবেদান্তের যুক্তিজাল অনুসরণ করিয়া ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে সাধ্য-সিদ্ধির অনুপযোগী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্যতিরেকব্যাপ্তেঃ প্রকৃতসাধ্যসিদ্ধাবনুপযোগাৎ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৯ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব বিঃ সং; ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ ঐরূপ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণিতে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ব্যতিরেকী-অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-রহস্যজ্ঞ আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি সমর্থন করিয়াছেন।[২] নৈয়ায়িকগণ অর্থাপত্তি-প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অর্থাপত্তি-স্থলেও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলে অনুমানেরই উদয় হইয়া থাকে। বেদান্ত-পরিভাষায় ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র মীমাংসক-মত অনুসরণ করিয়া অনুমানকে একমাত্র অন্বয়িরূপ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, অন্বয়ী বা কেবলান্বয়ী বলিয়া ন্যায়-মতে অনুমানের যে স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, অদ্বৈতবেদান্তের অন্বয়ী-অনুমান ন্যায়-

---

১। (ক) নাপ্যনুমানস্য ব্যতিরেকিরূপত্বং সাধ্যাভাবে সাধনাভাবনিরূপিত-ব্যাপ্তিজ্ঞানস্য সাধনেন সাধ্যানুমিতাবনুপযোগাৎ। কথংতর্হি ধূমাদাবন্বয়ব্যাপ্তি-মবিদুষোঽপি ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানাদনুমিতিঃ। অর্থাপত্তিপ্রমাণাদিতি বক্ষ্যামঃ। বেদান্তপরিভাষা, ১৭৯ পৃষ্ঠা, বোম্বেসং;

(খ) অতএবানুমানস্য নান্বয়ব্যতিরেকিরূপত্বম্। ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানস্যানুমিত্য-হেতুত্বাৎ। বেদান্তপরিভাষা, ১৮৩ পৃষ্ঠা, বোম্বেসং;

(গ) নহি ভাবেন ভাবসাধনে অভাবস্য অভাবেন ব্যাপ্তিরুপযুজ্যতে।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৯ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব বিঃ সং;

২। বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১০৮ পৃষ্ঠা;

বৈশেষিকোক্ত সেই কেবলান্বয়ী অনুমান নহে। বেদান্তের মতে অন্বয়-শব্দের অর্থ অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞান; সুতরাং অন্বয়-ব্যাপ্তিমূলে ধূমাদি দৃষ্ট পদার্থ হইতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নি প্রভৃতির যে অনুমান হয়, তাহাই বেদান্তীর অন্বয়ী অনুমান। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি সমর্থন করিয়া ঐ অনুমানকে অন্বয়-ব্যতিরেকিরূপে বিভাগ করিবার চেষ্টা করিলেও, বৈদান্তিক-সম্প্রদায় ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে অনুমানের কারণ বলিয়া স্বীকার না করায়, ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত কেবল-ব্যতিরেকী যেমন অনুমান নহে, অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের ব্যতিরেকী অংশও সেইরূপ অনুমান নহে, উহা অর্থাপত্তি। নৈয়ায়িকগণের কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী, এই ত্রিবিধ অনুমানের পরিবর্ত্তে বৈদান্তিক অন্বয়ী-রূপ একমাত্র অনুমানই স্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িক-সম্মত কেবলান্বয়ী-অনুমান অদ্বৈতবেদান্তের মতে অসম্ভব কল্পনা। কেননা, যেই অনুমানের সাধ্যের অভাব পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যেই অনুমানের কোন বিপক্ষ নাই, সকলই সপক্ষ বটে, তাহাই কেবলান্বয়ী-অনুমান বলিয়া নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্তে বিশ্বের তাবদ্ বস্তুই অভিধেয় ও বটে, প্রমেয়ও বটে; সুতরাং অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধ্যের অত্যন্তাভাব কোথায়ও থাকে না, থাকিতে পারে না। এইজন্যই অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে (অত্যন্তাভাবের অপ্রতি-যোগী বিধায়) কেবলান্বয়ী বলা হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। পরব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ধর্ম্মরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মেরই অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়। নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম অবাঙ্মনস-গোচর। ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, জ্ঞানের অগোচর বলিয়াই অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মেরও অত্যন্তাভাব সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অবশ্যই থাকিবে। এই মতে অত্যন্তা-ভাবের অপ্রতিযোগী বলিয়া কিছুই নাই; অতএব কেবলান্বয়ী বলিয়াও কিছুই নাই। রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির দর্শনে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক নহে, সধর্ম্মক; নির্গুণ নহে, সগুণ; অজ্ঞেয় নহে, জ্ঞান-গম্য। এইরূপ অনন্তকল্যাণ-গুণাকর পরব্রহ্মে অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কেবলান্বয়ী ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না, ঐ সকল ধর্ম্মের ভাবই থাকে। এইজন্য ইঁহাদের মতে কেবলান্বয়ী ধর্ম্মের কল্পনা অসম্ভব নহে। বিপক্ষ-রহিত কেবলান্বয়ী অনুমানের

প্রয়োগ-বাক্য (Syllogism) প্রদর্শন করিতে গিয়া আচার্য্য বেঙ্কট ন্যায়-পরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্যং (অভিধেয়ং) বস্তুত্বাৎ, দ্রব্যত্বাদ্ বা ঘটাদিবৎ; ব্রহ্ম শব্দ-গম্য যেহেতু, পরব্রহ্ম ঘট প্রভৃতির ন্যায়ই এক প্রকার দ্রব্য। "অনুভূতিঃ অনুভাব্যা বস্তুত্বাৎ ঘটাদিবৎ" অনুভূতিও ঘট প্রভৃতির ন্যায়ই অনুভাব্য, যেহেতু উহাও ঘটাদির মত এক জাতীয় বস্তুই বটে। বিশ্বের নিখিল বস্তুই রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির দৃষ্টিতে অনুভাব্য বা জ্ঞেয়ও বটে, অভিধেয় বা শব্দবাচ্যও বটে; অনভিধেয়, অজ্ঞেয় বলিয়া ইঁহাদের মতে কিছুই নাই। সুতরাং আলোচিত কেবলান্বয়ী-অনুমান এইমতে অসম্ভব নহে।[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবলান্বয়ী-অনুমানের যখন কোন বিপক্ষ নাই, তখন অনুমানের হেতু বা ব্যাপ্য-লিঙ্গকে "বিপক্ষে বৃত্তিরহিত হইতে হইবে" (বিপক্ষবৃত্তিরহিতত্বম্) এইরূপে সাধ্যের অনুমাপক নির্দ্দোষ হেতুর যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কেবলান্বয়ী-অনুমানের ক্ষেত্রে কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বেঙ্কট বলেন, কেবলান্বয়ী-অনুমানের কোন বিপক্ষ নাই বলিয়াই, কেবলান্বয়ী-অনুমানের হেতুর বিপক্ষে বৃত্তিতাও (বিদ্যমানতাও) নাই; হেতুর বিপক্ষে বৃত্তিতার অভাবই আছে অর্থাৎ হেতুটি বিপক্ষে বৃত্তিরহিতই হইয়াছে।[২] এইভাবেই ন্যায়োক্ত কেবলান্বয়ী-অনুমানের সম্ভাব্যতা রামানুজ-সম্প্রদায় উপপাদন করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকের কথিত কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান যে প্রমাণ, অদ্বৈতবেদান্তী, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি কোন বৈদান্তিক আচার্য্যই তাহা স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ যামুনাচার্য্য তাঁহার আত্মসিদ্ধি গ্রন্থে বলিয়াছেন, কেবল-ব্যতিরেকী হেতুর কোন সপক্ষেই অন্বয় হইতে পারে না বলিয়া, ঐরূপ ব্যতিরেকী হেতুকে হেতুই বলা চলে না। আচার্য্য রামানুজ তাঁহার ন্যায়কুলিশ নামক গ্রন্থে স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপ-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্পষ্ট বাক্যেই ন্যায়োক্ত কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান যে প্রমাণ হইতে পারে না, তাহা বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। মাধ্ব-প্রমাণবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ প্রভৃতিও

১। তাদৃশমেব বিপক্ষ রহিতং কেবলান্বয়ি যথা ব্রহ্ম শব্দবাচ্যং বস্তুত্বাৎ দ্রব্যত্বাদ্বা ঘটাদিবৎ। অনুভূতিরনুভাব্যা বস্তুত্বাদ্ঘটাদিবদিত্যাদি। নহি অবাচ্যমননুভাব্যমিতিবা কিঞ্চিদস্তি যেন বিপক্ষঃস্যাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১২১-১২২ পৃষ্ঠা;

২। তর্হি বিপক্ষরহিতস্য কেবলান্বয়িনো বিপক্ষবৃত্ত্যভাবঃ কথমিতি চেৎ হন্ত কিং তস্য বিপক্ষবৃত্তিত্বমস্তি তদপি নাস্তীতি চেত্তর্হি তদেব অনুমানাঙ্গমিত্যুক্তম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১২৩—১২৪ পৃষ্ঠা;

অনুমানের প্রয়োগে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির যে কোন উপযোগিতা নাই, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহা হইলে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-প্রদর্শনের তাৎপর্য্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন যে, অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের স্থলে পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমানে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য বা অবিনাভাব পাকঘর প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষতঃই লক্ষ্য যাইতে পারে বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির বিশেষ কোন উপযোগিতাই দেখা যায় না। কেবল ধূম ও বহ্নির ব্যভিচারের অভাব অর্থাৎ ধূম যে কখনও বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এইটুকুমাত্র প্রদর্শন করাই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উপযোগিতা বলিয়া ধরা যায়। কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের প্রয়োগে কোন এক স্থলেও হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। কেননা, সমস্ত পক্ষেই কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের সাধ্যটি সন্দিগ্ধই বটে। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি নিখিল জগতের কর্ত্তা, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ," এইরূপে যে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সেখানেও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে যাঁহারা অনুমানের কারণ বলিয়া গ্রহণ করেন না সেই অদ্বৈতবাদী, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির মতে "যিনি অখিল বিশ্বের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ" এইরূপে অন্বয়-ব্যাপ্তিরই উদয় হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তিমূলেই আলোচ্য কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ-ক্ষেত্রেও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন উপযোগিতা বুঝা যায় না। কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের কোন সপক্ষ নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, সপক্ষ বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইবে, সেখানেও কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের সাধ্যটি সন্দিগ্ধ বিধায়, সকল সপক্ষই (পক্ষসম বা) পক্ষান্তর্ভুক্তই হইয়া দাঁড়াইবে; এইজন্যই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, যেমন অমুক, এইরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তি এবং কোন দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। এখানে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির সাহায্যেই কেবল প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব যেখানে থাকিবে, সর্ব্বজ্ঞত্বও সেইখানেই থাকিবে। সর্ব্বকর্ত্তৃত্বটি ব্যাপ্য ধর্ম্ম, আর সর্ব্বজ্ঞতা ব্যাপক ধর্ম্ম। ব্যাপ্যের সাহায্যে ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে, ইহাই অনুমানের রহস্য। আবার সর্ব্বজ্ঞতার অভাব যেখানে থাকিবে, সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের অভাবও সেখানে অবশ্যই

থাকিবে। কেননা, ব্যাপকের অভাব ঘটিলে ব্যাপ্যের অভাব সেখানে অবশ্যই ঘটিবে। ব্যাপক বহ্নির অভাবে ব্যাপ্য ধূমের অভাব না হইয়া কোনমতেই পারে না। এইভাবে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি হেতু এবং সাধ্যের অন্বয়-বোধের সহায়তা সম্পাদন করিয়াই "ব্যাপ্তি" সংজ্ঞা লাভ করে। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে কখনও অনুমিতির কারণ হয় না।[১] মাধ্ব-পণ্ডিতগণ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে অনুমানের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। এইজন্যই কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী, এইরূপ অনুমানের বিভাগও তাঁহারা অনুমোদন করেন না। রামানুজের মতের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, রামানুজ-সম্প্রদায়ও কেবল-ব্যতিরেকী-অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। রামানুজ অন্বয়-ব্যতিরেকী এবং কেবলান্বয়ী, এই দুই প্রকার অনুমানই সমর্থন করিয়াছেন। মাধ্বও অদ্বৈতবেদান্তীর যুক্তি অনুসরণ করতঃ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে অনুমানের কারণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তিমূলেই অনুমান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে কেবল-ব্যতিরেকী যেমন অনুমান নহে, সেইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের ব্যতিরেকী অংশ অর্থাপত্তি-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বিধায়, ঐ ব্যতিরেকী অংশও অনুমান নহে। অনুমান অদ্বৈত-বেদান্তীর দৃষ্টিতে একমাত্র অন্বয়ীরূপ বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। তচ্চানুমানমন্বয়িরূপমেব, বেঃ পরিভাষা, ১৭৭ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

আলোচিত অনুমান স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান, এই দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে বুঝিবার জন্য যে অনুমানের সাহায্য লওয়া হয়, তাহাকে স্বার্থানুমান বলে। পাকঘর প্রভৃতি স্থানে বহুবার ধূম যে বহ্নির নিয়ত-সহচর তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া, "যেখানে ধূম থাকে, সেইখানেই বহ্নিও থাকে" এইরূপে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির নিশ্চয় করিলাম। তারপর কোনও পর্ব্বতের কাছে গিয়া পর্ব্বতের শিখর হইতে অবিচ্ছিন্ন ধূমজাল নির্গত হইতে দেখিলাম এবং তাহা দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এইরূপ অনুমান করিলাম। ইহা আমার স্বার্থানুমান। আমার এই বহ্নির অনুমান-পদ্ধতি যদি অপর কাহাকেও বুঝাইতে হয়, তবে আমার বাক্যের সাহায্যেই তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। যেরূপ বাক্যের

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান

১। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৯ পৃষ্ঠা; এবং প্রমাণপদ্ধতি, ৪৩ পৃষ্ঠা;

সাহায্যে উহা আমি অপরকে বুঝাইব তাহারই নাম "ন্যায়-বাক্য"। ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে ন্যায়-বাক্যের (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন, এই পাঁচটি অবয়ব বা অংশ আছে। এই পাঁচটি অবয়ব বা অংশ লইয়া যে বাক্য-সমষ্টি গঠিত হয়, তাহাই "ন্যায়" নামক মহাবাক্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অবয়ব-প্রদর্শক খণ্ড বাক্যগুলি ঐ "ন্যায়" নামক মহাবাক্যেরই অংশ। এইজন্যই উহার এক একটি অংশকে "অবয়ব" বলা হইয়া থাকে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইটি প্রতিজ্ঞা; "ধূমাৎ" এইটি হেতু; যাহা ধূমময় তাহাই বহ্নিময়, যেমন পাকশালাস্থ বহ্নি, ইহা দৃষ্টান্ত। এই পর্ব্বতও ধূমযুক্ত, সুতরাং এই পর্ব্বত বহ্নিযুক্তও বটে। এই শেষোক্ত বাক্যের প্রথমার্দ্ধের নাম "উপনয়," আর দ্বিতীয়ার্দ্ধকে বলে "নিগমন"।[১] ন্যায়-মহাবাক্যের প্রদর্শিত পাঁচটি অবয়ব নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য-সূত্রকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেও মীমাংসক এবং বৈদান্তিক-সম্প্রদায় অনুমানের প্রয়োগে আলোচিত পঞ্চাবয়বের উপযোগিতা স্বীকার করেন নাই। মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তীর মতে (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু ও (৩) উদাহরণ, অথবা (১) উদাহরণ, (২) উপনয় ও (৩) নিগমন, এই অবয়বত্রয়ই পরার্থানুমানের পক্ষে যথেষ্ট, উল্লিখিত পঞ্চাবয়ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক-মতের আলোচনায় দেখা যায়, পাশ্চাত্য-মতেও উল্লিখিত তিনটি অবয়ব হইতেই অনুমানের উদয় হইয়া থাকে। মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর কথিত অবয়বত্রয়-বাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা অবয়বত্রয়ের যে দুই প্রকার বিভাগ করিয়াছেন, সেখানে প্রথম কল্পে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, উপনয় বাক্য না থাকায় পাকশালা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত-বলে ধূম ও বহ্নির যে ব্যাপ্তি-বোধের উদয় হইয়াছিল, সেই ব্যাপ্য ধূম যে পর্ব্বতরূপ পক্ষে (অনুমেয় বহ্নির আধারে) বিদ্যমান আছে তাহা বুঝা যায় না। ফলে, পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানই

অনুমানে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত পঞ্চাবয়বের পরিচয়

১। (১) পর্বতোবহ্নিমান্, (২) ধূমবত্বাৎ (৩) যোযো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্, (৪) তথাচায়ম্, অয়ং পর্বতোধূমবান্, (৫) তস্মাত্তথা, তস্মাদয়ং পর্বতো-বহ্নিমান্। তর্কসংগ্রহ, ৪১ পৃষ্ঠা;

হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম, এই অবয়বত্রয় গ্রহণ করিলে, দ্বিতীয় অবয়ব হেতুটি বাদ পড়ায়, হেতুব্যতীত অনুমানের উদয় হইবে কিরূপে? এইরূপ আপত্তির প্রথমটির উত্তরে মীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, তাঁহাদের মতে তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ অর্থাৎ সাধ্য বা অনুমেয় বহ্নির সহিত ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতু যে ধূম, সেই ধূমের পর্ব্বত প্রভৃতি পক্ষে বৃত্তিতা বা বিদ্যমানতা-বোধ যে অনুমানের পূর্ব্বাঙ্গ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে। "পর্ব্বতো ধূমবান্" এইরূপে পর্ব্বতে ধূম দেখা গেলেই পাকশালা প্রভৃতিতে ধূম ও বহ্নির সহচার-দর্শন থাকায়, "যেখানে ধূম থাকে, সেইখানেই বহ্নি থাকে" এইরূপে ধূম ও বহ্নির যে ব্যাপ্তি-বোধর উদয় হয়, এবং যেই ব্যাপ্তি-বোধ সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে, সেই সুপ্ত ব্যাপ্তি-সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইলেই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমানের উদয় হইবে। ইঁহাদের মতে তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ নামক উপনয় অনুমানের কারণের মধ্যেই পড়ে না; সুতরাং উপনয় নামক যে চতুর্থ অবয়বটি আছে, তাহাকে অবয়বের গণনায় বাদ দিলেও, অনুমানের তাহাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না। অবয়বের মধ্যে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুটি বাদ পড়ার আশঙ্কার উত্তরে মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, উপনয়কে অবয়বের মধ্যে গণনা করায় তাহাদ্বারাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতুকেও অবশ্যই পাওয়া যাইবে। এই অবস্থায় হেতুকে একটি স্বতন্ত্র অবয়ব হিসাবে পরিগণনা না করিলেও কিছুই অনিষ্ট হয় না।[১]

১। উল্লিখিত মতের প্রতিবাদ করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণিতে বলিয়াছেন যে, উপনয়কে (অর্থাৎ ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট লিঙ্গ-পরামর্শকে) অনুমানের কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও, "হেতুমান্ পক্ষ" এইরূপে বহ্নি-অনুমানের হেতু ধূমের পক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতিতে বর্ত্তমানতা-বোধকে অনুমানের পূর্ব্বাঙ্গরূপে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা পক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতিতে সাধ্য বহ্নির অনুমানই হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় হেতুর পক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতিতে বৃত্তিতা বা বর্ত্তমানতা-প্রদর্শনের জন্যই উপনয়-বাক্যের প্রয়োগ আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, উপনয়-বাক্যের দ্বারা হেতু পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বুঝা যায় না। কেননা, পঞ্চমী বিভক্তিই হেতুর সূচক। উপনয়-বাক্যের মধ্যে পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হেতুর কোনও প্রয়োগ পাওয়া যায় না। সুতরাং হেতুর বোধের জন্যই পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হেতুর প্রয়োগও একান্ত আবশ্যক।

নৈয়ায়িকের পঞ্চাবয়বের স্থলে মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তী তিনটি অবয়ব স্বীকার করিলেও, জৈন তার্কিকগণ আলোচিত অবয়বত্রয়ের পরিবর্ত্তে দুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়াই ন্যায়-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জৈন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ধর্ম্মভূষণ তাঁহার ন্যায়দীপিকা গ্রন্থে প্রতিজ্ঞা এবং হেতু, এই দুইটি মাত্র অবয়ব অঙ্গীকার করিয়াই অনুমানের উপপাদন করিয়াছেন,—দ্বাববয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতুশ্চ। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য বাদিদেব সূরি তাঁহার প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার গ্রন্থে উদাহরণ, উপনয় এবং নিগম, এই তিনটি অবয়বকেই ন্যায়-প্রয়োগে অনাবশ্যক-বোধে পরিত্যাগ করিয়া, উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা এবং হেতু এই অবয়বদ্বয়-বাদই সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞা এবং হেতু, এই দুইটি অবয়বই ন্যায়-প্রয়োগে পর্য্যাপ্ত হইলেও, স্থূলধী ব্যক্তিগণকে বুঝাইবার জন্য অনুমানকে যেখানে অধিকতর বিশদ করা আবশ্যক, সেখানে দৃষ্টান্ত, উপনয় এবং নিগমন-বাক্যেরও প্রয়োগ করা অসঙ্গত নহে। "মন্দ-মতীস্তু ব্যুৎপাদয়িতুং দৃষ্টান্তোপনয়-নিগমনান্যপি প্রযোজ্যানি।" জৈন নৈয়ায়িক কুমারনন্দীও এই দৃষ্টিতেই বলিয়াছেন, প্রয়োগপরিপাটীতু প্রতিপাদ্যানুসারতঃ। রামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীনিবাস তাঁহার যতীন্দ্রমতদীপিকা নামক গ্রন্থে এই উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছেন যে, পরার্থানুমানে বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মতে অবয়ব-প্রয়োগের কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। সুধী ব্যক্তিগণ উদাহরণ এবং উপনয়, এই দুইটি মাত্র অবয়ব শুনিয়াই বাদীর বক্তব্য বুঝিতে পারেন, সুতরাং তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির পক্ষে উল্লিখিত দুইটি মাত্র অবয়বই যথেষ্ট। যাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর বুদ্ধিমান্ তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য উদাহরণ এবং উপনয়ের সহিত নিগমন-বাক্যও প্রযোজ্য। আবার যাঁহারা স্থূলবুদ্ধি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে, প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পাঁচটি অবয়বেরই প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, নতুবা স্থূলধী ব্যক্তিগণ বাদীর বক্তব্য নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-রহস্যজ্ঞ আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধি গ্রন্থে ন্যায়োক্ত পরার্থানুমানের খণ্ডনে বলিয়াছেন যে, অনুমানমাত্রই অনুমান-কারীর নিজ-প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যেই ব্যাপ্তি-স্মরণ প্রভৃতির ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থ ভিন্ন পরার্থানুমান বলিয়া কিছুই নাই।

অবয়বের সংখ্যা-সম্পর্কে দার্শনিক-গণের মতভেদ

রামের কথা শুনিয়া শ্যামের যেখানে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি-সম্পর্কে অনুমান-জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রামের কথাই শ্যামের অনুমান-জ্ঞানোদয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। রামের কথা শুনিয়া যেই হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-বোধ জন্মে, শ্যাম নিজের মনের মধ্যে তাহা ধীরভাবে পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিতে থাকে। শ্যামের ঐ অনুধাবনের ফলেই তাঁহার অনুমান-জ্ঞানের উদয় হয়। এই অবস্থায় অনুমানকে স্বার্থ ভিন্ন পরার্থানুমান বলা কোনক্রমেই চলে না। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের কথা শুনিয়া শ্রোতার যেখানে অনুমান-জ্ঞানোদয় হয়, সেখানেও শ্রোতা নিজেই অনুমান করিয়া থাকে, উহাও তাঁহার স্বার্থানুমানই বটে। অনুমান কোন ক্ষেত্রেই "পরার্থ" হয় না।[১] আলোচ্য অনুমানের মূলে আপ্ত বাক্য আছে, এইজন্যই যদি ঐ জাতীয় অনুমানকে "পরার্থানুমান" বলিয়া অনুমানের বিভাগ কল্পনা আবশ্যক হয়; তবে অপরের কথা শুনিয়া শব্দ জ্ঞানের, স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষেরও উদয় হইয়া থাকে বলিয়া, শব্দ এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরও ঐরূপ বিভাগ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেবল অনুমানেরই ঐরূপ বিভাগ কল্পনা করার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বেঙ্কট প্রমাণমাত্রকেই (ক) স্বয়ংসিদ্ধ প্রমাণ এবং (খ) অপরের বাক্যমূলে উৎপন্ন প্রমাণ, এইরূপ দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন।[২] তাঁহার ঐরূপ বিভাগ যে অযৌক্তিক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বেঙ্কট ভট্টপরাশর-রচিত তত্ত্ব-রত্নাকরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] উল্লিখিত বিভাগ অনুসারে অনুমানও

১। তদিদমনুমানং স্বার্থং পরার্থঞ্চেতি কেচিদ্ বিভজন্তে তদযুক্তম্। সর্বেষামপ্যনুমানানাং স্বপ্রতিসন্ধানাদিবলেন প্রবৃত্ততয়া স্বব্যবহারমাত্রহেতুত্বেন চ স্বার্থত্বাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৫৪—১৫৫ পৃষ্ঠা;

২। দ্বিবিধানি প্রমাণানি। স্বয়মেবসিদ্ধানি পরবাক্যপূর্বাণিচেতি। সামান্যতঃ এব বিভাগঃ কার্য ইতি। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৫৫ পৃষ্ঠা;

৩। সর্বং প্রমাণং সামগ্র্যা স্বত এব প্রবৃত্তয়া।
জন্যতে পরবাক্যেন বৃত্তয়া চেতিহি দ্বিধা॥
অতোঽনুমানং দ্বিবিধং স্বপরার্থত্বভেদতঃ।
* * * *
অনুমোদ্বোধকং ব্যাক্যং প্রয়োগঃ সাধনঞ্চতৎ॥
ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৫৬ পৃষ্ঠা;

স্বয়ংসিদ্ধ এবং পরবাক্যপূর্ব্বক, এই দুই প্রকারেরই হইয়া দাঁড়াইল। পরবাক্যমূলে যে অনুমান উৎপন্ন হয়, তাহাই ন্যায়োক্ত পরার্থানুমান। এইরূপ পরার্থানুমানের উদ্বোধক বা সাধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন, এই পাঁচ প্রকার ন্যায়াবয়ব বা প্রয়োগ-বাক্য নামে ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে অভিহিত হইয়াছে। অনুমানের প্রয়োগ-বাক্য-সম্পর্কে দার্শনিকগণের মধ্যে যে গুরুতর মতভেদ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতের ব্যাখ্যায় বেঙ্কট বলিয়াছেন যে, যদিও উদাহরণ এবং উপনয়, এই দুইটি অবয়বই পরার্থানুমানের পক্ষেও যথেষ্ট; উক্ত অবয়বদ্বয়ের সাহায্যেই হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তি-বোধ এবং হেতুর পক্ষে (সাধ্যের অধিকরণে) বিদ্যমানতা প্রভৃতি অনুমানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গের জ্ঞানোদয় হওয়া সুধীব্যক্তির সম্ভবপর, তবুও যে সকল স্থূলধী ব্যক্তিগণের জন্য অনুমান-প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ; অথবা উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন; এই তিনটি অবয়বের প্রয়োগও অবশ্য কর্ত্তব্য। এমনও যদি কোন স্থূলদর্শী থাকেন, যিনি উল্লিখিত অবয়বত্রয় শুনিয়াও বাদীর বক্তব্য বুঝিতে ভুল করেন, তবে তাঁহার জন্য আলোচিত পাঁচটি অবয়বের প্রয়োগই প্রয়োজন। এই জন্যই প্রাচীন বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্য প্রভৃতিতে ন্যায়াবয়বের কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম মানা হয় নাই। বেঙ্কটও অবয়বের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।[১]

১। (ক) বয়স্তু নয়মং ক্রমঃ। নিয়মবদনিয়মস্যাপ্যাভিমানিকতয়া সিদ্ধান্তত্বোপপত্তেঃ। দৃষ্টশ্চানিয়মেন ভাষ্যাদিষু প্রয়োগঃ। ক্বচিৎ পঞ্চাবয়বঃ, ক্বচিত্ত্র্যবয়বঃ, ক্বচিদবয়বকল্পনারহিতঃ। ক্বচিদেকব্যাপ্তিকঃ, ক্বচিদ্ব্যাপ্তিদ্বয়বিশিষ্ট ইত্যাদি। ইদংচ বাদিনোঃ পরস্পরসংবাদানুরূপম্।........................ ...অতোঽনিয়তাবয়ব এব প্রয়োগঃ। উপপন্নশ্চ মৃদুমধ্যকঠোরধিয়াং বিস্তরসংগ্রহাভ্যাং ব্যবহারঃ। যদ্যপ্যুদাহরণোপনয়াভ্যামেব ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতয়োঃ সিদ্ধত্বাত্তাবদেব তত্ত্বতো বক্তুমুচিতং তথাপি বিবক্ষিতস্ফোটনায় প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণানি, উদাহরণোপনয়নিগমনানি বা বাচ্যানি। অন্যথা বিবাদবিষয়স্য সাধ্যার্থস্য ব্যক্তপ্রতিপাদনানুপপত্তেঃ।

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা;

(খ) নচ সর্বদা সর্বে অবয়বাঃ প্রযোজ্যাঃ ন ন্যূনা নাধিকা ইতি নির্বন্ধনিয়মঃ বক্তৃপ্রতিবক্তৃসম্প্রতিপত্তৌ লঘূপায়োপাদানেঽপি দোষাভাবাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৬৩ পৃষ্ঠা;

অবয়ব-সম্পর্কে কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম যে মানা যায় না, তাহা মাধ্ব-প্রমাণবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতিতে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। জয়তীর্থ বলেন যে, তুমি বাদী অনুমানের পঞ্চাবয়বই মান, কি তিনটি অবয়বই মান, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা এই যে, প্রতিবাদী তোমার উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন কিনা। যদি বিশ্বাস্য বলিয়া মনে না করেন, তবে আলোচ্য পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেও হয়তো প্রতিবাদীর সন্দেহের অবসান ঘটিবে না, সেই অবস্থায় প্রতিবাদীর সন্দেহ দূর করিবার জন্য ষষ্ঠ অবয়বের প্রয়োগেরও আবশ্যকতা দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে, বাদীর কথায় প্রতিবাদীর আস্থা থাকিলে, সে শুধু অনুমানের প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনিয়াই (পর্ব্বতো বহ্নিমান্, এইটুকু শোনামাত্রই) পক্ষে (সাধ্যের আধারে) সাধ্য-বহ্নি প্রভৃতির অনুমানকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে। সেইরূপ স্থলে হেতুর প্রয়োগও নিষ্প্রয়োজন মনে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই যে, বাদীর উক্তিতে প্রতিবাদীর আস্থা থাকুক, কি নাই থাকুক, কোন ক্ষেত্রেই অবয়ব-সম্পর্কে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানার কথা উঠে না। এখন প্রশ্ন এই, বাদীর প্রতিপাদ্য প্রতিবাদী বুঝিবে কি উপায়ে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে জয়তীর্থ বলেন যে, ন্যায়-বৈশেষিকের মতে (ক) হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-বোধ, এবং (খ) হেতু-ধূম প্রভৃতির পক্ষে অর্থাৎ সাধ্য-বহ্নির আধার পর্ব্বত প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকা, (ব্যাপ্তিঃ, পক্ষধর্মতাচ) এই দুই কারণই পরার্থানুমানের পক্ষেও যথেষ্ট। মাধ্ব-পণ্ডিতগণ হেতুর পক্ষে বর্ত্তমান থাকাকে অনুমানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য তাঁহাদের মতে ব্যাপ্তি এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে হেতুটি বর্ত্তমান থাকিলেই (ব্যাপ্তিঃ সমুচিতদেশবৃত্তিত্বাভ্যাং বা[১])

১। "সমুচিতদেশবৃত্তিত্ব" কথার দ্বারা মাধ্ব-মতে যেখানে হেতু বর্ত্তমান থাকিলে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি বুঝিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না, সেইরূপ স্থান বুঝিতে হইবে। স্থলবিশেষে সাধ্যের আধারে বর্ত্তমান না থাকিয়াও হেতু সাধ্য সাধন করে বলিয়া, হেতুর পক্ষে অর্থাৎ সাধ্যের আধার পর্ব্বত প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকাকে (হেতুর পক্ষবৃত্তিতাকে) অনুমানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া মাধ্ব-পণ্ডিতগণ মানিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি।

বাদীর বক্তব্য প্রতিবাদী বুঝিতে পারিবেন; এবং বাদীর ন্যায় প্রতিবাদীরও যথার্থ অনুমানের উদয় হইবে। অনুমানের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য অবয়বের সংখ্যা-সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানার কোনও মূল্য নাই। আলোচ্য অঙ্গদ্বয় (অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং উপযুক্ত স্থানে হেতুর বৃত্তিতা) থাকিলেই সেক্ষেত্রে অনুমানের উদয় হইতে কোনরূপ বাধা হইবে না। ব্যাপ্তির স্মৃতি কি কি কারণে মনের মধ্যে উদিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে অবয়বের নিয়মবাদীরা কেহ পঞ্চাবয়ব, কেহ বা প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ, কিংবা উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন এই অবয়বত্রয়, কোন দার্শনিক উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়া তন্মূলে ব্যাপ্তির স্মৃতি উপপাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট অবয়ব স্বীকার করার বিরুদ্ধে জয়তীর্থ বলেন যে, প্রকারান্তরেও ব্যাপ্তির স্মরণ অসম্ভব হয় না। অনুমানের কৌশল যাঁহারা জানেন, সেই সকল অনুমানাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যাপ্তি গ্রহণের উপযুক্ত কোন প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনিবামাত্রই ঐ বাক্যের অন্তরালে যে ব্যাপ্তি আছে, তাহা বুঝিতে পারেন এবং ঐ ব্যাপ্তিমূলে তাঁহাদের যথার্থ অনুমানেরও উদয় হয়। এই অবস্থায় ব্যাপ্তির স্মৃতি উপপাদনের জন্য নিদ্দিষ্ট অবয়ব স্বীকার করার কোনই অর্থ হয় না। অবয়বের নিয়ম না মানিয়াও কত বিভিন্ন প্রকারে যে অনুমানাঙ্গ ব্যাপ্তি-বোধের উদয় হইয়া অনুমান উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতিতে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। (জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন) তারপর, অবয়বের নিয়ম মানার পক্ষে আরও বাধা এই যে, অবয়বের নিয়ম যে সকল দার্শনিক মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অবয়ব-সম্পর্কে যে গুরুতর মতভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। নৈয়ায়িক পাঁচটি অবয়ব মানিয়াছেন। মীমাংসক নৈয়ায়িকের পাঁচ অবয়বের পরিবর্ত্তে অবয়বত্রয় অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন কথা এই যে, অবয়ব পাঁচটিই মান, কি তিনটিই মান, ঐ অবয়ব যখন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নহে, তখন অনুমানের সাহায্যেই ন্যায়োক্ত পঞ্চাবয়ব, কিংবা মীমাংসোক্ত অবয়বত্রয় সাধন করিতে হইবে। নৈয়ায়িক যখন পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিয়া তাঁহার স্বীকৃত পঞ্চাবয়ব-বাদের অনুমান করিতে যাইবেন, তখন মীমাংসকের দৃষ্টিতে বিচার করিলে নৈয়ায়িকের অনুমানে দুইটি অবয়বের আধিক্যই ফুটিয়া উঠিবে। আবার মীমাংসক যখন তাঁহার অঙ্গীকৃত

অবয়বত্রয়ের অনুমান করিবেন, তখন ন্যায়ের দৃষ্টিতে বিচার করিলে সেখানে দুইটি অবয়বের ন্যূনতাই ঘটিবে। পঞ্চাবয়বের সাহায্যে ন্যায়োক্ত পঞ্চাবয়বের কিংবা অবয়বত্রয়ের সাহায্যে মীমাংসোক্ত অবয়বত্রয়ের অনুমান করিতে গেলেও, ঐসকল অনুমানে যে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়িবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং নির্দ্দিষ্ট অবয়ব-বাদ প্রমাণ করাই তো আদৌ কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় অবয়ব-নিয়ম ছাড়িয়া দিয়া, যেটুকু মানিলে যথার্থ অনুমানের উদয় হইতে কোনরূপ বাধা হয় না, সেই হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-বোধ এবং উপযুক্ত দেশে (ন্যায়-মতে পক্ষে) হেতুটি বিদ্যমান থাকা, অনুমানের এই দুইটি আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গকে সাধন হিসাবে গ্রহণ করাই সমধিক যুক্তিসঙ্গত নহে কি?[১]

মাধ্বের অনুমান-লক্ষণে আমরা দেখিয়াছি যে, মাধ্ব-পণ্ডিতগণ "নির্দ্দোষ উপপত্তিকে" অনুমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "উপপত্তি" বলিতে

হেত্বাভাস

এই মতে অনুমানের লিঙ্গ (ব্যাপ্য) ধূম প্রভৃতিকে বুঝায়। উপপত্তির্ব্যাপ্যং যুক্তির্লিঙ্গমিতি পর্য্যায়ঃ। প্রমাণ-পদ্ধতি ২৮ পৃষ্ঠা; অনুমানের লিঙ্গ বা হেতুটি যদি সর্ব্বপ্রকার দোষমুক্ত না হয়, তবে ঐ দোষ-কলুষিত হেতুদ্বারা সাধ্য-সিদ্ধি কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। কতকগুলি দুষ্ট হেতু আছে, সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে হেতুর মত মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নির্দ্দোষ হেতু নহে, হেত্বাভাস। "হেতুবদাভাসন্তে", অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ হেতু নহে, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিলে "হেত্বাভাস" এই শব্দটির দ্বারাই হেত্বাভাসের সাধারণ লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে হয়, এইজন্যই মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায়সূত্রে হেত্বাভাসের লক্ষণ-নিরূপণের জন্য কোন পৃথক্ সূত্র রচনা করেন নাই। কেবল (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম এবং (৫) কালাতীত, এই পাঁচটি নাম দিয়া পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] হেতোরাভাসাঃ, অর্থাৎ

১। জয়তীর্থ কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা; এবং জনার্দ্দন-কৃত প্রমাণপদ্ধতির টীকা, ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;

২। সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ। ন্যায়সূত্র ১।২।৪।

হেতুর দোষ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক হেতুর দোষকেই হেত্বাভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ক) ব্যভিচার, (খ) বিরোধ, (গ) সংপ্রতিপক্ষ, (ঘ) অসিদ্ধি এবং (ঙ) বাধ, এই পাঁচ প্রকার হেতুর দোষকে পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণের সূচনা করিয়াছেন। আভাস শব্দের দোষ অর্থ মুখ্য অর্থ নহে। এই অবস্থায় হেতুর নানাবিধ দোষকে কিংবা বিভিন্ন দোষদুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করা সমীচীন মনে হয় না। অবশ্যই গঙ্গেশ, রঘুনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা যাহা হেতুর ন্যায় প্রতিভাত হয় এমন পদার্থকেই বুঝায়। "হেতুর ন্যায়" এইরূপ বলায় হেত্বাভাস যে প্রকৃত হেতু নহে, অহেতু, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই, তাহাই অহেতু। অহেতু পদার্থকে হেত্বাভাস বলিয়া গ্রহণ করিলে অসংখ্য পদার্থ হেত্বাভাস হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ ক্ষেত্রে হেত্বাভাসের গণনাই চলিতে পারে না। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, যে-পদার্থ বস্তুতঃ হেতু না হইলেও হেতুর সহিত সাদৃশ্য থাকায় হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। হেত্বাভাস পদার্থে হেতুর সাদৃশ্য কি আছে, যাহার ফলে উহা হেতুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, অনুমানের প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উপন্যাস করিবার পর যথার্থ হেতুরও যেমন প্রয়োগ হয়, সেইরূপ যাহা প্রকৃত হেতু নহে, দুষ্ট হেতু, তাহারও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রয়োগই হেতুর সহিত হেত্বাভাসের সাদৃশ্য বলিয়া জানিবে। হেত্বাভাসেও হেতুর কোন-না-কোনরূপ ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য থাকিতে পারে। তবে প্রকৃত যাহা হেতু, তাহা দ্বারা অনুমানের সাধ্য-সাধন সম্ভবপর হয়, হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুদ্বারা সাধ্য-সিদ্ধি হয় না, হইতে পারে না। এই অবস্থায় সাধ্যের সাধকত্ব এবং অসাধকত্বই যথাক্রমে হেতু এবং হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়া বুঝা যায়। যথার্থ হেতুর যাহা যাহা লক্ষণ তাহা থাকিলেই, হেতু যে সাধ্যের সাধক হইবে তাহা (হেতুর সাধ্য-সাধকত্ব) বুঝা যাইবে; আর প্রকৃত হেতুর লক্ষণ না থাকিলেই, হেত্বাভাস যে সাধ্যের সাধক নহে, অসাধক তাহা

জানিতে পারা যাইবে। এখন কথা এই যে, প্রকৃত হেতুর লক্ষণ কি? নৈয়ায়িকের পরিভাষায় বিচার করিলে দেখা যায়, সাধ্যের আধার বা ধর্ম্মীতে (পর্ব্বত প্রভৃতিতে) অনুমেয় ধর্ম্মের (বহ্নি প্রভৃতির) যে অনুমান করা হয়, সেক্ষেত্রে ধর্ম্মী পর্ব্বত প্রভৃতিকে পক্ষ, আর অনুমেয় বহ্নিপ্রভৃতিকে সাধ্য বলা হয়। যেই হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান করা হয়, সেই হেতুটির পক্ষে বিদ্যমান থাকা (পক্ষ-সত্তা) ন্যায়-মতে হেতুর একটি একান্ত আবশ্যকীয় লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যেই হেতু পক্ষে থাকে না, সেইরূপ হেতু কস্মিন্ কালেও পক্ষে সাধ্যের সাধন করিতে পারে না। হেতুর কেবল পক্ষে সত্তা থাকিলেই চলিবে না। (২) সপক্ষে অর্থাৎ যেখানে সাধ্যটি নিশ্চিতই আছে (পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে পাকঘর প্রভৃতিকে বলে সপক্ষ, কারণ পাকঘরে যে বহ্নি আছে, তাহা নিঃসন্দেহ) সেই স্থানে হেতুটি বর্ত্তমান থাকা (সপক্ষ-সত্তা) এবং (৩) যেখানে সাধ্য বহ্নি প্রভৃতি নিশ্চিতই নাই, সেই সকল বিপক্ষে (পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতিতে) হেতুটি বিদ্যমান না থাকা, (বিপক্ষে অসত্তা) এই দুইটিকেও হেতুর যথার্থ লক্ষণ বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। অবশ্যই যে-সকল (কেবলান্বয়ী) অনুমানের বিপক্ষ বলিয়া কিছুই নাই, সকলই সপক্ষ বটে, সেইরূপ অনুমানের প্রয়োগ বিপক্ষে অসত্তাকে হেতুর লক্ষণ বলিয়া ধরা চলিবে না। এইরূপ যেই সকল (কেবল-ব্যতিরেকী) অনুমানের সপক্ষ নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে সপক্ষে সত্তাকেও হেতুর লক্ষণ বলা চলিবে না। সপক্ষ-সত্তাকে ছাড়িয়া দিয়াই হেতুর লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে। উল্লিখিত (১) পক্ষে সত্তা, (২) সপক্ষে সত্তা, (৩) বিপক্ষে অসত্তা, এই তিন প্রকারের হেতুর লক্ষণ ব্যতীত আরও দুই প্রকারের হেতুর লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহা হইতেছে (৪) অবাধিতত্ব এবং (৫) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রবল প্রমাণের সাহায্যে পক্ষে সাধ্যের অভাব নিশ্চিতরূপে জানা যায়, সেই স্থলে সাধ্যশূন্য পক্ষে সাধ্য সাধন করিবার জন্য হেতুর প্রয়োগ করিলে ঐ হেতুকে (প্রবল প্রমাণের দ্বারা) বাধিত হেতু বলা হয়, ঐরূপ বাধিত হেতু সাধ্য-সিদ্ধির অনুকূল নহে বলিয়া, অবাধিতত্বকেও হেতুর অন্যতম লক্ষণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে কোনও পক্ষে হেতুর দ্বারা সাধ্যের অনুমান করিতে গেলে, সেই পক্ষেই অপর একটি হেতুর

উপন্যাস করিয়া সাধ্যাভাবেরও অনুমানের আপত্তি হইতে পারে; এবং উভয় অনুমানের হেতুই তুল্যবল বিধায় কেহই কাহাকে বাধা দিতে পারে না। সেরূপ ক্ষেত্রে দুই হেতুই পরস্পর প্রতিপক্ষ হিসাবে বিদ্যমান থাকায়, ঐরূপ হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলা হইয়া থাকে। সৎপ্রতিপক্ষ-স্থলে দুইটি হেতুর কোনটিই সাধ্য সাধন করিতে পারে না। এইজন্য ঐরূপ সৎপ্রতিপক্ষ হেতুকে হেতুই বলা চলে না। "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ কোন হেতু বর্ত্তমান না থাকাও নির্দ্দোষ হেতুর একটি লক্ষণ বলিয়া বুঝা যায়।

হেতুর বস্তুতঃ পাঁচটি লক্ষণই অত্যাবশ্যক। ঐ পাঁচটি লক্ষণের যে কোন একটির অভাব ঘটিলেই সেই হেতু আর প্রকৃত হেতু বলিয়া গণ্য হইবে না। ফলে, হেত্বাভাসও পাঁচ প্রকারেরই হইয়া দাঁড়াইবে। গৌতম মুনিও সব্যভিচার, বিরুদ্ধ প্রভৃতি পাঁচ প্রকারের হেত্বাভাসেরই সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বিশ্বনাথও অনৈকান্তিক, বিরুদ্ধ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে যাহাকে সব্যভিচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

সব্যভিচার

বিশ্বনাথ তাহাকেই অনৈকান্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। সব্যভিচার বলিলে ব্যভিচারযুক্ত বা ব্যভিচারী হেতুকে বুঝায়। যেই হেতুর গতি সর্ব্বতোমুখী, অর্থাৎ যেই হেতু সাধ্যের অধিকরণে যেমন থাকে, সাধ্যাভাবের অধিকরণেও তেমন থাকে, সেইরূপ ব্যভিচারী হেতুমূলে কোন সাধ্যের অনুমান করা চলে না। ঐরূপ হেতুকে ব্যভিচারী হেতু বা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, এই ব্যক্তি দাতা, যেহেতু ইনি ধনী ব্যক্তি; অথবা যদি বলা যায় যে, এই ব্যক্তি ধনী, যেহেতু উনি দাতা। এই উভয়স্থলেই হেতু সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, ধনী হইলেই দাতা হয় না, আর দাতামাত্রই ধনীও নহে। অদাতাকেও ধনী হইতে দেখা যায়, আবার দাতাকেও দরিদ্র হইতে দেখা যায়। ধনিত্ব দাতা অদাতা উভয়েই আছে, দাতৃত্বও ধনী এবং দরিদ্র উভয়েই

১। অনৈকান্তোবিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্তুপঞ্চধাঃ॥
ভাষাপরিচ্ছেদ, ৭১ শ্লোক;

আছে। এই অবস্থায় দানশীলতার অনুমানে ধনিত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে; কিংবা ধনিত্বের অনুমানে দানশীলতাকে হেতু করিলে, উভয়ক্ষেত্রেই হেতুটি সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইবে। যেই হেতুটি সাধ্য যেখানে থাকে সেই সাধ্যের অধিকরণে বা পক্ষে থাকে না, অধিকন্তু সাধ্য

বিরুদ্ধ

যেখানে থাকে না, সেইরূপ বিপক্ষে অর্থাৎ সাধ্যশূন্য স্থানেই হেতুটি বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে বিরুদ্ধ হেতু বা হেত্বাভাস বলে। ঐরূপ হেতু সাধ্যের সাধক না হইয়া সাধ্যের অভাবেরই সাধক হয়। সাধ্য পদার্থকে বিশেষরূপে রুদ্ধ করে বলিয়াই ইহাকে বিরুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন যদি কেহ বলেন যে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, যেহেতু এই পৃথিবী সনাতন। এইরূপে পৃথিবীর উৎপত্তির সাধক অনুমানে যদি সনাতনত্ব বা নিত্যত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে ঐ স্থলে সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, জন্যত্ব এবং সনাতনত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। যাহা জন্য নহে, এবং যাহার বিনাশ নাই, এইরূপ পদার্থই সনাতন হইয়া থাকে। পৃথিবীকে জন্য বলিয়া আবার সনাতন বলিলে, ঐরূপ উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হয় বলিয়া এখানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস অবশ্যম্ভাবী। মহর্ষি কণাদ এইরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে "অসৎ" হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনও

প্রকরণসম
বা
সৎপ্রতিপক্ষ

অনুমানে একই পক্ষে বাদী সাধ্যের এবং প্রতিবাদী সাধ্যাভাবের সাধকরূপে বিভিন্ন দুইটি হেতুর প্রয়োগ করিলে, ঐ হেতু দুইটি যদি তুল্যবল হয়, তবে প্রকরণ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা নির্দ্দোষ করণ-সম্পর্কে চিন্তার উদয় হয় বলিয়া, ঐরূপ হেতুদ্বয়কে প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস বলা যায়। যেমন নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ অনিত্য; কেননা, শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। নিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি বা প্রতীতি না হইলে সেই বস্তু অবশ্য অনিত্যই হইবে; যেমন জাগতিক ঘট প্রভৃতি বস্তুরাজি। এইরূপ অনুমানের প্রয়োগে কোন দোষ প্রদর্শন না করিয়াই, ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদী মীমাংসক বলিলেন, শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দে কোন অনিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি হইতে দেখা যায় না। প্রতিবাদী মীমাংসকের এইরূপ অনুমানের হেতুতেও বাদী নৈয়ায়িক কোনরূপ দোষ উদ্‌ভাবন করিতে পারিলেন না। ফলে, শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ই অনিবার্য্য

হইয়া পড়িল। প্রদর্শিত হেতু দুইটির কোনটি দ্বারাই কোনরূপ সাধ্য-সিদ্ধি সম্ভব হইল না। উক্ত হেতুদ্বয় প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসই হইয়া দাঁড়াইল।

যে হেতু সিদ্ধ নহে, যে হেতুকে সাধন করিতে হয়, তাহাকে সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেতু বলে। বাদী যেই হেতুর বলে সাধ্য সাধন করিতে চাহেন, প্রতিবাদী সেই হেতুই যদি না মানেন, তবে সেক্ষেত্রে বাদাকে সাধ্যের ন্যায় হেতুকেও সাধন করিতে হইবে। ঐরূপ হেতু সিদ্ধ নহে বলিয়া সাধ্য সাধন করিতে পারিবে না। যে নিজেই অসিদ্ধ, সে অপরকে (সাধ্যকে) সাধন করিবে কিরূপে? অসিদ্ধ হেতু হেতুই নহে, উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। মীমাংসক অনুমান করেন যে, ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য-পদার্থ, কারণ তাহার গতি আছে। যাহার গতি আছে তাহা দ্রব্য-পদার্থই হইবে। দ্রব্যভিন্ন কোনও পদার্থের গতি নাই। নৈয়ায়িক এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, অন্ধকার দ্রব্য-পদার্থ নহে, উহা আলোকের অভাবমাত্র। গতি-ক্রিয়া যে দ্রব্যের লক্ষণ, ইহা মীমাংসকও মানেন, নৈয়ায়িকও মানেন। এখন কথা এই, নৈয়ায়িক অন্ধকারকে অভাব-পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, তাঁহার মতে ছায়া বা অন্ধকারের যে গতি আছে, তাহাই তো সিদ্ধ নহে। মানুষ যখন গমন করিতে থাকে, তখন তাহার নিজ দেহই পশ্চাদ্‌গামী আলোকের আচ্ছাদক হয়। এইজন্য তাহার পিছন-ভাগে ছায়া পড়ে। মানুষের পিছনভাগে যে আলোকের অভাব থাকে ইহাতো সকলেই প্রত্যক্ষ করে। কোনও লোক সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ঐ লোকের ছায়াও তাহার পাছে পাছে গমন করিতেছে এইরূপ মনে হইয়া থাকে। ছায়ার এই গতি-বুদ্ধি এক্ষেত্রে নিছকই ভ্রান্তি। ছায়ার প্রকৃতপক্ষে গতি নাই, ছায়া দ্রব্য-পদার্থও নহে। এইরূপ অবস্থায় ছায়ার দ্রব্যত্ব যেমন সাধনসাপেক্ষ, ছায়ার গতিমত্তাও তেমনই সাধনসাপেক্ষ। এইজন্য মীমাংসকোক্ত অনুমানের গতিমত্তারূপ হেতু সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, প্রকৃত হেতু নহে।

সাধ্যসম বা অসিদ্ধ

মীমাংসকের মতে শব্দ নিত্য পদার্থ। শব্দ শ্রবণের পরেও থাকে, পূর্ব্বেও থাকে। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ হইলে দূরস্থ শ্রোতা যে শব্দ শ্রবণ

কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত হেত্বাভাস

করে, সেখানে কাষ্ঠ এবং কুঠারের সংযোগ শব্দের উৎপাদক নহে, নিত্য শব্দেরই অভিব্যক্তির সাধন বা অভিব্যঞ্জকমাত্র। শব্দের অভিব্যক্তি কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। যাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য তাহা অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও থাকে পরেও থাকে, যেমন কোনও বস্তুর রূপ। অন্ধকারে রূপের অভিব্যক্তি হয় না। এইজন্য যাহার রূপ দেখিতে হইবে সেই রূপবান্ বস্তুর সহিত আলোকের সংযোগ অত্যাবশ্যক। আলোকের সহিত সংযোগের পরই রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং রূপ যে আলোক-ব্যঙ্গ্য ইহা নিঃসন্দেহ। এই আলোক-সংযোগব্যঙ্গ্য রূপ দেখিয়া মীমাংসক যদি অনুমান করেন যে, আলোক-সংযোগব্যঙ্গ্য রূপ যেমন অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও আছে পরেও থাকিবে, সেইরূপ কাষ্ঠ এবং কুঠারের সংযোগ-ব্যঙ্গ্য শব্দও কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগের পূর্ব্বেও আছে, পরেও থাকিবে, অর্থাৎ শব্দ জন্য নহে, নিত্য। কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ প্রভৃতি নিত্য শব্দের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশকমাত্র, উৎপাদক নহে। উল্লিখিত মীমাংসকের অনুমানের সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব হেতুটি, নৈয়ায়িক বলেন, কালাতীত বা কালাত্যয়াপদিষ্ট নামক হেত্বাভাস। কেননা, মীমাংসক তাঁহার অনুমানের সমর্থনে যে আলোক-সংযোগব্যঙ্গ্য রূপের অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, সেই রূপের দৃষ্টান্তটির এ-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। রূপের প্রত্যক্ষ আলোক-সংযোগ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই হয়। আলোক সংযোগ না থাকিলে আর রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, হইতে পারে না। সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি যে আলোক-সংযোগ-ব্যঙ্গ্য তাহা কে না স্বীকার করিবে? শব্দের অভিব্যক্তিকে কিন্তু রূপের ন্যায় সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা যায় না। কারণ, আলোক-সংযোগের সমকালে যেমন রূপের অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগের সমকালে দূরস্থ শ্রোতার কানে শব্দের অভিব্যক্তি হয় না। দূরে শব্দের অভিব্যক্তি তখনই হয়, যখন শব্দের উৎপাদক কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ থাকে না, সংযোগের বিয়োগ ঘটে। কাঠুরিয়া গাছের গোড়ায় কুঠার মারিতেছে। একবার কুঠার মারিতেছে একটি শব্দ হইতেছে, কুঠার উঠাইতেছে, আবার মারিতেছে, এইরূপে কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগে পুনঃ পুনঃ শব্দ জন্মিতেছে। শব্দের উৎপত্তি যে কুঠার-সংযোগজন্য তাহাতে

অবশ্য কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রোতা দূরে দাঁড়াইয়া যে সেই শব্দ শুনিতেছেন, সেখানে দূরস্থ শ্রোতার কর্ণকুহরে শব্দের ঐ অভিব্যক্তিকে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা চলে কি? দূরে উৎপন্ন শব্দ যখন শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া শ্রোতার কানে আসিয়া পৌঁছায়, তখনই শুধু দূরস্থ শ্রোতা শব্দ শুনিতে পান। দূরবর্ত্তী শ্রোতা যখন শব্দ শোনেন, তখন আর কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ থাকে না। ক্রমিক শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া দূরে আসিয়া শব্দ পৌঁছিতে যে সময়টুকু লাগিতেছে তাহার মধ্যে কাঠুরিয়া পুনরায় মারিবার জন্য কুঠার উঠাইয়া লইয়াছে। ফলে, কুঠার-সংযোগের কাল অতিক্রম করিয়া, সংযোগের বিয়োগ কালেই যে দূরে শব্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ইহা নিঃসন্দেহ। এই অবস্থায় দূরে শব্দের অভিব্যক্তিতে সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বকে যে হেতুরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে, সেই হেতুর একদেশ সংযোগ না থাকায়, দূরে শব্দ-শ্রবণকালে সংযোগের কাল অতীত হওয়ায়, ঐরূপ হেতু কালাতীত বা কালাত্যয়াপদিষ্ট নামক হেত্বাভাস হইবে।[১] দ্বিতীয়তঃ ন্যায়-প্রয়োগের রহস্য পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কোন পক্ষে কোনরূপ সাধ্যের অনুমান-বলে সাধন করিতে হইলেই হেতুর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ-নিরাসের জন্যই হেতুর প্রয়োগের আবশ্যকতা। পক্ষে সাধ্যটি নাই, ইহা প্রবলতর প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিতরূপে জানা গেলে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় হইলে, সেক্ষেত্রে পক্ষে সাধ্য আছে কিনা, এইরূপ সংশয় কখনই জাগে না। জলহ্রদে বহ্নি নাই, ইহা প্রত্যক্ষতঃ জানিলে জলহ্রদে বহ্নি আছে কিনা, এইপ্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে কি? যে-পর্য্যন্ত পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ থাকে, সেই পর্য্যন্তই পক্ষে সাধ্যের অনুমানের জন্য নির্দ্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিলে ঐরূপ হেতু-বলে পক্ষে সাধ্য সাধন সম্ভবপর হয়। দৃঢ়তর প্রমাণের সাহায্যে পক্ষে সাধ্যের অভাব-নিশ্চয় হইলে পক্ষে সাধ্যের সন্দেহের অবকাশ থাকে না বলিয়া, সেখানে হেতুর প্রয়োগেরও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সেইরূপ ক্ষেত্রে সাধ্য-সাধনের জন্য যেকোন হেতুর প্রয়োগই হইবে অপপ্রয়োগ। পক্ষে সাধ্যের সংশয়ের কাল চলিয়া যাওয়ার পরে প্রযুক্ত হওয়ায় ঐরূপ হেতু হইবে কালাত্যয়ে

১। ন্যায়সূত্র এবং বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ১।২।৯ দ্রষ্টব্য;

অপদিষ্ট, কাল-বিগমে প্রযুক্ত বা কালাতীত নামক হেত্বাভাস। ফল কথা, যথার্থ প্রত্যক্ষ এবং শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই আলোচ্য কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলিয়া জানিবে। অগ্নির উষ্ণতা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, এই অবস্থায় কেহ যদি "বহ্নিরনুষ্ণঃ" এই বলিয়া অগ্নির অনুষ্ণতার অনুমান করিতে যান, তবে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ ঐরূপ অনুমানে তিনি যে-কোন পদার্থকে হেতুরূপে উপন্যাস করুন না কেন, সেই হেতুই কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস হইতে বাধ্য।

ন্যায়োক্ত পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের পরিচয় দেওয়া গেল। বৈশেষিকের মতে হেত্বাভাস উক্ত পাঁচ প্রকার নহে; (ক) অপ্রসিদ্ধ, (খ) অসৎ বা বিরুদ্ধ এবং (গ) সন্দিগ্ধ—এই তিন প্রকার। যেই হেতুর কোনরূপ প্রসিদ্ধি নাই, তাহার নাম অপ্রসিদ্ধ হেতু। প্রসিদ্ধি শব্দের অর্থ এ-ক্ষেত্রে প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্তি, তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই, যেই হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অথবা ব্যাপ্তি থাকিলেও কোন কারণে সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় হয় না, সেইরূপ হেতুই অপ্রসিদ্ধ হেতু বা হেত্বাভাস বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অপ্রসিদ্ধ হেতুরই অপর নাম "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ"। যেই হেতু সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহাকে অসদ্ধেতু বলে। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ হেতু। সাধ্যের সহিত যে হেতুর ব্যাপ্তি নাই, সাধ্যের অভাবের সহিতই ব্যাপ্তি আছে, যেই হেতু পক্ষে বিদ্যমান থাকে না, তাহাই বিরুদ্ধ হেতু বা অসদ্ধেতু। যেই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির সন্দেহ হয়, যেই হেতু কখনও সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহমাত্রই উৎপাদন করে, তাহার নাম সন্দিগ্ধ হেতু বা হেত্বাভাস। এইরূপ সন্দিগ্ধ হেতুই ন্যায়ে অনৈকান্তিক নামে পরিচিত। যেই হেতু কেবল সাধ্যের সহিত অথবা কেবল সাধ্যাভাবের সহিতই সম্বদ্ধ, সেইরূপ হেতুই সাধ্য-সিদ্ধির অনুকূল "ঐকান্তিক" হেতু। যেই হেতু সাধ্য এবং সাধ্যাভাব এই উভয়ের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, সেই হেতুই অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। শৃঙ্গিত্বকে হেতু করিয়া গোত্বের অনুমান করিতে গেলে শৃঙ্গিত্ব-হেতু গরুতেও যেমন আছে, সেইরূপ মহিষ প্রভৃতিতেও আছে। সুতরাং শৃঙ্গিত্ব-হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো-শরীরে আছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ সাধ্য-গোত্বের অভাবের অধিকরণ মহিষ প্রভৃতিতেও

আছে বলিয়া সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় শৃঙ্গিত্ব হেতুকে "ঐকান্তিক" হেতু বলা চলিবে না, উহা হইবে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। শৃঙ্গিত্ব-হেতু গোত্বের নিশ্চায়ক হয় না, গোত্বের সন্দেহমাত্র জন্মায়। এইজন্য ঐরূপ হেতু সন্দিগ্ধ হেত্বাভাস বলিয়াও অভিহিত হয়।

উপরে যে হেত্বাভাস বা দূষিত হেতুর বিবরণ দেওয়া গেল তাহা ছাড়াও আর এক প্রকার হেতুর দোষ আছে, ঐ দোষকে বলে হেতুর উপাধি-দোষ। অনুমান-বিশেষজ্ঞ দার্শনিক আচার্য্যগণ অনুমানের হেতু ও সাধ্যের স্বাভাবিক বা অনৌপাধিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্যাপ্তিশ্চ উপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ। সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) স্বাভাবিক, (খ) ঔপাধিক। রক্তজবার সহিত রক্তিমার সম্পর্ক স্বাভাবিক। বড় একখানি আয়নার সম্মুখে রক্তজবা ধরিলে স্বচ্ছ শুভ্র আরসীতে যে রক্তিমা ফুটিয়া উঠে, ঐ রক্তিমা আয়নার স্বাভাবিক নহে, উহা ঔপাধিক। রক্তজবাই এখানে আরসীর উপাধি। "উপ" শব্দের অর্থ সমীপবর্ত্তী, কাছে থাকে বলিয়া নিকটস্থ অন্য কোনও পদার্থে যাহা নিজ ধর্ম্মের আধান বা আরোপ জন্মায়, তাহাকেই উপাধি বলে। ইহাই উপাধি শব্দের যৌগিক অর্থ।[১] রক্তজবা তাহার নিকটস্থ আরসীতে নিজ ধর্ম্ম রক্তিমার আরোপ জন্মায়, এইজন্য রক্তজবাকে এক্ষেত্রে উপাধি বলা হয়। ঔপাধিক বা আরোপিত অবাস্তব সম্বন্ধ-মূলে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয় করা চলে না। স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা নিয়ত-সম্বন্ধই অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ধূমে বহ্নির ঐরূপ অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, উহাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি; ঐরূপ ব্যাপ্তি-বলে ধূমকে হেতু করিয়া পর্ব্বত প্রভৃতিতে বহ্নির অনুমান করা হইয়া থাকে। যেই কল্পিত হেতুটি সাধ্য যেখানে নাই, সেখানেও (সাধ্যশূন্য স্থানেও) থাকে, তাহাতে সাধ্যের নিয়ত-সম্বন্ধ বা অনৌপাধিক সম্বন্ধ কোনমতেই থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐরূপ কল্পিত হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিও থাকে না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এইরূপে বহ্নিকে হেতুরূপে উপন্যাস

১। উপ সমীপবর্তিনি আদধাতি স্বংধর্ম্মমিত্যুপাধিঃ। উপাধিবাদের দীধিতি; সমীপবর্তিনি স্বভিন্নে আদধাতি সংক্রাময়তি, আরোপয়তীতি যাবৎ। উপাধিবাদের জগদীশ-কৃত টীকা;

করিয়া ধূমকে সাধ্য করিয়া অনুমান-বাক্যের প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, ঐরূপ অনুমানের হেতু যে বহ্নি তাহা ধূমশূন্য অর্থাৎ সাধ্যশূন্য স্থানে, উত্তপ্ত লৌহ-পিণ্ডেও বর্ত্তমান আছে। অতএব বহ্নির সহিত ধূমের যে সম্বন্ধ তাহা ধূমের সহিত বহ্নির সম্বন্ধের ন্যায় স্বাভাবিক বা অনৌপাধিক নহে, এই সম্বন্ধ ঔপাধিক। ভিজা-কাঠে আগুন ধরাইলেই সেখানে বহ্নি হইতে প্রচুর ধূমরাশি নির্গত হইতে দেখা যায়। অতএব বহ্নির সহিত ধূমের সম্পর্ক যে ভিজা-কাষ্ঠরূপ (আর্দ্রেন্ধনরূপ) উপাধিমূলক তাহা নিঃসন্দেহ। হেতুতে এইরূপ কোন উপাধি থাকিলেই সেই হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে অর্থাৎ সাধ্য যেখানে নাই, সেই সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকিবে, তাহা বুঝা যাইবে। ফলে, ঐরূপ দুষ্টহেতু-মূলে কোনরূপ নির্দোষ অনুমান করাই চলিবে না। এইজন্য অনুমানের মুখ্য সাধন ব্যাপ্তির সত্যতা পরীক্ষার জন্য উপাধির স্বরূপ পর্য্যালোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা সাধ্যের ব্যাপক হয় বটে, কিন্তু হেতুর ব্যাপক হয় না, তাহাকেই উপাধি বলা হয়—সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতুরব্যাপকস্তথা স উপাধির্ভবেৎ। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৮ কারিকা; যে পদার্থ সাধ্যের সর্ব্ববিধ আধারেই বর্ত্তমান থাকে, সাধ্যশূন্য কোন স্থানেই থাকে না, কিন্তু হেতুর সমস্ত আধারে অর্থাৎ হেতু যেই যেই স্থানে থাকে, সেই সেই স্থানেই থাকে না, এমন পদার্থকেই বলে "উপাধি"। যেই অনুমানে যাহাকে সাধ্য বলিয়া ধরা যায়, সেই সাধ্যের ব্যাপক উপাধি-ধর্ম্মটি যদি হেতুর ব্যাপক না হয়, অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপক ঐ উপাধিটিকে ছাড়িয়াও যদি হেতু থাকে, তবে ঐ হেতু যে সাধ্যকে ছাড়িয়াও থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যেই হেতু সাধ্যকে ছাড়িয়া থাকে, সেই হেতু সাধ্য-সাধন করিবে কিরূপে? ঐরূপ হেতুতো হেতুই নহে, উহা হেত্বাভাস। আলোচ্য উপাধি লক্ষণের দ্বারা ইহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উপাধি শব্দের যৌগিক অর্থ যাহা পাওয়া যায়, সেই যোগার্থ-অনুসারে অনুমানের উপাধির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এইরূপ অনুমানের প্রয়োগে ভিজা-কাঠকে যে উপাধি বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই, ভিজাকাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নি ধূমরূপ সাধ্যের ব্যাপক অবশ্যই হইবে; ভিজা-কাঠে আগুন ধরাইলে ধূম সেখানে থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু ভিজা-কাষ্ঠোৎপন্ন বহ্নিকে তো বহ্নিরূপ হেতুর ব্যাপক বলা চলিবে

না। ভিজা-কাষ্ঠের যোগ ব্যতীতও রক্তিম লৌহপিণ্ডে বহ্নিকে থাকিতে দেখা যায়। এই অবস্থায় "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অনুমানে বহ্নিরূপ হেতুকে ধূমরূপ সাধ্যের ব্যাপক করিতে হইলে, "বহ্নেঃ" এইরূপে বহ্নি-মাত্রের বোধক যে বহ্নিশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই বহ্নিকে "ভিজাকাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নি" এইভাবে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইবে; অর্থাৎ ভিজাকাষ্ঠ-সমুৎপন্ন বহ্নিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই "বহ্নেঃ" এইরূপ বহ্নিসামান্যের বোধক হেতুতে আরোপ করিতে হইবে। সাধারণ বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও ভিজাকাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নির সহিত ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারই "বহ্নেঃ" এই বহ্নিসামান্যে ভ্রম হয়; এবং ঐ ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তিমূলে ধূমের ভ্রান্ত অনুমিতি জন্মে। ভিজাকাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নি "বহ্নেঃ" এইরূপ বহ্নিমাত্রের বোধক হেতুতে স্বীয় ধর্ম্ম ধূম-ব্যাপ্তির আরোপ উৎপাদন করিয়া, জবাকুসুমের ন্যায়ই উপাধি আখ্যা লাভ করে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভিজা-কাষ্ঠকে কিন্তু উপাধি বলা চলে না। কেননা, যেই যেই স্থানে ভিজা-কাঠ থাকে, সেই সেই স্থানেই ধূম থাকে না। ঐ যে ভিজা-কাঠের গুড়িগুলি মাঠে পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে ধূম আছে কি? ভিজা-কাঠের সহিত ধূমের যে ব্যাপ্তি নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। ভিজা-কাঠের সহিত ধূমের ব্যাপ্তি না থাকায়, বহ্নিসামান্যের বোধক "বহ্নেঃ" এই বহ্নিরূপ হেতুতে সেই ব্যাপ্তির আরোপ করাও চলে না। যাহা ধূমরূপ সাধ্যের সহিত সমব্যাপ্ত সেই ভিজাকাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নিকেই উপাধির মর্য্যাদা দিতে হইবে, শুধু ভিজা-কাঠকে নহে। সাধ্যের যাহা সমব্যাপ্ত, অর্থাৎ যাহা সাধ্যের ব্যাপকও বটে, ব্যাপ্যও বটে, এইরূপ পদার্থই যে "উপাধি" হইবে, তাহা আচার্য্য উদয়ন তাঁহার কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ববিবেকে উদয়নাচার্য্য উপাধির বিশ্লেষণে উপাধিকে সাধ্যের সাধক (সাধ্য-প্রযোজক) হেত্বন্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপাধি-পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে, তাহাকে কোনমতেই সাধ্যের সাধক হেতু বলা যায় না। সুতরাং উদয়নাচার্য্যের মতে উপাধি পদার্থ যে সাধ্যের সমব্যাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? নব্যন্যায়গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তত্ত্বচিন্তামণিতে আচার্য্য উদয়নের অভিমত যুক্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যায়

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নব্য ন্যায়াচার্য্যগণ বলিয়াছেন, উপাধিশব্দের যোগার্থমাত্র গ্রহণ করিলে অনেক ক্ষেত্রে উপাধির নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং উপাধি শব্দটির রূঢ়ি অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তি-যুক্ত। যাহা সাধ্যের ব্যাপক হয় বটে, কিন্তু হেতুর ব্যাপক হয় না, তাহাই উপাধি শব্দের রূঢ়ি অর্থ। এইরূপ রূঢ়ার্থও অবশ্য সম্পূর্ণ যোগার্থ-বর্জ্জিত নহে। অতএব উপাধিশব্দটি এক্ষেত্রে "যোগরূঢ়" এইরূপ বলাই নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ প্রভৃতির অভিমত বুঝা যায়। উপাধি-পদার্থকে যেমন সাধ্যের ব্যাপক হইতে হইবে, সেইরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যও হইতে হইবে, কেবল সাধ্যের ব্যাপক হইলেই চলিবে না। যদি সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্য না হইলেও তাহাকে উপাধি বলা যায়, তাহা হইলে অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইয়া দাঁড়ায়। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে পর্ব্বতকে পক্ষ বলা হইয়াছে। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের পূর্ব্বে পর্ব্বতে বহ্নির সিদ্ধি নাই, সুতরাং পর্ব্বতকে বহ্নিময় বলিয়া তখন কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না। পর্ব্বত বহ্নিময় না হইলে, পাকশালা প্রভৃতি যে সকল স্থানে বহ্নি নিশ্চিতই আছে, সেই সকল বহ্নিযুক্ত স্থানমাত্রেই পক্ষ-পর্ব্বতের ভেদ থাকায়, পর্ব্বতের ভেদ যে বহ্নিরূপ সাধ্যের ব্যাপক হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের পূর্ব্বেই ধূমরূপ হেতুটি পর্ব্বতে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হওয়ায়, পর্ব্বতকে ধূমময় বলিয়া মানিতেই হইবে। ধূমময় পর্ব্বতে পর্ব্বতের ভেদ না থাকায়, পর্ব্বতের ভেদ ধূমরূপ হেতুর অব্যাপক হইতে বাধ্য। এখন সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর যাহা অব্যাপক হয় তাহাকেই উপাধি বলিলে, পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান-স্থলে পর্ব্বতের ভেদ (পক্ষের ভেদ) সাধ্য বহ্নির ব্যাপক এবং ধূমরূপ হেতুর অব্যাপক হওয়ায়, উপাধি-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া উপাধিই হইবে। এইরূপে অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইয়া পড়ায়, সকল অনুমানই উপাধি-দুষ্ট হইবে। ফলে, অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় অনুমানের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্য বলিতেই হইবে যে, উপাধি-পদার্থটি যেমন সাধ্যের ব্যাপক হইবে, সেইরূপ উহা সাধ্যের ব্যাপ্যও হইবে, নচেৎ তাহা উপাধিই হইবে না। আলোচ্য স্থলে পর্ব্বত-রূপ পক্ষের ভেদ সাধ্য বহ্নির ব্যাপক হইলেও, বহ্নির উহা ব্যাপ্য হয় নাই। কেননা, যেখানে যেখানে পর্ব্বতের

ভেদ আছে সেই সকল পর্ব্বতভিন্ন স্থানে বহ্নি থাকিলেই, পর্ব্বতের ভেদকে বহ্নির ব্যাপ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতো নাই, জলহ্রদে পর্ব্বতের ভেদ আছে সত্য, কিন্তু সেখানে তো বহ্নি নাই, বহ্নির অভাবই নিশ্চিতরূপে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে পর্ব্বতের ভেদকে (পক্ষের ভেদকে) পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে সাধ্য-বহ্নির ব্যাপক বলা চলিলেও, ব্যাপ্য বলা চলে না। পর্ব্বতের ভেদ সুতরাং উপাধি-লক্ষণাক্রান্তও হয় না। অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ সাধ্যের ব্যাপ্য না হওয়ায় উপাধি হইবে না; অনুমানের উচ্ছেদেরও কোনরূপ আশঙ্কা ঘটিবে না। মোট কথা, যাহা সাধ্যের ব্যাপ্যও হইবে, ব্যাপকও হইবে এবং হেতুর অব্যাপক হইবে, এমন পদার্থই হইবে উপাধি। আচার্য্য উদয়ন উপাধিকে সাধ্যের সমব্যাপ্ত বলিয়া এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ,' এইরূপ বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমানে যেই যেই স্থানে ভিজা-কাঠ থাকে, সেই সেই স্থানেই ধূম না থাকায়, ভিজা-কাঠ (আর্দ্র-ইন্ধন) উপাধি হইবে না, ভিজাকাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নিই সাধ্যের সমব্যাপ্ত বলিয়া উপাধি হইবে। উদয়নাচার্য্যের এইমত পরবর্ত্তীকালে গঙ্গেশ উপাধ্যায় তদীয় তত্ত্বচিন্তা-মণির উপাধিবাদে প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। উপাধির ব্যাখ্যায় গঙ্গেশ বলিয়াছেন, যে-পদার্থ বাদীর কথিত হেতুর ব্যভিচারী হয়, এবং স্বীয় ব্যভিচারিতা দ্বারা বাদীর প্রদর্শিত হেতুতে সাধ্যের ব্যভি-চারের অনুমাপক হইয়া থাকে, সেই পদার্থই উপাধি বলিয়া কথিত হয়। উপাধি-পদার্থটি বাদীর অভিপ্রেত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমান উৎপাদন করতঃ ঐ হেতুকে দুষ্ট হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এইজন্যই উপাধি-পদার্থকে হেতুর দূষক বলে এবং উহাই তাহার দূষকতার বীজ। এই দূষকতা বীজ থাকিলেই তাহা উপাধি হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থে পূর্ব্বোক্ত দূষকতা বীজ আছে বলিয়াই, তাহাকে অনুমানের দূষক উপাধি বলা হইয়া থাকে। এখন কথা এই যে, প্রদর্শিত দূষকতা বীজকে অবলম্বন করিয়াই যদি উপাধি-লক্ষণের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, তবে বহ্নিকে হেতু করিয়া যেখানে ধূমের অনুমান করা হইয়া থাকে (ধূমবান্ বহ্নেঃ) সেক্ষেত্রে ভিজা-কাঠকেও উপাধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কেননা, ভিজা-কাঠ (আর্দ্র-ইন্ধন) যেখানে নাই, এইরূপ তপ্ত

লৌহপিণ্ড প্রভৃতিতেও বহ্নি থাকে বলিয়া, বাদীর অভিমত হেতু "বহ্নি" যে আর্দ্র-ইন্ধনের ব্যভিচারী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। তারপর, আর্দ্র-ইন্ধন ধূমময় স্থানমাত্রেই থাকে বলিয়া, উহা ধূমের ব্যাপক পদার্থও বটে। ধূমই এই স্থলে বাদীর অভিপ্রেত সাধ্য। এখন বহ্নি-পদার্থকে (ধূমবান্ বহ্নেঃ এই অনুমানের হেতুকে) যদি ধূমের ব্যাপক আর্দ্র-ইন্ধনের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়, তবে বহ্নি-পদার্থকে ধূমরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী বলিয়াও ধরা যায়। কারণ, যাহা ধূমের ব্যাপক-পদার্থের ব্যভিচারী হইবে, তাহা অবশ্যই ধূমেরও ব্যভিচারী হইবে। ধূমযুক্ত-স্থানমাত্রেই যেই আর্দ্র-ইন্ধন থাকে, সেই আর্দ্র-ইন্ধনশূন্য স্থানে বহ্নি থাকিলে, তাহা ধূমশূন্য স্থানেও থাকিবে; এবং আর্দ্র-ইন্ধনশূন্য স্থানকেই ধূমশূন্য স্থানরূপেও গ্রহণ করা চলিবে। ফলে, আর্দ্র-ইন্ধন-পদার্থও স্বীয় ব্যভিচারিতা দ্বারা বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচারের অনুমাপক হওয়ায়, তাহাতেও উপাধির পূর্ব্বোক্ত দূষকতা-বীজ বর্ত্তমান আছে বলিয়া, আর্দ্র-ইন্ধনও উপাধি হইবে। উপাধিকে উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "সাধ্যের সমব্যাপ্ত" বলা কোনমতেই চলিবে না। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উপাধি হইলে, যেই যেই স্থলে আর্দ্র-ইন্ধন থাকে সেই সেই স্থানেই ধূম না থাকায়, আর্দ্র-ইন্ধনকে সাধ্য ধূমের সমব্যাপ্ত বলা যাইবে না। উপাধিও সুতরাং বলা চলিবে না। ধূমরূপ সাধ্যের সমব্যাপ্ত আর্দ্র-ইন্ধন-সঞ্জাত বহ্নিই সেক্ষেত্রে উপাধি হইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে আর্দ্র-ইন্ধনেও যখন উপাধির দূষকতা-বীজ বর্ত্তমান আছে, তখন সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত আর্দ্র-ইন্ধনকেও উপাধির লক্ষ্যই বলিতে হইবে। ভিজা-কাষ্ঠও (আর্দ্র-ইন্ধনও) যখন বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচারের অনুমাপক হইয়া অনুমানের দূষক হয়, তখন তাহাকে উপাধি না বলিবার কোন যুক্তি নাই। উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষেই বরং যুক্তি রহিয়াছে। এই অবস্থায় সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উপাধি হইবে, বিষমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করার অনুকূলে কোন যুক্তি দেখা যায় না। ইহাই গঙ্গেশের উপাধি-ব্যাখ্যার রহস্য।

আচার্য্য উদয়ন এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ঐরূপ বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান তাঁহার কুসুমাঞ্জলি-প্রকাশে বলিয়াছেন যে, সাধ্যের সমব্যাপ্ত অর্থাৎ যাহা সাধ্যের ব্যাপকও

বটে, ব্যাপ্যও বটে, এইরূপ পদার্থই মুখ্য উপাধি। সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থ উক্ত বুৎপত্তি অনুসারে উপাধি-শব্দবাচ্য না হইলেও, তাহাও সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক হওয়ায়, মুখ্য উপাধির ন্যায়ই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমাপক হইয়া হেতুকে দূষিত করে। এইজন্য উপাধির সদৃশ বলিয়া তাহাকেও (সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থকেও) উপাধি আখ্যা দেওয়া হয়। উপাধি শব্দের ইহা গৌণ অর্থ। বর্দ্ধমানের ব্যাখ্যানুসারে উদয়নাচার্য্য সাধ্যের সমব্যাপ্তের ন্যায় সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থকেও যে উপাধি বলিতেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এইরূপ বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমান-স্থলে আর্দ্র-ইন্ধনকে (ভিজা কাষ্ঠকে) উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিও বিষমব্যাপ্ত পদার্থও যে উপাধি হইবে, এবিষয়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সহিত একই মত পোষণ করেন। এই সকল বিচার করিলে উপাধিশব্দের বর্দ্ধমানোক্ত গৌণ-মুখ্যভেদ-প্রদর্শন এবং বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য উপপাদন অতিশয় শোভন বলিয়াই মনে হয়।

উপাধির দুই প্রকার বিভাগ

আলোচিত উপাধি দুই প্রকার, (ক) নিশ্চিত এবং (খ) সন্দিগ্ধ। যে উপাধিটি সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক ইহা সুনিশ্চিত, তাহাই "নিশ্চিত-উপাধি"। দৃষ্টান্তস্বরূপে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এইরূপে বহ্নিকে হেতু করিয়া ধূমের যে অনুমান করা হয়, ঐ অনুমানে ভিজা-কাঠকে (আর্দ্র-ইন্ধনকে) কিংবা ভিজা-কাষ্ঠ-সঞ্জাত বহ্নিকে নিশ্চিত-উপাধি বলা যায়। যেই উপাধির সাধ্যের ব্যাপকতা, হেতুর অব্যাপকতা, অথবা ঐ উভয়ই সন্দেহের বিষয়, তাহাই "সন্দিগ্ধ-উপাধি" বলিয়া জানিবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ন্যায়াচার্য্যগণ সন্দিগ্ধ-উপাধির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, স শ্যামো মিত্রা-তনয়ত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে মিত্রা-তনয়ত্বকে হেতু করিয়া মিত্রা নামে পরিচিত মহিলাটির গর্ভস্থ পুত্রের শ্যামত্বের অনুমান করিতে গেলে, সে-ক্ষেত্রে "শাক-পাকজন্যত্ব" সন্দিগ্ধ-উপাধি হইয়া দাঁড়াইবে। সন্দিগ্ধ-উপাধির উল্লিখিত দৃষ্টান্তের আসল কথাটা এই যে, মিত্রা নামে একটি স্ত্রীলোক ছিল। তাঁহার সবগুলি সন্তানই শ্যাম বর্ণের হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মিত্রার গর্ভস্থ সন্তানও শ্যাম বর্ণেরই হইবে, এইরূপ যদি

কেহ অনুমান করেন, তবে ঐরূপ অনুমানের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদ-কারী বলিতে পারেন যে, মিত্রার সমস্ত পুত্রই যে শ্যামবর্ণ হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ, সন্তান গর্ভস্থ থাকা কালে প্রসূতি যদি অধিক মাত্রায় শাক ভোজন করেন, তবে শ্যামল শাকের রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানও শ্যামবর্ণ হইতে পারে, ইহা চিকিৎসাশাস্ত্র-পাঠে জানা যায়।[১] মিত্রার পূর্ব্বজাত সন্তানগুলি তাঁহার গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত শাক-সব্জী ভোজনের ফলেই যে শ্যামবর্ণ হয় নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তারপর, যদি অতিরিক্ত শাক-সব্জী ভোজনের ফলেই মিত্রার পূর্ব্বজাত সন্তানগুলি শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে, তবে মিত্রার পুত্র বলিয়াই যে সেই পুত্র শ্যামবর্ণ হইবে, ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। কেননা, অতিরিক্ত মাত্রায় শাক ভোজন না করিলে মিত্রার পুত্র গৌরবর্ণও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মিত্রা-তনয়ত্ব হেতুটি শ্যামত্বের অনুমানে প্রকৃতপক্ষে হেতুই হয় না। ঐ হেতুতে পাকশাক-জন্যত্ব সন্দিগ্ধ-উপাধি হইয়া দাঁড়ায়। আলোচিত অনুমানে মিত্রা-তনয়ত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে, আর, শ্যামত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে। মিত্রার শ্যামবর্ণ পুত্রগণ মিত্রার অতিরিক্ত শাক ভোজনের ফল কি না, ইহাও সন্দিগ্ধ; ফলে, শাক-পরিপাকজন্যত্বরূপ উপাধিটিও এইরূপ স্থলে সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহাও সন্দিগ্ধ। তারপর এখানে শাক-পরিপাকজন্যত্বরূপ উপাধিটি (মিত্রা-তনয়ত্বাৎ এইরূপ) মিত্রা-তনয়ত্বরূপ হেতুর অব্যাপক কি না, তাহাও সন্দিগ্ধ। কারণ, মিত্রার সবগুলি পুত্রই যদি তাঁহার অতিরিক্ত শাক ভোজনের ফলেই শ্যামবর্ণ হইয়া জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে শাক-পরিপাকজন্যত্বরূপ উপাধিটি সেক্ষেত্রে মিত্রা-তনয়ত্বের ব্যাপকই হইয়া দাঁড়াইবে, অব্যাপক হইবে না। মিত্রার শ্যামবর্ণ পুত্রগুলি শাক ভোজনের ফলেই শ্যামবর্ণ হইয়াছে কি না, ইহাই যখন সন্দিগ্ধ, তখন

১। সুশ্রুত-সংহিতার শারীর-স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেহের শ্যামতার কারণ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, যাদৃগ্‌বর্ণমাহারমুপসেবতে গর্ভিণী তাদৃগ্‌বর্ণ-প্রসবা ভবতীত্যেকে ভাষন্তে। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত মনে করেন, গর্ভিণী যেরূপ বর্ণের আহার গ্রহণ করেন, সেইরূপ বর্ণের সন্তান প্রসব করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গর্ভাবস্থায় শ্যামলবর্ণ শাক অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিলে গর্ভস্থ সন্তানও শ্যামল বর্ণের হইতে পারে।

ঐ শাক-পরিপাকজন্যত্বরূপ উপাধিটি মিত্রা-তনত্বরূপ হেতুর ব্যাপক কি অব্যাপক, তাহাও সন্দিগ্ধই হইবে; এবং উক্তরূপ সংশয়বশতঃ আলোচিত অনুমানে শাক-পরিপাকজন্যত্ব যে সন্দিগ্ধ-উপাধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

নিশ্চিত-উপাধি হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী, অর্থাৎ সাধ্যকে ছাড়িয়াও যে হেতু থাকিতে পারে, ইহা নিশ্চিতভাবে জানাইয়া দেয়। এইজন্যই এইরূপ উপাধিকে নিশ্চিত-উপাধি বলা হয়। সন্দিগ্ধ-উপাধি হেতুতে সাধ্যের যে ব্যভিচার আছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝাইয়া দেয় না বটে, তবে হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইতে পারে, এইরূপ সংশয় জাগাইয়া তোলে বলিয়াই ইহাকে সন্দিগ্ধ-উপাধি বলে। সন্দিগ্ধ-উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের সংশয় কিভাবে উৎপাদন করিয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে দীধিতি রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি বলেন যে, ব্যাপ্য-পদার্থের সংশয় থাকিলে, ব্যাপক-পদার্থের সংশয়ও সেখানে অবশ্যই থাকিবে। এইজন্য ব্যাপ্য-পদার্থের সংশয়কে ব্যাপক-পদার্থের সংশয়ের কারণরূপেও ধরা যাইবে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, আর বহ্নি ধূমের ব্যাপক। যে-ক্ষেত্রে বহ্নি বা তাহার অভাব নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, সেইরূপ ক্ষেত্রে পর্ব্বত প্রভৃতি আধারে ধূমের সংশয় হইলে বহ্নির সংশয়ও অনিবার্য্য। যদিও ধূম না থাকিলেও স্থলবিশেষে বহ্নি থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বহ্নি যখন দেখা যাইতেছে না, বহ্নিলিঙ্গ, বহ্নির অনুমাপক ধূমও যেখানে সন্দিগ্ধ, সেখানে বহ্নি আছে কিনা, এইরূপ সংশয় অবশ্যম্ভাবী। এখন কথা হইতেছে এই যে, ব্যাপ্যের সংশয় ব্যাপকের সংশয়ের কারণ ইহা সুস্থির হইলে, যে-ক্ষেত্রে উপাধি-পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপক ইহা নিশ্চিত, কিন্তু উহা হেতুর অব্যাপক কিনা, ইহা সন্দিগ্ধ, সেই ক্ষেত্রে উপাধি-পদার্থে হেতুর অব্যাপকতার সংশয় দেখা দিলে, হেতুতেও সাধ্যের ব্যাপক উপাধি-পদার্থের ব্যভিচারের সংশয় অবশ্যই দেখা দিবে। কেননা, উপাধি-বস্তুটি হেতুর অব্যাপক হইলে, হেতু-পদার্থটি যে উপাধি-পদার্থের ব্যভিচারী হইবে, তাহাতে সুধী-মাত্রেরই কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। এই অবস্থায় উপাধি-বস্তুটি হেতুর অব্যাপক কি না, এইরূপ সংশয় হইলে, হেতু-পদার্থটি উপাধির ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সংশয়ও অবশ্যই জন্মিবে। উপাধিটি সর্ব্বত্রই সাধ্যের ব্যপক হইয়া থাকে। সাধ্য-ব্যাপক ঐ উপাধি-পদার্থের ব্যভিচারের

সংশয় হইলে, তাহার ফলে হেতুতেও সাধ্যের ব্যভিচারের সংশয় আসিয়া দাঁড়াইবে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক-পদার্থের ব্যভিচার যেই পদার্থে থাকে, সেই পদার্থে সাধ্যের ব্যভিচারও নিশ্চয়ই থাকিবে। সাধ্যের ব্যাপক-পদার্থের ব্যভিচার সাধ্যের ব্যভিচারের ব্যাপ্য-পদার্থ। ব্যাপ্য-পদার্থের সংশয় যে ব্যাপক-পদার্থের সংশয়ের কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এখন ঐ সাধ্যের ব্যভিচাররূপ ব্যাপ্য-পদার্থের সংশয় জন্মিলে, ঐরূপ সংশয়মূলে সাধ্যের ব্যাপক উপাধি-পদার্থের সংশয়ও অনিবার্য্য। এইরূপ যেখানে উপাধিটি হেতুর ব্যাপক নহে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দিগ্ধ, সেখানে অর্থাৎ ঐ প্রকার সন্দিগ্ধ-উপাধির স্থলে হেতুর অব্যাপক সেই উপাধির সাধ্য-পদার্থে ব্যাপ্যত্বের সংশয়ও অবশ্যই জন্মিবে। কারণ, উপাধি-বস্তুটি হয় সাধ্যের ব্যাপক, আর সাধ্যটি হয় সেই উপাধির ব্যাপ্য। এই অবস্থায় উপাধি-বস্তুটিই সাধ্যের ব্যাপক কি না, এই প্রকার সংশয় আসিলে, সেক্ষেত্রে সাধ্যটি সেই উপাধির ব্যাপ্য কিনা, এইরূপ সন্দেহও অবশ্যম্ভাবী। ফলে, হেতুটি সাধ্যের ব্যাপক কি না, এই প্রকার সংশয়ও আসিয়া পড়িবে। কেননা, যে যে পদার্থ হেতুর অব্যাপক-পদার্থের ব্যাপ্য, তাহারা সমস্তই হেতুর অব্যাপক-পদার্থ হইয়া থাকে। আলোচিত সাধ্য-পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্বের সংশয়ও ব্যাপ্য-পদার্থের সংশয়জন্য ব্যাপক-পদার্থেরই সংশয়। এই প্রকার সংশয়-স্থলে হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য কি না, এইরূপ (হেতুতে সাধ্যের বাপ্যতার) সন্দেহও জন্মিতে বাধ্য। সন্দিগ্ধ-উপাধির উল্লিখিত দৃষ্টান্তে (স শ্যামো মিত্রা-তনয়ত্বাৎ এই স্থলে) মিত্রা-তনয়ত্বরূপ হেতুতে আলোচিত রীতিতে সাধ্য-শ্যামত্বের ব্যভিচারের সংশয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই, এই স্থলটি সন্দিগ্ধ-উপাধির দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িক-মতানুসারে হেত্বাভাসের এবং উপাধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। এই সকল বিষয়ে নব্যনৈয়ায়িকগণ অতিসূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ পাঠ না করিলে ঐ সকল গভীর বিচার এবং তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয় না। এজন্য আমরা জিজ্ঞাসু পাঠককে আকরগ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হেত্বাভাস এবং উপাধি-পদার্থটি কি তাহা না বুঝিলে, কোন্‌টি প্রকৃত হেতু, কোন্‌টি হেতু নহে, এবং হেতু-পদার্থে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে কি না, তাহা

নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। এইজন্য অনুমান-রহস্য বুঝিতে হইলেই হেত্বাভাসের এবং উপাধির বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। অতএব অনুমান-প্রমাণের বিবরণ-প্রসঙ্গে ঐ সকলের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বৃথা বাগ্‌জাল নহে। সকল দার্শনিকই অনুমানের স্বরূপ-বিচারে হেত্বাভাস প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতি গ্রন্থে ও রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রবীণ আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধি, তত্ত্বমুক্তাকলাপ প্রভৃতি গ্রন্থে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-বিশেষজ্ঞ আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তদীয় পরপক্ষগিরিবজ্রে নানারূপ হেত্বাভাস বা হেতু-দোষের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে ঐ সকল আচার্য্যগণের আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হেত্বাভাস-সম্বন্ধে মাধবমুকুন্দের মত

হেত্বাভাস কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে বলিয়াছেন, যাহা আপাতদৃষ্টিতে হেতু বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত হেতুর লক্ষণ যাহাতে নাই; সুতরাং যাহা অনুমানের সাধকতো নহেই, বাধকই বটে, তাহাই "হেত্বাভাস" বলিয়া জানিবে।[১] এইরূপে হেত্বাভাসের পরিচয় প্রদান করিয়া মাধবমুকুন্দ নৈয়ায়িক-মতের প্রতিধ্বনি করিয়া অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, অনৈকান্তিক, প্রকরণসম এবং কালাত্যয়াপদিষ্ট, এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। মাধবোক্ত হেত্বাভাসের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায় যেই দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের (ক) আশ্রয়াসিদ্ধ, (খ) স্বরূপাসিদ্ধ এবং (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, এই তিন প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, মাধবমুকুন্দও সেই ন্যায়-বৈশেষিক-প্রদর্শিত রীতির অনুবর্ত্তন করিয়াই ন্যায়োক্ত নামানুসারে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের ত্রিবিধ বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।[২]

১। অনুমিতিবাধকো হেতু র্হেত্বাভাসঃ, হেতুলক্ষণরহিতত্বে সতি হেতুবদ্-ভাসমানত্বং তত্ত্বম্ (হেত্বাভাসত্বম্)। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৪-২১৫ পৃষ্ঠা;

২। আশ্রয়াসিদ্ধাদ্যন্যতমত্বমসিদ্ধত্বং স ত্রিবিধঃ আশ্রয়াসিদ্ধঃ স্বরূপাসিদ্ধো-ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধশ্চ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৫ পৃষ্ঠা;

ন্যায়মতে দেখুন :—

আশ্রয়াসিদ্ধ্যাদ্যন্যতমত্বমসিদ্ধত্বম্। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ৭২ কারিকা;

আশ্রয়াসিদ্ধিরাদ্যাস্যাৎ স্বরূপাসিদ্ধিরপ্যথ।
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা স্যাদসিদ্ধিরতস্ত্রিধা॥

ভাষাপরিচ্ছেদ, ৭৫ কারিকা;

আশ্রয়াসিদ্ধ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় নৈয়ায়িকও যাহা বলিয়াছেন এবং যে-প্রকার দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন, মাধবমুকুন্দও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন, নূতন কিছুই বলেন নাই। যেই অনুমানের যাহা সাধ্য বা প্রতিপাদ্য সেই সাধ্যের (প্রতিপাদ্যের) আধার বা আশ্রয়কে নব্যন্যায়ের পরিভাষায় পক্ষ বলা হয়। ঐ পক্ষই যেই অনুমানের প্রসিদ্ধ নহে, কিংবা পক্ষের বিশেষণরূপে যেই ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেই (পক্ষতাবচ্ছেদক) ধর্ম্মেরই যদি পক্ষে অভাব থাকে, তবে সেখানে "পক্ষাসিদ্ধ" বা "আশ্রয়াসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[১] যদি বলা যায়, আকাশ-পদ্মটি সুগন্ধি, যেহেতু ইহাও সরোবরস্থিত পদ্মের ন্যায় পদ্মই বটে—গগনারবিন্দং সুরভি, অরবিন্দত্বাৎ সরোজারবিন্দবৎ; কিংবা যদি বলা হয় যে, সোনার পর্ব্বতটি বহ্নিময়—কাঞ্চনময় পর্ব্বতো বহ্নিমান্, তাহা হইলে ঐসকল অনুমানের পক্ষের স্বরূপ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, আকাশে কমল ফোটে না, সোনার পর্ব্বতও কোথায়ও দেখা যায় না। এই অবস্থায় প্রথম অনুমানে আকাশকে যে পদ্মের বিশেষণরূপে (পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে) বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাও যেমন অসম্ভব বর্ণনা; সেইরূপ দ্বিতীয় অনুমানের প্রয়োগে অনুমানের পক্ষ পর্ব্বতকে যে সুবর্ণময় বলা হইয়াছে, তাহাও একেবারেই অসম্ভব কল্পনা। ফলে, উক্ত অনুমান দুইটির কোনটিরই পক্ষ প্রসিদ্ধ নহে, অসিদ্ধ। ঐরূপ অসিদ্ধ পক্ষে সাধ্য-সিদ্ধির জন্য যেই হেতুর উপন্যাস করা হইবে, সেই হেতুই "পক্ষাসিদ্ধ" বা "আশ্রয়াসিদ্ধ" হেত্বাভাস বলিয়া জানিবে। যেই হেতুর বলে পক্ষে সাধ্য-সাধন করা হইয়া থাকে, সেই হেতুই যদি পক্ষে (সাধ্যের আধারে) না থাকে, তবে ঐরূপ হেতু "স্বরূপাসিদ্ধ" হেত্বাভাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি কেহ অনুমান করেন যে, জলে রস আছে, যেহেতু গন্ধ আছে,—জলং রসবৎ গন্ধবত্ত্বাৎ; কিংবা যদি বলেন যে, জলহ্রদে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম আছে—হ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। জলে গন্ধ থাকে না, (গন্ধ কেবল

আশ্রয়াসিদ্ধ

স্বরূপাসিদ্ধ

১। পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকাভাব আশ্রয়াসিদ্ধত্বম্।

পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৫ পৃষ্ঠা;

আশ্রয়াসিদ্ধিঃ পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকস্যাভাবঃ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ৭২ কারিকা;

পৃথিবীতেই থাকে, পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোথায়ও থাকে না) জলহ্রদেও ধূম থাকে না। এরূপক্ষেত্রে উল্লিখিত অনুমানে প্রযুক্ত হেতু "স্বরূপাসিদ্ধ" হেত্বাভাস হইবে। অনুমানের প্রয়োগে হেতুর অস্তিত্ব পক্ষে সন্দিগ্ধ হইলেও তাহা স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলিয়াই জানিবে। ঐরূপ হেত্বাভাসকে বলা হয় "সন্দিগ্ধ স্বরূপাসিদ্ধ"। আলোচ্য স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস-স্থলে পক্ষে হেতু না থাকায়, কিংবা হেতুটি পক্ষে সন্দিগ্ধ হওয়ায়, অনুমানের মূল যে পরামর্শ (অর্থাৎ পক্ষঃ সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্, পক্ষটি সাধ্যের ব্যাপ্য যে হেতু সেই হেতুযুক্ত, এইরূপ জ্ঞান) তাহাই জন্মিতে পারে না। ফলে, অনুমানও হইতে পারে না।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ

যেই অনুমানের সাধ্য অথবা হেতুই অপ্রসিদ্ধ ; কিংবা সাধ্যের অথবা হেতুর অংশে যেই বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, ঐ প্রকার বিশেষণ সাধ্যে, বা হেতুতে বিদ্যমান নাই, বা থাকে না, সেই শ্রেণীর অনুমানের প্রয়োগেই "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ" হেত্বাভাস হইতে দেখা যায়। যেমন পর্ব্বতে স্বর্ণময় বহ্নির অনুমান করিলে (পর্ব্বতঃ স্বর্ণময়-বহ্নিমান্) স্বর্ণময় বিশেষণটি সাধ্য বহ্নিতে না থাকায়, ঐরূপ অনুমানের সাধক যে কোন হেতুই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইবে। তারপর পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিতে গিয়া যদি সুবর্ণময় ধূমকে হেতুরূপে উপন্যাস করা হয়— পর্ব্বতো বহ্নিমান্ সুবর্ণময়-ধূমাৎ। তবে সুবর্ণময় ধূম অসম্ভব-বিধায় ঐরূপ হেতুও হইবে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস। সাধ্যের অংশে প্রযুক্ত বিশেষণের (সাধ্যতাবচ্ছেদকের) অভাব এবং হেতুর বিশেষণের (হেতুতাবচ্ছেদকের) অভাব যথাক্রমে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, সাধনাপ্রসিদ্ধি নামেও অভিহিত হয়। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, সাধনাপ্রসিদ্ধি প্রভৃতি আলোচ্য "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি অনুমিতির কারণ পরামর্শের, এবং সাধনাপ্রসিদ্ধি অনুমানের হেতু ব্যাপ্তি-জ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই উহা দোষ বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই হইল ন্যায়োক্ত অসিদ্ধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্র নামক গ্রন্থে "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ" হেত্বাভাসের যে-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, তিনিও সাধ্য এবং হেতুর অসিদ্ধিকেই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। তাঁহার মতে দুইপ্রকারের ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্যাপ্তিগ্রাহক-প্রমাণবিধুরএকঃ, সোপাধিকোদ্বিতীয়ঃ।

পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৫ পৃষ্ঠা; প্রথমতঃ, ব্যাপ্তির গ্রাহক উপযুক্ত প্রমাণের অভাব বশতঃ যদি ব্যাপ্তির জ্ঞানোদয় না হয়; দ্বিতীয়তঃ, হেতুর যদি কোন প্রকার উপাধি-দোষ থাকে তাহা হইলে ঐ দুই ক্ষেত্রেই হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হিসাবে মাধবমুকুন্দ বলেন, যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, সত্ত্বাৎ ঘটবৎ; সৎ বা সত্য বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, যেমন ঘট। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের ঐ অনুমানে সত্য বস্তুমাত্রই ক্ষণিক এইরূপ বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তির গ্রাহক প্রবলতর কোন প্রমাণ না থাকায়, উল্লিখিত বৌদ্ধানুমান ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস-দুষ্টই হইবে।

উপাধি কাহাকে বলে? উপাধি কিভাবে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমাপক হইয়া হেতুকে দূষিত করে, উপাধি-সম্পর্কে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা পূর্ব্বেই ন্যায়োক্ত উপাধির ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। নৈয়ায়িক শঙ্কিত এবং সমারোপিত বা নিশ্চিত, এই দুই প্রকার উপাধির বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তের প্রমাণ-রহস্যের ব্যাখ্যাতা আচার্য্য বেঙ্কটনাথও সাধনের অব্যাপক, সাধ্যের সহিত সমব্যাপ্ত, সাধনের ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্মকেই উপাধি বলিয়া নিরূপণ করিয়া উপাধির শঙ্কিত এবং নিশ্চিত, এই ন্যায়োক্ত দুই প্রকার বিভাগেরই অনুমোদন করিয়াছেন।[১] মাধবমুকুন্দের পরপক্ষগিরিবজ্রে আমরা দেখিতে পাই যে, মাধবমুকুন্দ উপাধিকে নিম্নলিখিত চার ভাগে বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন—(ক) কেবলসাধ্যব্যাপক; (খ) পক্ষধর্ম্মতাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক; *(গ) সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক, (ঘ) উদাসীন-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক।* সাধ্যের ব্যাপক হইয়াও যাহা সাধনের অব্যাপক হইয়া থাকে, তাহাইতো উপাধি বটে। ঐ উপাধি যখন কেবল সাধ্যেরই ব্যাপক হয়, যেমন "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এইরূপ বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমানে ভিজা-কাষ্ঠের সংযোগকে (আর্দ্রেন্ধন-সংযোগকে) যে উপাধি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ঐ উপাধিটি এক্ষেত্রে কেবল ধূমরূপ সাধ্যেরই ব্যাপক হওয়ায়, ঐরূপ উপাধিকে অনায়াসেই "কেবলসাধ্যব্যাপক" উপাধি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মাধবোক্ত "বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাৎ", এইরূপ

মাধবমুকুন্দের মতে উপাধির ব্যাখ্যা

১। সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তঃ সাধনধর্মব্যতিরিক্তো ধর্ম উপাধিঃ। সদ্বিধা নিশ্চিতঃ শঙ্কিতশ্চ। বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১০৮—১১০ পৃষ্ঠা;

অনুমানে কিংবা মাধ্বোক্ত "বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ", এই অনুমানে উদ্‌ভূতরূপ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূলরূপকে যে উপাধি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, সেখানে দেখা যায় যে, গুণ প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অথচ গুণ প্রভৃতির উদ্‌ভূতরূপ বা স্থূলরূপ নাই। গুণ প্রভৃতির রূপ থাকিলে তাহা আর গুণ হইত না, রূপ থাকার দরুণ দ্রব্যই হইয়া দাঁড়াইত। এই অবস্থায় উদ্‌ভূতরূপ বা স্থূলরূপকে উল্লিখিত অনুমানের সাধ্য প্রত্যক্ষত্বের সমব্যাপ্ত করিতে হইলে, প্রত্যক্ষকে "দ্রব্যের প্রত্যক্ষ" (দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ) এইরূপে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে এই যে, আত্মা দ্রব্যও বটে, প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যও বটে; আত্মা প্রত্যক্ষগম্য হইলেও আত্মার উদ্‌ভূতরূপ বা স্থূলরূপ না থাকায়, উদ্‌ভূতরূপকে তো আত্ম-প্রত্যক্ষের ব্যাপক বলা চলিবে না। সুতরাং উদ্‌ভূতরূপকে প্রত্যক্ষের ব্যাপক করিয়া দেখিতে হইলে, আলোচ্য অনুমানের সাধ্য-প্রত্যক্ষকে কেবল দ্রব্যগত বা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ এইরূপ বলিলেই চলিবে না। দ্রব্যকেও বাহিরের দ্রব্য বা স্থূলদ্রব্য এইরূপভাবে আরও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে। আত্মা দ্রব্য হইলেও স্থূলদ্রব্য নহে। আত্মার প্রত্যক্ষকে বাহিরের দ্রব্যের বা স্থূল দ্রব্যের প্রত্যক্ষের ন্যায় বাহ্যপ্রত্যক্ষও বলা যায় না। স্থূল *দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সর্ব্বত্রই "উদ্‌ভূতরূপ" অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ন্দ্রিয়-গ্রাহ্য* **স্থূলরূপ** অবশ্যই থাকিবে। ফলে, উদ্‌ভূতরূপকে স্থূল দ্রব্য-প্রত্যক্ষের (আলোচ্য সাধ্যের) ব্যাপক এবং হেতুর (প্রমেয়ত্বের) অব্যাপক বলিয়া উপাধি আখ্যা দেওয়াও চলিবে। আলোচ্য স্থলে উদ্‌ভূতরূপকে অনুমানের সাধ্য-প্রত্যক্ষের সমব্যাপ্ত করিবার জন্য সাধ্য-প্রত্যক্ষের সম্পর্কে "বাহিরের দ্রব্যের বা স্থূল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ" (বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ) এইরূপে যে বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সাধ্যের সেই বিশেষ ধর্ম্মকে উল্লিখিত অনুমানের পক্ষের (বায়ুর) বিশেষণ হিসাবে অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। বায়ু যে স্পর্শগম্য এবং বাহিরের স্থূল দ্রব্য তাহাতে সন্দেহ কি? ঐ প্রকার পক্ষের বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা সাধ্য-প্রত্যক্ষকে বিশেষ করিয়া বুঝিলেই উদ্‌ভূতরূপকে সাধ্যের ব্যাপক হওয়ায় উপাধি বলা যায়। এই শ্রেণীর উপাধিকেই "পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক" উপাধি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকার উপাধিকে বলা হইয়াছে "সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধি"।

দ্বিতীয় শ্রেণীর (পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক) উপাধির স্বরূপ ব্যাখ্যায় আমরা দেখিতে পাই, পক্ষের বিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা সাধ্যকে যদি রূপায়িত করিয়া বলা যায়, তবেই সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপাধিটিকে সাধ্যের সমব্যাপ্ত করিয়া উপাধি লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে। তৃতীয় প্রকার উপাধির স্বরূপ বিচারে দেখা যায় যে, এখানে প্রযোজ্য উপাধিটিকে সাধ্যের ব্যাপক করিবার জন্য সাধ্যটিকে হেতুর ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে "স শ্যামো মিত্রা-তনয়ত্বাৎ", সেই ব্যক্তি শ্যামবর্ণ, যেহেতু সে মিত্রানামক মহিলার পুত্র। এই অনুমানে "শাক-পাকজত্ব"কে উপাধি বলা হইয়াছে, ইহা আমরা ন্যায়োক্ত উপাধির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই বিশেষ-ভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। আলোচ্য অনুমানে শ্যামত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে। শ্যামবর্ণ হইলেই যে তাহা অতিরিক্ত শাক-পরিপাকের ফল হইবে, এরূপ তো বলা কোনমতেই চলে না। কেননা, কাক, কোকিল প্রভৃতিও তো শ্যামবর্ণের বটে, উহাদের ঐ শ্যামতা তো আর শাক-রস পরিপাকের ফল নহে। সুতরাং উল্লিখিত অনুমানের শাক-পাকজত্বরূপ উপাধিটিকে সাধ্য-শ্যামত্বের ব্যাপক করিবার জন্য সাধ্য শ্যামতাকে উক্ত অনুমানের যাহা হেতু সেই হেতুর ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। যদি বলি যে, শ্যামতামাত্রই নহে, কিন্তু মিত্রার তনয়ে যে শ্যমতা দেখা যায়, তাহা গর্ভাবস্থায় মিত্রার অতিরিক্ত শাক ভোজনেরই ফল; তবে অবশ্যই প্রদর্শিত উপাধিটি সাধ্যের (মিত্রা-তনয়-গত শ্যামত্বের) ব্যাপকও হইবে এবং উপাধির লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় উপাধি বলিয়াও গ্রহণ করা চলিবে। চতুর্থ প্রকার উপাধিটিকে বলা হইয়াছে "উদাসীন-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক" উপাধি। এই উপাধির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া প্রমাণ-চন্দ্রিকা বলিয়াছেন যে, পরমাণুর রূপটিও প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য, যেহেতু তাহাও ঘট প্রভৃতির ন্যায় প্রমেয় বটে—পরমাণুরূপং প্রত্যক্ষং প্রমেয়ত্বাৎ ঘটবৎ। এই অনুমানে যদি "উদ্‌ভূতরূপকে" উপাধি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এক্ষেত্রেও উপাধিকে সাধ্য-প্রত্যক্ষের ব্যাপক করিবার জন্য, "বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাৎ", এইরূপ অনুমানের ন্যায় সাধ্য-প্রত্যক্ষকে বাহিরের দ্রব্যের বা স্থূল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ (বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ) এইরূপ ভাবে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইবে। কেননা, যেখানে যেখানে বাহিরের স্থূল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ আছে, সেখানেই উদ্‌ভূতরূপ বা স্থূলরূপও আছে; সুতরাং

উদ্‌ভূতরূপটি যে স্থূল দ্রব্য-প্রত্যক্ষের (সাধ্যের) ব্যাপক হইবে, তাহতে সন্দেহ কি? উক্ত অনুমানের সাধ্য-প্রত্যক্ষকে যে বাহিরের দ্রব্যের প্রত্যক্ষ (বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ) এইরূপে বিশেষভাবে নির্ব্বচন করা হইয়াছে, তাহা এক্ষেত্রে একটি উদাসীন ধর্ম্ম ব্যতীত কিছুই নহে। অনুমানের সাধ্য-প্রত্যক্ষের অংশে বাহিরের দ্রব্যের, বা স্থূল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ এইরূপে যে বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাকে এই অনুমানের পক্ষের (পরমাণুর) ধর্ম্মও বলা যায় না, হেতুরও ধর্ম্ম বলা চলে না, এইজন্য উক্ত ধর্ম্মকে উদাসীন ধর্ম্মই বলিতে হয়।

(ক) বিরুদ্ধ, (খ) অসিদ্ধ, (গ) অনৈকান্তিক, (ঘ) সৎ-প্রতিপক্ষ এবং (ঙ) কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত নামে যে পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের বিবরণ মাধবমুকুন্দের পরপক্ষগিরিবজ্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়-বৈশেষিকের ব্যাখ্যারই অনুরূপ। ন্যায়োক্ত হেত্বাভাসের বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছি। এই অবস্থায় অনাবশ্যক মনে করিয়াই মাধবমুকুন্দের হেত্বাভাসের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল না।

মাধ্বোক্ত হেতু-দোষের বিবরণ

মাধ্ব-পণ্ডিতগণ নির্দ্দোষ উপপত্তি বা যুক্তিকে (flawless reasoning) এবং অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিমূলে ব্যাপক ধূম প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষুর অগোচরে অবস্থিত বহ্নি প্রভৃতির জ্ঞানকে অনুমান বলিয়াছেন। এখন কথা এই যে, উপপত্তি বা যুক্তিকে যে নির্দ্দোষ বলা হইল, উপপত্তির দোষ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থ বলেন, যে সকল দোষ থাকিলে লিঙ্গ বা হেতুমূলে অভিপ্রেত জ্ঞানের উদয় হয় না, অথবা হইলেও সংশয় বা ভ্রম জ্ঞানেরই উদয় হয়, তাহাই উপপত্তির অর্থাৎ যুক্তির বা অনুমিতির দোষ বলিয়া জানিবে।[১] মাধ্ব-পণ্ডিতগণ যুক্তির বা হেতুর দোষ-উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া, হেতু-দোষকে প্রথমতঃ (ক) বিরোধ (contradiction) এবং (খ) অসঙ্গতি (inappropriateness) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। বিরোধ (discrepency) মাধ্ব পণ্ডিতগণের মতে তিন প্রকার—(ক) প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, (খ) হেতু-বিরোধ এবং দৃষ্টান্ত-

---

১। যৎ সদ্‌ভাবে লিঙ্গাভিমতং জ্ঞানমেব ন জনয়তি, সংশয়-বিপর্যয়ৌ বা করোতি তে দোষাঃ। জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ৪৮ পৃষ্ঠা;

বিরোধ। প্রতিজ্ঞা-বিরোধ (contradiction in the proposition to be proved) আবার দুই প্রকার—প্রমাণ-বিরোধ এবং স্ববচন-বিরোধ। প্রমাণের সঙ্গে যে বিরোধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রবলতর প্রমাণের সহিত বিরোধ এবং তুল্যবল প্রমাণের সহিত বিরোধ, এই দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবেদান্তীর "জগৎ মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, যথা শুক্তি-রজতম্", এইরূপ অনুমান দ্বৈতবেদান্তীর সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অনুমান-বিরুদ্ধ এবং আগম-বিরুদ্ধও বটে। সুতরাং প্রবলতর প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া জগতের ঐরূপ মিথ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞা কোনমতেই গ্রহণ-যোগ্য নহে। ঘট প্রভৃতি বস্তুর সত্যতা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। জাগতিক বস্তুগুলি সর্ব্বদা আমাদের জীবনযাত্রার সহায়তা করে বলিয়া, উহা-দিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। শ্রুতিও বিশ্বের তাবদ্-বস্তুকে সত্য (বিশ্বং সত্যম্) বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অবস্থায় প্রবলতর প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-বিরুদ্ধ অদ্বৈতোক্ত জগন্মিথ্যাত্বের প্রতিজ্ঞাকে সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা চলে কি? তারপর, "জগৎ মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তি-রজতবৎ," অদ্বৈতবাদীর এইরূপ জগতের মিথ্যাত্বের অনুমানের বিরুদ্ধে দ্বৈতবেদান্তী সহজেই জগতের সত্যতা অনুমান করিয়া বলিতে পারেন যে, জগৎ মিথ্যা নহে সত্য, যেহেতু জগৎ আত্মা প্রভৃতি সত্য পদার্থের ন্যায়ই প্রমাণসিদ্ধ—জগৎ সত্যং প্রামাণিকত্বাদাত্মবৎ। উল্লিখিত অনুমানদ্বয় পরস্পর সৎপ্রতিপক্ষ বিধায় যে তুল্যবল প্রমাণ-বিরোধী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। সমবল প্রমাণ-বিরোধী কোন অনুমান-প্রতিজ্ঞাই কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। স্বীয় উক্তির যে বিরোধের কথা বলা হইয়াছে (self-contradictory statement) তাহাও আবার দুই প্রকার। এক প্রকার স্বোক্তি-বিরোধকে বলা হয় "অপসিদ্ধান্ত", দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হইয়া থাকে "জাতি"। অপসিদ্ধান্ত কাহাকে বলে? পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ যেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সেই স্বীকৃতির বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত স্বীয় উক্তিবলে মানিতে গেলে সেক্ষেত্রে অপসিদ্ধান্ত নামক স্ববচন-বিরোধ ঘটিবে। নিজের কথার মধ্যেই যেখানে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়, সেখানে "জাতি" নামক স্বোক্তি-বিরোধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (স্ববচন এব স্বব্যাহতি র্জাতিঃ) আমার মাতা বন্ধ্যা, এইরূপ উক্তি

স্বব্যাহতি বা জাতি নামক স্বোক্তি-বিরোধের অতিউত্তম দৃষ্টান্ত। এইত গেল প্রতিজ্ঞা-বিরোধের কথা।

হেতু-বিরোধ সম্পর্কে বলিতে গিয়া মাধ্ব প্রথমতঃ হেতু-বিরোধকে স্বরূপাসিদ্ধ এবং অব্যাপ্তি, এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যেই হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হয় সেই হেতুটিই যদি পক্ষে অর্থাৎ সাধ্যের আশ্রয় বা অধিকরণে না থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়াছি। প্রমাণ-চন্দ্রিকার রচয়িতা শ্রীমচ্ছলারিশেষাচার্য্য স্বরূপাসিদ্ধের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"শব্দোঽনিত্যশ্চাক্ষুষত্বাৎ," শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, এইরূপে যদি কেহ অনুমান-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তবে সেই প্রয়োগ-বাক্যের হেতু চাক্ষুষত্ব বা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্র-গ্রাহ্য শব্দে অর্থাৎ উক্ত অনুমানের পক্ষে না থাকায়, ঐ হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইবে। অব্যাপ্তি নামক হেতু-বিরোধ সম্পর্কে মাধ্ব বলেন, অব্যাপ্তি তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ অনুমানের হেতুটি যদি সাধ্য এবং সাধ্যাভাব এই উভয়ের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ হেতুটি যদি সাধ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া, কেবল সাধ্যের অভাবের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয়তঃ সাধ্য এবং সাধ্যাভাব এই উভয়ের কাহারও সহিতই হেতুটি যদি সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তবে ঐ সকল স্থলে "অব্যাপ্তি" নামক হেত্বাভাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা প্রমেয় বটে, শব্দোঽনিত্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ, এই অনুমানের প্রমেয়ত্ব-হেতুটি অনিত্যত্বরূপ সাধ্যেও যেমন থাকে, সেইরূপ অনিত্যত্বরূপ সাধ্য যেখানে নাই, অর্থাৎ যাহা অনিত্য নহে সেই সকল নিত্য বস্তুতেও থাকে। এইজন্যই ঐরূপ হেতু সাধ্য-সাধনে সমর্থ নহে, উহা দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস। তারপর যদি বলি যে, শব্দ নিত্য, *যেহেতু শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে—শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ। এই অনুমানের* হেতু-কৃতকত্ব অর্থাৎ জন্যত্ব নিত্যত্বরূপ সাধ্যে কখনই থাকিবে না, সাধ্যের অভাবের স্থলে অনিত্য বস্তুতেই কেবল কৃতকত্ব বা জন্যত্ব থাকিবে। এই জাতীয় হেতুর সহিত আলোচ্য সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিবে না বলিয়া, উহা বিরুদ্ধ-হেতুই হইবে। যদি কেহ অনুমান করেন যে, সমস্তই অনিত্য যেহেতু বিশ্বের তাবদ্ বস্তুরই সত্তা বা অস্তিত্ব আছে—সর্ব্বমনিত্যং সত্ত্বাৎ। এই অনুমানে নিখিল

বস্তুকেই পক্ষ করা হইয়াছে, ফলে এই অনুমানের সাধ্য অথবা সাধ্যের অভাব বলিয়া যাহা ধরা যাইবে, তাহা সকলই পক্ষের মধ্যেই পড়িবে, (পক্ষান্তর্ভুক্তই হইবে) পক্ষের বাহিরে সপক্ষ অথবা বিপক্ষ, নিশ্চিত সাধ্যযুক্ত বা নিশ্চিত সাধ্যশূন্য বলিয়া কিছুই পাওয়া যাইবে না, যেখানে হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয় করা যাইতে পারে। অনুমানমাত্রেই পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ থাকে। যে সকল স্থানে সাধ্য নিশ্চিতই আছে, সেই সকল স্থলে অর্থাৎ সপক্ষে হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই, পক্ষে হেতু দেখিয়া সাধ্যের অনুমান করা হইয়া থাকে। অনুমানের যদি কোন সপক্ষই না থাকে, তবে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইবে কোথায়? ক্ষেত্রবিশেষে সাধ্যের অভাবে হেতুর অভাব দেখিয়াও হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তির নির্ণয় করা চলে। ইহাকে বিপক্ষ দৃষ্টান্ত বলা হয়। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ এবং জলহ্রদ প্রভৃতি বিপক্ষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সপক্ষ দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষতঃ ভাবমূলে (positively) বিপক্ষে সাধ্যের অভাবে হেতুর অভাব লক্ষ্য করিয়া অভাবমূলে (negatively) হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় এবং তাহারই বলে পক্ষে হেতু দেখিয়া সাধ্যের অনুমান করা হয়। যে-সকল অনুমানের কোনরূপ সপক্ষ (নিশ্চিত সাধ্যযুক্ত) বা বিপক্ষ (নিশ্চিত সাধ্যশূন্য) দৃষ্টান্ত নাই, সকলই পক্ষসম অর্থাৎ পক্ষান্তর্ভুক্তই বটে, সেই সকল অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয় অসম্ভব বিধায়, সেইরূপ হেতু পক্ষে কেবল সাধ্যের সন্দেহই জাগাইয়া তোলে, সাধ্য-সাধনে সমর্থ হয় না। এইজন্য ঐরূপ হেতু হেত্বাভাস হইতে বাধ্য। নৈয়ায়িকগণ ঐরূপ হেতুকেই "অনুপসংহারী" হেত্বাভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধ্য অথবা সাধ্যের অভাব ইহার কোন একটি ক্ষেত্রেই যেই হেতুর উপসংহার নাই, অর্থাৎ যেই হেতু কোথায়ও নিয়ত সম্বদ্ধ নহে, তাহাই ন্যায়োক্ত অনুপসংহারী হেতু। যে-ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই থাকে, কোথায়ও যাহার অভাব পাওয়া যায় না, সেইরূপ ধর্ম্মকেই "কেবলান্বয়ী" ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। অনুমানের পক্ষ যদি আলোচ্য কেবলান্বয়ী ধর্ম্মযুক্ত হয়, তবে সেইরূপ ব্যাপক পক্ষের পুটে কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেরই অন্তর্ভুক্তি করা যাইতে পারে। পক্ষান্তর্ভুক্ত নিখিল পদার্থেই সেক্ষেত্রে সাধ্যের সন্দেহ জাগরূক থাকে। এই অবস্থায় সেইরূপ অনুমানের

সাধ্য-সাধনের জন্য প্রযুক্ত যেকোন হেতুই হইবে হেত্বাভাস। উল্লিখিত মাধ্ব-অনুমানে (সর্ব্বমনিত্যং সত্ত্বাৎ, এই অনুমানে) "সর্ব্বং"কে পক্ষ, অনিত্যত্বকে সাধ্য, এবং "সত্ত্বাৎ"কে হেতুরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে সর্ব্বং অর্থাৎ নিখিল বস্তুই অনুমানের পক্ষ হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত বস্তুতেই অনিত্যত্বের (উক্ত অনুমানের সাধ্যের) সন্দেহও রহিয়াছে। সাধ্যযুক্ত বা সাধ্যশূন্য, সপক্ষ, কি বিপক্ষ, এমন কোন স্থলই নাই, যেখানে সাধ্য-অনিত্যত্বের সহিত হেতু-সত্তার ব্যাপ্তির নিশ্চয় করা যাইতে পারে। ব্যাপ্তির নিশ্চয় না হওয়ায় ব্যভিচারের আশঙ্কা বশতঃ ঐরূপ হেতু হেত্বাভাসই হইবে। ন্যায়-সিদ্ধান্তে ঐ জাতীয় হেতু যে "অনুপসংহারী" নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে-হেতু সাধ্যযুক্ত বা সাধ্যশূন্য কোন স্থানেই নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে না, তাহাকেই অনৈকান্তিক হেতু বলে। এই অনৈকান্তিক হেতু ন্যায়-মতে (ক) সাধারণ-অনৈকান্তিক, (খ) অসাধারণ-অনৈকান্তিক এবং (গ) অনুপসংহারী-অনৈকান্তিক, এই তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। যেই হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, ন্যায়ের পরিভাষায় তাহাই সাধারণ-অনৈকান্তিক; যেই হেতু সাধ্যযুক্ত বা সাধ্যশূন্য কোন স্থানেই থাকে না, তাহা অসাধারণ-অনৈকান্তিক; আর যে অনুমানের পক্ষটি কেবলান্বয়ী, সে জাতীয় অনুমানের সপক্ষ বা বিপক্ষ বলিয়া কিছু না থাকায়, সেই স্থলীয় যেকোন্ হেতুই অনুপসংহারী-অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস হইয়া থাকে। ন্যায়োক্ত ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়াই মাধ্ব-সিদ্ধান্তেও "অব্যাপ্তি" নামক হেতু-বিরোধকে উল্লিখিত তিন প্রকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১]

দৃষ্টান্ত-বিরোধ সম্পর্কে মধ্বাচার্য্যগণ বলেন, দুই প্রকার দৃষ্টান্ত-বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায়। একটিকে বলে সাধ্য-বৈকল্য, অপরটির নাম সাধন-বৈকল্য। অনুমানের সাধ্যটি দৃষ্টান্তে পাওয়া না গেলে, সেক্ষেত্রে সাধ্য-বৈকল্য দোষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধন বা হেতুটিকে যদি দৃষ্টান্তে না পাওয়া যায়, তবে সেখানে সাধন-বৈকল্য নামক দৃষ্টান্ত বিরোধ ঘটিবে। মনেরও মূর্ত্তি থাকায়, যদি মূর্ত্তত্বকে হেতু করিয়া মনের অনিত্যতা সাধনে

১। (ক) শ্রীমচ্ছলারিশেষাচার্য-কৃত প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫২ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব বিঃ সং; এবং (খ) জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতির অনুমান-পরিচ্ছেদোক্ত হেত্বাভাসের বিবরণ দেখুন।

পরমাণুকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হয়—“মনোঽনিত্যং মূর্ত্তত্বাৎ পরমাণুবৎ” ; তবে এই অনুমানের সাধ্য অনিত্যত্ব, অনুমানোক্ত দৃষ্টান্ত নিত্য পরমাণুতে না থাকায়, এখানে সাধ্য-বৈকল্য নামক দৃষ্টান্ত-দোষ ঘটিবে। তারপর ঐ অনুমান-বাক্যেই যদি পরমাণুর পরিবর্ত্তে কর্ম্মকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মের কোন মূর্ত্তি নাই বলিয়া, উক্ত অনুমানের হেতু “মূর্ত্তত্ব” আলোচ্য দৃষ্টান্তে (কর্ম্মে) কদাচ থাকিবে না। এই অবস্থায় ঐরূপ অনুমানের প্রয়োগে সাধন-বৈকল্য নামক দৃষ্টান্ত-বিরোধ হইবে। অসঙ্গতি কাহাকে বলে ? ইহার উত্তরে মাধ্ব পণ্ডিতগণ বলেন, যে-তথ্য বাদীর স্বীকৃত ; সুতরাং যে-তথ্যকে প্রমাণ করিবার জন্য বাদীর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, বাদীর অঙ্গীকৃত সেইরূপ কোন তথ্য যদি বাদীর নিকট অনুমান প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে সেই অনুমান অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায়, অবশ্যই “অসঙ্গতি” দোষে দুষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায় যে, যিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী মহাপুরুষ তাঁহার নিকট যদি কেহ “পৃথিবীর একজন কর্ত্তা আছেন, যেহেতু পৃথিবীও জন্য বটে ; জন্যমাত্রেরই কর্ত্তা থাকে, জন্য পৃথিবীর কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহ নহেন—“ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ”, এইরূপে অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার [illegible] সাধ্যশূন্য) দৃষ্টান্ত নাই. সকলই বাদীর কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা বটে [illegible] ঐ অনুমানে ঈশ্বর-বিশ্বাসী [illegible] না থাকায়, ঐরূপ অনুমান যে বাদীর দৃষ্টিতে সঙ্গতিবিহান হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? অসঙ্গতি-দোষ কেবল দৃষ্টান্তেরই হয় এমন নহে। প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি সম্পর্কেও অসঙ্গতির উদ্ভব হইতে পারে।

আলোচিত বিরোধ এবং অসঙ্গতি ব্যতীত আরও নানাপ্রকার দোষের পরিচয় পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে অবশ্য বক্তব্যের একদেশ বা অংশমাত্র বলার দরুণ প্রতিজ্ঞায় “ন্যূনতা” দোষ ঘটে ; প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন তাহার পুনরুক্তি করিলে, উহাকে বলে “আধিক্য”-দোষ। যেই প্রমেয় বিবাদাস্পদ ঐরূপ প্রমেয় অঙ্গীকার করিলে “সংবাদ” নামক দোষের উদয় হয় ; প্রতিবাদীকে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবার জন্য যাহা অবশ্য বলা উচিত তাহা না বলিলে সেক্ষেত্রে “অনুক্তি” নামক দোষ ঘটে। উল্লিখিত ছয় প্রকার দোষকে ছয়টি নিগ্রহস্থান বলিয়া জয়তীর্থ প্রমাণ-পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিগ্রহস্থান কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের

উত্তরে জয়তীর্থ বলেন, যেরূপ দোষযুক্ত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিলে পাণ্ডিত্যাভিমানী প্রতিবাদীর বিচারে পরাজয় এবং তাহার ফলে সভ্যগণের নিকট নিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী, তাহাকেই "নিগ্রহস্থান" বলা হইয়া থাকে।[1] বাদীর যদি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, কিংবা ভ্রান্ত ধারণা থাকে; এবং প্রতিবাদী যাহা বলেন তাহা যদি বাদী বুঝিতে না পারেন বা ভুল বোঝেন, তবে ঐরূপ অজ্ঞ বাদীও পণ্ডিতসভায় নিগৃহীত হইয়া থাকেন। পণ্ডিত জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতিতে ঐরূপ অজ্ঞ বাদীর প্রতিজ্ঞা-হানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস প্রভৃতি বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানের বর্ণনা করিয়াছেন।[2] স্বীয় প্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ, প্রতিজ্ঞান্তর-গ্রহণ, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ প্রভৃতি যে নিগ্রহস্থান তাহা ন্যায়-দর্শনে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে। নৈয়ায়িক বিভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থানের পরিচয় দিতে গিয়া আশী প্রকার নিগ্রহস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত জয়তীর্থ তাঁহার প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা-হানি প্রভৃতি বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানকে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ, অসঙ্গতি প্রভৃতি ছয় প্রকার কথা-দোষ এবং প্রতিজ্ঞা-দোষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, পরিশেষে (ষড়েব নিগ্রহস্থানানি) ছয় প্রকার নিগ্রহস্থান অঙ্গীকার করিয়াছেন। কালাত্যয়াপদিষ্ট এবং সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের যে-বিবরণ মাধ্ব-সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ন্যায়-প্রদত্ত ব্যাখ্যারই অনুরূপ : সুব্যাখ্যা করিতে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ...হস্থানের

বেঙ্কট তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে নিগ্রহস্থানের উল্লেখ ক... বলিয়াছেন, তর্কের বাদ, জল্প, বিতণ্ডা প্রভৃতি যে বিভিন্ন প্রকার সভা-বিজয়ের কৌশল আছে, তন্মধ্যে সত্য-নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দোষ তর্কের অবতারণা, যাহা 'বাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই গ্রাহ্য; কিন্তু প্রতিবাদীর শাস্ত্র-দৃষ্টি কলুষিত করিবার উদ্দেশ্যে যে অসত্তর্কের আশ্রয় সময়

বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে নিগ্রহস্থানের বিবরণ

১। কথায়ামপণ্ডিতাহঙ্কারপরেণ পরস্যাহঙ্কারখণ্ডনং পরাজয়ঃ, নিগ্রহ ইত্যুচ্যতে, তন্নিমিত্তং নিগ্রহস্থানং। অহঙ্কারখণ্ডনঞ্চ স্বপক্ষসাধন-পরপক্ষদূষণ সঙ্কল্পভ্রংশঃ। প্রমাণপদ্ধতি, ৫১ পৃঃ ;

২। জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ;

সময় গ্রহণ করা হয়, এবং যে তর্কে স্বীয় প্রতিজ্ঞার সমর্থনে বলিষ্ঠ কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল পরোক্ত প্রতিজ্ঞার অন্যায্য সমালোচনাই মুখ্য লক্ষ্য দেখা যায়, সেইরূপ অসত্তর্কই জল্প এবং বিতণ্ডা নামে ন্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐরূপ কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাদযুদ্ধে বাদীর বিজয়ের প্রচেষ্টাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বেঙ্কটের মতে কথার বা বিচারের নিম্নলিখিত চারটি অঙ্গ থাকা আবশ্যক—(১) সভ্যসংখ্যা-নির্ব্বাচন, (২) সভাপতি-বরণ, (৩) কে বাদী হইবেন, কে প্রতিবাদী হইবেন তাহার নির্দ্ধারণ, (৪) বিচার্য্য বিষয়ের অবধারণ, এবং বিচারের রীতি, অর্থাৎ বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা, এই তিন প্রকার বিচার-কৌশলের কোন্ প্রকার কৌশল অবলম্বনে বিচার হইবে তাহার নিরূপণ। বিচার-সভার সভ্য-সংখ্যা হইবে তিন বা পাঁচ। মত-দ্বৈধ উপস্থিত হইলে, অধিক-সংখ্যক সভ্যের মত গ্রাহ্য হইবে। বিচার-সভায় এমন একজন বিজ্ঞতম ব্যক্তি সভাপতি নিযুক্ত হইবেন, যাঁহার মত সকল সভ্যই শ্রদ্ধাবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে পারেন। সত্য-নির্ণয়ের জন্য বাদী ও প্রতিবাদী বাদযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে, সত্যের মীমাংসাই সেক্ষেত্রে বিচারের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। জল্প এবং বিতণ্ডা নামক কুতর্কের আশ্রয় লইয়া এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করিলে, শেষপর্য্যন্ত বাদী অথবা প্রতি-না থাকায়, ঐরূপ হব বিচারের ফল। এই অবস্থায় নিগ্রহস্থান বিধায়, জল্প-সন্দেহ কি ? অদ্বয়ে গ্রাহ্য নহে, ত্যাজ্য, এবিষয়ে সত্য-জিজ্ঞাসুর কোনরূপ হেতু প্র নাই। বিচার-ক্ষেত্রে জল্প ও বিতণ্ডার আশ্রয় লইলেই, প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিত্যাগ, স্বোক্তি-হানি, স্বোক্তি-বিরোধ, উক্তির অপলাপ, অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি[১] বহু প্রকার নিগ্রহস্থান আসিয়া দাঁড়ায়। উল্লিখিত নিগ্রহস্থানগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত নিগ্রহস্থান "উক্তিহানি" বা স্বীয় উক্তির পরিত্যাগই প্রতিজ্ঞা-হানি, হেতু-হানি, দৃষ্টান্ত-হানি, সাধ্য-হেতু-দৃষ্টান্ত প্রভৃতির বিশেষণাংশের হানি প্রভৃতি বহুরূপে এবং প্রত্যক্ষ-হানি, অনুমান-হানি,

---

১। উক্তহানিরুক্তবিশেষণমুক্তাপলাপ উক্তবিরোধোঽপসিদ্ধান্তোঽবাচকম্বিতমপ্রাপ্তকালমবিজ্ঞাতার্থমর্থান্তরং ন্যূনমধিকং পুনরুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভাক্ষেপো মতানুজ্ঞা পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং নিরনুযোজ্যানুযোগঃ প্রমাণাভাসাশ্চ বিধা প্রত্যেকং নিগ্রহস্থানানীতি। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৭৬ পৃষ্ঠা ;

আগম-হানি প্রভৃতি বিবিধ হানির আকারে দেখা দিয়া থাকে। এইভাবে পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির অবান্তর ভেদ বিচার করিলে নিগ্রহস্থান যে ন্যায়োক্ত আশী প্রকার হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? বেঙ্কটোক্ত বিভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থানের বিস্তৃত বিবরণ বেঙ্কট-রচিত ন্যায়পরিশুদ্ধির অনুমান-অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহ্নিকে জিজ্ঞাসু পাঠক দেখিতে পাইবেন। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা-বিচারের এবং বিভিন্ন প্রকার ছল ও অসদুত্তর প্রভৃতির যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ন্যায়পরিশুদ্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকাংশে ন্যায়ের বিশ্লেষণের অনুরূপ হইলেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বেঙ্কটোক্ত হেত্বাভাসের পরিচয়

প্রমাণাভাস এবং হেত্বাভাস সম্পর্কে বেঙ্কট বলেন যে, যাহা প্রমাণ না হইয়াও প্রমাণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রমাণাভাস বলে। এই প্রমাণাভাস প্রত্যক্ষাভাস, অনুমানাভাস, আগমাভাস এবং স্মৃত্যাভাস-ভেদে চার প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর দোষবশতঃ যদি কেহ একটি চন্দ্রকে দুইটি দেখেন, শাদা শঙ্খকে হলুদবর্ণের দেখেন, তবে তাঁহার ঐ প্রত্যক্ষ যথার্থ প্রত্যক্ষ হইবে না, উহা হইবে প্রত্যক্ষাভাস। প্রত্যক্ষাভাস প্রভৃতিও হেত্বাভাসের ন্যায়ই গ্রহণের অযোগ্য। হেত্বাভাসকে যথার্থ হেতু বলিয়া গ্রহণ সিদ্ধ-অনুমান করিতে গেলে তাহা যেমন বাদীর নিগ্রহস্থান বা পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ প্রত্যক্ষাভাসকে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে, তাহাও বাদীর নিগ্রহস্থানই হইবে। গৌতমের ন্যায়সূত্রে নিগ্রহস্থানের বিবরণে হেত্বাভাসকে নিগ্রহস্থান বলিয়া যেরূপ স্পষ্ট-বাক্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রমাণাভাসের কথা সেইরূপ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা না হইলেও, হেত্বাভাস কথা-দ্বারায় সেখানে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণাভাসকেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং গৌতম-সূত্রে প্রত্যক্ষাভাস প্রভৃতির স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না থাকিলেও, নিগ্রহস্থানের পরিগণনায় সূত্রকারের ন্যূনতার কথা উঠে না। অনুমানাভাসের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করিতে গিয়া বেঙ্কট বলিয়াছেন যে, নীহারিকাপুঞ্জ কিংবা ধূলিজাল প্রভৃতিকে ধূম ভ্রম করিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিলে, ঐ অনুমান অবশ্যই অনুমানাভাস হইবে। হেত্বাভাসের বিবরণে বেঙ্কট বলেন, হেতু না হইয়াও যাহা হেতুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহাই হেত্বাভাস বলিয়া জানিবে।[১]

১। হেতুভিন্নত্বে সতি হেতুবদ্‌ব্যবহারবিষয়ত্বং হেত্বাভাসসামান্যলক্ষণম্। ন্যায়-পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-কৃত টীকা, ২৭১ পৃষ্ঠা;

এই হেত্বাভাস প্রথমতঃ দুই প্রকার, (ক) হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে, অথবা (খ) হেতুটি পক্ষে না থাকিলে সেইরূপ হেতুই হেত্বাভাস হইয়া থাকে। অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক, বিরুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল হেত্বাভাসের বিবরণ ন্যায়-দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদেরও মূলতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, "অসিদ্ধ" বা স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়া যেই হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেখানে হেতুটি পক্ষে না থাকায় (হেতুটি পক্ষের ধর্ম্ম না হওয়ায়) পক্ষে অবৃত্তি ঐ শ্রেণীর হেতু অবশ্য স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসই হইবে। অনৈকান্তিক কিংবা বিরুদ্ধ প্রভৃতি হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তি থাকে না; সুতরাং সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তির অভাবই যে ঐ সকল হেত্বাভাসের মূল তাহাতে সন্দেহ কি? ঐ মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বেঙ্কটে সিদ্ধান্তে হেত্বাভাসকে প্রথমতঃ দুই প্রকার বলা হইয়াছে; এবং ঐ দুই প্রকার হেত্বাভাসের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়াই অপরাপর হেত্বাভাসের তুলনা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনৈকান্তিক, বাধিত এবং প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া হেত্বাভাসের যে বিভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলেও হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তি-সম্পর্কেই আপত্তি বলিয়া, ঐ সকল হেত্বাভাস সহজেই "অব্যাপ্ত" নামক হেত্বাভাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। অনৈকান্তিক-হেত্বাভাসকে বেঙ্কটের মতে সাধারণ এবং অসাধারণ-ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়া থাকে*। ঐ দুই প্রকার অনৈকান্তিক-হেত্বাভাসের স্থলেই হেতুটি সাধ্যের ঐকান্তিক নহে অর্থাৎ সাধ্য-মাত্রেই হেতুটি ব্যাপ্ত নহে বলিয়া, ইহাদিগকেও "অব্যাপ্ত" হেত্বাভাসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বাধ বা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সেক্ষেত্রে হেতুটি যেমন পক্ষে থাকে না, (পক্ষের ধর্ম্ম হয় না) সেইরূপ হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিও থাকে না। "পৃথিবী জন্যা সদাতনত্বাৎ", এইরূপে সদাতনত্ব বা নিত্যত্বকে হেতু করিয়া যদি পৃথিবীর জন্যত্ব সাধন করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে ঐ হেতুটি সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়া দাঁড়ায়। আলোচ্য

১। অব্যাপ্তাপক্ষধর্মৌ দ্বৌ হেত্বাভাসৌ সমাসতঃ।
তয়োরেব প্রপঞ্চেন স্যাদসিদ্ধ্যাদিকল্পনা॥

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২১১ পৃঃ;

*নৈয়ায়িক-মতে অনৈকান্তিক-হেত্বাভাস সাধারণ, অসাধারণ, এবং অনুপসংহারী এই তিন প্রকার ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সদাতনত্ব হেতুটি উক্ত অনুমানের সাধ্য জন্যত্বের বিরুদ্ধ। ফলে, হেতুটি সাধ্যে যেমন থাকিবে না, সেইরূপ জন্য পৃথিবীতে অর্থাৎ পক্ষেও উহা থাকিবে না। এইরূপ হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিও সম্ভব নহে, হেতুর পক্ষে বিদ্যমানতাও (পক্ষ-বৃত্তিতাও) সম্ভবপর নহে। এই উভয়ের অভাবই হেতুতে থাকিবে। এরূপ ক্ষেত্রে বেঙ্কটোক্ত দুই প্রকার হেত্বাভাসের সমুচ্চয়ই ঘটিবে। সৎপ্রতিপক্ষ-স্থলে একই পক্ষে দুইটি অত্যন্ত বিরুদ্ধ সাধ্যের অনুমানের উদয় হওয়ায়, ঐ অনুমান দুইটির কোন্‌টি সবল, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহার নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত, কোনরূপ ব্যাপ্তির কিংবা পক্ষ-ধর্ম্মতারই নির্ণয় করা চলিবে না। এই অবস্থায় সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের হেতুকে সহজেই ব্যাপ্তিবিধুর (অব্যাপ্ত) এবং পক্ষ-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত এই উভয় প্রকার হেত্বাভাসের দৃষ্টান্তস্থল বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতির স্থলেও যথাক্রমে হেতুর পক্ষে বৃত্তিতার অভাব এবং হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তির অভাব ঘটে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে হেত্বাভাসকে সংক্ষেপে কেবল অব্যাপ্ত এবং পক্ষে বৃত্তিরহিত, এই দুই প্রকারই বলা যায়। বেঙ্কটও তাহাই বলিয়াছেন—সিদ্ধ-সাধনও বেঙ্কটের মতে পক্ষে বৃত্তিরহিত হেতুর দোষাক্রান্তই বটে। সিদ্ধ-সাধনস্থলে পূর্ব্ব হইতেই পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধি থাকায়, সেইরূপ পক্ষকে পক্ষই বলা চলে না। কারণ, পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধি না থাকিলে এবং পক্ষে সাধ্য-সিদ্ধির প্রবল ইচ্ছা (সিসাধয়িষা) থাকিলে, তবেই সেইরূপ সাধ্যের আধারকে নব্যন্যায়ের পরিভাষায় “পক্ষ” বলা হয়। সিদ্ধ-সাধনের ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধি থাকার দরুণ সেইরূপ নিশ্চিত-সাধ্যের আধারকে যেমন পক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত বলা যায় না, হেতুকেও সেইরূপ পক্ষের ধর্ম্ম বা পক্ষ-বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না। সুতরাং সিদ্ধ-সাধন অবশ্যই উল্লিখিত “অপক্ষধর্ম্ম” বা পক্ষাবৃত্তি হেত্বাভাসেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। বেঙ্কটের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, বেঙ্কট পক্ষাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতিকে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ হেত্বাভাসেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নৈয়ায়িক পক্ষাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতির স্বরূপ অতি স্পষ্ট-ভাবে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ইহাদের পৃথক্ পরিগণনা করিয়াছেন। এইজন্যই ন্যায়ের সিদ্ধান্তে হেত্বাভাসের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

বেঙ্কটোক্ত হেত্বাভাসের বিবরণে হেত্বাভাস-বিশেষজ্ঞ নৈয়ায়িক-

গণের চিন্তার প্রভাব থাকিলেও স্থলবিশেষে বেঙ্কট নূতন আলোক-পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অসিদ্ধ-হেত্বাভাসের কথাই ধরা যাউক। অসিদ্ধ-হেত্বাভাসকে নৈয়ায়িক আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, এই তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। বেঙ্কট অসিদ্ধ-হেত্বাভাসের আরও অনেক প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। অসিদ্ধ-হেত্বাভাসের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, যেই হেতুর সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তি নাই এবং যেই হেতুর পক্ষে স্থিতিরও (বৃত্তিতারও) নিশ্চয়তা নাই, সেইরূপ হেতুই "অসিদ্ধ"-হেত্বাভাস বলিয়া জানিবে—ব্যাপ্তি-পক্ষ-বৃত্তিনিশ্চয়রহিতোঽসিদ্ধঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৭৯ পৃষ্ঠা ; উক্ত লক্ষণে "নিশ্চয়-রহিতঃ" বলায় প্রত্যেক অসিদ্ধ-হেত্বাভাসই যে, যথার্থ জ্ঞানের অভাববশতঃ, সন্দেহ এবং ভ্রান্তিমূলে তিন প্রকারের হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই (অজ্ঞান-সংশয়-বিপর্যয়ৈস্ত্রিভিরেব অসিদ্ধি র্ভবতি) ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৭৯ পৃষ্ঠা ; তারপর, যাহাকে "আশ্রয়াসিদ্ধ" হেত্বাভাস বলা হইয়াছে তাহা (ক) আশ্রয়াসিদ্ধ, (খ) আশ্রয় বা পক্ষের বিশেষণের অসিদ্ধ (আশ্রয়-বিশেষণাসিদ্ধ) এবং (গ) আশ্রয়েরই অংশ বিশেষের অসিদ্ধ (আশ্রয়-ভাগাসিদ্ধ) এইরূপে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাধ্যা-প্রসিদ্ধিরও সাধ্যের অসিদ্ধি এবং সাধ্যের বিশেষণের অসিদ্ধি, এই দুই প্রকারের বিভাগ করা চলে। সাধনাপ্রসিদ্ধিকে আশ্রয়াসিদ্ধির ন্যায় সাধন বা হেতুর অপ্রসিদ্ধি, হেতুর বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি এবং হেতুর অংশ বিশেষের (কোন এক অংশের) অপ্রসিদ্ধি, এই তিন প্রকারের হইতে দেখা যায়। ফলে অসিদ্ধ-হেত্বাভাস মোটের উপর আট প্রকারের হইয়া দাঁড়ায়*। বেঙ্কটনাথ সব্যভি-চার বা অনৈকান্তিক-হেত্বাভাসকে প্রথমতঃ সাধারণ এবং অসাধারণ এই দুই-ভাগে বিভাগ করিয়া, প্রত্যেক ভাগের আবার আট প্রকার অবান্তর বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেই অনুমানের হেতুটি সপক্ষেও থাকে, আবার

---

* উক্ত আট প্রকারের অসিদ্ধ-হেত্বাভাসের প্রত্যেকটিকেই যদি অজ্ঞান, সংশয় এবং বিপরীত-জ্ঞানমূলে তিন প্রকারের বলিয়া ধরা যায়। তবে অসিদ্ধ-হেত্বাভাস ২৪শ প্রকারের হইয়া দাঁড়ায়। আরও নানাপ্রকার "অসিদ্ধ"-হেত্বাভাসের ভেদ লক্ষ্য করিয়াই অসিদ্ধকে বেঙ্কটের ব্যাখ্যায় শতাধিক প্রকার বলা হইয়াছে—অসিদ্ধয়োঽংশ-সিদ্ধেশ্চ বিবিচ্যন্তে শতাধিকাঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৮০ পৃষ্ঠা ; এবং ন্যায়পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-কৃত টীকা, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ;

বিপক্ষেও থাকে, (সাধ্য যেস্থলে নিশ্চিতই আছে বহ্নির অনুমানে সেই সকল পাকাশালা প্রভৃতিকে সপক্ষ, এবং যেখানে সাধ্য নিশ্চিতই নাই সেই জলহ্রদ প্রভৃতিকে বিপক্ষ বলে) সেইরূপ ব্যাপক হেতুকে সাধারণ-অনৈকান্তিক, এবং যে-ক্ষেত্রে হেতুটি সপক্ষে বা বিপক্ষে কোথায়ও থাকে না, তাহাকে অসাধারণ-অনৈকান্তিক বলা হইয়া থাকে। বেঙ্কটের মতে সাধারণ-অনৈকান্তিকও আট প্রকারের হইতে দেখা যায়। সাধারণ-অনৈকান্তিককে বেঙ্কট—(১) পক্ষ-সপক্ষ-বিপক্ষ-ব্যাপক, (২) পক্ষ-মাত্র-ব্যাপক, (৩) সপক্ষমাত্র-ব্যাপক, (৪) বিপক্ষমাত্র-ব্যাপক, (৫) বিপক্ষ-ব্যাপক, (৬) পক্ষেতর-ব্যাপক, (৭) সপক্ষেতর-ব্যাপক এবং (৮) বিপক্ষেতর-ব্যাপক, এই আট ভাগে ভাগ করিয়াছেন।[১] অসাধারণ-অনৈকান্তিককেও বেঙ্কটনাথ পক্ষ-রহিত, সপক্ষ-রহিত, বিপক্ষ-রহিত, সপক্ষ-বিপক্ষ-রহিত, এইরূপভাবে আট প্রকারের বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।[২] সাধ্যের সহিত যে-হেতুর ব্যাপ্তি নাই, সাধ্যের অভাবের সহিতই যেই হেতুর ব্যাপ্তি দেখা যায়, সেইরূপ হেতুকে বেঙ্কট বিরুদ্ধ-হেত্বাভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সাধ্যবিপরীতব্যাপ্তো বিরুদ্ধো যথা পর্বতো নিরগ্নির্ধূমবত্ত্বাদিতি। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৯৩ পৃষ্ঠা; এই বিরুদ্ধ-হেত্বাভাসও বেঙ্কটের মতে নিম্নলিখিত আট প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যেই অনুমানের সপক্ষ আছে সেই অনুমানের ক্ষেত্রে হেতুটি যদি সপক্ষ-ব্যাপক না হইয়া, কেবল (১) পক্ষ-ব্যাপক, (২) বিপক্ষ-ব্যাপক, (৩) পক্ষ-বিপক্ষ উভয়-ব্যাপক কিংবা (৪) পক্ষ-বিপক্ষ এই উভয়ের অব্যাপক হয়, তবে তাহার ফলে বিরুদ্ধ-হেত্বাভাসও চার প্রকারের হইবে। তারপর, কোন অনুমানের সপক্ষই যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে (১) পক্ষমাত্র-ব্যাপক, (২) বিপক্ষমাত্র-ব্যাপক, (৩) তদুভয়-ব্যাপক এবং (৪) তদুভয়ের অব্যাপক, এই চার প্রকারের বিরুদ্ধ-হেত্বাভাসকে লইয়া বিরুদ্ধ-হেত্বাভাস আট প্রকারেরই হইয়া দাঁড়াইবে।[৩] বেঙ্কটনাথ এইরূপে তাঁহার

১। ত্রয়াণামপি পক্ষাণাং ব্যাপকোঽব্যাপকস্তথা।
একদ্বিব্যাপকাঃ ষট্‌চেত্যেবং সাধারণোঽষ্টধা॥ ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৮৭ পৃষ্ঠা;

২। নিঃসপক্ষো নির্বিপক্ষো দ্বয়ং নির্বিষয়ং তথা।
পক্ষব্যাপ্তি-তদব্যাপ্ত্যো রষ্ট সাধারণাঃ স্মৃতাঃ॥ ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৮৭ পৃষ্ঠা;

৩। সপক্ষে সত্যসতি চ পৃথক্ পক্ষবিপক্ষয়োঃ।
ব্যাপ্তিব্যাপ্ত্যোর্দ্বয়োশ্চেতি বিরুদ্ধোঽপ্যষ্টধা মতঃ॥ ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৯৩ পৃষ্ঠা;

গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাসের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বেঙ্কট কেবল হেত্বাভাসের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধির অনুমান-পরিচ্ছেদের চতুর্থ-আহ্নিকে বিভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থানের এবং স্বোক্তি-বিরোধ প্রভৃতি নানারূপ কথা-দোষ, প্রতিজ্ঞা-দোষ, আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনাবস্থা প্রভৃতি যুক্তি-দোষের বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আমরা ঐ সকল বিভিন্ন দোষের এবং নিগ্রহস্থান প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমরা বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, তত্ত্বমুক্তা-কলাপ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে অদ্বৈতবেদান্তী পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন, দ্বৈতবেদান্তী জগতের সত্যতা সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা কতটুকুই বা জানিতে পারি? আমাদের বেশীর ভাগ জানাই নির্ভর করে অনুমান এবং শব্দ-প্রমাণের উপর। শব্দ-প্রমাণ বৈশেষিক আচার্য্যগণের মতে এক প্রকার অনুমানই বটে। সুতরাং প্রমাণের মধ্যে অনুমান যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

—— ——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপমান

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অনুমান-প্রমাণের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে উপমানের স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে। বৈদান্তিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি কেহই উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।[১] প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণই তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। উপমান তাঁহাদের মতে এক জাতীয় অনুমান, স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। উপমানস্যানুমান এবান্তর্ভাবাৎ—প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬৩ পৃঃ: বৈশেষিক-দর্শনে এবং সাংখ্য-দর্শনেও উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। বৈশেষিকের মতে উপমান একপ্রকার অনুমানই বটে; সাংখ্যের মতে ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অনেক দার্শনিকই উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা দিতে রাজী নহেন। উপমানকে যাঁহারা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং শব্দ-প্রমাণ যে বহু দার্শনিকের সম্মত, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় অনুমান-নিরূপণের পর শব্দ-প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করাই তো স্বাভাবিক। মীমাংসার প্রসিদ্ধ শ্লোক-বার্ত্তিক, শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে অনুমানের পর শব্দ-প্রমাণেরই নিরূপণ করা হইয়াছে; এবং শব্দ-প্রমাণ নিরূপণ করিবার পর উপমান-প্রমাণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বেদান্তপরিভাষার রচয়িতা ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রমাণের স্বরূপ-বিশ্লেষণে অনেকাংশে মীমাংসার পথ অনুসরণ করিলেও, অনুমান-প্রমাণ-বিচারের পর শব্দ-প্রমাণ নিরূপণ না করিয়া, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র উপমান নিরূপণ করিতে গেলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে

১। নন্বেবং ক্বচিৎ সাদৃশ্যাদপ্যর্থবোধাদুপমিতেরপ্যস্তি হেতুত্বমিতি কথং ন তন্নিরূপ্যতে ইতি চেন্ন তস্যানুমানানতিরেকাৎ,

ন্যায়পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-রচিত টীকা ন্যায়সার, ৩৬০ পৃষ্ঠা;

রামকৃষ্ণাধ্বরি তদীয় শিখামণিতে বলিয়াছেন যে, উপমান-প্রমাণ শব্দ-প্রমাণের ন্যায় বিচারবহুল নহে। ইহা স্বল্পায়তন এবং সহজবোধ্যও বটে। এইজন্যই "সূচি-কটাহ-ন্যায়ের[১]" অনুসরণ করতঃ বেদান্তপরিভাষায় প্রথমতঃ উপমান-প্রমাণ নিরূপণ করিয়া, পরে শব্দ-প্রমাণের স্বরূপ বিচার করা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, অপরাপর প্রমাণের তুলনায় বিচারবহুল নহে বলিয়াই যদি "সূচি-কটাহ" ন্যায়ানুসারে প্রথমে উপমান-প্রমাণের বিশ্লেষণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরও নিরূপণের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রমাণ-বিচারের প্রারম্ভে স্বল্পায়তন উপমান-প্রমাণের স্বরূপ বিচার করা হইল না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে রামকৃষ্ণাধ্বরি বলেন যে, চার্ব্বাক ব্যতীত সকল দার্শনিকই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই দুইটি প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অপরাপর প্রমাণ-সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকিলেও এই দুই প্রমাণ-সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। এইজন্য সকল দার্শনিকের অভিপ্রেত বলিয়া প্রথমেই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা এই, উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা দিতে অনেকেরই আপত্তি আছে। যাঁহারা উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণনা করেন না, তাঁহারা প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের মধ্যেই উপমানকে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। ঐ অন্তর্ভাব বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বাহ্নেই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের স্বরূপ জানা প্রয়োজন হয়। এইজন্যই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান-প্রমাণ নিরূপণের পর উপমান-প্রমাণের নিরূপণের প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।[২]

প্রমাণ-বিচারে উপমান-প্রমাণের স্থান নির্দ্দেশ করা গেল। এখন দেখা যাউক যে, উপমানকে যাঁহারা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া দাবী করেন তাঁহাদের সেই দাবীর সত্যতা কতটুকু? উপমান কাহাকে বলে?

১। সূচি-কটাহ-ন্যায়—কোন লৌহশিল্পীকে যদি একটি সূঁচ এবং একটি কড়াই প্রস্তুত করিতে বলা হয়, তবে শিল্পী সেক্ষেত্রে সূঁচটি স্বল্পপ্রয়াস-সাধ্য বলিয়া প্রথমতঃ সূঁচটিই প্রস্তুত করিবে তৎপর শ্রমসাধ্য কড়া প্রস্তুত করিবে। যে-কার্য্যটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াস-সাধ্য মানুষ তাহাই প্রথমে করিবার চেষ্টা করে এবং এইরূপ প্রচেষ্টাই স্বাভাবিক। সূচি-কটাহ-ন্যায় সেই স্বভাবেরই ইঙ্গিত করিয়া থাকে।

২। বেদান্তপরিভাষার শিখামণি টীকা, ১৯৭ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, অন্যের সাদৃশ্য হইতে অন্য বস্তুতে যে সাদৃশ্য-জ্ঞান উদিত হয় তাহারই নাম উপমান। অরণ্যে গবয় বা নীলগরু নামে এক প্রকার পশু আছে। নীলগাই দেখিতে ঠিক গরুর মত। সহরবাসী কোন বুদ্ধিমান্ দর্শক অরণ্যে গিয়া দৈবক্রমে কখনও যদি তাঁহার সম্মুখে গবয়-পশুটিকে দেখিতে পান, তাহা হইলে গবয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গরুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া গবয়-দর্শী ব্যক্তি গৃহে অবস্থিত তাঁহার গরুতেও অবশ্যই গবয়ের সাদৃশ্য অনুভব করিবেন। গরুতে গবয়ের এই সাদৃশ্য-জ্ঞানই অদ্বৈতবাদীর মতে উপমান-জ্ঞান বা উপমিতি বলিয়া জানিবে। গবয়-পশুতে গোর সাদৃশ্য-বোধ এক্ষেত্রে ঐরূপ উপমান-জ্ঞানের করণ বা উপমান-প্রমাণ। গবয় বা নীলগাই দেখিয়া গবয়-পশুতে গরুর যে সাদৃশ্য-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে গবয়-পশুটি দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছে বলিয়া উহা যে প্রত্যক্ষ হইবে, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এখন কথা এই যে, সাদৃশ্য তো আর একে থাকে না, ইহা গবয় এবং গরু এই উভয় পশুতেই আছে। গবয়-পশুটি দর্শকের চক্ষুর গোচরে আছে বলিয়া গবয়ে গোর সাদৃশ্য যে প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা বেশ বুঝা গেল; কিন্তু গো-পশুতে গবয়ের যে সাদৃশ্য আছে, গরুটি চক্ষুর গোচরে না থাকায়, ঐ সাদৃশ্যকে তো প্রত্যক্ষ-গম্য বলা চলে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচরে নিজ গৃহ-প্রাঙ্গনে অবস্থিত গরুতে গবয়-প্রাণীর সাদৃশ্য-বোধ অদ্বৈতবেদান্তীর মতে উপমান-জ্ঞান। চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত গবয়-পশুতে গরুর যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান চক্ষুর অগোচরে অবস্থিত গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞানের (যাহাকে অদ্বৈতবেদান্তী উপমিতি বা উপমান-জ্ঞান বলিতেছেন তাহার) করণ বা সাক্ষাৎ জনক বিধায়, অদ্বৈত-বেদান্তী গবয়ে গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাংখ্য-পণ্ডিতগণ গবয়ে গোর এই সাদৃশ্য-বোধকে প্রত্যক্ষই বলিতে চাহেন। উপমান নামে স্বতন্ত্র প্রমাণ সাংখ্য-দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। সাংখ্য-দার্শনিকগণের যুক্তির মর্ম্ম এই, গবয়-পশুতে এবং গরুতে পরস্পর যে সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্যের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত উভয় পশুর সাদৃশ্যই বস্তুতঃ

এক এবং অভিন্ন। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর অবয়বসমূহ অনেক অংশে তুল্য বা সমান হইলেই, ঐ বস্তু দুইটিকে পরস্পর "সদৃশ" বলা হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য দুই বস্তুতেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় এক বস্তুতে সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে, অপর বস্তুতেও (উভয় বস্তুর সাদৃশ্য অভিন্ন বিধায়) সেই সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হইতে বাধা কি? কেননা উভয় বস্তুর সাদৃশ্য তো আর ভিন্ন কিছু নহে; উহা এক এবং অভিন্ন।[১] নৈয়ায়িক, অদ্বৈত-বেদান্তী এবং মীমাংসক আচার্য্যগণ সাংখ্যকারের উল্লিখিত যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, গবয় এবং গরুর সাদৃশ্য এক এবং অভিন্ন হইলেও, ঐ সাদৃশ্য তো আর সাদৃশ্যের আশ্রয় বা আধার গো-শরীরকে বাদ দিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না, গো-শরীরেই গবয়ের সাদৃশ্য অনুভূত হইবে। এই অবস্থায় গো-শরীরটি (সাদৃশ্যের আশ্রয়টি) যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গোচরে না আসিবে, সেক্ষেত্রে ঐ অপ্রত্যক্ষ গো-শরীরে গবয়-পশুর যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্যকে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বলিবে কিরূপে?

গো-শরীরে গবয়-পশুর যে সাদৃশ্য আছে তাহা যদি প্রত্যক্ষ-গোচর না হইতে পারে, তবে ঐ সাদৃশ্যকে অনুমান-গম্য বলা যাউক। গবয় বা নীলগাই এবং গরু ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্য যখন একই বস্তু তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচরে অবস্থিত গো-শরীরে গবয়ের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ না হইলেও, নিম্নলিখিত প্রকারে তাহার অনুমান হইতে বাধা কি? আমার গরুটি (পক্ষ) গবয় নামক প্রাণীর সদৃশ (সাধ্য), যেহেতু গবয়-পশুতে গরুর যে সাদৃশ্য আছে, গরুটিই সেই সাদৃশ্যের প্রতিযোগী হইয়াছে।[২] যেই বস্তু যেই বস্তুর

১। যত্তু গবয়স্য চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য গোসাদৃশ্যজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমেব। অতএব স্মর্যমাণায়াং গবি গবয়সাদৃশ্যজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, নহ্যন্যদ্ গবি সাদৃশ্যমন্যচ্চ গবয়ে, ভূয়োঽবয়বসামান্যযোগো হি জাত্যন্তরবর্ত্তী জাত্যন্তরে সাদৃশ্যমুচ্যতে, স চেদ্ গবয়ে প্রত্যক্ষো গব্যপি তথেতি নোপমানস্য প্রমেয়ান্তরমস্তি। যত্র প্রমাণান্তরমুপমানং ভবেদিতি ন প্রমাণান্তরমুপমানম্।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, উপমানখণ্ড, ৫ শ্লোক;

২। গবয় পশুতে গরুর যে সাদৃশ্য-জ্ঞানোদয় হয়, সেই সাদৃশ্যের প্রতিযোগী হয় গরু, অনুযোগী হয় গবয়-পশু। যাহার সাদৃশ্য বোধ হয় তাহাকে সাদৃশ্যের প্রতিযোগী বলে, যেই বস্তু বা ব্যক্তিতে সাদৃশ্য-জ্ঞান জন্মে, তাহাকে সাদৃশ্যের অনুযোগী বলা হইয়া থাকে।

সাদৃশ্যের প্রতিযোগী হয়, সেই বস্তু শেষোক্ত বস্তুর সদৃশ হইয়া থাকে। যেমন চন্দ্রে মুখের যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্যের প্রতিযোগী মুখখানি চন্দ্রের সদৃশ বা তুল্য হইয়া থাকে। দ্বৈত-বেদান্তী অনুমান করেন, সম্মুখস্থ এই প্রাণীটির নাম গবয়; কারণ, এই পশুটি গরু নহে, অথচ দেখিতে ইহা ঠিক গরুর মত। যাহা গরু নহে এবং গরুর তুল্যও নহে, তাহা গবয়ও নহে, যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তুরাজি—বিমতো গবয়শব্দবাচ্যঃ, অগোত্বে সতি গোসদৃশত্বাৎ ব্যতিরেকেণ ঘটবৎ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬১ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব বিঃ সং; আলোচ্য অনুমান-প্রমাণমূলে যাঁহারা উপমানকে বাদ দিতে চাহেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তকেও নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লওয়া চলে না। কেননা, উল্লিখিত অনুমান করিতে হইলেই অনুমানের হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের জন্য, গরু এবং গবয়-পশুকে পাশাপাশি রাখিয়া বার বার পরস্পরের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে উভয়ের সাদৃশ্যের ভূয়ো-দর্শন হইলেই, অনুমানের হেতু ব্যপ্তি-নিশ্চয় সম্ভবপর হয়; এবং পূর্বোক্ত অনুমান-বাক্যের প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু যেই সহরবাসী ব্যক্তি কখনও গবয়-পশু বা নীলগাই দেখে নাই, কেবল গরুই দেখিয়া আসিয়াছে, ঐরূপ সহরবাসী ব্যক্তির গরু এবং গবয়-পশুর সাদৃশ্য বার-বারের কথা কি, একবারও গরু এবং গবয়কে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই। অথচ ঐরূপ সহরবাসী ব্যক্তিও যদি বনে গিয়া দৈবক্রমে তাহার সম্মুখে গবয়-পশু দেখিতে পায়, তবে ঐ পশুকে সে গবয় বলিয়া না চিনিলেও, ঐ গবয়-পশুতে সে গরুর সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষ্য করিবে। ফলে, গরুতেও ক্রমে গবয়-পশুর সাদৃশ্য-জ্ঞানের উদয় হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তো সহরবাসী দর্শকের গরু ও গবয়-পশুর সাদৃশ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান নাই: এখানে অনুমানের সাহায্যে গরুতে গবয়ের সাদৃশ্যের উপপাদন করিবে কিরূপে[১]? এই জ্ঞান সাদৃশ্যমূলে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া গরুতে

১। নচেদমুপমানং প্রত্যক্ষান্তর্গতম্। অনিন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টত্বান্নগরস্থস্য গোঃ। ন চানুমানম্, অগৃহীতসম্বন্ধস্যাপ্যুপজায়মানত্বাৎ। এবং কিলানুমীয়েত গৌ র্গবয়-সদৃশো গবয়সাদৃশ্যপ্রতিযোগিত্বাৎ, যদ্ যৎসাদৃশ্যপ্রতিযোগি তৎ তৎসদৃশং দৃষ্টম্; ন চেদং যুক্তম্ যোহি দ্বাবর্থৌ মিথঃ সদৃশৌ যুগপন্ন দৃষ্টবানেকামেবতু গামুপলভ্য নগরে বনে গবয়ং পশ্যতি সোঽপি গাং গবয়সাদৃশ্যবিশিষ্টামুপমিনোত্যেব, তস্মান্নানুমনম্। শাস্ত্রদীপিকা, তর্কপাদ, উপমান-প্রামাণ্য-সমর্থন, ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

গবয়ের সাদৃশ্য-বোধকে উপমিতি বা উপমান-জ্ঞান বলাইতো যুক্তি-সঙ্গত। দ্বিতীয় কথা এই যে, গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য-বোধ অনুমান-প্রমাণের ফল হইলে, গরুতে "গবয়ের সাদৃশ্যের অনুমান করিলাম" এই-রূপেই গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য আমাদের অনুভবের (মানস-প্রত্যক্ষের) গোচর হইত। "আমার গরুটি গবয়-পশুর ন্যায়" এইরূপে সাদৃশ্যটি প্রধানভাবে আমাদের জ্ঞানে ভাসিত না। অতএব অনুভবের ভিত্তিতে বিচার করিলে, উপমানকে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের ন্যায় স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়াই সঙ্গত নহে কি? নৈয়ায়িক, মীমাংসক, অদ্বৈত-বেদান্তী প্রভৃতি সকলেই উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য নৈয়ায়িকের উপমান-প্রমাণের উপপাদন এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর উপ-পাদনের মধ্যে যে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য আছে, তাহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। অদ্বৈত-বেদান্তী গবয়-পশুতে গোর সাদৃশ্য-বোধকে প্রত্যক্ষ এবং ঐ প্রত্যক্ষমূলে অপ্রত্যক্ষ গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞানকে উপমান-জ্ঞান বা উপমিতি বলেন। অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে গবয়ে গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ আলোচিত উপমান-জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন বা উপমান-প্রমাণ।

রামানুজ-মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, রামানুজ-সম্প্রদায় গবয়ে গোর সাদৃশ্য-বোধ (যাহাকে অদ্বৈত-বেদান্তী প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন) এবং গরুতে গবয়-পশুর সাদৃশ্য-জ্ঞান, এই উভয় প্রকার সাদৃশ্য-জ্ঞানকেই অনুমানের ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপমান নামে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। রামানুজোক্ত সাদৃশ্য-অনুমানের প্রয়োগ-বাক্য কিরূপ হইবে, তাহা বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধির টীকাকার শ্রীনিবাস তদীয় টীকা ন্যায়-সারে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন।[১] চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত গবয়-পশুতে গোর সাদৃশ্য-বোধকে সহজেই প্রত্যক্ষ বলা চলে, সেস্থলেও অনুমান-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করায় রামানুজের সিদ্ধান্তকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায়

১। ইয়ং গবয়ব্যক্তি র্জাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তদ্যোতকগোসাদৃশ্যবতী তন্নিরূপিত ব্যক্তিত্বাৎ গবয়ান্তরবৎ।......যদা পুনরনেন সদৃশী মদীয়া গৌরিতি তদাপি মদীয়া গৌঃ তাদৃশগোবৎসাদৃশ্যাধিকরণং গবয়ান্তরবদিতি সুলভঃ পন্থাঃ। শ্রীনিবাস-কৃত ন্যায়সার, ৩৬০ পৃষ্ঠা ;

না। অপ্রত্যক্ষ গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য-বোধকে (যাহাকে অদ্বৈতবাদী উপমান বা উপমিতি বলেন) অনুমানের সাহায্যে প্রতিপাদন করার যে-চেষ্টা রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপমান-প্রমাণ-বিচারে দেখা যায়, তাহাও অনুমানের হেতু ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতির নিরূপণ দুরূহ বলিয়া, মাধ্ব প্রভৃতির প্রদর্শিত অনুমানকে যেমন গ্রহণ করা হয় নাই, সেইরূপই গ্রহণ করা চলে না। তারপর, আলোচিত সাদৃশ্য-বোধকে শব্দ-প্রমাণগম্য বলিয়া রামানুজের মতে ব্যাখ্যা করার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, যেই অরণ্যবাসী বৃদ্ধের কথা শুনিয়া গরু এবং গবয়-পশুর পরস্পর সাদৃশ্য-বোধ উদিত হইবে, সেই অরণ্যবাসী বৃদ্ধ যে সত্যবাদী, তাহা তুমি বুঝিলে কিরূপে? আর তাহা বুঝিলেও, গরু এবং গবয় এই উভয় পশুতে বিদ্যমান সাদৃশ্যকে তো গো এবং গবয় এই কোন শব্দেরই বাচ্যার্থ বলা যায় না। ফলে, সাদৃশ্য-বোধকে শব্দ-প্রমাণগম্যও বলা চলে না। সাদৃশ্য-বোধের জন্য উপমান নামে স্বতন্ত্র প্রমাণই স্বীকার করিতে হয়।

উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বিশেষভাবে পরিচিত কোন পদার্থের সহিত কোনও অজ্ঞাত পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে, সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ-দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া ঐ বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পূর্ব্বে সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকারী যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। তাহার ফলে সে বুঝিতে পারে যে, আমার অপরিচিত এই পদার্থটি অমুক পদার্থ। এইরূপ বস্তু-পরিচয়ই ন্যায়-মতে উপমিতি বা উপমান-জ্ঞান। অজ্ঞাত বস্তুতে পরিচিত বা জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ আলোচিত উপমান-জ্ঞানের করণ বা উপমান-প্রমাণ। অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে পূর্ব্বে শ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ এক্ষেত্রে করণের অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ব্যাপার। যাঁহারা করণের ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিতে চাহেন, সেই প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণই মুখ্য উপমান-প্রমাণ বলিয়া জানিবে।[১] গবয় বা নীল-

১। গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশ্যতো গবয়াদিকং।
সাদৃশ্যধী র্গবাদীনাং যা স্যাৎ সা করণং মতম্॥
বাক্যার্থস্যাতিদেশস্য স্মৃতির্ব্যাপার উচ্যতে।
গবয়াদিপদানাস্তু শক্তিধীরুপমাফলম্॥
ভাষাপরিচ্ছেদ, ৭৯-৮০ কারিকা, এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলী দেখুন;

গাই নামে অরণ্যে একপ্রকার পশু দেখিতে পাওয়া যায়। সহরবাসী ঐ পশু কখনও দেখে নাই; কিন্তু অভিজ্ঞ অরণ্যবাসীর নিকট শুনিয়াছে যে, "গবয়-পশু দেখিতে ঠিক গরুরই মত"। ঘটনাক্রমে ঐ সহরবাসী লোকটি বনে গিয়া একদিন একটি গবয়-পশু দেখিতে পাইল এবং ঐ গবয়-পশুতে গরুর পূর্ণ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল। এই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরমুহূর্ত্তেই সে পূর্ব্বে যে অভিজ্ঞ অরণ্য-বাসীর নিকট শুনিয়াছিল, "গবয়-পশু দেখিতে ঠিক গরুর মত," সেই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল; এবং তাহার ফলে সে বুঝিল যে, এই প্রাণীটি গবয়ই বটে, গবয় ছাড়া অন্য কিছু নহে। ইহাই ন্যায়ের মতে উপমিতি বা সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষরূপ উপমান-প্রমাণের ফল। অদ্বৈত-বেদান্তী গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকে উপমিতি বলিয়াছেন। আর নৈয়ায়িক অপরিচিত গবয়-পশুকে গবয় নামে চেনাকেই (অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট গবয়-পশুই গবয় শব্দের বাচ্য, এইরূপে গবয়-পশু এবং গবয় শব্দের বাচ্য-বাচকতার বা সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর বোধকেই) উপমান-প্রমাণের ফল বা উপমিতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] অদ্বৈত-বেদান্তের মতে আমরা দেখিয়াছি যে, গরুতে গবয়ের সাদৃশ্য-বোধই উপমিতি বা উপমান-প্রমাণের ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপমান-প্রমাণের ফল-সম্পর্কেও নৈয়ায়িক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উপমানের করণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, অদ্বৈত-বেদান্তী গবয়-পশুতে গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকে উপমিতির সাক্ষাৎ সাধন বা উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নৈয়ায়িক গবয়ে গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকে উপমিতির করণ বলিয়া মানিলেও, তাঁহারা এখানেই

১। মাধ্ব-পণ্ডিতগণও নৈয়ায়িকের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করিয়াই উপমান-জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—অতিদেশবাক্যার্থস্মরণসহকৃত গোসাদৃশ্য-বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞানমুপমানম। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬৩ পৃষ্ঠা; অবশ্যই উপমানকে তাঁহারা নৈয়ায়িকের ন্যায় স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই; এক শ্রেণীর অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। মাধ্বোক্ত অনুমানের হেতু-সাধ্যের নির্ভুল ব্যাপ্তি-বোধ কিভাবে উৎপন্ন হইবে, সে-সম্পর্কে মাধ্ব-পণ্ডিতগণ পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলেন নাই। অনুমানের মূল ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতির অভাব বশতঃ মাধ্ব-প্রদর্শিত অনুমান যে গ্রহণ-যোগ্য নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ক্ষান্ত হন নাই। অরণ্যস্থ পশু-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধের বাক্যকে এবং সেই বাক্যার্থের স্মৃতিকেও নৈয়ায়িক উপমিতির সাধনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। বৃদ্ধ নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় গবয়ে গোর সাদৃশ্যকে উপমিতির প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া, বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধের "গবয় দেখিতে ঠিক গরুর মত" এইরূপ বাক্যের অর্থ-বোধকেই উপমানের করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত বাক্যার্থের স্মরণ আলোচিত করণের ব্যাপার। গবয়ে গোর সাদৃশ্য-বোধ এই মতে উপমান-জ্ঞানের সহকারী কারণ, করণ নহে। নব্যনৈয়ায়িক-মতের আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁহাদের মত বৃদ্ধ নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নব্য-মতে গবয়ে গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষই উপমিতির প্রধান কারণ বা উপমান-প্রমাণ। অভিজ্ঞ বৃদ্ধের বাক্যার্থের স্মৃতি, এই মতে সহকারী কারণ। তত্ত্বচিন্তামণির রচয়িতা নব্য ন্যায়গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার "উপমান-চিন্তামণি" গ্রন্থে জয়ন্তভট্ট প্রভৃতির মত বলিয়া আলোচিত নব্য-মতের সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ অভিজ্ঞ বৃদ্ধের বাক্যার্থের স্মৃতি-সহকৃত সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, নব্য-মতেরই অনুমোদন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে উপমান-প্রমাণ-খণ্ডনের প্রারম্ভে "যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ", এইরূপ অভিজ্ঞ বৃদ্ধের বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, তদীয় ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির মতের অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতই যে সমধিক প্রসিদ্ধ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসার মতের আলোচনায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক শ্রেণীর মীমাংসকও অভিজ্ঞ বৃদ্ধের উল্লিখিত বাক্যকেই উপমান-প্রমাণ বলিতেন। শবরস্বামীর সম্প্রদায় কিন্তু এই মত অনুমোদন করেন নাই, তাঁহারা আলোচ্য সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। মূল কথা, উপমান-প্রমাণের ফল-সম্পর্কে যেমন দার্শনিকগণের মধ্যে মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, উপমান-প্রমাণের স্বরূপ-সম্পর্কেও সেইরূপ দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতানৈক্য দেখা যায়। চিন্তা-জগতে ইহা সজীবতার লক্ষণ সন্দেহ নাই।

আলোচিত ন্যায়-মতের বিরুদ্ধে অদ্বৈত-বেদান্তীর বক্তব্য এই যে, যিনি

পূর্ব্বে অরণ্যবাসী অভিজ্ঞ বৃদ্ধের উপদেশ শুনিবার সুযোগ পান নাই, ঐরূপ বুদ্ধিমান্ দর্শকেরও অরণ্যে গিয়া গবয়-পশু দেখিবামাত্র গবয়-পশুতে পূর্ব্বপরিচিত গোর সাদৃশ্য-বোধ অবশ্যই উদিত হইবে ; এই সাদৃশ্য গরু এবং গবয়, এই উভয় পশুতেই সমানভাবে আছে। ফলে, অপ্রত্যক্ষ গৃহস্থিত গরুতেও গবয়ের সাদৃশ্য-বোধ অবশ্যই জন্মিবে। গরুতে গবয়ের এই সাদৃশ্য-বোধই উপমিতি বা উপমান-জ্ঞান। এইরূপ উপমিতিতে অভিজ্ঞ বৃদ্ধের উক্তি কোন কাজেই লাগিতেছে না। এই অবস্থায় বৃদ্ধের বচনকে কিংবা বৃদ্ধের বাক্যার্থের স্মৃতিকে উপমানের হেতুর মধ্যে টানিয়া আনার কোনই অর্থ হয় না। নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও একটা আপত্তি এই যে, গবয়-পশুতে গবয়-শব্দের শক্তি-বোধ বা অর্থ-নিশ্চয়ই যদি ন্যায়-মতে উপমান-প্রমাণের ফল দাঁড়ায়, তবে, এইরূপ উপমান-প্রমাণকে মুক্তির সহায়ক বলিবে কিরূপে? শব্দার্থের শক্তি-নির্ণয় ছাড়া দার্শনিক তত্ত্ব-নির্ণয়ে উপমান-প্রমাণের প্রয়োগ পাওয়া গেলেই মোক্ষ-শাস্ত্রে উপমান-প্রমাণ-নিরূপণের সার্থকতা বুঝা যায়। মীমাংসক ও অদ্বৈত-বেদান্তী এইরূপেই উপমান-প্রমাণের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট তদীয় শ্লোকবার্ত্তিকে এবং শবরস্বামী তাঁহার মীমাংসা-ভাষ্যে উপমান-প্রমাণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে অপরাপর প্রমাণের ন্যায় সাদৃশ্য-মূলে বিবিধ তত্ত্ব নিরূপণই যে উপমান-প্রমাণের লক্ষ্য, তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বেদে সাদৃশ্যমূলে অনেক জটিল তত্ত্ব-প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্ব-বোধ যে উপমানের সাহায্যেই উদিত হয়, ইহা কে না স্বীকার করিবে? উপমান সাদৃশ্যমূলে বেদার্থ প্রকাশের সহায়ক হইয়া যে মুক্তির উপযোগী হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ন্যায়-সিদ্ধান্তে উপমানের সেইরূপ উপযোগিতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়-মতের সমর্থনে বলা যায় যে, মহর্ষি গৌতম যখন মীমাংসকের ন্যায় উপমানকে স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন শব্দার্থের নিশ্চয় ছাড়া, বিবিধ তত্ত্ব-নিশ্চয়ও যে উপমানের লক্ষ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উপমান-লক্ষণ-সূত্র-ভাষ্যে "এইরূপ অন্যও উপমান-প্রমাণের বিষয় বলিয়া জানিবে"[১], এই কথা-দ্বারা শব্দার্থের শক্তি-নিশ্চয় ছাড়া, স্থলবিশেষে বিবিধ তত্ত্ব-

---

১। এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্য ইতি। ন্যায়ভাষ্য, ১।১।৬,

নির্ণয়ও যে উপমান-প্রমাণের লক্ষ্য, তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তারপর ইহাও দেখা যায় যে, স্থলবিশেষে কোন কোন শব্দের অর্থ-নিশ্চয় উপমান-প্রমাণের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়, উহা সেখানে অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে হইতেই পারে না। এইজন্য স্থলবিশেষে শব্দের শক্তি বা অর্থ-নিশ্চয়ও যে উপমান-প্রমাণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

গৌতমোক্ত উপমান-প্রমাণের তাৎপর্য্য উল্লিখিতরূপে ব্যাখ্যা করিলে, উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় অদ্বৈত-বেদান্তী এবং মীমাংসক প্রভৃতির মতের সহিত ন্যায়-মতের যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারও অনেকটা অবসান হয়। অবশ্য অনেক নৈয়ায়িকই হয়তো এইভাবে মহর্ষি গৌতমের মতে উপমান-প্রমাণ-রহস্য ব্যাখ্যা করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদেরও একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ন্যায়-মতে অনুমানের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি যে পাঁচটি অবয়বের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে চতুর্থ অবয়ব উপনয়-বাক্যটিকে স্পষ্টবাক্যেই ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উপমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—উপমানমুপনয়-স্তথেত্যুপসংহারাৎ। ন্যায়ভাষ্য, ১।১।৩৯, নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "তথাচায়ম্" এইরূপ উপনয়-বাক্যে তথা শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য সূচিত হওয়ায়, সেই সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণই বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, তিনি সাদৃশ্যমূলক জ্ঞানমাত্রকেই উপমান বলিতে চাহেন। কেবল শব্দার্থের বা সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর নির্ণয়কেই ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উপমান বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। শব্দার্থের নিশ্চয় যদি কোথায়ও সাদৃশ্যমূলে উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে উপমান বলিতে অবশ্য বাধা নাই। তবে শব্দার্থের শক্তি-নিশ্চয়ই কেবল উপমান-প্রমাণের লক্ষ্য নহে; ইহাই ন্যায়-ভাষ্যকার তাঁহার উপনয়-বাক্যের ব্যাখ্যায় প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈধর্ম্ম্যোপমিতি

উপমান-জ্ঞান যে কেবল সাদৃশ্যমূলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এমন নহে। বৈসাদৃশ্য বা বৈধর্ম্ম্যমূলেও স্থলবিশেষে উপমান-জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। সুতরাং সাদৃশ্য-প্রমাকরণমুপমানম্, বেদান্তপরিভাষা, :৯৭ পৃঃ, বোম্বে সং; সাদৃশ্য-জ্ঞানের যাহা করণ বা সাক্ষাৎ সাধন তাহাই উপমান-প্রমাণ, এইরূপে বেদান্ত-

পরিভাষায় উপমান-প্রমাণের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ লক্ষণকে "প্রায়িক" বলিয়া বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ প্রায়শঃ সাদৃশ্যমূলেই উপমান-জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায় বলিয়া, সাদৃশ্য-জ্ঞানের করণকে উপমান বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বৈসাদৃশ্যমূলে কখনও উপমান-জ্ঞানের উদয় হইবে না, এমন কোন অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত করা হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে কি সাদৃশ্য, কি বৈসাদৃশ্য, উভয় প্রকার জ্ঞানমূলেই যে-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই উপমান-জ্ঞান বা উপমিতি বলিয়া জানিবে। ন্যায়গুরু মহর্ষি গৌতমও ন্যায়সূত্রে জ্ঞাত পদার্থের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যমূলে অজ্ঞাত পদার্থের সাধনকে উপমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎসাধ্যসাধনমুপমানম্। ন্যায়সূত্র, ১।১।৬; গৌতমোক্ত উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় সত্যের অনুরোধে সাদৃশ্য বা সাধর্ম্ম্যের ন্যায় বৈসাদৃশ্যমূলেও যে কোন কোন স্থলে উপমান-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে তাহা স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি বলেন যে "গবয়-পশু দেখিতে ঠিক গরুর মত" এইরূপ বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধের কথা শুনিবার পর বনে গিয়া গবয়-পশুতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন বুদ্ধিমান্ দর্শক বুঝিতে পারেন যে, এই জাতীয় পশুর নামই "গবয়", সেইরূপ উটের গলা অতিশয় লম্বা, পীঠ কুঁজা, উট দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত, উট কাঁটা খাইতে ভালবাসে, উট যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার নিকট উটের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া, পূর্ব্বে যিনি কখনও উট দেখেন নাই এইরূপ কোনও ব্যক্তি যদি দৈবাৎ কোথায়ও উট দেখিতে পান, তবে সেই ব্যক্তি উটের লম্বা গলা এবং পীঠের কুঁজ প্রভৃতি দেখিয়া উটে গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি পশুর বৈসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, ঐ লম্বা গলা, পীঠ কুঁজা, কাঁটাভোজী কুৎসিত পশুটি যে উট, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। তাঁহার এই জ্ঞান সাদৃশ্যমূলে উৎপন্ন হয় নাই, উটে অন্যান্য পশুর বৈসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ফলেই উদিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সাদৃশ্যের ন্যায় বৈসাদৃশ্য বা বৈধর্ম্ম্যমূলেও যে উপমান-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি জানকীনাথ তাঁহার ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীতে উপমান-প্রমাণের বিবরণে সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যের ন্যায় বৈধর্ম্ম্যকেও স্থলবিশেষে উপমান-

জ্ঞানের সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বরদরাজ তদীয় তার্কিক-রক্ষা গ্রন্থে গৌতম-সূত্রোক্ত উপমান-প্রমাণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, সূত্রস্থ সাধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য এবং ধর্ম্ম, এই তিনকেই গ্রহণ করিয়াছেন; এবং উপমানকেও ফলে তিনি (১) সাধর্ম্ম্যোপমিতি, (২) বৈধর্ম্ম্যোপমিতি এবং (৩) ধর্ম্মোপমিতি, এই তিন প্রকারের বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য্য-টীকায় গৌতম-সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দকে ধর্ম্মমাত্রের উপলক্ষণ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। সূত্রস্থ "সাধর্ম্ম্য" শব্দ ধর্ম্মমাত্রের বোধক হইলে, ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের মতেও সাধর্ম্ম্যোপমিতির ন্যায় বৈধর্ম্ম্যোপমিতিরও উপপত্তি করা সহজ-সাধ্য হয়; এবং বাচস্পতি, বরদরাজ প্রভৃতির বৈধর্ম্ম্যোপমিতির ব্যাখ্যা যে সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী এমন কথাও বলা চলে না। আলোচিত "বৈধর্ম্ম্যোপমিতি" যে ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নেরও অভিপ্রেত ইহা বুঝাইবার জন্যই ন্যায়াচার্য্য বাৎস্যায়ন উপমান-লক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন, "ইহা ছাড়া আরও অনেক উপমানের বিষয় আছে"। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উপমানের বহুবিধ উদাহরণ তাঁহার ভাষ্য-মধ্যে প্রদর্শন করিয়াও ভাষ্য-শেষে ঐরূপ মন্তব্য করার উদ্দেশ্য বাচস্পতি এবং বরদরাজ প্রভৃতির মতে এই যে, সাধর্ম্ম্যোপমিতির ন্যায় বৈধর্ম্ম্যোপমিতিও স্থলবিশেষে না মানিয়া উপায় নাই। অদ্বৈত-বেদান্তের মতে আলোচিত বৈধর্ম্ম্যোপমিতির সাহায্যেই সচ্চিদানন্দ পর-ব্রহ্মের তুলনায় মায়াময় জড় প্রপঞ্চের নশ্বরতা আমরা বুঝিতে পারি। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয়। উপমান-প্রমাণের সাহায্যে মিথ্যা জগৎ এবং সত্য, সনাতন পরব্রহ্মের বৈসাদৃশ্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই বেদান্ত-জিজ্ঞাসায় উপমান-প্রমাণ নিরূপণের সার্থকতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শব্দ-প্রমাণ

উপমান-প্রমাণ নিরূপণ করার পর এই প্রবন্ধে শব্দ-প্রমাণ নিরূপণ করা যাইতেছে। বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক-দর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই দুইটিমাত্র প্রমাণ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, শব্দকে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের ন্যায় স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের মতে শব্দ শোনার পর ঐ শব্দমূলে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা এক প্রকার মানস-প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ-তার্কিকগণ বলেন, "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্য শুনিলে প্রথমতঃ বাক্যস্থ পদ এবং পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তারপর মনের সাহায্যেই গরুর অস্তিত্ব-বোধের উদয় হইয়া থাকে। এইজন্য বৌদ্ধ-মতে শব্দজ-জ্ঞান মানস-প্রত্যক্ষই বটে; মানস-প্রত্যক্ষ ভিন্ন কিছু নহে। বৈশেষিকের সিদ্ধান্তে শব্দ-প্রমাণ এক জাতীয় অনুমান, স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে,। বৈশেষিক শব্দ-প্রমাণকে "শব্দ-অনুমান" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ "অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই শব্দ-প্রমাণেরও ব্যাখ্যা করা হইল" (এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্, বৈশেষিক-সূত্র, ৯ অঃ ২য় আঃ ৩ সূত্র;) সূত্রের এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা শব্দজ-বোধকে এক শ্রেণীর অনুমান বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিক-ভাষ্যকার প্রশস্তপাদও শব্দ এবং উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে অসঙ্কোচে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—শব্দাদীনামপ্যনুমানেঽন্তর্ভাবঃ। প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, ২১৩ পৃষ্ঠা, বিজয়নগর সং; এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকও শব্দকে এক জাতীয় অনুমান বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। বৈশেষিক-সূত্রকার কণাদ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। আলোচ্য স্বাভাবিক-সম্বন্ধ অনুমানের হেতু "ব্যাপ্তি"রই নামান্তর। মহর্ষি কণাদের মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি থাকায়, ঐ ব্যাপ্তিমূলে বিভিন্ন শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অনুমান হইয়া থাকে। শব্দ শোনার পর কিরূপ হেতুবলে, কি প্রণালীতে সেই শব্দ-গম্য অর্থের

শব্দ যে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ, এই মতের সমর্থন

অনুমান হইবে; বৈশেষিকোক্ত শব্দ-অনুমানের হেতু সাধ্য কি হইবে, প্রয়োগ-বাক্যটি কিরূপ দাঁড়াইবে, এই সকল সম্পর্কে মহর্ষি কণাদ তাঁহার সূত্রে স্পষ্টতঃ কিছুই বলেন নাই। বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈশেষিক আচার্য্যগণ নানাবিধ অনুমান-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া, কণাদ-কথিত শব্দ-অনুমান উপপাদন করিয়াছেন।[১] বৈদান্তিক এবং মীমাংসক পণ্ডিতগণও শব্দ এবং অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা কণাদের ন্যায় শব্দ-প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ শব্দ ও অর্থের কণাদোক্ত স্বাভাবিক-সম্বন্ধ অনুমোদন করেন নাই, ঐ মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যখন একই শব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝিতেছে দেখা যায়, সকল দেশে সকল জাতি সমানভাবে শব্দের অর্থ বোঝে না, তখন কেমন করিয়া শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়?[২] শব্দ হইলেই তাহা যে সকল দেশে একরূপ অর্থই বুঝাইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শব্দের অর্থের সুস্পষ্ট ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই দেশে যে শব্দের যেই অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, অন্য দেশে হয়তো দেখা যাইবে যে, সেই শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃতই হয় না, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থই প্রকাশ করে। আর্য্যগণ যব-শব্দে গোধূম বোঝেন, ম্লেচ্ছগণ কাউন বোঝেন; এবং ঐ অর্থেই যব-শব্দের প্রয়োগ করেন। চৌর বলিলে

১। পদানি স্মারিতার্থসংসর্গবিজ্ঞপ্তিপূর্ব্বকাণি যোগ্যতাসত্তিমত্ত্বে সতি সংসৃষ্টার্থপরত্বাৎ গামভ্যাজেতি পদকদম্বকবদিত্যনুমানেন সাধ্যসিদ্ধেঃ। ন্যায়লীলাবতী, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন এক প্রাচীন বৈশেষিক-সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এই সম্প্রদায়ের মতে শব্দ-প্রমাণ অনুমান নহে, পৃথক্ আর একটি প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রমাণই এই সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের ব্যোমবতী-বৃত্তিতে ব্যোমশিবাচার্য্য এই মতের বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিবরণ জানিবার জন্য আমাদের বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ, ১ম খণ্ড, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা দেখুন;

২। জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ। ন্যায়সূত্র, ২য় অঃ ১ম আঃ ৫৬ সূত্র; এবং ঐ সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য দ্রষ্টব্য;

আমরা পরস্বাপহারী তস্কর বুঝি, দাক্ষিণাত্যগণ ভাত বোঝেন। এইরূপে দেশ-ভেদে শব্দার্থের ভেদ সুধীমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আধুনিক বিবিধ শব্দ হইতেও নানাপ্রকার অর্থ-বোধ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় কোনমতেই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ স্বীকার করা চলে না। শব্দ-সঙ্কেত হইতে শব্দার্থ-বোধের উদয় হয়; এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হয়। যদি বল যে, "সকল শব্দেরই সকল অর্থের সহিত স্বাভাবিক-সম্বন্ধ আছে। বিভিন্ন দেশে যে অর্থে যেই শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই অর্থের সহিতও সেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে।" বিভিন্ন দেশে কোন বিশেষ অর্থে সেই শব্দের সঙ্কেত-জ্ঞাননিবন্ধন সেই বিশেষ অর্থেরই বোধ হইয়া থাকে; এবং সেই অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দার্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধবাদীর উল্লিখিত মতের প্রতিবাদ করিয়া জয়ন্তভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে এবং বাচস্পতি মিশ্র তদীয় ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায় বলিয়াছেন, "সকল পদার্থের সহিতই সকল শব্দের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ আছে বলিলে, সকল শব্দের দ্বারাই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। সুতরাং স্বাভাবিক-সম্বন্ধবাদীরও অর্থবিশেষের সহিতই শব্দবিশেষের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবার দেশভেদে যে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহা উপপন্ন হইবে না। অর্থমাত্রের সহিত শব্দমাত্রের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ থাকিলেও, অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেত স্বীকার করায় শব্দার্থ-বোধের ব্যবস্থা বা নিয়ম উপপন্ন হয়, ইহা বলিতে পারিলেও অর্থমাত্রের সহিত শব্দমাত্রের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ আছে, এবিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায়, উহা স্বীকার করা যায় না। দেশভেদে যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেত-ভেদ প্রযুক্তও উপপন্ন হইতে পারায়, অর্থমাত্রের সহিত শব্দমাত্রের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক"[১]।

শব্দ-সঙ্কেত কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, "এই শব্দ হইতে এই অর্থের বোধ হইবে" এইরূপ ইচ্ছার নামই শব্দ-সঙ্কেত। সৃষ্টির উষায় জগৎপিতা পরমেশ্বরই আলোচ্য

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ন্যায়-দর্শন, ২য় খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা;

শব্দ-সঙ্কেতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কোন্ শব্দ হইতে কোন্ অর্থের বোধ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শব্দ-সঙ্কেতকে এইরূপে ঈশ্বরাধীন, অনাদি এবং অপৌরুষেয় বলিলে, দেশভেদে শব্দের অর্থের যে বিভেদ পরিলক্ষিত হয়, এবং আধুনিক বিবিধ শব্দ হইতে যে বিভিন্ন অর্থ-বোধ উৎপন্ন হয়, তাহার উপপাদন দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণ আলোচ্য শব্দ-সঙ্কেতকে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন না বলিয়া, জ্ঞানগুরু মহর্ষিগণের ইচ্ছাধীন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে পুরুষের ইচ্ছার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায়, শব্দ-সঙ্কেতও নানা প্রকারের হইতে দেখা যায়। অবশ্য উদ্দ্যোতকর প্রমুখ প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণের উক্ত অভিমত নব্য-নৈয়ায়িকগণ গ্রহণ করেন নাই। গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নব্য-নৈয়ায়িকগণের মতে আলোচ্য শব্দ-সঙ্কেত মনুষ্য-সৃষ্ট নহে, উহা পরমেশ্বর-কৃত। পরমেশ্বর শব্দ-সঙ্কেত সৃষ্টি করিয়া, সৃষ্টির উষায় ঈশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণকে ঐ সঙ্কেত বুঝাইয়া দিয়াছেন; পরে সেই শব্দার্থবিদ্ মনীষিগণের ব্যবহার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে কোন্ শব্দের কি অর্থ তাহা জনসাধারণ বুঝিয়া লইয়াছে। পরমেশ্বরের জ্ঞান নিত্য। ঈশ্বর-সৃষ্ট শব্দ-সঙ্কেতও সুতরাং অনাদি এবং নিত্যসিদ্ধ। ঈশ্বর পূর্ব্বাচার্য্যগণেরও গুরু। সেই জগদ্গুরুর অনুগ্রহেই জগতে জ্ঞানালোকের বিকাশ হইয়াছে এবং হইতেছে। শব্দ-সঙ্কেত অনাদি এবং নিত্যসিদ্ধ হইলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে শব্দার্থের ভেদ হয় কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই নব্য-মতের সমর্থকগণ বলেন যে, ইহাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। ঈশ্বরেচ্ছা অপ্রতিহত। ঈশ্বরের সেই অপ্রতিহত ইচ্ছাবশেই বিভিন্ন দেশে শব্দ-সঙ্কেতেরও ভেদ হইয়া থাকে। আধুনিক শব্দে ঐরূপ নিত্য শব্দ-সঙ্কেত নাই বটে; এবং তাহা নাই বলিয়াই এই মতে আধুনিক শব্দকে বাচক শব্দ বলা হয় না, পারিভাষিক শব্দ বলা হইয়া থাকে। পারিভাষিক আধুনিক শব্দে প্রকৃতপক্ষে নিত্য শব্দ-সঙ্কেত না থাকিলেও, আধুনিক শব্দে অনাদি শব্দ-সঙ্কেতেরই ভ্রম হইয়া থাকে। শব্দ-সঙ্কেতের ঐরূপ ভ্রান্তিবশতঃই আধুনিক শব্দের প্রয়োগ এবং তন্মূলে আধুনিক শব্দার্থ-বোধ উদিত হয়। নিত্য শব্দ-সঙ্কেতবিশিষ্ট শব্দকে বাচক-শব্দ বলে। এই নিত্য শব্দ-সঙ্কেতেরই অপর নাম শব্দ-শক্তি। শব্দ-সঙ্কেত

যে, আজানিক বা নিত্য এবং আধুনিক এই দুই প্রকার, তাহা প্রসিদ্ধ দার্শনিক-বৈয়াকরণ পণ্ডিত ভর্তৃহরি তাঁহার গ্রন্থে বিবিধ যুক্তির সাহায্যে উপপাদন করিয়াছেন। নিত্য শব্দ-সঙ্কেত স্বীকার করিয়া নব্য-নৈয়ায়িকগণ বাচক-শব্দের অর্থ-বোধের জন্য শব্দ-বিজ্ঞানের মধ্যে যে পরমেশ্বরকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া যাঁহারা শব্দার্থের অনুশীলন করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের কিছুতেই মনঃপূত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহাদের কি শব্দার্থের বোধ হইবে না? এই সকল কারণে শব্দ-সঙ্কেতকে ঈশ্বর-কৃত না বলিয়া, বিশেষজ্ঞ পুরুষ-কৃত বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। শব্দ-সঙ্কেত ঈশ্বর-কৃত, না পুরুষ-কৃত, এ-বিষয়ে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-ভেদ দেখা গেলেও, শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে কোনরূপ স্বাভাবিক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নাই, এবং আলোচিত শব্দ-সঙ্কেত বা শব্দ-শক্তি-বশতঃই যে শব্দার্থের বোধ হইয়া থাকে, এ-বিষয়ে সকল নৈয়ায়িকই একমত। মহর্ষি কণাদ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও বৈশেষিক আচার্য্যগণের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায় না। বৈশেষিক-দর্শনের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর ভট্ট তাঁহার ন্যায়-কন্দলী-টীকায় কণাদ-সম্মত শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ খণ্ডন-পূর্ব্বক ন্যায়োক্ত শব্দ-সঙ্কেতেরই অনুমোদন করিয়াছেন। শব্দ এবং অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধের অনুমোদন না করিলেও, শ্রীধর ভট্ট শব্দ-প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। কণাদ-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করতঃ শব্দ-প্রমাণকে এক জাতীয় অনুমান বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শব্দ এবং তাহার অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি না থাকিলে, শ্রীধর ভট্টের মতে কোন শব্দ শুনিয়া কিরূপে ঐ শব্দার্থের অনুমানের উদয় হইবে তাহা বুঝা যায় না; এবং এ-সম্পর্কে শ্রীধর ভট্টের মতের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করাও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্তভট্ট, নব্য-ন্যায়গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায়, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি প্রাচীন এবং নব্য নৈয়ায়িকগণ সকলেই শব্দ-প্রমাণ যে অনুমান হইতে পারে না; শব্দ যে অনুমানের ন্যায় স্বতন্ত্র আর একটি প্রমাণ, তাহা কণাদোক্ত শব্দানুমানের

অযৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন। ন্যায়াচার্য্যগণের উক্তির মর্ম্ম এই, বৈশেষিক শাব্দ-বোধকে যে এক জাতীয় অনুমান বলিতেছেন এখানে প্রথমতঃই বিচার করা আবশ্যক, শাব্দ-বোধ কাহাকে বলে? শব্দ শোনার পর শব্দ-জন্য যে শব্দার্থ-জ্ঞান উদিত হয়, তাহাই শাব্দ-বোধ কি? প্রকৃতপক্ষে শব্দ-জন্য শব্দার্থের বোধকে তো শাব্দ-বোধ বলে না। "গৌরস্তি" এইরূপ শব্দ শোনার পর, "অস্তি" পদ হইতে অস্তিত্বের এবং "গৌঃ" পদ হইতে গরুর বোধ উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিচ্ছিন্ন পদার্থ-বোধ বস্তুতঃ শাব্দ-বোধ নহে। অস্তিত্বের সহিত গো-পদার্থের সম্বন্ধ-বোধ উদিত হইয়া, "গরুটি আছে" ("অস্তিত্ব-বিশিষ্ট গো" কিংবা গোর অস্তিত্ব) এইরূপ যে অন্বয়-বোধ উৎপন্ন হয়, পদার্থগুলির পরস্পর সেই সম্বন্ধ-বোধ বা অন্বয়-বোধকেই শাব্দ-বোধ বলে। এইরূপ পদার্থগুলির পরস্পর অন্বয়-বোধরূপ শাব্দ-বোধকে অনুমান বলা কোন মতেই চলে না। ঐ প্রকার বিশেষ অনুভূতির সাক্ষাৎ সাধন বা করণ হিসাবে শব্দ-প্রমাণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যদি বল যে, আলোচিত অন্বয়-বোধও অনুমানের সাহায্যেই উদিত হইবে; তবে সে-ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ হেতুর দ্বারা কিরূপে পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়-বোধ উৎপন্ন হয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। অন্বয়-বোধে শব্দই হেতু হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা, যেই গো-পদার্থে অস্তিত্বের অনুমান হইবে, সেই গো-পদার্থে অর্থাৎ অনুমানের পক্ষে শব্দ (হেতু) না থাকায়, পক্ষে অবৃত্তি হেতুকে হেতুই বলা চলে না, উহা হইবে হেত্বাভাস। শব্দ-অনুমানের বৈশেষিকোক্ত অপরাপর হেতুও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে হেত্বাভাস বা মিথ্যা হেতুই হইয়া দাঁড়ায়। তারপর শব্দ-বোধ অনুমান হইলে, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতিমূলেই যে গোর অস্তিত্বের অন্বয়-বোধ জন্মিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐরূপ অন্বয়-বোধ যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতিমূলে অনুমানের সাহায্যে উদিত হয় তাহাতো অনুভবে আসে না, বরং হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান ব্যতীত, "গৌরস্তি" এইরূপ শব্দ শোনার ফলে উৎপন্ন হয়, ইহাই অনুভবে ভাসে। পদ-জ্ঞান, পদের অর্থ-জ্ঞান প্রভৃতি শাব্দ-বোধের কারণগুলি উপস্থিত থাকিলে, শব্দ হইতে তখনই শাব্দ-বোধ উৎপন্ন হয়; কোনরূপ হেতু-জ্ঞান, ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতির অপেক্ষা

রাখে না। অনুমানের কারণ এবং শাব্দ-বোধের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শাব্দ-বোধের কারণের এইরূপ বিভেদবশতঃ শাব্দ-বোধ যে অনুমান নহে, অনুমান হইতে ভিন্ন জাতীয় এক প্রকার জ্ঞান, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। আর এক কথা এই যে, "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্য শুনিয়া "গরু আছে ইহা শুনিলাম" এইরূপেই লোকে বুঝিয়া থাকে, গরু আছে ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম, কিংবা গরুর অস্তিত্ব অনুমান করিলাম, এইরূপে বোঝে না। ইহা হইতে শাব্দ-বোধ যে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নহে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান হইতে শব্দ যে একটি পৃথক্ প্রমাণ, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়। বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না। শব্দ শোনার পর যে জ্ঞান জন্মে, তাহা তাঁহাদের মতে এক জাতীয় মানস-প্রত্যক্ষ। "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্য শুনিয়া "গো"-পদ এবং "অস্তি" পদের অর্থ-জ্ঞানের পর, মনের সাহায্যেই গরুর অস্তিত্ব-বোধের উদয় হয়। ইহা মানস-প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার শব্দ-চিন্তামণির প্রারম্ভে আলোচিত বৌদ্ধ-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও তাঁহার শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে শব্দের প্রামাণ্য-বিচার-প্রসঙ্গে শাব্দ-বোধ এক জাতীয় মানস-প্রত্যক্ষ, এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া, শব্দ-প্রমাণ এক প্রকার অনুমান, এই বৈশেষিক-মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। শাব্দ-বোধ প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বুঝাইতে গিয়া জগদীশ বলিয়াছেন, শাব্দ-বোধের স্থলে সেই সেই অর্থে সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ শাব্দ-বোধের বিষয় হয় না। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, শব্দ উচ্চারণ করিয়া বক্তা শ্রোতাকে যে-ক্ষেত্রে যতটুকু বুঝাইতে চাহেন, উচ্চার্য্যমাণ শব্দে যে অর্থটুকু ভাসে, ততটুকুই কেবল শ্রোতা বুঝিতে পারেন, তাহার বেশী কিছুই তিনি বুঝিতে পারেন না। নিজের বুদ্ধি বা ব্যক্তিত্ব খাটাইয়া নূতন কিছু বুঝিবার অধিকার এক্ষেত্রে শ্রোতার নাই। সুতরাং শাব্দ-বোধে শ্রোতার কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই, বক্তারই কেবল স্বাতন্ত্র্য আছে। শাব্দ-বোধকে প্রত্যক্ষ বলিলে কিন্তু দ্রষ্টার স্বাতন্ত্র্যকে এভাবে খর্ব্ব করা চলে না। "গৌরস্তি" এই কথা শুনিয়া গরুর অস্তিত্বের যে বোধ জন্মে তাহা মানস-প্রত্যক্ষ হইলে, "জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষ"বলেই এখানে গরুর অস্তিত্বের মানস-প্রত্যক্ষ

হইয়াছে বলিতে হইবে। জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষে দৃশ্য বস্তু-সম্পর্কে দ্রষ্টার স্মৃতিপটে যাহা যাহা আঁকা থাকে, তাহারই স্ফুরণ হয়। ইহাকেই "উপনীত-ভান" বলে। উপনীত অর্থাৎ স্মৃতিতে যাহা আরূঢ় হয়, মানস-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে তাহারই ভান বা প্রকাশ হয়। গরুর স্মৃতির সহিত যাহা বিজড়িত আছে তাহার ভাতি বা প্রকাশ সম্ভবপর হইলে, "গৌরস্তি" এইরূপ শব্দ শুনিয়া গরুর অস্তিত্বের যেমন মানস-প্রত্যক্ষ জন্মে, সেইরূপ গরুর স্মৃতির সহিত বিজড়িত রাখাল, গোচারণ প্রভৃতিরও মানস-প্রত্যক্ষের উদয় হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। শাব্দ-বোধ প্রত্যক্ষ হইলে, সেখানে আর শাব্দ-বোধে সাকাঙ্ক্ষ পদের দ্বারা যেই অর্থটুকু প্রকাশ পায় তাহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ শাব্দ-বোধের বিষয় হয় না, এইরূপ নিয়ম মানা চলে না। কেননা, ঐ নিয়ম কেবল শাব্দ-বোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, শব্দ-জন্য মানস-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ঐরূপ নিয়ম একেবারেই অচল। শব্দের অর্থ সর্ব্বদাই শব্দের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। শব্দের অর্থ শব্দের দ্বারা "সুনিয়ন্ত্রিত" বলিয়াই, শব্দকে প্রত্যক্ষও বলা যায় না, অনুমানও বলা যায় না, একথা অতি-স্পষ্ট ভাষায় জগদীশ তাঁহার "শব্দশক্তিতে" প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা এই, "গৌরস্তি" এই বাক্যে গো-পদটি হইতেছে বিশেষ্য, অস্তি-পদটি এখানে বিশেষণ। ফলে, "অস্তিত্ববিশিষ্ট গো" এইরূপেই এক্ষেত্রে শব্দার্থের বোধ উৎপন্ন হয়। বাক্যোক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কখনও কোনরূপ শব্দার্থ-বোধের উদয় হয় না, হইতে পারে না। শব্দার্থ-বোধ যদি প্রত্যক্ষ হইত, তবে আলোচ্য স্থলে অস্তিত্ব বিশেষণ হইয়া অস্তিত্ববিশিষ্ট গোর যেমন প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ অস্তিত্ব বিশেষ্য এবং গোপদটি বিশেষণ হইয়া, "অস্তিত্ব গোবিশিষ্ট" (অস্তিত্বং গবীয়ম্) এইরূপেও মানস-প্রত্যক্ষের উদয় হইতে পারিত। কেননা উপনীতভান-স্থলে কোন্‌টি বিশেষ্য হইবে, কোন্‌টি বিশেষণ হইবে, তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দ্রষ্টার দৃষ্টি-কোণের উপর। প্রত্যক্ষে যে দ্রষ্টার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে, ইহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করেন। উল্লিখিতস্থলে "অস্তিত্ববিশিষ্ট গো" এইরূপ বুদ্ধিরই উদয় হয়, "অস্তিত্ব গোবিশিষ্ট" এইরূপ বোধ জন্মে না। সুতরাং শাব্দ-বোধ যে মানস-প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, শব্দ যে স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়।

শাব্দ-বোধ যে অনুমান হইতে পারে না ইহা বুঝাইতে গিয়া জগদীশ শব্দশক্তি গ্রন্থে বলিয়াছেন, "ঘটাদন্যঃ" এই কথা বলিলে, ঘট হইতে ভিন্ন এইরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। "ঘটভিন্ন" এই কথাটি একটি বিশেষণ পদ, আলোচ্য বাক্যে কোন বিশেষ্য-পদের প্রয়োগ নাই। পট প্রভৃতি পদার্থই যে এই বাক্যের বিশেষ্য হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু পট প্রভৃতি বিশেষ্যকে বুঝাইবার মত কোন শব্দ উক্ত বাক্যে পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষ্যশূন্য ঐরূপ বাক্য-জন্য শাব্দ-বোধকে ন্যায়ের ভাষায় "নিরচ্ছিন্নবিশেষ্যতাক"-বোধ বলে; অর্থাৎ উল্লিখিত বাক্যের বিশেষ্যটি যে কিরূপ হইবে, (কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইবে) তাহা উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় না। বিশেষ্য-পদের প্রয়োগ উহ্য রাখিয়া কেবল বিশেষণ-পদের প্রয়োগ করিলেও, সে-ক্ষেত্রে শাব্দ-বোধের উদয় হইতে কোনরূপ বাধা হয় না। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ না বলিয়া, শুধু "বহ্নিমান্" এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ করিলেও, "বহ্নিযুক্ত" এই অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কেবল "বহ্নিমান্" এইটুকু শুনিয়া কোনরূপ অনুমান করা কখনও কাহারও সম্ভবপর হয় না। অনুমান করিতে হইলে বিশেষণ-পদের সহিত বিশেষ্য-পদেরও প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইহাই অনুমান-প্রয়োগের আকার। অনুমানের প্রয়োগে সাধ্যের আধার-পক্ষটি হয় বিশেষ্য, আর সাধ্যটি হয় পক্ষের বিশেষণ। পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধিই অনুমিতির ফল। পর্ব্বতকে বহ্নিমান্‌রূপে জানাই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমান-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। পক্ষ কিংবা সাধ্য ইহাদের কোন একটিকে বাদ দিয়া অনুমানের উদয় হয় না, হইতে পারে না। কেবল পক্ষের বা কেবল সাধ্যের উল্লেখ থাকিলেও সেখানে শাব্দ-বোধ হইতে অবশ্য কোন বাধা হয় না। নির্ব্বিশেষ্য কেবল "বহ্নিমান্" এইরূপ যেমন অনুমান হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল "ঘটভেদবিশিষ্ট" এইরূপও অনুমান জন্মিতে পারে না। কিন্তু "ঘটাদন্যঃ" এই বাক্য হইতে ঘট হইতে ভিন্ন, ঘটভেদবিশিষ্ট এইরূপ শাব্দ-বোধ সকলেরই উদিত হইয়া থাকে। যাঁহারা শাব্দ-বোধকে অনুমান বলিতে চাহেন, তাঁহারা অনুমানের সাহায্যে কোনমতেই ঐরূপ বোধ উপপাদন করিতে পারেন না। সুতরাং শাব্দ-বোধ যে অনুমান নহে, অনুমান হইতে ভিন্ন এক

প্রকারের বোধ; এবং শব্দ যে অনুমান হইতে পৃথক প্রমাণ, তাহা না মানিয়া উপায় নাই।[১]

কিরূপ শব্দ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে?

কিরূপ শব্দকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের সমর্থক আচার্য্যগণ বলেন, আপ্ত বা সত্যদর্শী মহাপুরুষের উক্তিই শব্দ-প্রমাণ। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের কোনরূপ ভ্রম কিংবা প্রমাদ নাই, চিত্তে কোনরূপ আবিলতা নাই। জিজ্ঞাসুকে প্রতারণা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার মনের কোণেও স্থান পায় না। ফলে, এইরূপ সত্যদ্রষ্টা, সত্যবাক্ মহাপুরুষের উক্তিকে সহজেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়।[২] শব্দজ জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, মানুষ প্রথমতঃ কান দিয়া শব্দ শোনে; শব্দ শুনিয়া শ্রুত শব্দার্থের স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগরূক হয়। তারপর, "এই শব্দে এই অর্থ বা বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে", এইরূপ শব্দ-সঙ্কেতবলে শব্দ-জন্য শব্দার্থ-বোধের উদয় হয়। এইরূপ শাব্দ-বোধে শব্দ-জ্ঞান বা পদ-জ্ঞানকে শব্দ-জন্য শব্দার্থ-জ্ঞানের সাক্ষাৎ-সাধন বা করণ বলে; শব্দার্থের স্মৃতিকে ঐ করণের ব্যাপার, (function) আর শাব্দ-বোধকে ফল বলা হইয়া থাকে।[৩] আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং তাৎপর্য্য-জ্ঞান শাব্দ-বোধের সহকারী-কারণ।[৪] উক্ত সহকারী-কারণ-চতুষ্টয় বিদ্যমান থাকিলেই বাক্য হইতে বাক্যার্থ-জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য্য প্রভৃতির যে-কোন একটির অভাব ঘটিলেই বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয় হয় না। আসত্তি,

---

১। সাকাঙ্ক্ষ শব্দে যো বোধ স্তদর্থান্বয়গোচরঃ।
সোঽয়ং নিযন্ত্রিতার্থত্বান্ন প্রত্যক্ষং ন চানুগা॥
জগদীশ-কৃত শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ৩ শ্লোক;

২। ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সারহিত-
পুরুষোচ্চরিতং বাক্যং প্রমাণম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৯-২২০ পৃষ্ঠা;

৩। পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারংতত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলংতত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী॥ ভাষাপরিচ্ছেদ, ৮১ কারিকা;

৪। বাক্যজন্যে চ জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-
সত্তয়স্তাৎপর্যজ্ঞানঞ্চেতি চত্বারি কারণানি। বেদান্তপরিভাষা ২১০ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থাকিলে বক্তা বাক্যটি যে-তাৎপর্য্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই তাৎপর্য্যের বোধক বাক্যই হয় শব্দ-প্রমাণ। এইরূপে বাক্যের তাৎপর্য্যের উপর জোর দিয়া শব্দ-প্রমাণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, অদ্বৈত-বেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন, যেই বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বাক্যই প্রমাণ বলিয়া জানিবে।[১] আলোচিত শব্দ-প্রমাণের লক্ষণে বাক্যের যে তাৎপর্য্যার্থ-বোধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কোন স্থলে হইবে সসম্বন্ধ-বোধ, কোথায়ও বা হইবে নিঃসম্বন্ধ অখণ্ড-বোধ। 'গামানয়' গরুকে আন, এইরূপ বাক্যজ-জ্ঞান গরু (কর্ম্ম) এবং আনয়ন ক্রিয়া, এই দুই পদের অর্থ-বোধ এবং পদদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, এইরূপ বাক্যার্থ-বোধ হইবে "সসম্বন্ধ" বা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বোধ। অদ্বৈত-বেদান্তীর "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য-জন্য বোধ হইবে নিঃসম্বন্ধ অখণ্ড-বোধ। এই নিঃসম্বন্ধ অখণ্ড-বোধ অদ্বৈত-বেদান্তীর নিজস্ব। অন্য কোন দার্শনিকই উহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে সর্ব্বপ্রকার বাক্যজ জ্ঞানই হইবে, বাক্যান্তর্গত পদ-পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বোধ বা সসম্বন্ধ-বোধ। বাক্যজন্য জ্ঞানকে যে প্রমাণান্তরের দ্বারা অবাধিত বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই, বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য যদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অন্য কোনও প্রবল প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে সেই বাক্য হইবে অপ্রমাণ, আর বাধাপ্রাপ্ত না হইলেই সেক্ষেত্রে বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। "আকাশ-কুসুম লইয়া আস" "ঘোড়ার ডিম বাজারে বিক্রয় হইতেছে" এই সকল বাক্যের অন্তর্গত আকাশ-কুসুম, অশ্ব-ডিম্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষতঃ বাধিত বলিয়া, ঐরূপ বাক্যকে কখনও প্রমাণ বলা চলিবে না।

দ্বৈত-বেদান্তী মাধ্ব-সম্প্রদায় কেবল প্রত্যক্ষপ্রভৃতি প্রবল প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেই যে শব্দকে অপ্রমাণ বলিয়াছেন এমন নহে।

১। (ক) যস্য বাক্যস্য তাৎপর্যবিষয়ীভূত সংসর্গো
মানান্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্‌বাক্যং প্রমাণম্।

বেদান্তপরিভাষা ২০৮ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

(খ) মানান্তরাবাধিত তাৎপর্যবিষয়ীভূতপদার্থসংসর্গবোধকত্বং যস্য বাক্যস্য তদ্‌বাক্যং প্রমাণশব্দ ইত্যর্থঃ। শিখামণি, ২০৮ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

মাধ্ব-প্রমাণবিদ্ আচার্য্য জয়তীর্থ প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থে শব্দ-প্রমাণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রবল প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত ছাড়া, আরও নানাপ্রকারের শব্দ-দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

শব্দ-প্রমাণ সম্পর্কে মাধ্ব-মত

মাধ্বোক্ত সেই সকল শব্দ-দোষের যে-কোন একটী দোষ বিদ্যমান থাকিলেই, সেই দুষ্ট শব্দকে মাধ্ব-মতে প্রমাণ বলা চলিবে না। সর্ব্বপ্রকার দোষমুক্ত শব্দই তাঁহাদের মতে আগম বা শব্দ-প্রমাণ—নির্দোষঃ শব্দঃ আগমঃ। প্রমাণ-চন্দ্রিকা ১৫৭ পৃষ্ঠা; নির্দোষ শব্দকে বুঝিতে হইলেই, প্রথমতঃ শব্দ-দোষ কি এবং কত প্রকার তাহা জানা আবশ্যক। এইজন্য শব্দ-প্রমাণ-বিচারের প্রারম্ভেই মাধ্ব-পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত বিবিধ প্রকার শব্দ-দোষের নিরূপণ করিয়াছেন। (১) অবোধকত্বম্, (২) বিপরীত-বোধকত্বম্, (৩) জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বম্, (৪) অপ্রয়োজনবত্ত্বম্, (৫) অনভিমত-প্রয়োজনবত্ত্বম্, (৬) অশক্যসাধন-প্রতিপাদনম্, (৭) লঘূপায়ে সতি গুরূপায়োপদেশমমিত্যাদয়ঃ শব্দদোষাঃ[১]। প্রমাণচন্দ্রিকা ১৫৭ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং; শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থের অভাব ঘটিলে, কিংবা শব্দ ও অর্থের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ অন্বয় না থাকিলে, সেই ক্ষেত্রে অবোধকত্ব নামক শব্দ-দোষের উদ্ভব হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, কেহ যদি "কচতটপ" "জবগড়দ" এইরূপ সম্পূর্ণ নিরর্থক শব্দের প্রয়োগ করেন; কিংবা গরু, ঘোড়া, মানুষ, হাতী, (গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী,) এইরূপ পরস্পর নিঃসম্বন্ধ এবং নিরন্বয় (অর্থাৎ যে সকল পদের অর্থ থাকিলেও সেই অর্থগুলির মধ্যে পরস্পর কোনরূপ সম্বন্ধ বা অন্বয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এইরূপ) শব্দের প্রয়োগ করেন, তবে ঐরূপ বাক্য "অবোধকত্ব" নামক শব্দ-দোষে দূষিত হইবে বলিয়া প্রমাণ

১। The defects of a verbal communication are :—

(1) unintelligibility, (2) conveying of the opposite of the true or correct information, (3) conveying of what is already known, (4) conveying of useless information (for woich nobody cares), (5) conveying of information not derived or sought for by the person to whom it is conveyed, (6) conveying of a command or injunction to accomplish the impossible, (7) conveying of advice of a more difficult means when easier means are well within reach, etc.

Dr. S. K. Maitra's Translation of Pramāṅachandrikā P. 101,

হইবে না। যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নাই, শূদ্রেরই বেদে অধিকার আছে, এইরূপ বাক্য সর্ব্বজন-বিদিত সত্যের অপলাপ করে বলিয়া অপ্রমাণ হইতে বাধ্য। সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়, এইরূপ বাক্য জ্ঞাত বিষয়কেই জানাইয়া দেয়, নূতন কিছু জানায় না, এইজন্য ঐরূপ বাক্য হইবে নিষ্ফল এবং অপ্রমাণ। যদি বল যে, এক প্রমাণের সাহায্যে যাহা জানা যায়, তাহা প্রমাণান্তরের দ্বারায় সমর্থিত হইলে আরও সুদৃঢ় হয়, এই অবস্থায় জ্ঞাত-জ্ঞাপনকে শব্দ-দোষ বলিয়া গণনা করা হইবে কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমে একটি প্রমাণের সাহায্যে যাহা জানা গিয়াছে, সেই জানার মধ্যে যদি কোনরূপ অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা থাকে, তবেই সেক্ষেত্রে পরে প্রমাণান্তরের সাহায্যে পূর্ব্বের জ্ঞাত বিষয়কে সুদৃঢ় করার প্রশ্ন আসে। যেখানে পূর্ব্বের জানায় কোনরূপ অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা নাই, সেইরূপ স্থলে জ্ঞাত-জ্ঞাপন অর্থবিহীন বিধায়, তাহাও শব্দ-দোষ বলিয়াই গণ্য হইবে বৈকি? যে-বিষয়ে জিজ্ঞাসুর কোনরূপ প্রয়োজন নাই, সেইরূপ বাক্য নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই অপ্রমাণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে কাকের কয়টা দাঁত? কম্বলে কতগুলি রোম আছে; এই জাতীয় প্রয়োজনহীন বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাণিজ্যের উপদেশ বাণিজ্যার্থীর পক্ষে প্রয়োজন হইলেও, সংসার-বিরাগী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ উপদেশ অনভিপ্রেত বলিয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীকে ঐরূপ উপদেশ দিতে গেলে, সেই উপদেশ-বাক্য সেই ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত অর্থের বিজ্ঞাপক হওয়ায় অপ্রমাণই হইয়া দাঁড়াইবে। যেই ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে তাহাকে যদি কেহ মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগের উপদেশ দেন, তবে সেই উপদেশ যাহা অশক্য বা অসম্ভব তাহারই সাধনের প্রয়াস বলিয়া যে অপ্রমাণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তারপর, কোনও সহজ-সাধ্য ব্যাপারে সহজ পন্থাকে বাদ দিয়া গুরুতর কোনরূপ উপদেশ দিতে গেলে, সেই উপদেশও অপ্রমাণ বলিয়াই লোকে পরিত্যাগ করিবে। কোন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল পান করিবার জন্য কূপ খননের উপদেশ দিলে, কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই ঐরূপ উপদেশকে প্রামাণিক বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। উল্লিখিত বিবিধ প্রকার শব্দ-দোষ মাধ্ব-দার্শনিকগণের মতে শব্দকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সকল শব্দ-দোষের কোন

একটিও না থাকিলে, সেই শব্দই হইবে নির্দ্দোষ শব্দ ; এবং ঐরূপ নির্দ্দোষ শব্দই প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করিবে। শাব্দ-বোধে মাধ্ব-মতেও ন্যায়-সিদ্ধান্তের ন্যায় শব্দই করণ বা শব্দ-প্রমাণ, শব্দ-জন্য শব্দার্থের স্মৃতি সেই করণের ব্যাপার, আর শাব্দ-বোধ সেই করণের অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের ফল।[১] আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি প্রভৃতিকে নৈয়ায়িক এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর ন্যায় মাধ্ব-পণ্ডিতগণও শাব্দ-বোধের সহকারী-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শব্দের শক্তি-জ্ঞান প্রভৃতি থাকিলে সেইরূপ (শক্তি-গ্রহাদিযুক্ত) শব্দ যথাযথভাবে শ্রুতিগোচর হইয়াই তাহা আগম-গম্য অর্থের বোধক হইবে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ন্যায় আগম কেবল থাকিলেই তাহা আগম-বেদ্য অর্থের বোধক হইবে না ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ থাকিলেই যেমন প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত বস্তু-সম্পর্কে দর্শকের জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ আগম কেবল থাকিলেই চলিবে না, সেই মর্ম্মে আগম যে আছে, তাহা শ্রোতার জানা থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রের বিধান আছে, সেই বিধান আমি কখনও শুনি নাই, অথবা শুনিলেও তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝি নাই, এই অবস্থায় সেই অজ্ঞাত, অশ্রুত শাস্ত্রীয় বিধান আমার জ্ঞানোদয়ের সহায়ক হইবে কি ? শাস্ত্রীয় বিধান আমার জানা-শুনা থাকিলেই ঐ বিধান আমার জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হয়। অনুমান-স্থলেও দেখা যায় যে, অনুমান কেবল থাকিলেই চলে না, অনুমানের প্রয়োগটি আমাদের জানা থাকা আবশ্যক। অনুমানটির স্বরূপ যদি আমরা না জানি, তবে সেক্ষেত্রে অজ্ঞাত অনুমান আমাদের অনুমানমূলে কোনরূপ জ্ঞানোদয়ের সাহায্য করে কি ? তাহা তো করে না ; সুতরাং দেখা যায় যে, শব্দ এবং অনুমান-প্রমাণ কেবল থাকিলেই তাহা জ্ঞানোদয়ে সাহায্য করে না ; জানা-শুনা থাকিলেই তাহা জ্ঞানোৎপত্তির সহায়তা করে।[২]

১। অত্র বাক্যং করণম্, পদার্থস্মৃতিরবান্তরব্যাপারঃ বাক্যার্থজ্ঞানং ফলম্। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা ; তুলনা করুন ভাষাপরিচ্ছেদ, ৮১ শ্লোক ;

পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥

২। আগমোঽপি শক্তিগ্রহাদিসংযুতঃ সম্যক্ শ্রুত এবার্থস্য বোধকো ন প্রত্যক্ষবৎ সত্তাদিমাত্রেণ। আগমস্য অনুমানবৎ জ্ঞাতকরণত্বাৎ। অন্যথা আগমস্য স্বরূপতঃ সত্ত্বেঽপি তদশ্রাবিণঃ শ্রবণেঽপি অগৃহীতসঙ্গতিকস্য বা পুংসঃ স্বার্থ-প্রমাপকত্বাপত্তেঃ ॥ প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫৯ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব বিঃ সং ;

শব্দ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ যে জ্ঞানের গোচর হইয়াই প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করে, তাহা সকল দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়োক্ত শব্দ-প্রমাণের লক্ষণ সংক্ষেপে বিচার করা গেল, এখন শব্দ-প্রমাণ সম্পর্কে রামানুজ-সম্প্রদায় কি বলেন তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। রামানুজ-মতের প্রমাণ-ব্যাখ্যাতা আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধি গ্রন্থে নিজ-সম্প্রদায়োক্ত শব্দ-প্রমাণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা ভ্রম ও প্রমাদ প্রভৃতির বশ, সুতরাং সত্যসন্ধ এবং "আপ্ত"-পদবাচ্য নহেন, এইরূপ অনাপ্ত ব্যক্তি-কর্ত্তৃক যেই বাক্য উক্ত হয় নাই, সেইরূপ বাক্যমূলে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসুর যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই আগম বা শব্দ-প্রমাণের ফল বলিয়া জানিবে, আর ঐরূপ (অনাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুক্ত) বাক্যই হইবে আগম-প্রমাণ—অনাপ্তানুক্তবাক্যজনিতং তদর্থবিজ্ঞানং তৎ প্রমাণম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬১ পৃষ্ঠা; অর্থ বা বস্তুর বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণেও আছে। ফলে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণে শব্দ-প্রমাণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা অপরিহার্য্য হয়। এইজন্য অর্থ-বিজ্ঞান বা বস্তু-পরীক্ষাকে উক্ত লক্ষণে "বাক্যমূলে উৎপন্ন" (বাক্য-জনিতম্) এইরূপে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্যের স্বরূপ-বিজ্ঞানও বাক্য-জনিত বটে, কিন্তু বাক্যের স্বরূপের জ্ঞান আগম-প্রমাণের ফল নহে। বাক্যের অর্থ-বিজ্ঞানই আগম প্রমাণের ফল, ইহা সূচনা করিবার জন্যই আলোচিত লক্ষণে শুধু "বাক্য-জনিতং বিজ্ঞানং" না বলিয়া, "অর্থ-বিজ্ঞানং" এইরূপে "অর্থ" পদের অবতারণা করা হইয়াছে। বাক্যই বাক্য-জন্য বাক্যার্থ-বোধের করণ বা শব্দ-প্রমাণ; আর সেই বাক্যার্থের বোধই শব্দ-প্রমাণের ফল, বা শব্দ-প্রমা বলিয়া জানিবে। আলোচ্য লক্ষণে "বিজ্ঞান" পদটি না দিলে, শব্দজ জ্ঞানের যাহা করণ তাহাই ফল হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণ ও তাহার ফলের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। এইজন্যই লক্ষণে "বিজ্ঞান" পদটির অবতারণা করিয়া বাক্যার্থের বোধ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভ্রান্তিজনক অসত্য বাক্যে শব্দ-প্রমাণের লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি বারণের জন্য শব্দকে "অনাপ্ত বা অসত্যদর্শী কর্ত্তৃক অনুক্ত" এইরূপ-ভাবে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। যিনি আপ্ত, সত্যসন্ধ মহাপুরুষ, ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি যাঁহার দৃষ্টিকে কলুষিত করিতে পারে না, যাঁহার

শব্দ-প্রমাণ ও রামানুজ মত

জ্ঞান কদাচ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আপ্ত-বাক্যই শব্দ-প্রমাণ। যিনি আপ্ত বা সত্যব্রত নহেন, তাঁহার অসত্য উক্তির ফলে উৎপন্ন মিথ্যা বস্তু-বোধ প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিতও বটে, অনাপ্তের দৃষ্টি ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতির দ্বারা কলুষিতও বটে। এইজন্যই তাঁহার উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না। নচানাপ্তোক্তবাক্যং প্রমাণং কারণদোষবাধকদর্শনাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬১ পৃষ্ঠা ;

শব্দ-প্রমাণের ব্যাখ্যায় মাধবমুকুন্দ বলেন যে, অনাপ্ত ব্যক্তির বুদ্ধিমান্দ্য, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, প্রতারণা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি এবং কোনও বিষয়ের প্রতি অন্যায্য আসক্তি, এই চারি প্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল দোষই বিভ্রমের হেতু। ঐরূপ দোষ বশতঃ অনাপ্ত, অসত্যসন্ধ ব্যক্তির পদে পদে ভ্রম করিবার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এইজন্য ভ্রান্তদর্শী অনাপ্তের উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা কোনমতেই চলে না। আপ্তকর্ত্তৃক উক্ত বাক্যই প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করে। আপ্তপ্রযুক্তবাক্যং শব্দরূপং প্রমাণম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৯ পৃষ্ঠা; আপ্ত কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলেন, বুদ্ধিমান্দ্য, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি বিভ্রমের পূর্ব্বোক্ত হেতুচতুষ্টয় যাঁহার নাই, পদ-বাক্য প্রভৃতির যথার্থ স্বরূপ এবং তাহাদের প্রমাণ-রহস্য যিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন ; এবং ঐ প্রমাণ-রহস্য যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য যাঁহার আছে, যিনি সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা বলেন না, এইরূপ সত্যদ্রষ্টা মহাজনই আপ্তপদ-বাচ্য। তাঁহার উক্তিই শব্দ-প্রমাণ।[১]

ভাল, আপ্ত মহাপুরুষের সত্য বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া বরং মানিয়াই লইলাম, কিন্তু তাহার জন্য শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গণনা করার আবশ্যকতা কি ? বৈশেষিকের পথ অনুসরণ করিয়া শব্দ-প্রমাণকে এক শ্রেণীর অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করা যাউক। ন্যায়লীলাবতীর রচয়িতা বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি যেই প্রকার অনুমান-প্রয়োগের সাহায্যে শব্দ-অনুমান সমর্থন করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ অনুমানের প্রয়োগ করিব।

১। আপ্তত্বং নাম ভ্রমহেত্বভাবসহকৃত বাক্যপ্রমাণবেত্তৃত্বে সতি যথার্থ-বক্তৃত্বম্। ভ্রমহেতবস্তাবচ্চত্বারঃ বুদ্ধিমান্দ্যমিন্দ্রিয়াহপাটববিপ্রলিপ্সাদুরাগ্রহশ্চেতি। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২১৯-২২০ পৃষ্ঠা ;

বাক্যস্থ পদগুলির (পক্ষ) প্রয়োগের তাৎপর্য্য বিচার করিলে তাহাদের অর্থ-সম্পর্কে যে স্মৃতি মনের কোণে উদিত হয়, সেই স্মৃত অর্থের মধ্যেও পরস্পর যে একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা বেশ বুঝা যায় (সাধ্য)। কারণ, বাক্যস্থ পদগুলি তো পরস্পর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিযুক্ত নহে। "গাম্ আনয়" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিলে, "গাম্" শব্দে গরুকে "আনয়" পদের দ্বারা আনয়ন ক্রিয়াকে বুঝায়। ইহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া জ্ঞানে ভাসে না; পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই "গরুকে লইয়া আস" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে (হেতু)। তাহার কারণও এই যে, "গাম্" এবং "আনয়" এই পদ দুইটি পরস্পর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যুক্তই বটে; ফলে, ঐ বাক্যস্থ পদদ্বয়ের অর্থও পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই প্রতিভাত হয় (দৃষ্টান্ত)।[১] শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণনা না করিয়া, শব্দ-প্রমাণকে যাঁহারা উল্লিখিত অনুমানেরই শাখা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শব্দ-প্রমাণের স্বাতন্ত্র্যবাদী রামানুজ-সম্প্রদায় বলেন, শব্দ-প্রমাণকে যে তোমরা এক জাতীয় অনুমান বলিতে চাও, সেখানে জিজ্ঞাস্য এই, ঐ শব্দ-অনুমানকে কি স্বার্থানুমান বলিবে, না পরার্থানুমান বলিবে?[২] আলোচিত শব্দ-অনুমানকে যদি

১। অস্তু বা অনুমানবিধয়া প্রমাণং তথাহি লৌকিকানি বৈদিকানি বা পদানি তাৎপর্যবিষয়স্মারিতপদার্থসংসর্গবন্তি আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদকদম্বকত্বাৎ গামানয়েতি পদকদম্বকবদিত্যাগ্যনুমানাদেব সংসর্গবোধসিদ্ধিঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-কৃত টীকা ন্যায়সার, ৩৬২ পৃষ্ঠা; উল্লিখিত অনুমান-বাক্যের সহিত বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতীতে প্রদর্শিত অনুমান-বাক্যের তুলনা করুন—পদানি স্মরিতার্থ-সংসর্গ-বিজ্ঞপ্তি-পূর্ব্বকাণি যোগ্যতাসত্তিমত্ত্বে সতি সংসৃষ্টার্থপরত্বাৎ গামভ্যাজেতি পদকদম্বকবদিত্যনুমানেন সাধ্যসিদ্ধেঃ। ন্যায়লীলাবতী ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

২। অনুমান-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নিজে বুঝিবার জন্য যে অনুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাকে স্বার্থানুমান বলে, আর অপরকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান-প্রয়োগের অবতারণা করেন, তাহাকে পরার্থানুমান বলা হইয়া থাকে। পরার্থ-অনুমানে প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অনুমানের পাঁচটি অবয়ব-প্রদর্শন এবং তাহার ফলে অনুমানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আবশ্যক। নিজে বুঝিবার জন্য যেক্ষেত্রে অনুমানের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সেখানে পরার্থানুমানের ন্যায় অনুমানের পঞ্চাঙ্গের বিশ্লেষণ সকল স্থলে আবশ্যক করে না; হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান এবং হেতুর পক্ষে বা সাধ্যের আধারে বিদ্যমানতা বোধ থাকিলেই সেক্ষেত্রে অনুমানের উদয় হইতে পারে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা অনুমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৭৪-১৭৬ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে, সেই আলোচনা দেখুন।

স্বার্থানুমান বল, তবে সেস্থলেও (আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদকদম্বকত্বাৎ এইরূপ) হেতুর স্বরূপ-জ্ঞান এবং প্রদর্শিত (তাৎপর্য্যার্থবিষয়স্মারিতপদার্থ-সংসর্গবন্তি এই) সাধ্যের সহিত উক্ত হেতুর ব্যাপ্তি-বোধ প্রভৃতি যাহা যাহা অনুমানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গ, তাহাদের জ্ঞান যে শব্দের সাহায্যেই উৎপন্ন হইবে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই শব্দও আবার সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন যথার্থ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সাধন হয় না, দুষ্ট শব্দকেও সেইরূপ শব্দ-জন্য যথার্থ জ্ঞানের (প্রমা-জ্ঞানের) সাধন বলা চলিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের সাহায্যে শব্দজ জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে গেলেও, নির্দ্দোষ শব্দ এবং ঐ নির্দ্দোষ শব্দমূলে উৎপন্ন শব্দজ জ্ঞানের সহিত অনুমানকারীর সাক্ষাৎ পরিচয় একান্ত আবশ্যক। ফলে, শব্দ যে স্বতন্ত্র প্রমাণ, ইহাই সিদ্ধ হয়। অনুমানের সাহায্যে শব্দের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের প্রশ্নই সেক্ষেত্রে অবান্তর হইয়া দাঁড়ায়। তারপর, শব্দ-অনুমানকে যদি পরার্থানুমান বল, তবে সেখানেও শব্দার্থ-বোধের সাহায্যেই (পদসমূহরূপ) বাক্যের অর্থ-বোধ উৎপন্ন হইবে। বাক্যের অর্থ-বোধের জন্য ব্যাপ্তি-জ্ঞান, পরামর্শ প্রভৃতির (অনুমানের যাহা পূর্ব্বাঙ্গ তাহার) আবশ্যক হইবে না। আলোচ্য শব্দ-অনুমানে পদের তাৎপর্য্যার্থের পরস্পর সম্বন্ধ-বোধকে অনুমানের সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, আর আকাঙ্ক্ষা-প্রভৃতি যুক্ত পদসমূহকে হেতুরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ অনুমানের সাধ্যকে অনুমান-বলে সাধন করিতে গেলেও, ঐরূপ সাধ্য-সিদ্ধির অনুকূল (আকাঙ্ক্ষাদি-মৎপদকদম্বকত্বাৎ এইরূপ) হেতুর স্বরূপ-বোধের জন্যই শব্দের প্রামাণ্য-সাধক আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতির সহিত অনুমানকারীর সাক্ষাৎ পরিচয় আবশ্যক। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ পরিচয় কি অনুমানের সাহায্যে হইবে, না শব্দের বা বাক্যের সাহায্যে হইবে? যদি শব্দের সাহায্যে বল, তবে (অনুমান করিবার পূর্ব্বেই) শব্দ যে স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ, তাহাতো জানাই গেল, শব্দ-অনুমানের আড়ম্বর সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণই নিষ্ফল। আর যদি ঐরূপ হেতু-বোধ অনুমানের সাহায্যে উদয় হইবে বল, তবে শব্দ-অনুমানের হেতু-সিদ্ধির অনুকূল হেতুর বোধের জন্যও পুনরায় অনুমান-প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে, ফলে অনবস্থা-দোষই আসিয়া দাঁড়াইবে।

দ্বিতীয় কথা এই, উল্লিখিত শব্দ-অনুমান উপপাদনের জন্য অনুমানের যাহা পক্ষ সেই পদসমূহে ("পদানি" এইটিই পূর্ব্বোক্ত শব্দ-অনুমানের পক্ষ, ইহাতে) "আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদকদম্বকত্বাৎ" এই হেতু যে বর্ত্তমান, তাহা অনুমানকারীর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেননা, হেতুটি পক্ষে না থাকিলে সেক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমানই জন্মিবে না। কোনও বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি যদি আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি প্রভৃতি যুক্তই হয়, তবে সেই বাক্য যে প্রমাণ হইবে, তাহাতে তো কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। শব্দের অর্থাৎ বাক্যের প্রামাণ্য-সাধনের জন্য অনুমান-প্রয়োগের সেখানে কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি এবং তাহাদের অর্থের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের বোধ পূর্ব্বে উদিত হইয়াই পরে পদ-জ্ঞান, বাক্য-জ্ঞান প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক হয় বলিয়াই শব্দ অনুমান-প্রমাণ হইবে, এইভাবে যাঁহারা শব্দ-অনুমান সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিমতও কোনক্রমেই গ্রহণ-যোগ্য নহে। শব্দ ও তাহার অর্থের সম্বন্ধ আছে সত্য, সেই সম্বন্ধ বাচ্য-বাচকভাবরূপ। শব্দ অর্থের বাচক, আর অর্থ শব্দের বাচ্য। শব্দ করিলে শব্দ-প্রতিপাদ্য অর্থের বোধ হইয়া থাকে। শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে কোনরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব বা ব্যাপ্তি নাই। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞানকেই অনুমানের সাক্ষাৎ সাধন বলা হয়। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে বাচ্য-বাচকসম্বন্ধ আছে, উহা দ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় না; শব্দ ও অর্থের মধ্যে ব্যাপ্তির নির্ব্বাহক অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকায়, শব্দ শুনিয়া

১। শব্দঃ কিং স্বার্থানুমানং পরার্থানুমানং বা নাদ্যঃ ধূমাদিজ্ঞানবৎ শব্দং বিনা লিঙ্গাদিজ্ঞানাহনুৎপত্তেঃ শব্দেন চেদ্ দুষ্টেন্দ্রিয়াদেঃ প্রমাহজনকত্ববৎ দুষ্টশব্দস্য জ্ঞানাজনকত্বাৎ সিদ্ধং শব্দপ্রামাণ্যম্। নচ পরার্থানুমানমাত্রমিতি শক্যং তত্র পদার্থবোধেন বা বাক্যার্থবোধে ব্যাপ্ত্যাদেরপরামর্শাৎ। অত্র সংসর্গবোধস্য অনুমানপূর্বকত্বে আকাঙ্ক্ষাসত্তিতাৎপর্যবত্ত্বাদীনাং সংসর্গগ্রহপূর্বং গ্রহো বক্তব্যঃ স তু বাক্যেন বা গৃহ্যতে অনুমানেন বা, আদ্যে তস্যৈব শব্দত্বং সিদ্ধং দ্বিতীয়ে অনবস্থা। কিঞ্চ পদৈঃ পদার্থসংসর্গাদিতত্ত্বগর্ভাদনুমানস্য পক্ষেহপি পদার্থসংসর্গজ্ঞানেহপি বোধাভাবাৎ ন ব্যাপ্তিপরামর্শো মন্যেত কল্প্যেত বা।

শ্রীনিবাস-কৃত ন্যায়সার,

৩৬৩—৩৬৪ পৃষ্ঠা;

কোনরূপ অর্থের অনুমান করাও চলে না। শব্দকে অনুমান হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শব্দ-বোধের কারণ এবং অনুমানের কারণ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন; তুল্য জাতীয় নহে, বিজাতীয়। শাব্দ-বোধের কারণ বাচ্য-বাচকসম্বন্ধের বোধ, অনুমানের কারণ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধের বোধ বা ব্যাপ্তি-জ্ঞান। শব্দ-প্রমাণের এবং অনুমানের কারণ বিভিন্ন বলিয়া, বিভিন্ন কারণমূলে উৎপন্ন শাব্দ-বোধ এবং অনুমান কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারিবে না, বিভিন্নই হইবে। ফলে, শাব্দ-বোধকে যে অনুমান বলা চলিবে না, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অর্থের বোধক হইলেই যে তাহা অনুমান হইবে, এইরূপ উক্তিরও কোন মূল্য দেওয়া চলে না। সেরূপ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থ বা দৃষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রত্যক্ষও অনুমানই হইয়া দাঁড়ায়।[১] অনুমান ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নিরূপণেরই আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বের দৃষ্ট বা পরিজ্ঞাত বিষয়-সম্পর্কে যেরূপ শব্দ-জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বের অজ্ঞাত, অশ্রুত বস্তু-সম্পর্কেও শব্দ-শ্রবণের ফলে জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায়। এইজন্য শাব্দ-বোধকে স্মৃতিও বলা চলে না। নচ স্মৃতিঃ অপূর্ব্ববিষয়ত্বাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৫; অজ্ঞাত, অশ্রুত বিষয়-সম্পর্কেও উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, শাব্দ-বোধ স্মৃতি নহে; উহা স্মৃতি-জ্ঞান হইতে বিজাতীয় একপ্রকার অনুভূতি। ঐ অনুভূতির উপপাদনের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ-প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রকার

১। (ক) আগমোঽনুমানং সম্বন্ধগ্রহণে সত্যেব বোধকত্বাদিতি চেন্ন বোধ্য-বোধকভাবাতিরিক্তসম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষিণ্যনুমানত্বনিয়মাৎ। ন চাত্র তদতিরিক্তঃ সম্বন্ধঃ যদ্‌গ্রহণং নিয়মেনাপেক্ষ্যেত। অন্যথা সম্বন্ধসাপেক্ষতয়া তয়োঃ প্রত্যক্ষস্যাপি তথা সুসাধ্যত্বাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৫ পৃষ্ঠা;

(খ) সম্বন্ধস্ত্বনুমানে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবঃ। শব্দেতু পদার্থসম্বন্ধো ন ব্যাপ্তিস্তেন নানুমিতিরিত্যর্থঃ। অত্র স সম্বন্ধো নাপেক্ষ্যতে সম্বন্ধান্তরমেব শব্দরূপানুমান ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি। ন চেতি। সতি সম্বন্ধে প্রমাণনিয়ামকত্বং তদেব নেত্যর্থঃ। সম্বন্ধমাত্রেণ অনুমিতিত্বে প্রত্যক্ষস্যাপি তথাত্বমাপাদয়তি।

শ্রীনিবাস-কৃত ন্যায়সার, ৩৬৫ পৃষ্ঠা;

প্রমাণই অঙ্গীকার করিয়াছেন।[১] বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য যামুন মুনি তাঁহার গ্রন্থে শব্দ-অনুমানের বিরুদ্ধে আগমের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে :—

তস্মাদস্তি নদীতীরে ফলমিত্যেবমাদিষু।
যা সিদ্ধবিষয়া বুদ্ধিঃ সা শাব্দী নানুমানিকী॥

বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধিতে উদ্ধৃত যামুনাচার্য্যের শ্লোক ;
ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৮ পৃষ্ঠা ;

বরদবিষ্ণু মিশ্র প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও যামুনাচার্য্যের সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া, তত্ত্বরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে আগম-প্রামাণ্য বিস্তৃতভাবে বিচারপূর্ব্বক উপপাদন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের সেই উপপাদন সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহাতে বৈশেষিকের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকের শব্দ-প্রামাণ্য উপপাদনের যুক্তিজালের প্রভাব সুধী দার্শনিক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। বাক্য কাহাকে বলে? (বাক্যের ঘটক) পদের লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, পদসন্দোহবিশেষো বাক্যম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৫ পৃষ্ঠা ; বেঙ্কটোক্ত বাক্যের লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ন্যায়পরিশুদ্ধির টীকাকার শ্রীনিবাস তাঁহার ন্যায়সারে বলিয়াছেন যে, বিশেষ সংসর্গের অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, তাৎপর্য্য প্রভৃতির বোধক বিশিষ্ট পদসমূহকেই বাক্য বলিয়া জানিবে।[২] পদের পরিচয়ে শ্রীনিবাস বলেন, শুধুমাত্র বর্ণসমূহকে পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তাহা হইলে "কপচটত" এইরূপ যথেচ্ছভাবে উচ্চারিত বর্ণসমূহ, যাহা কোনরূপ অর্থের বোধক হয় না, তাহাও পদের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ বর্ণের সমূহই যদি পদ হয়, তবে "অঃ" এই একাক্ষর পদে যে বিষ্ণুকে, "ইঃ" এই একপদে যে কামদেবকে বুঝায়, (সমূহ না থাকায়) সেই এক এক অক্ষর তো পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তারপর

১। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কুর্য্যাৎ ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ মনুসংহিতা, ১২।১০৫ ;
দৃষ্টানুমানাগমজমিতি মন্বাদিমহর্ষিসম্মতেশ্চ শব্দানুমানয়োর্ভেদো দৃশ্যতে।
ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৪ ;

২। সংসর্গবিশেষবিশিষ্টপদসমূহ ইত্যর্থঃ। বিশেষ আকাঙ্ক্ষাদিরিতি ধ্যেয়ম্।
ন্যায়সার, ৩১৬ পৃষ্ঠা ;

সুবন্তকে পদ বলিলে, তিঙন্ত পদকে আর পদ বলা যায় না ; পক্ষান্তরে, তিঙন্তকে পদ বলিলে সুবন্ত পদ হয় না।[১] এইরূপে পদের লক্ষণ-নির্ব্বাচন কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন যে, প্রমাণ-রহস্যবিদ্ পণ্ডিতগণ যাহাকে "পদ" আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাকেই পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।[২] পদ, বাক্য প্রভৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন যে, পদ এবং বাক্য, শব্দের এই দুই প্রকার রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ, তিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত সার্থক বর্ণসমষ্টিকে পদ-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। গৌতম মুনিও তাঁহার ন্যায়সূত্রে বিভক্ত্যন্ত বর্ণরাজিকেই পদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদম্। ন্যায়সূত্র, ২।২।৫৮, জয়ন্তভট্টও ন্যায়মঞ্জরীতে গৌতমের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, পদং হি বিভক্ত্যন্তো বর্ণসমুদায়ো ন প্রাতিপদিকমাত্রম্। ন্যায়মঞ্জরী, ৩২২ পৃষ্ঠা ; এই পদ মাধ্ব-পণ্ডিতগণের মতে যৌগিক, রূঢ় এবং যোগরূঢ়, এই তিন প্রকার। নৈয়ায়িকগণ যৌগিক-রূঢ় নামে আরও এক প্রকার পদের বিভাগ করিয়া পদকে চারি প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের অর্থের সাহায্যে যে-পদের অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে যৌগিক-পদ বলে। পাচক, পাঠক প্রভৃতি এই যৌগিক-পদ। যেখানে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের সাহায্যে পদের অর্থ বুঝা যায় না, তাহা রূঢ় শব্দ। "মণ্ডপ" শব্দ এই জাতীয় রূঢ় শব্দ। মণ্ডপ শব্দে মণ্ড যে পান করে সেইরূপ মণ্ডপায়ী আতুরকে না বুঝাইয়া, পূজা-মণ্ডপকে বুঝায়। পঙ্কজ শব্দে পঙ্কে জাত এই অর্থে শৈবাল প্রভৃতিকে না বুঝাইয়া যে পদ্মকে বুঝায়, ইহা যোগরূঢ় শব্দ। উদ্ভিদ্ শব্দে যোগার্থ বশতঃ পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া উৎপন্ন তরু, গুল্ম প্রভৃতিকে বুঝায়। রূঢ় বশতঃ বেদোক্ত উদ্ভিদ্-যাগকে বুঝায়। এইরূপ শব্দকে নৈয়ায়িকগণ যৌগিক-রূঢ় শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কয়েকটি পদে মিলিয়া একটি বাক্য গঠিত হয়। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে পরস্পর আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা

১। ননু কিমিদং পদং নাম যৎসংসর্গবিশেষো বাক্যম্। ন তাবদ্বর্ণসমূহঃ কপটাদীনামপি পদত্বাপত্তেঃ। একবর্ণাত্মকানাং অঃ বিষ্ণুঃ ইঃ কাম ইত্যাদীনাং পদত্বানাপত্তেশ্চ, নাপি সুবন্তত্বং তিঙন্তেষ্বভাবাৎ, নাপি তিঙন্তত্বং সুবন্তেষ্বভাবাৎ। ন্যায়সার, ৩৬৬ পৃষ্ঠা ;

২। প্রামাণিকপদব্যবহারবিষয়ঃ পদম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৬ পৃষ্ঠা ;

প্রভৃতি থাকিলে, সেই পদগুলি "বাক্য" সংজ্ঞা লাভ করে।[১] মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রেও আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি প্রভৃতি যুক্ত পদসমুদায়কেই বাক্য আখ্যা দিয়াছেন।[২]

বাক্যাঙ্গ আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতির বিবরণ

বাক্যাঙ্গ পদসমষ্টির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি না থাকিলে তাহা যে বাক্য হইবে না, এবিষয়ে সকলেই একমত। আকাঙ্ক্ষা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কোনও বাক্যের এক অংশ শুনিবামাত্র অপর অংশগুলিকে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসুর যে ব্যাকুলতা দেখা যায়, তাহারই নাম আকাঙ্ক্ষা। "দেখিতেছে" শুনিলেই কে কাহাকে দেখিতেছে, কোথায় দেখিতেছে? এইরূপে "দেখিতেছে" ক্রিয়ার কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং অধিকরণকে জানিবার জন্য যে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে। পূর্ব্বপদসঞ্জাতাকাঙ্ক্ষাপূরকত্বমাকাঙ্ক্ষা। প্রমাণচন্দ্রিকা ১৫৮ পৃষ্ঠা; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই দ্বৈত-বেদান্তী মাধ্ব-সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য মাধব-মুকুন্দ বলিয়াছেন, যেই পদ ব্যতীত যেই পদের অন্বয়-বোধ সম্ভব হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে।[৩] এই মতে অন্বয়ের অনুপপত্তিকেই আকাঙ্ক্ষার বীজ বলিয়া জানিবে।

১। বিভক্ত্যন্তা বর্ণাঃ পদম্। অকাঙ্ক্ষা সন্নিধি-যোগ্যতাবতাং পদানাং সমূহো বাক্যম্। প্রমাণপদ্ধতি, ৮০ পৃষ্ঠা;

২। বাক্যত্বঞ্চ আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্ত্যাদিমত্ত্বেসতি পদসমুদায়ত্বম্।
পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২০ পৃষ্ঠা;

৩। যস্য যেন বিনা বাক্যার্থান্বয়াননুভাবকত্বং তস্য তেনাকাঙ্ক্ষা, যথা ঘটমানয়েত্যত্র ক্রিয়াপদস্য কর্ম্মপদেন বিনা ক্রিয়াকর্ম্মভাবান্বয়বোধাজনকত্বমিত্যানয়-পদস্যঘটপদেন সহাকাঙ্ক্ষা। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫৮ পৃষ্ঠা;

(খ) যৎপদেন বিনা যৎপদস্য অন্বয়াননুভাবকত্বং তেন সহ তস্যাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াপদস্য কারকপদং বিনা, কারকপদস্য ক্রিয়াপদং বিনা শাব্দবোধাজনকত্বাৎ তয়োরিতরেতরাকাঙ্ক্ষা। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২০ পৃষ্ঠা;

(গ) যৎপদেন বিনা যস্যাননুভাবকতা ভবেৎ। আকাঙ্ক্ষা, ভাষাপরিচ্ছেদ, ৮৪ কারিকা; যেন পদেন বিনা যৎপদস্য অন্বয়াননুভাবকত্বং তেন পদেন সহ তস্যাকাঙ্ক্ষা ইত্যর্থঃ। ক্রিয়াপদং বিনা কারকপদং নান্বয়বোধং জনয়তীতি তেন তস্যাকাঙ্ক্ষা। মুক্তাবলী, ৮৪ কাঃ;

অন্বয়ানুপপত্তিরাকাঙ্ক্ষেতি। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২০ পৃঃ; আলোচিত আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানিবার জন্য যে ব্যগ্রতা বা ব্যাকুলতা তাহা তো চেতনের ধর্ম্ম, অচেতনের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং বাক্যের অর্থ জানিবার জন্য যিনি ব্যাকুল সেই পুরুষেই কেবল আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, বাক্যান্তর্গত অচেতন পদসমূহে তাহা থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় বাক্যের ঘটক পদগুলিকে "সাকাঙ্ক্ষ" বলা হয় কি হিসাবে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে মাধ্ব এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণ বলেন যে, আকাঙ্ক্ষা চেতনের ধর্ম্ম হইলেও বাক্যার্থ এবং বাক্যান্তর্গত পদগুলি সেই আকাঙ্ক্ষার জনক বিধায়, তাহাদিগকে (গৌণভাবে) সাকাঙ্ক্ষ বলা হইয়া থাকে।[১] মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে আকাঙ্ক্ষা পদের ধর্ম্ম নহে, পদার্থের ধর্ম্ম। সুতরাং মীমাংসা এবং অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে একটি পদার্থকে জানিলে অপর পদার্থকে জানিবার যে ইচ্ছা হয়, তাহার নাম আকাঙ্ক্ষা। যে জিজ্ঞাসু নহে এইরূপ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরও বাক্য শুনিবামাত্রই অর্থ-জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। অতএব বস্তুতঃপক্ষে জানিবার ইচ্ছা (জিজ্ঞাসা) থাকুক, বা নাই থাকুক, জিজ্ঞাসার যোগ্য হইলেই সেই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে।[২] যেই বাক্যের যাহা তাৎপর্য্য তাহা যদি কোনও প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই সেই বাক্যে যোগ্যতা আছে বলিয়া বুঝা যাইবে। যোগ্যতা তাৎপর্য-বিষয়াবাধ এব, অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬৮৯ পৃঃ; "জলের দ্বারা সেচন করিতেছে" বলিলে জলের সহিত সেচন ক্রিয়ার অন্বয়ে কোনরূপ বাধা দেখা যায় না। কিন্তু বহ্নিনা সিঞ্চতি, অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে এইরূপ বলিলে, অগ্নির সহিত সেচন ক্রিয়ার অন্বয়ে বাধা আছে।

যোগ্যতা

১। (ক) যদ্যপাকাঙ্ক্ষা চেতনধর্মঃ তথাপি অর্থাস্তাবৎ স্বপদশ্রোতুরন্যোন্য-বিষয়াকাঙ্ক্ষাজনকত্বেন সাকাঙ্ক্ষাইত্যুচ্যন্তে। তৎপ্রতিপাদকত্বাৎ পদান্যপি সাকাঙ্ক্ষা-নীত্যুচ্যন্তে। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৪৮ পৃষ্ঠা;

(খ) জ্ঞাতুরিতরেতরাকাঙ্ক্ষাজনকত্বেনৈব পদানাং সাকাঙ্ক্ষত্বং নতু আকাঙ্ক্ষাবত্ত্বেন তস্য চেতনাসাধারণধর্ম্মত্বাৎ শব্দস্য অচেতনত্বেন তত্ত্বাযোগাৎ। এতেন হস্তী গৌরশ্ব ইত্যাদি পদসমুদয়স্য বাক্যত্বমিতি নিরস্তম্ আকাঙ্ক্ষাশূন্যত্বাৎ। পরপক্ষ-গিরিবজ্র, ২২০ পৃষ্ঠা;

২। পদার্থানাং পরস্পরজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বযোগ্যত্বমাকাঙ্ক্ষা।
অজিজ্ঞাসোরপি বাক্যার্থবোধাদ্ যোগ্যত্বমুপাত্তম্।
বেদান্তপরিভাষা, ২১২ পৃষ্ঠা;

কেননা, সেচন-ক্রিয়া জলের দ্বারা হওয়াই স্বাভাবিক, বহ্নিতে সেচন ক্রিয়ার যোগ্যতা নাই। ফলে, "বহ্নিনা সিঞ্চতি" এইরূপ বাক্যকে যোগ্যতার অভাব থাকায় প্রমাণ বলা চলিবে না।[১] তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ" এবং "ত্বম্" এই পদ দুইটির অর্থ বিচার করিলে, ঐ পদদ্বয়ের বাচ্য-অর্থের অভেদ আপাতদৃষ্টিতে বাধাপ্রাপ্ত বলিয়া মনে হইলেও, অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে "তৎ" এবং "ত্বম্" এই উভয় পদেরই চৈতন্যে লক্ষণা করায়, নির্ব্বিশেষ ভূমা চৈতন্যই উভয় পদের অর্থ বলিয়া বুঝা হয়। চৈতন্যের অভেদান্বয়ে কোনই বাধা নাই, সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যেও অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে যোগ্যতা আছে ইহাই দেখা গেল, যোগ্যতার অভাব ঘটিল না। ফলে, ঐ বাক্যও প্রমাণই হইল।

বাক্যের অর্থ-বোধের জন্য বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর অন্বয়সাপেক্ষ পদগুলির উচ্চারণ অনতিবিলম্বে হওয়া আবশ্যক, ইহারই নাম আসত্তি বা সন্নিধি। গাম্, আনয়, এই পদ দুইটি অবিলম্বে

আসত্তি বা সন্নিধি

উচ্চারিত হইলেই, উচ্চারিত পদদ্বয়ে আসত্তি থাকিবে বলিয়া ইহা একটি বাক্য হইবে। "গাম্" এই পদটি প্রথম ঘণ্টায় উচ্চারণ করিয়া, দ্বিতীয় ঘণ্টায় "আনয়" পদটি উচ্চারণ করিলে, বাক্যের ঘটক উক্ত পদ দুইটির সন্নিধির অভাববশতঃ ইহা বাক্য হইবে না।[২] দ্বিতীয়তঃ বাক্যস্থ যেই পদের সহিত যেই পদের

১। (ক) যোগ্যতাচ তাৎপর্য্যবিষয়সংসর্গাবাধঃ। বহ্নিনাসিঞ্চেদিত্যাদৌ তাদৃশ-সংসর্গবাধান্নাতিব্যাপ্তিঃ। বেদান্তপরিভাষা, ২২৬ পৃষ্ঠা ;

(খ) প্রতীতান্বয়স্য প্রমাণাদিবিরোধাভাবো যোগ্যতা। যথা জলেন সিঞ্চতীত্যত্র জলসেচনয়োঃ কার্য-কারণভাবসংসর্গস্য অবাধিতত্বাৎ সেচনস্য জলেন সহ অন্বয়ো যোগ্যতা। অতএব অগ্নিনা সিঞ্চতীতি ন বাক্যম্। যোগ্যতাবিরহাৎ। নহি অগ্নিসেচনয়োঃ পরস্পরান্বয়যোগ্যতাস্তি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫৮ পৃষ্ঠা ;

(গ) পদার্থসংসর্গাবাধো যোগ্যতা, পদার্থস্য পদার্থান্তরসম্বন্ধো বা অগ্নিনা সিঞ্চেদিত্যস্য পদসমুদায়ত্বেঽপি ন বাক্যত্বং যোগ্যতাভাবাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র ২২০—২২১ পৃষ্ঠা ;

(ঘ) পদার্থে তত্র তদ্বত্ত্ব যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা। ভাষাপরিচ্ছেদ, ৮৩ কাঃ একপদার্থে ঽপরপদার্থসম্বন্ধো যোগ্যতেত্যর্থঃ। তজ্জ্ঞানাভাবাৎ বহ্নি সিঞ্চতীত্যাদৌ ন শাব্দবোধঃ। মুক্তাবলী, ৮৩ কারিকা ;

২। (ক) ইতরেতরান্বয়সাপেক্ষাণাং পদানামবিলম্বেনোচ্চারণমাসত্তিঃ সৈ সন্নিধিরুচ্যতে, কালব্যবধানেনোচ্চরিতপদসমুদায়স্য ন বাক্যত্বম্ তত্রাসত্ত্যভাবাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২১ পৃ

(খ) অবিলম্বেনোচ্চরিতত্বং সন্নিধিঃ। যথাঽব্যবধানেন উচ্চরিতানি গাম

অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত, বাক্যের অর্থ-বোধের জন্য সেই পদগুলি কাছাকাছি থাকা আবশ্যক। পদগুলি কাছাকাছি থাকিলেই বাক্যে "আসত্তি" আছে বুঝা যাইবে। পরস্পর অন্বয়-যোগ্য বাক্যস্থ পদগুলি যদি পদান্তরের দ্বারা ব্যবধানে পড়িয়া যায়, তবে সেইরূপ বাক্যে আসত্তি থাকিবে না। ফলে, ঐরূপ বাক্য হইতে কোনরূপ অর্থ-বোধও উৎপন্ন হইবে না। "পর্ব্বতো ভুক্তং বহ্নিমান্ রামেণ" এইরূপ বাক্যে "পর্ব্বত" পদের সহিত "বহ্নিমান্" পদের, এবং "রামেণ" এই পদের সহিত "ভুক্তম্" পদের অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত। অন্বয়-যোগ্য পদগুলি একটির পর একটি সজ্জিত থাকিলে, এই বাক্যে আসত্তি থাকিত, শাব্দ-বোধেরও উদয় হইত। এখানে "পর্ব্বতঃ" এই পদের পর "ভুক্তম্" পদটি থাকিয়া বহ্নিমান্ পদটিকে ব্যবধান করায়, বাক্যটি আসত্তি বা সন্নিধিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং এইরূপ বাক্য হইতে বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।[১]

দুই প্রকার পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি পদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ, ইহাই শব্দের শক্তি বলিয়া পরিচিত, দ্বিতীয়টি লক্ষ্যার্থ।[২] পদমাত্রই কোন-না-কোন অর্থের বাচক হয়; পদে অর্থের বাচকতা-শক্তি আছে। এই শক্তি-পদার্থটি কি তাহা বিবেচ্য। গরু বলিলে গলকম্বলধারী পশুকে বুঝায়। ইহাই গোশব্দের শক্তি বা মুখ্যার্থ। নৈয়ায়িকদিগের মতে "এই পদ হইতে এই অর্থ বুঝা যাইবে" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা বা ইচ্ছার নামই সঙ্কেত বা শক্তি। নৈয়ায়িকগণ এই শক্তিকে একটি পৃথক্ পদার্থ বলিয়া মনে করেন না। অগ্নিতে যে দাহিকা-শক্তি আছে, তাহা তাঁহাদের মতে

পদের শক্তি বা বাচ্যার্থের পরিচয়

ত্যাদিপদানি সন্নিধিমন্তি। অতএব প্রহরে প্রহরেঽসহোচ্চারিতানি গামানয়েত্যাদীনি ন বাক্যং। সন্নিধ্যভাবাৎ। প্রমাণচন্দ্রিকা ১৫৮ পৃষ্ঠা;

১। (ক) আসত্তিশ্চাব্যবধানেন পদজন্যপদার্থোপস্থিতিঃ।

বেঃ পরিভাষা, ২২৬ পৃষ্ঠা;

(খ) কারণং সন্নিধানন্তু পদস্যাসত্তিরুচ্যতে। ভাষাপরিচ্ছেদ, ৮৩ কারিকা; যৎপদার্থস্য যৎপদার্থেন অন্বয়োঽপেক্ষিত স্তয়োরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ (শাব্দবোধে) কারণম্। তেন গিরিভুর্ক্তমগ্নিমান্ দেবদত্তেনেত্যাদৌ ন শাব্দবোধঃ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ৮২ কারিকা;

২। পদার্থশ্চ দ্বিবিধঃ শক্যো লক্ষ্যশ্চেতি. তত্র শক্তির্নাম পদানামর্থেষু মুখ্যা বৃত্তিঃ। বেঃ পরিভাষা, ২৩২ পৃষ্ঠা;

অগ্নি হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে শক্তি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। অগ্নিতে যে দাহিকা-শক্তি আছে, তাহাও ইঁহাদের মতে অগ্নি হইতে পৃথক্ বস্তু। এরূপ দেখা যায় যে, কোনও এক জাতীয় মণিকে অগ্নির নিকটে উপস্থিত করিলে অগ্নির দাহিকা-শক্তি তিরোহিত হয়; ঐ মণি দূরে সরাইয়া লইলে অগ্নির দাহিকা-শক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, অগ্নির দাহিকা-শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ বস্তু। নৈয়ায়িকগণ এখানে বলেন যে, মণির উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বার বার উৎপত্তি এবং বিনাশ মানিতে গেলে তাহা হয় অত্যন্তই গুরুতর কল্পনা। এইজন্য অগ্নি হইতে পৃথক্ ঐ দাহিকা-শক্তিকে অগ্নি-দাহের প্রতি কারণ না বলিয়া, দাহিকা-শক্তির প্রতিরোধী মণির অভাববিশিষ্ট বহ্নিকেই দাহের কারণ বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ন্যায়-মতে বহ্নিই দাহের কারণ, তবে দাহ-প্রতিরোধী মণি দাহের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে বলিয়া, প্রতিবন্ধক মণির অভাবকে অবশ্যই কারণ বলিতে হইবে। এই জন্যই নৈয়ায়িক মণির অভাববিশিষ্ট বহ্নিকে দাহের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মীমাংসক এবং বৈদান্তিক নৈয়ায়িকদিগের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে বহ্নির দাহিকা-শক্তির বার বার উৎপত্তি এবং ধ্বংস যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তখন বহ্নির দাহিকা-শক্তিকে বহ্নি হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণে কার্য্যের যে সৃজনী-শক্তি আছে, তাহাও কারণ হইতে পৃথক্ পদার্থ। গোশব্দ শোনামাত্র গল-কম্বলধারী পশুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। গোশব্দটি এস্থলে উক্ত অর্থ-বোধের মুখ্য কারণ বা সাক্ষাৎ সাধন; আর ঐরূপ পশুবিশেষের জ্ঞান গোশব্দের বাচ্য বা প্রতিপাদ্য। গোশব্দরূপ কারণে আলোচিত অর্থ-জ্ঞানরূপ কার্য্যের জনক শক্তি আছে; ঐ শক্তি আছে বলিয়াই, গোশব্দ শুনিবামাত্র ঐরূপ অর্থের বোধ হইয়া থাকে। অর্থ-জ্ঞানরূপ কার্য্যের দ্বারা অনায়াসেই বাচক শব্দে অর্থ-বোধের সাধক শক্তির অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ শক্তির সাহায্যে মুখতঃ যে অর্থের বোধ হয় তাহাকেই বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ বলে।[১]

শক্তি কাহাকে বলে? শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ কি?

১। সা চ শক্তিঃ পদার্থান্তরম্, সিদ্ধান্তে কারণেষু কার্য্যানুকূলশক্তিমাত্রস্য পদার্থান্তরত্বাৎ। সাচ তত্তৎপদজন্যপদার্থজ্ঞানরূপকার্য্যানুমেয়া। তাদৃশ-শক্তিবিষয়ত্বং শক্যত্বম্। বেদান্তপরিভাষা, ২৩৩, ২৩৫ পৃষ্ঠা;

এখন প্রশ্ন এই যে, শব্দের এই শক্তি থাকে কোথায়? "গৌঃ" এই পদের দ্বারা কি গোত্ব জাতিকে বুঝাইবে? না গোর আকৃতিকে, (general shape) না গো-ব্যক্তিকে (particular cow) বুঝাইবে? এই বিষয় লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে গুরুতর মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারিলপন্থী মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন, জাতিই একমাত্র পদার্থ; গোশব্দের যাহা শক্তি তাহা গোত্ব জাতিতেই থাকে। জাতিকে না জানিলে ব্যক্তিকে জানা যায় না; গোত্ব অর্থাৎ গো-প্রাণীর অসাধারণ ধর্ম্ম কি তাহা না বুঝিলে, গরু কাহাকে বলে তাহা চিনিবার উপায় নাই। গরু চিনিতে হইলে গরুর যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বেই জানা আবশ্যক। এইজন্য গোশব্দের গোত্বে শক্তি কল্পনা করাই স্বাভাবিক। গোশব্দের দ্বারা একমাত্র গোত্ব-জাতিকে বুঝাইলেও জাতি তো ব্যক্তিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; গো-শরীর ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও গোত্বের কল্পনা করা যায় না। জাতি ও ব্যক্তির জ্ঞান একত্রই উদিত হয়। একজ্ঞান-বেদ্য বলিয়াই জাতির বোধ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিরও বোধ হইয়া থাকে। কথংতর্হি গবাদিপদাদ্ ব্যক্তিভানমিতি চেৎ জাতের্ব্যক্তিসমানসংবিৎসংবেদ্যতয়েতি ক্রমঃ। বেদান্তপরিভাষা, ২০৫ পৃষ্ঠা; গো-ব্যক্তি অনন্ত এবং অসংখ্য; অসংখ্য প্রত্যেক গো-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গোশব্দের শক্তি কল্পনা করিতে যাওয়া নিতান্তই গৌরবও বটে, অসম্ভবও বটে।

জাতি-শক্তি ও ব্যক্তি-শক্তিবাদ

কুমারিলোক্ত জাতি-শক্তিবাদের খণ্ডন করিতে গিয়া প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণ বলিয়াছেন যে, গোর আকৃতি এবং গো-ব্যক্তিকে না জানিলে, গোত্ব-জাতিকে কোনমতেই জানা যায় না। জাতির বোধ আকৃতি এবং ব্যক্তির জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। যিনি গরুর আকারটি কিরূপ, গো-পশুটি দেখিতে কেমন, তাহা জানেন না এবং কখনও গরু দেখেন নাই, এইরূপ ব্যক্তির গোত্ব-জাতি সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞানোদয় হওয়া সম্ভবপর কি? এই অবস্থায় গোর আকৃতি এবং ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কেবল গোত্ব-জাতিকেই গোশব্দের শক্যার্থ বা মুখ্যার্থ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।[১] এইরূপে জাতি-শক্তিবাদ খণ্ডন করিয়া প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ব্যক্তি,

১। নাকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ। ন্যায়সূত্র. ২।২।৬৫;

জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহ্যমাণায়ামাকৃতৌ ব্যক্তৌচ জাতিমাত্রং শুদ্ধং গৃহ্যতে। তস্মান্ন জাতিঃ পদার্থ ইতি। বাৎস্যায়ন-ভাষ্য. ২।২।৬৫;

আকৃতি এবং জাতি, এই তিনটিকেই পদের অর্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ। ন্যায়সূত্র, ২।২।৬৬ ; গোশব্দের দ্বারা গোত্ব-জাতি এবং গোর আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির বোধ হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে গো-ব্যক্তি, গোর আকৃতি এবং গোত্ব-জাতি, এই পদার্থত্রয়েই গোশব্দের শক্তি স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রাচীন-নৈয়ায়িকের অভিমত বলিয়া উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন। গোর আকৃতি, ব্যক্তি এবং জাতি, এই তিনই গোশব্দের অর্থ বা প্রতিপাদ্য হইলেও, সকল ক্ষেত্রে এই তিনটিকেই যে প্রধানভাবে বুঝা যাইবে এমন নহে। কোন স্থলে ব্যক্তির, কোন ক্ষেত্রে জাতির, কোথায়ও বা আকৃতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত পদার্থত্রয়ের একটি প্রধান হইলেই, অপর দুইটি যে অপ্রধান হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও আলোচ্য পদার্থত্রয়েই যে গো-পদের একটি শক্তি বা সঙ্কেত আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রাচীনগণ স্বীকার করেন নাই। গৌর্গচ্ছতি, গৌস্তিষ্ঠতি প্রভৃতি প্রয়োগে গোশব্দে গো-ব্যক্তিকেই প্রধানভাবে বুঝাইয়া থাকে। কেননা, গোত্ব জাতির বা গোর আকৃতির তো গমনাগমন প্রভৃতি সম্ভবপর নহে; সুতরাং আলোচ্য স্থলে গো-ব্যক্তিকেই যে মুখ্যতঃ গোশব্দের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা নিঃসন্দেহ। তারপর, "গরুকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করিবে না, গৌর্ন পদা স্প্রষ্টব্যা," এইরূপ বাক্যে গরুমাত্রকেই পায়ের দ্বারা স্পর্শ করার নিষেধ সূচনা করে বলিয়া, গোশব্দে এখানে গো-সামান্যকে অর্থাৎ গোত্ব-জাতিকেই বুঝায়। আকৃতির উদাহরণ উল্লেখ করিতে গিয়া, জয়ন্তভট্ট, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, বৈদিক যজ্ঞে যেখানে পিটুলির দ্বারা গরু প্রস্তুত করিবার কথা আছে, (পিষ্টকময্যো গাবঃ ক্রিয়ন্তাম্) সেস্থলে গোশব্দে প্রধানতঃ গোর আকৃতিকে, এবং গৌণভাবে গো-ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। পিটুলির তৈয়ারী গরুতে গোত্ব-জাতি নাই; সুতরাং জাতির সেক্ষেত্রে বোধ হইবে না, শুধু ব্যক্তি এবং আকৃতিকেই বুঝাইবে।[১] প্রাচীন-মতে এইরূপে জাতি,

---

১। ক্বচিৎ প্রয়োগে জাতেঃ প্রাধান্যং ব্যক্তেরঙ্গভাবঃ, যথা "গৌর্ন পদ স্প্রষ্টব্যে"তি, সর্বগবীষু প্রতিষেধো গম্যতে। ক্বচিদ্‌ব্যক্তেঃ প্রাধান্যং জাতেরঙ্গভাবঃ। যথা গাং মুঞ্চ গাং বধানেতি নিয়তাং কাঞ্চিদ্‌ব্যক্তিমুদ্দিশ্য প্রযুজ্যতে। ক্বচিদাকৃতেঃ প্রাধান্যং ব্যক্তেরঙ্গভাবো জাতির্নাস্ত্যেব যথা পিষ্টকময্যো গাবঃ ক্রিয়ন্তামিতি সন্নিবেশচিকীর্ষয়া প্রয়োগ ইতি। ন্যায়মঞ্জরী, ৩২৫ পৃষ্ঠা, বিজয়নগর সং;

আকৃতি এবং ব্যক্তি, এই পদার্থত্রয়ই গোপদের শক্যার্থ বা মুখ্যার্থ বলিয়া কথিত হইলেও, গদাধর প্রভৃতি নব্য-নৈয়ায়িকগণ এই প্রাচীন-মতের অনুসরণ করেন নাই। নব্য-নৈয়ায়িকগণ গোর আকৃতি বা অবয়ব-সন্নিবেশকে গোশব্দের শক্তির মধ্যে টানিয়া না আনিয়া, গোত্ব-জাতি, এবং গো-ব্যক্তিতেই গোশব্দের শক্তি কল্পনা করিয়াছেন। ভট্ট-মীমাংসার মতের ন্যায় নব্যন্যায়-মতে শক্তি কেবল জাতিতেই থাকে এমন নহে, উহা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে থাকে। এইমতে গোশব্দে গোত্ব-জাতিবিশিষ্ট গো-পশুকে বুঝায়। ইহাই গোশব্দের মুখ্য অর্থ। গোশব্দের কেবল জাতিতে শক্তি হইলে, গোশব্দের দ্বারা কেবল গোত্বকেই বুঝাইত, গো-প্রাণীকে বুঝাইত না; সুতরাং ভট্ট-মীমাংসোক্ত জাতি-শক্তিবাদ নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যায় না। জৈন-দার্শনিকগণ বলেন যে, গোর আকৃতিই গোশব্দের মুখ্য অর্থ বা প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। কেননা, গরু যে ঘোড়া নহে, কিংবা ঘোড়া যে গরু নহে; অথবা গরু যে গরু, ঘোড়া যে ঘোড়া, তাহাতো গরু বা ঘোড়ার আকৃতি দেখিয়াই আমরা বুঝিয়া থাকি। এই অবস্থায় আকৃতিকেই একমাত্র পদার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া সঙ্গত নহে কি? এইরূপ জৈন-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক বলেন যে, আকৃতিকেই পদার্থ বলিলে অর্থাৎ গোর আকৃতিকেই গোশব্দের শক্তি বা মুখ্য অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে, মাটির দ্বারা যদি একটি গরু তৈয়ারী করা যায়, তবে সেই মাটির গরুতেও গোর আকৃতি আছে বলিয়া তাহাও গোশব্দের মুখ্য অর্থযুক্তই হইয়া দাঁড়ায় না কি? মাটির গরুতে গরুর আকৃতি থাকিলেও গোত্ব-জাতি নাই। গোত্ব-জাতির সঙ্গে যোগ না থাকায়, শুধু আকৃতিকে পদার্থ বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না। যদি জাতিকে ছাড়িয়া, কেবল আকৃতি এবং ব্যক্তিকেই পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে মাটির গরুতেও মুখ্যতঃ গোশব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ, মাটির গরুতে গোত্ব না থাকিলেও, গোর আকৃতি আছে। গামানয়, গাংমুঞ্চ, গাংদেহি প্রভৃতি বাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, উল্লিখিত কোন প্রয়োগেই গোশব্দে মাটির গরুকে বুঝায় না। কেন বুঝায় না? ইহার উত্তর এই যে, মাটির গরুতে গোত্ব-জাতি নাই। আকৃতি ঐ পদের বাচ্য নহে, গোত্ব-জাতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিই ঐ সকল স্থলে গো-পদের বাচ্যার্থ বলিয়া বুঝা যায়। গো-ব্যক্তির জ্ঞানে গোত্ব-

জাতির জ্ঞান কারণ। গোর সামান্য-ধর্ম্ম (common characteristics) যাহা সকল গরুতেই আছে, গরুভিন্ন ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি অন্য কোনও প্রাণীতে যেই ধর্ম্ম নাই, সেই সামান্য-ধর্ম্ম বা জাতির জ্ঞান প্রথমে মনের মধ্যে উদিত হইয়া, সেই ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে রূপায়িত (অর্থাৎ জাতিবিশিষ্ট) ব্যক্তির বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গো-ব্যক্তি অসংখ্য, গোত্ব-জাতি বা গোর সামান্য-ধর্ম্মকে ছাড়িয়া, অনন্ত-অসংখ্য গো-ব্যক্তিতে (গো-শরীরে) গোশব্দের শক্তি-বোধ সম্ভবপর নহে বলিয়া, গোর সামান্য-ধর্ম্মমূলে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে, গোত্ববিশিষ্ট গোতে নব্য-নৈয়ায়িকগণ গোশব্দের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। আলোচিত নব্যন্যায়-মতের অনুসরণ করিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-রহস্যজ্ঞ আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে বলিয়াছেন, সাচ শক্তির্জাতিবিশিষ্টব্যক্তাবেব ন জাতিমাত্রে, তথাত্বে ব্যক্ত্যবোধপ্রসঙ্গাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৪৫ পৃষ্ঠা ; মাধবমুকুন্দের উল্লিখিত অভিমত নব্যন্যায়-মতের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইলেও, নব্যন্যায়-মত এবং নিম্বার্ক-মতের তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, নব্য-নৈয়ায়িকগণ জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি মানিয়া লইয়া গোত্ব-জাতি এবং গো-ব্যক্তিতে একটি সঙ্কেত স্বীকার করিয়াছেন। জাতি-শক্তির ন্যায় ব্যক্তি-শক্তিকেও সমান-ভাবে গো প্রভৃতি পদার্থ-জ্ঞানের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মাধবমুকুন্দ তাহা করেন নাই। মাধবমুকুন্দ প্রভাকর-মীমাংসার মতের অনুবর্ত্তন করিয়া, জাতি-শক্তিকেই শক্তি-জ্ঞানের সহায়ক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তি-শক্তিকে শক্তি-জ্ঞানের সাধক শক্তি হিসাবে মাধব-মুকুন্দ স্বীকার করেন নাই; ব্যক্তিতেও একটা শক্তি আছে এইমাত্রই বলিয়াছেন। (জাতৌ জ্ঞাতা শক্তিঃ ব্যক্তৌতু স্বরূপবতীতি বিবেকঃ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৪৫ পৃষ্ঠা ;) মাধবমুকুন্দের মতে তাহা হইলে জাতি-শক্তিই মুখ্য-শক্তি, ব্যক্তি-শক্তি গৌণ-শক্তি।

প্রভাকরপন্থী মীমাংসকগণ ভট্ট-মীমাংসকের জাতিশক্তি-বাদে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, গো প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই গলকম্বলধারী এক প্রকার প্রাণীর কথা মনে আসে। এই অবস্থায় গোশব্দে যে গোপ্রাণীকে বুঝাইবে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? গো-ব্যক্তিতে গোশব্দের শক্তি নাই, গোশব্দে গো-ব্যক্তিকে বুঝায় না, গোত্ব-জাতিকেই কেবল বুঝায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা

কোনমতেই চলে না। অসংখ্য, অনন্ত গো-ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গোশব্দের শক্তি-জ্ঞানের উদয় হওয়া কঠিন, আর তাহা অত্যন্ত গুরুতর কল্পনাও বটে। এইজন্য গোত্ব-প্রভৃতি জাতিতেও গোশব্দের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। গোশব্দের দ্বারা গোর যাহা ধর্ম্ম, এবং যাহা সকল গরুতেই বর্ত্তমান আছে, সেই গোত্ব-জাতিকে বুঝায়। ইহাই গোশব্দের মুখ্য অর্থ, বাচ্যার্থ বা শক্তি।" এইরূপ জাতি-শক্তি-বলেই শব্দার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, জাতি-শক্তিকেই গো প্রভৃতি শব্দের অর্থ-বোধের সহায়ক বা সাধক শক্তি বলা হয়। ব্যক্তি-শক্তি থাকিলেও তাহার বলে গো প্রভৃতি শব্দের অর্থ-বোধের উদয় হইতে পারে না। এইজন্য ঐ ব্যক্তি-শক্তিকে বাচ্যার্থ (শক্যার্থ) জ্ঞানের উৎপাদক শক্তি বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না; (উহা স্বরূপসতী শক্তি) বিভিন্ন গো-ব্যক্তিতে একটা ব্যক্তি-শক্তি বিদ্যমান আছে এইমাত্র।[১] প্রভাকরপন্থী মীমাংসকগণের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভট্ট-সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, ব্যক্তি-শক্তি বাচ্যার্থ-জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না; জাতি-শক্তি হইতেই গো প্রভৃতি পদের শক্যার্থ বা মুখ্যার্থের জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, ইহা প্রভাকর-সম্প্রদায়ও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় জাতি-শক্তি-ভিন্ন ব্যক্তিতে শক্তি কল্পনা করার আবশ্যকতা কি? ব্যক্তি-শক্তিজ্ঞান না থাকিলেও, জাতি-শক্তির সাহায্যে জাতি-শক্তিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি-শক্তিজ্ঞানেরও উদয় হইবে। কেননা, গোত্ব প্রভৃতি জাতি তো গো-ব্যক্তিকে ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও থাকিবে না, জাতি ব্যক্তিতেই থাকিবে। এরূপ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক নহে, এইরূপ একটি (স্বরূপসতী) শক্তি স্বীকার করার কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে-শক্তি আমাদের পদার্থ-বোধ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই জাতি-শক্তিই যথার্থ শক্তি: এবং এই শক্তির যাহা বিষয় তাহাই শক্যার্থ, বাচ্যার্থ, বা মুখ্যার্থ। এই সিদ্ধান্তই সত্যের অনুরোধে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে হয়। ভট্ট-মীমাংসার মতানুসারে শক্তির এবং ঐ শক্তিলভ্য পদার্থের (শক্যার্থের) যে বিবরণ পাওয়া গেল, অদ্বৈত-বেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রভৃতিও তাহাই তাঁহাদের গ্রন্থে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন।

১। গবাদিপদানাং ব্যক্তৌ শক্তিঃ স্বরূপসতী নতু জ্ঞাতা, জাতৌতু সা জ্ঞাতা হেতুঃ। নচ ব্যক্ত্যংশে শক্তিজ্ঞানমপি কারণং গৌরবাৎ। বেদান্তপরিভাষা,২৩৭ পৃষ্ঠা;

প্রভাকর-কথিত ব্যক্তি-শক্তিবাদ ভট্ট-মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর অনুমোদন লাভ না করিলেও, দ্বৈত-বেদান্তী জয়তীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের শব্দ-শক্তিবাদের আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁহারা আলোচ্য ব্যক্তি-শক্তিবাদ সমর্থন করিয়াছেন।[১] তাঁহাদের অভিমত এই; অভিজ্ঞ বৃদ্ধের কথা অনুসারে প্রৌঢ় ব্যক্তির আচরণ দেখিয়া, অনভিজ্ঞ বালকের প্রাথমিক শব্দার্থ-বোধের উদয় হইয়া থাকে। বৃদ্ধ প্রৌঢ়কে বলিলেন, "গাম্ আনয়," গরুটি লইয়া আস, বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি গল-কম্বলধারী একটি চতুষ্পদ প্রাণীকে লইয়া আসিল। বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "অশ্বম্ আনয়, গাম্ নয়," ঘোড়াটি আন, গরুটি লইয়া যাও। এইরূপ বলার পরই প্রৌঢ় লোকটি লম্বাগলার আর একটি পশু লইয়া আসিল, এবং গরুটিকে ভিতরে লইয়া গেল। প্রৌঢ়ের এই প্রকার আচরণ দেখিয়া এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত বিভিন্ন বাক্যের পদের অদল-বদল লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমান্ বালক বুঝিল যে, "গাম্" শব্দে গলকম্বলধারী পশুকে, "অশ্বম্" পদে লম্বাগলার এই প্রাণীটিকে বুঝায়। প্রৌঢ়ের পশুটিকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসা "আনয়" পদের দ্বারা, গরুটিকে ঘরে লইয়া যাওয়া "নয়" পদের দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। বৃদ্ধের কথানুসারে প্রৌঢ়ের ব্যবহার এখানে বালকের নিকট ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, জাতিকে অবলম্বন করিয়া নহে। সুতরাং ব্যক্তিই যে গো প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। ব্যক্তি-শক্তি-বাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, অনন্ত, অসংখ্য গো-ব্যক্তিতে গোশব্দের শক্তি-বোধ ব্যক্তি-শক্তির সাহায্যে কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই ব্যক্তি-শক্তিকে বাদ দিয়া, নিখিল গো-প্রাণীতে যে এক গোত্ব-ধর্ম্ম বা জাতি আছে, সেই গোত্ব-জাতিতেই গোশব্দের শক্তি কল্পনা করা যুক্তি-সঙ্গত। এইরূপ আপত্তির সমাধানে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য জয়তীর্থ, জনার্দ্দন ভট্ট প্রভৃতি বলেন যে, ব্যক্তি-শক্তিবাদ অনুসারে সম্মুখস্থ গলকম্বলধারী পশুতে গোশব্দের শক্তি-বোধ উৎপন্ন হইলে, প্রত্যক্ষ-

---

১। গবাদিপদানাং বিশেষ্যতয়া ব্যক্তয় এব বাচ্যাঃ।...গামানয় ইত্যাদৌ সর্বত্র আনয়নাদেঃ ব্যক্তাবেব সম্ভবেন বিশেষ্যতয়া ব্যক্তাবেব শক্তিকল্পনাৎ।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫৭ পৃষ্ঠা;

দৃষ্ট গো-পশুর সাদৃশ্যবশতঃ অদৃষ্ট, অতীত, অনাগত গো-প্রাণীতেও গোশব্দের শক্তি-বোধের উদয় হইতে কোনরূপ বাধা দেখা যায় না। এই অবস্থায় জাতি-শক্তিবাদ অঙ্গীকার করার কোন অর্থ হয় কি?[১] গোত্ব-জাতিতে গোশব্দের শক্তি কল্পনা করিয়া, ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতি অন্য কোথায়ও থাকে না, এই যুক্তিতে লক্ষণাবলে জাতির আধার বা আশ্রয়রূপে ব্যক্তির বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া ভট্ট-মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ এবং ব্যবহার-বিরুদ্ধও বটে। এইজন্য ভট্ট-মীমাংসোক্ত জাতি-শক্তিবাদ কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না। বর্ষীয়ান্ ব্যক্তির কথানুসারে প্রৌঢ়ের "গরু আনয়ন" প্রভৃতি ব্যবহার দেখিয়াই যে বালকের শব্দের প্রাথমিক শক্তি-বোধের উদয় হইয়া থাকে, তাহাতো কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, প্রৌঢ়ের ঐরূপ ব্যবহার কি গোত্ব-জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, না গো-ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়? গোত্বের আনয়ন সম্ভবপর নহে, গো-পশুর অর্থাৎ গো-ব্যক্তির আনয়নই সম্ভবপর; সুতরাং প্রৌঢ়ের ব্যবহার যে, জাতি-শক্তিবাদ সমর্থন করে না, ব্যক্তি-শক্তিবাদই সমর্থন করে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তারপর, গরুটি মরিয়াছে, গরুটি কৃশ, গরুটি দীর্ঘ, গরুটি শাদা, গরুটি খাইতেছে, যাইতেছে, আসিতেছে, এইরূপ ব্যবহার-দ্বারা গোশব্দে যে গো-প্রাণীকেই বুঝাইয়া থাকে, গোত্ব-জাতিকে নহে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়। এই অবস্থায় ব্যক্তি-শক্তিকে লক্ষ্যার্থ, আর জাতি-শক্তিকে শব্দের বাচ্যার্থ বলিয়া গ্রহণ করা কোনমতেই চলে না?[২] আলোচ্য ব্যক্তি-শক্তিবাদ সাংখ্য-দার্শনিকগণও সমর্থন করিয়াছেন।

১। তথাচ সাদৃশ্যেনৈব অতীতানাগতাদিসকলগোব্যক্ত্যুপস্থিতিসম্ভবাদুপস্থাপিতসকলব্যক্তিষু পদস্য শক্তিগ্রহঃ সম্ভবতি। অতোনৈতদর্থমনুগতসামান্যমঙ্গীকার্যম্।

প্রমাণপদ্ধতির জনার্দন ভট্ট-কৃত টীকা, ৮৩ পৃষ্ঠা;

২। প্রভৃ্যত শক্তিগ্রাহকস্যানয়নাদিব্যবহারস্য ব্যক্তাবেব সম্ভবাৎ পদানাং তত্রৈব শক্তিঃ। কিঞ্চ যস্যাং ব্যক্তৌ গৌর্নষ্টা, গৌর্দীর্ঘা, গৌঃ শুক্লা, গৌঃ সাস্নাদিমতী, গৌরনেকা, গৌর্গচ্ছতি, গাং বধান ইত্যাদৌ প্রয়োগপ্রতীত্যোঃ প্রাচুর্যং তস্যাং ব্যক্তৌ লক্ষণা, তদ্‌বিপরীতায়াং জাতৌ শক্তিরিত্যতিসাহসম্।

প্রমাণপদ্ধতির জনার্দন-কৃত টীকা, ৮২ পৃষ্ঠা;

শব্দের শক্তি-বোধ সম্পর্কে আরও বিচার্য্য এই যে, গরুটি আন, ঘোড়াটি আন, গরুটি লইয়া যাও (গামানয়, অশ্বমানয়, গাংনয়) বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধের এইরূপ উপদেশ অনুসারে প্রৌঢ় ব্যক্তির গরুর আনয়ন প্রভৃতি দেখিয়াই যে প্রথমতঃ বুদ্ধিমান্ বালকের শব্দের শক্তি বা অর্থ-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ইহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিশুর প্রাথমিক শব্দার্থের জ্ঞান যে ঐরূপে ক্রিয়ার সহিত জড়িত; এবং আনয়, নয় প্রভৃতি ক্রিয়ার ও ঐ সকল ক্রিয়ার সহিত অন্বিত "গাম্," "অশ্বম্" প্রভৃতি পদের ক্রমিক পরিবর্ত্তন বা অদল-বদল (আবাপোদ্বাপ) লক্ষ্য করার ফলেই শিশু "গাম্" পদে গলকম্বলধারী একজাতীয় প্রাণীকে, আনয় পদের দ্বারা এক প্রকার ক্রিয়াকে বুঝিয়া থাকে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। ইহা হইতে প্রভাকর-মীমাংসক সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, কোন-না-কোন যোগ্য ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়াই পদগুলি তাহাদের (বৃত্তিলভ্য) অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।[১] যে সকল প্রসিদ্ধ অর্থের বোধক বাক্যে কোন ক্রিয়াপদ দেখা যায় না, সেখানেও শব্দার্থের বোধের জন্য যোগ্য ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া লইয়া বাক্যান্তর্গত পদগুলির অর্থের নির্ণয় করিতে হইবে। এই মতে ক্রিয়ারহিত প্রসিদ্ধ পদের প্রয়োগকে পদের লাক্ষণিক প্রয়োগ বা গৌণ প্রয়োগ বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে, মুখ্য প্রয়োগ বলা চলিবে না।[২] প্রভাকর-মীমাংসকগণ তাঁহাদের স্বীকৃত কার্য্যান্বিত-শক্তি-বাদের সমর্থনে বলেন, পদ শুনিয়া যখন পদ-শক্তিবশতঃ সেই পদের অর্থের স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হয়, তখন স্মৃত পদের যে পদান্তরের সহিত অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে, তাহাও পদের শক্তিবলেই শ্রোতা জানিতে পারেন।

অন্বিতাভিধান-বাদ ও অভিহিতান্বয়-বাদ

১। (ক) যোগ্যেতরান্বিতস্বার্থেষু পদানামাবাপোদ্বাপদর্শনাত্তত্রৈব সামর্থ্যমবসীয়তে। চিৎসুখী, ১৪৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং ;

(খ) ব্যবহারশ্চেদ্ব্যুৎপত্ত্যুপায়ঃ কঃ কার্যান্বিতাভিধানং শব্দানামপহ্নুবেৎ। শালিকনাথ-কৃত প্রকরণপঞ্চিকা, ৯৩ পৃষ্ঠা ;

২। এবং লোকে যঃ সিদ্ধার্থপরতয়া পদানাং প্রয়োগঃ স লাক্ষণিকো ভবিষ্যতি..... .....সিদ্ধেঽপি বাক্যে যা ব্যুৎপত্তিঃ সাঽপি কার্যপরতাং ন বিহন্তি সর্বপদানামেব হি স্বাভাবিকী বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধা কার্যপরতা। লাক্ষণিকী চ সিদ্ধপরতেতি। প্রকরণপঞ্চিকা, ৯৩ পৃষ্ঠা ;

ইতরান্বিত-ঘটো ঘটপদ-বাচ্যঃ, আনয়ান্বিত-গৌঃ গোপদ-বাচ্যঃ, এইরূপেই কার্য্যান্বিত-শক্তিবাদী প্রভাকর-সম্প্রদায়ের মতে শব্দের শক্তি-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদার্থ সকল মিলিত হইয়া যে বাক্যার্থ প্রকাশ করে, তাহাও অন্বিতাভিধানবাদী মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্তে পদের শক্তি-জ্ঞানমূলেই জানা যায়। এই মতে একটি পদেই দুইটি শক্তি থাকে ; একটির নাম স্মারক-শক্তি, এই শক্তিটি জ্ঞানগোচর হইয়াই পদার্থের স্মরণ জন্মাইয়া দেয়। পদার্থের স্মরণ উৎপাদন করে বলিয়াই, এই প্রকার পদ-শক্তিকে পদের "স্মারক-শক্তি" বলা হইয়া থাকে। পদের অপর শক্তিটির নাম "অন্বয়ের অনুভাবক-শক্তি" ; এই শক্তিটি পদে স্বরূপতঃ থাকিয়াই অর্থাৎ শ্রোতার জ্ঞানের গোচর না হইয়াই, বাক্যের অন্তর্গত পদসমুদায়ের মধ্যে পরস্পর অন্বয়-বোধ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই মতে অন্বিত বাক্যই বাক্যার্থ বোধগম্য করাইয়া দেয়। পদার্থ-জ্ঞান বাক্যান্তর্গত পদগুলির পরস্পর অন্বয়-বোধ উৎপাদন করিয়াই বিরত হয় এবং ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বাক্যই প্রমাণের মর্য্যাদা লাভ করে। এইজন্যই এই মত প্রভাকর-মীমাংসায় "অন্বিতাভিধান-বাদ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই মত-বাদের মূল মর্ম্ম এই যে, পদের শক্তি-জ্ঞানে যাহা ভাসে না, শব্দজ জ্ঞানেরও তাহা বিষয় হয় না। বাক্যান্তর্গত পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধও শাব্দ-বোধের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যস্থ পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ যে পদের শক্তি জ্ঞানেরও বিষয় হইবে, তাহা এই মতে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।[১] কুমারিল ভট্টের মতের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাক্যাঙ্গ পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ-বোধ যে পদের শক্তিবলেই জানা যায়, পদের শক্তিতে যাহা নাই, শব্দজ জ্ঞানেও তাহা ভাসিতে পারে না, অন্বিতাভিধান-বাদের এই মৌলিক রহস্য ভট্ট-মীমাংসকও অস্বীকার করেন না। তবে প্রভাকর-সম্প্রদায় যেমন বাক্যাঙ্গ প্রত্যেক পদকেই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত করিয়া সেই পদের শক্তির নির্ণয় করেন, ক্রিয়া-

১। অন্বিতাভিধানবাদিনস্তু পদার্থসংসর্গস্যাপি বাচ্যতাং স্বীকুর্বন্তি, তন্মতে ইতরান্বিতঘটো ঘটপদশক্য এতাদৃশমেব শক্তিজ্ঞানং শাব্দবোধপ্রযোজকম্। ঘটো ঘটপদবাচ্য ইত্যাকারকস্যান্বয়াংশানন্তর্ভাবেন শক্তিগ্রহস্য তথাত্বে বৃত্তিগ্রহাবিষয়তয়া পদার্থসংসর্গস্য শাব্দবোধবিষয়তানুপপত্তেঃ।

গদাধরের শক্তিবাদ, ২৪ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

সহিত বাক্যকে পদ ও বাক্যের লাক্ষণিক বা গৌণ প্রয়োগ বলিয়া থাকেন, ভট্ট-সম্প্রদায় তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। অর্থাৎ কুমারিল-পন্থী মীমাংসকেরা অন্বিতাভিধান বা অন্বিত-শক্তিবাদ মানেন বটে, কিন্তু প্রভাকরোক্ত "ক্রিয়ান্বিত-শক্তিবাদ" (পদমাত্রেরই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া শক্তি-বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ প্রভাকর-সিদ্ধান্ত) মানেন না। ভট্ট-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁহারা বলেন যে, অভিজ্ঞ বৃদ্ধের গামানয়, অশ্বং নয় প্রভৃতি উক্তি শুনিয়া, প্রৌঢ় ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়া বালকের যে পদের প্রাথমিক শক্তি-জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই শক্তি-বোধ যে সাক্ষাদ্‌ভাবে আনয়, নয় প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত জড়িত, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু এমনও তো অনেক কথা শুনা যায় যেখানে ক্রিয়ার সহিত বাক্যোক্ত পদের সাক্ষাৎ কোনরূপ যোগই দেখা যায় না; কেবল প্রসিদ্ধ পদগুলির অদল-বদল দেখিয়াই পদের অর্থের নিশ্চয় করিতে হয়। সেক্ষেত্রে পদ-শক্তির বলেই পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইয়া পদার্থ-বোধ জন্মে, এই সত্য কথা কোন মনীষীই অস্বীকার করিতে পারেন না। পুত্রস্তে পণ্ডিতঃ, পুত্রস্তে কুশলী, পুত্রস্তে সুখী, পুত্রস্তে নিরাময়ঃ, এইরূপ বাক্যেও গামানয়, অশ্বং নয়, প্রভৃতি বাক্যের ন্যায় পদের অদল-বদল লক্ষ্য করিয়াই পুত্র, পণ্ডিত প্রভৃতি শব্দের এবং পুত্রের বিভিন্ন বিশেষণ-পদের শক্তি-বোধ উৎপন্ন হইবে, এবং ঐ পদগুলির মধ্যে পরস্পর অন্বয়ের বোধ উদিত হইয়া সমগ্র বাক্যার্থের জ্ঞানোদয় হইবে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? এই অবস্থায় ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হইয়া কোন পদই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, এইরূপ প্রভাকরোক্ত "ক্রিয়ান্বিত-শক্তিবাদ" কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না।[১] বাক্যান্তর্গত পদগুলি অন্বয়ের যোগ্য পদান্তরের সহিত স্ব স্ব শক্তিবলে অন্বিত হইয়াই বাক্যের অর্থ প্রকাশ করে, এইরূপ সিদ্ধান্তই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

পদের শক্তি-সম্পর্কে উল্লিখিত মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন, বাক্যস্থ পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ-বোধকে পদের শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ বলিয়া (ইতরান্বিতঘটো ঘটপদ-শক্যঃ, এইরূপে) মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা

অভিহিতান্বয়-বাদ

১। তত্ত্বপ্রদীপিকা ও নয়নপ্রসাদিনী ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং

আদৌ গ্রহণ-যোগ্য নহে। বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক পদের শক্তি মুখ্যতঃ কিংবা গৌণভাবে (শক্ত্যা লক্ষণয়া বা) পরিজ্ঞাত হইবার পর, আকাঙ্ক্ষাদি বশতঃই পদসকল পরস্পর অন্বিত হইয়া একটি মিলিত বিশিষ্ট অর্থের বোধ উৎপাদন করিতে পারে। ঐরূপ বিশিষ্টার্থ-বোধের জন্য পদ-শক্তির অতিরিক্ত বাক্যার্থের অন্বয়ানুভাবক-শক্তি নামে দ্বিতীয় একটি শক্তি স্বীকার করার কোনই যুক্তি দেখা যায় না। তারপর পদার্থের বা বাক্যার্থের "অন্বয়ানুভাবক-শক্তি" নামে কোন দ্বিতীয় শক্তি থাকিলেও, ঐ শক্তি পদার্থে বা বাক্যার্থেই কেবল থাকিতে পারে, পদে বা বাক্যে তাহা কোনমতেই থাকিতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য মীমাংসক-সিদ্ধান্তকে কোনমতেই গ্রহণ-যোগ্য বলা চলে না। আর এক কথা এই, অন্বিতাভিধান-বাদের সমর্থক আচার্য্যগণ (যোগ্যেতরান্বিত-ঘটো ঘটপদ-বাচ্যঃ, এইরূপে) অন্বয়ের যোগ্য পদান্তরের সহিত অন্বিত পদের যেই দৃষ্টিতে শক্তি কল্পনা করিয়াছেন, সেই দৃষ্টিতে গামানয়, এই বাক্যান্তর্গত গোপদ এবং আনয় পদের শক্তির রহস্য বিচার করিলে, তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, "গোপদটি" যে পর্য্যন্ত আনয় পদের সহিত অন্বিত হইয়া স্বীয় অর্থ না বুঝাইবে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদের (অন্বিতাভিধানবাদীর) মতে গোপদের অর্থ বুঝা যাইবে না। এইরূপ "আনয়" পদটিও গোপদের সহিত অন্বিত না হইয়া কোন অর্থ বুঝাইতে পারিবে না। ফলে, এই মতে "গাম্" এবং "আনয়" পদের অর্থ বুঝিতে গেলে যে "পরস্পরাশ্রয়-দোষ" আসিবে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।[১] অভিহিতান্বয়-বাদী নৈয়ায়িকের মতে কোনও পদ শুনিয়া ঐ পদার্থের স্মৃতি শ্রোতার মনের মধ্যে জাগরূক হয়। তারপর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বশতঃ বাক্যান্তর্গত অপরাপর পদার্থের সহিত পরস্পর অন্বয় বা সম্বন্ধ-বোধ উৎপন্ন হইয়া বিশিষ্ট কোনও একটি অর্থের জ্ঞানোদয় হয়। এই মতে পরস্পরাশ্রয়-দোষের কোন প্রশ্নই উঠে

১। তথাহি গামানয় ইত্যত্র গোপদং যাবদানয়পদেন গোপদার্থান্বিত স্বার্থো নাভিধীয়তে ন তাবত্তদন্বিতস্বার্থমভিধাতু মর্হতি, এবং তদপি পদং যাবৎ স্বার্থান্বিতমর্থং গোপদং নাভিদধ্যাৎ তাবত্তদন্বিতস্বার্থং নাভিধত্তে ততশ্চ গোপদেন তদন্বিত-স্বার্থেঽভিহিতে পশ্চাদানয় পদেন তদন্বিতঃ স্বার্থোঽভিধাতব্যঃ, সতি চ তস্মিন্ গোপদেন স্বার্থোঽভিধাতব্যইতি ব্যক্তমেব পরস্পরাশ্রয়ত্বম্। চিৎসুখী ১৪৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং ;

না।[১] তারপর অন্বিতাভিধানবাদীর পথ অনুসরণ করিয়া পদার্থের নির্ণয় করিতে গেলে, প্রত্যেক পদের অর্থেরই দুইবার উল্লেখ আবশ্যক হইয়া পড়ে। ঐরূপ দ্বিরুল্লেখের কোন প্রমাণও নাই, সঙ্গত যুক্তিও কিছু দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ পদ যদি পদান্তরের সহিত অন্বিত অর্থেরই বোধক হয়, তবে কোনও পদ শুনিয়া যখন পদার্থের স্মৃতি হইবে, তাহাও এই মতে পদান্তরের অর্থের সহিত অন্বিতভাবেই স্মরণকারীর মনের মধ্যে উদিত হইবে। কেননা, স্মৃতি তো জ্ঞানের অনুরূপই হইবে। এই অবস্থায় গরুর আনয়ন যেই বালক দেখিয়াছে, এমন কোন বালককে কেহ যদি "গাং পশ্য" গরুটিকে দেখ, এরূপ আদেশ করেন, তবে সেক্ষেত্রে বালকের আর "গাং পশ্য," এই বাক্যের অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কারণ, গোশব্দের তো আনয়নান্বিত-গোপদেই শক্তি বালক বুঝিয়াছে; এবং গোশব্দ শুনিবামাত্র ঐরূপ শক্তির স্মৃতিই বালকের মনে ভাসিবে। ফলে, "পশ্য" এই ক্রিয়ার সহিত গোপদের অন্বয় আকাঙ্ক্ষারহিত বিধায়, অসঙ্গত বলিয়াই তাহার মনে হইবে; এবং এইরূপ অসঙ্গতি প্রত্যেক বাক্যার্থ-বোধের স্থলেই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, কোনরূপ বাক্যার্থের বোধ উৎপন্ন হওয়াই এই মতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।[২] মীমাংসকোক্ত অন্বিতাভিধান-বাদে উল্লিখিত দোষগুলি লক্ষ্য করিয়াই নৈয়ায়িকগণ অন্বিতাভিধান-বাদের পরিবর্তে অভিহিতান্বয়-বাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পদোক্ত পদার্থই স্মৃতির বিষয় হইয়া আকাঙ্ক্ষাদি-বশে বাক্যান্তর্গত পদগুলির মধ্যে পরস্পর অন্বয় এবং তাহার ফলে বিশিষ্ট বাক্যার্থ-বোধ উৎপাদন করিয়া থাকে।[৩] ন্যায়-সিদ্ধান্তে বাক্যান্তর্গত পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ শক্তি-জ্ঞানের বিষয় হয় না। কেননা, ঐরূপ সম্বন্ধ তো শাব্দ-বোধের বিষয় নহে, যাহা শাব্দ-বোধের বিষয় নহে, তাহা নৈয়ায়িক-

---

১। অভ্যাসাতিশয়শ্চ পদার্থস্মরণহেতুঃ। স চ যথা পদানাং স্বার্থেষু, ন তথা অর্থান্তরেষু। তথা চ স্বরূপমাত্রেণৈব পদেভ্যঃ স্মারিতাঃ আকাঙ্ক্ষাদিমন্তঃ পদৈরন্বিতা অভিধীয়ন্ত ইতি ন পরস্পরাশ্রয়তা। চিৎসুখী, ১৪৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

২। তথাচ গাং পশ্যেতি প্রয়োগে গোপদেন পূর্বানুভূতানয়নান্বিত স্বার্থস্য স্মারিতত্বাৎ পশ্যেতিপদমনাকাঙ্ক্ষিতার্থমসঙ্গতং প্রসজ্যেত……তথাচ বাক্যার্থঃ ক্বাপি পরিনিষ্ঠিতো ন সিদ্ধ্যেৎ। চিৎসুখী, ১৪৬ পৃষ্ঠা;

৩। তস্মাৎ পদৈরভিহিতাঃ পদার্থা এব আকাঙ্ক্ষাদিমন্তঃ পরস্পরান্বয়ং বোধয়ন্তীতি যুক্তমাশ্রয়িতুম্। চিৎসুখী, ১৪৭ পৃষ্ঠা;

মতে শব্দের শক্তি-জ্ঞানেরও বিষয় নহে। ইহাই অভিহিতান্বয়বাদী নৈয়ায়িকের মূল বক্তব্য। অন্বিতাভিধানবাদী মীমাংসকগণ পদার্থসমূহের পরস্পর-সম্বন্ধকে শব্দের শক্তি-জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। এইজন্যই "ইতরান্বিত-ঘটো ঘটপদ-বাচ্যঃ," এইরূপে তাঁহারা শব্দ-শক্তির উপপাদন করিয়া থাকেন। অভিহিতান্বয়বাদীর মতে অভিহিত অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত পদের দ্বারা শক্তি কিংবা লক্ষণা বলে উপস্থাপিত অর্থেরই বোধ হইয়া থাকে। পদগুলির অন্তর্ব্বর্ত্তী পরস্পর-সম্বন্ধ পদের শক্তি-গম্য নহে; আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সাহায্যেই পদসমূহের পরস্পর-সম্বন্ধের বোধ উদিত হইয়া, বাক্যান্তর্গত পদগুলি মিলিতভাবে বিশিষ্ট, পরস্পর-সম্বদ্ধ একটি অর্থের জ্ঞান জন্মায়।[১]

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে ন্যায়-বৈশেষিকের সমর্থন লাভ না করিলেও, মীমাংসোক্ত অন্বিতাভিধান-বাদ মাধ্ব-রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের সমর্থন লাভ করিয়াছে। অবশ্যই পদে পদার্থের স্মারক-শক্তি ব্যতীত অন্বয়ানুভাবক-শক্তি নামে যে দ্বিতীয় আর একটি শক্তি মীমাংসক আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা মাধ্ব-পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন নাই। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি সংবলিত বাক্যের অন্তর্গত পদসকল যে পদশক্তি-বলে পরস্পর অন্বিত অর্থই প্রকাশ করে, অন্বিতাভিধান-বাদের এই মূল সিদ্ধান্ত মাধ্ব-পণ্ডিতগণ সমর্থন করিয়াছেন।[২]

অন্বিতাভিধান-বাদ ও মাধ্ব-মত

আকাঙ্ক্ষাসত্তিযোগ্যতাবন্তি হি পদানি অন্বিতমভিদধতি, অন্বয়ে বা বিশ্রাম্যন্তি। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৮ পৃষ্ঠা; আচার্য্য বেঙ্কটের উল্লিখিত উক্তি দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তী রামানুজ ও তাঁহার সম্প্রদায় যে শব্দের শক্তি-বিচারে আলোচিত অন্বিতাভিধান-বাদেরই অনুসরণ করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। বেঙ্কটনাথ স্বীয় উক্তির সমর্থনে (ন্যায়পরিশুদ্ধির ৩৬৭, ৩৭০

রামানুজ ও অন্বিতাভিধানবাদ

১। বিনাভিধেয়স্মরণমন্বয়াপ্রতিপত্তিতঃ।
তত্তৎপদার্থস্মৃতয়স্তেষামন্বয়বোধিকাঃ॥
পদকদম্বকশ্রবণ সমনন্তরমপি কুতশ্চিন্মানসাপরাধাদনুপজনিতপদার্থস্মৃতের্বাক্যার্থ-প্রত্যয়ানুদয়াচ্চোপজাতপদার্থস্মৃতেরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থস্মৃতীনাং বাক্যার্থপ্রত্যয়-হেতুত্বং তাবদবসীয়তে। চিৎসুখী, ১৪৯ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগরসং;

২। প্রত্যেকং সামান্যতো যোগ্যেতরান্বিতস্বার্থাভিধানশক্তীনি পদানি পদান্তরসন্নিধানাহিতশক্ত্যন্তরাণি বিশেষতোঽপ্যন্বিতান্ স্বার্থানভিদধতি। তথানুভবা-দিত্যাচার্য্যাঃ। প্রমাণপদ্ধতি, ৮৫ পৃষ্ঠা;

পৃষ্ঠায়,) প্রজ্ঞাপরিত্রাণ নামক প্রাচীন গ্রন্থের কতক অংশ উদ্ধৃত[1] করিয়া অন্বিতাভিধান-বাদই যে রামানুজ-সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন। পরাশর ভট্টারক-রচিত তত্ত্বরত্নাকর নামক গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বেঙ্কটনাথ দেখাইয়াছেন যে, বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য যামুন মুনি প্রভৃতি শাব্দ-বোধে অন্বিতাভিধান-বাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন।[2] রামানুজ-কৃত শ্রীভাষ্যের শ্রীরামমিশ্র-কৃত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, শ্রীভাষ্যকারও যে অন্বিতাভিধান-বাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন, বেঙ্কটনাথ তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[3] বেঙ্কটের আলোচনা দেখিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তের অন্বিতাভিধান-বাদই যে সিদ্ধান্ত, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। অতোঽন্বিতাভিধানং সিদ্ধান্ত ইতি। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৭২ পৃষ্ঠা ; আলোচ্য অন্বিতাভিধান-বাদ মাধবমুকুন্দও সমর্থন করিয়াছেন। তস্মাদন্বিতে পদার্থে শক্তিরিতি সিদ্ধম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৪৫ পৃষ্ঠা ;

অপরাপর দার্শনিকের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তীও অভিধা এবং উপচার, অর্থাৎ শক্তি এবং লক্ষণা, এই দুই প্রকার বৃত্তিই অঙ্গীকার করিয়াছেন। বৃত্তির্দ্বিধা—অভিধোপচারভেদাৎ, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৮ পৃষ্ঠা ; এই উভয় প্রকার বৃত্তিই এই মতে অন্বিতাভিধান-বাদেরই সূচনা করে। অন্বিতাভিধানবাদে আমরা দেখিতে পাই, পদমাত্রেরই দুইটি শক্তি আছে ; তাহার একটির নাম স্মারক-শক্তি, দ্বিতীয়টির নাম অন্বয়ানুভাবক-শক্তি। পদস্থ স্মারক-শক্তি পদার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং দ্বিতীয় শক্তিটির সাহায্যে বাক্যস্থ পদসমূহের পরস্পর অন্বয়-বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলোচিত প্রভাকর-মীমাংসা-মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তীও একটি পদেরই দুইটি শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, অভিহিতান্বয়-বাদ

১। অন্বিতার্থাভিধায়িত্বং যোগ্যতামাত্রধীর্গিরাম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৭ পৃষ্ঠা ;
অন্বিতার্থাভিধায়িত্বং শব্দশক্তিনিবন্ধনম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৭০ পৃষ্ঠা ;

২। তত্ত্বরত্নাকরেঽপি—
অবশ্যাশ্রয়ণীয়েয়মন্বিতার্থাভিধায়িতা।
ইত্যাহুর্যামুনাচার্যাঃ পদৈরেবান্বিতাভিধাম্॥
ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৭০ পৃষ্ঠা ;

৩। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৭১-৩৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ;

অনুমোদন করেন নাই। কেননা, অভিহিতান্বয়-বাদে পদে পদার্থের বোধক একটি শক্তি, পদার্থে বাক্যার্থের বোধক আর একটি শক্তি, এবং পদে বাক্যার্থের বোধক তৃতীয় একটি শক্তি, এই তিনটি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। এইজন্যই এই মত বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তিগণ সমর্থন করেন নাই।[১] অবশ্যই অভিহিতান্বয়-বাদের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তিগণ শক্তিত্রয় কল্পনার যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, অভিহিতান্বয়বাদী নৈয়ায়িক-পণ্ডিতগণ তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, আলোচ্য অন্বিতাভিধান-বাদে একই পদে দুইটি শক্তি স্বীকার করায়, এবং পদস্থ শক্তি-দ্বয়ের সাহায্যে বাক্যার্থের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করায়, এই মতে যে "অন্যোন্যাশ্রয়" দোষ আসিয়া পড়ে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন কথা এই, তোমরা (অন্বিতাভিধানবাদীরা) যাহাকে পদার্থের "অন্বয়ানুভাবক-শক্তি" বলিতেছ, তাহা একমাত্র পদার্থেই থাকিতে পারে, পদে তাহা কোন মতেই থাকিতে পারে না। ফলে, পদসমষ্টিরূপ বাক্যেও তাহা থাকিতে পারে না। এইজন্য ঐরূপ শক্তিমূলে বাক্যার্থের বোধেরও উদয় হইতে পারে না। পদেই পদার্থের অন্বয়-বোধক শক্তি থাকে ; পদ শুনিয়া পদের অর্থের স্মরণ হয় এবং তাহারই ফলে ক্রমে বাক্যার্থের বোধ উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে কি ?

পদ ও পদার্থের স্বরূপ এবং স্বভাব বিচার করা গেল। এখন বর্ণ হইতে পদ, পদ হইতে কি উপায়ে পদার্থের বোধ উৎপন্ন হয়, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কয়েকটি বর্ণ একত্রিত হইয়া একটি শব্দ গঠিত হয়। ঐ শব্দের পর যখন কোন বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই বিভক্ত্যন্ত শব্দ "পদ" আখ্যা লাভ করে ; এবং নির্দ্দিষ্ট কোন অর্থ বুঝাইয়া থাকে। বর্ণসকল উচ্চারণমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় এক বর্ণের সহিত অপর বর্ণের মিলন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় নাকি ? "গৌঃ" এই পদটি বিশ্লেষণ করিলে "গ্-ঔ-স্," এই তিনটি বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্ উচ্চারণকালে ঔ এবং স্ থাকে না, আবার ঔ এবং স্-এর উচ্চারণকালে যথাক্রমে গ্ এবং ঔ থাকে না। উচ্চারণ করিবামাত্রই ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া, বর্ণসকলের মিলন বা সমষ্টি কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। এখন প্রশ্ন

১। অভিহিতান্বয়বাদে হি পদানাং পদার্থে পদার্থানাং বাক্যার্থে পদানাঞ্চ তত্রেতি শক্তিত্রয়কল্পনাগৌরবং স্যাৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৯ পৃষ্ঠা ;

এই যে, গ্-ঔ-স্, এই বর্ণত্রয়ের মিলন বা সমষ্টি যদি অসম্ভবই হয়, তবে "গৌঃ" এই পদ উচ্চারণ করিলে গরুকে বুঝায় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক, শঙ্কর, মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বলেন যে, কোনও শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া গেলেও, বর্ণগুলির স্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। শেষ বর্ণটি যখন কানে আসিয়া পৌঁছায়, তখন বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বর্ণের স্মৃতি মনের মধ্যে জাগরূক হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের স্মৃতি-সহকৃত শেষ বর্ণটিই শব্দ-প্রতিপাদ্য অর্থকে বুঝাইয়া দেয়। শেষ বর্ণটি কানে পৌঁছিবামাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বর্ণের স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হইয়া সমস্ত বর্ণে মিলিয়া, "ইহা একটি পদ" এইরূপ পদ-বুদ্ধি জন্মে; পদ-বুদ্ধি হইতে বাক্য-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে ক্রমে পদার্থের এবং বাক্যার্থের জ্ঞানোদয় হয়।[১] বাক্যপদীয়-রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বলেন, বর্ণসকল উচ্চারণ করামাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়, উহাদের সমষ্টি অসম্ভব। এইজন্য বর্ণসমষ্টিকে কোনমতেই অর্থের বাচক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ঐ সকল বর্ণময় শব্দের অন্তরালে "স্ফোট" নামে যে আর এক প্রকার নিত্য শব্দ আছে, সেই "স্ফোট"রূপ নিত্য শব্দই অর্থকে প্রকাশ করে। অর্থকে প্রস্ফুটিত করে বলিয়াই উহাকে "স্ফোট" আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্ফোট নিত্য, অখণ্ড, ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই শব্দের প্রকৃত রূপ। বর্ণ, পদ, বাক্য প্রভৃতি অখণ্ড স্ফোটরূপ অক্ষর-ব্রহ্মেরই সখণ্ড, মিথ্যা অভিব্যক্তি। সমস্ত বাঙ্ময় জগৎই শব্দ-ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। শব্দের এই বাঙ্ময়, বিবর্ত্তরূপ মিথ্যা; নিত্য ব্রহ্মরূপই সত্য। ইহাই স্ফোটবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।* এই স্ফোটবাদ ষড়্দর্শনের মধ্যে একমাত্র পাতঞ্জল ব্যতীত, অপর কোন দর্শনেরই সমর্থন লাভ করে নাই। আলোচ্য

১। পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতং বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধগ্রহণসংস্কারানুগৃহীতমন্ত্যবর্ণসন্নিকৃষ্টং শ্রোত্রমনেকেষপি বর্ণেষু একাং পদবুদ্ধিং জনয়তি। তথা পূর্বপূর্বপদানুভবজনিতসংস্কারসহকৃতমন্ত্যপদবিষয়ং শ্রোত্রমনেকবর্ণেষু একাং বাক্য-বুদ্ধিমাকাঙ্ক্ষাদ্যনুসারেণ জনয়তি। তেন বর্ণানাং পদানাঞ্চ সমুদায়ো যুজ্যতে।

প্রমাণপদ্ধতি, ৮১ পৃষ্ঠা;

*আলোচ্য স্ফোটবাদের বিবরণ আমরা এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে ২৬২-২৬৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা বর্ণের অতিরিক্ত, শব্দার্থের প্রকাশক, নিত্য "স্ফোট" স্বীকার করেন, তাঁহারা বর্ণকেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এক একটি বর্ণই স্ফোটকে প্রকাশ করিবে, না সমুদয় বর্ণগুলি মিলিতভাবে স্ফোটের প্রকাশক হইবে? যদি এক একটি বর্ণই স্ফোটের প্রকাশক হয়, তবে "গ" বলিবামাত্রই গরু বোঝা উচিত, কিন্তু তাহাতো বুঝায় না; সুতরাং গ্, ঔ, স্ এই তিনটি বর্ণই মিলিতভাবে "গৌঃ" এই পদ-স্ফোটের সূচনা করে, একথা স্ফোটবাদীর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। উচ্চারণমাত্রই ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া বর্ণের সমষ্টি অসম্ভব, ইহা স্ফোটবাদীই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এই অবস্থায় স্ফোটবাদী বর্ণের সমষ্টিকে কোনমতেই স্ফোটের প্রকাশক বলিতে পারেন না। এক একটি বর্ণও স্ফোটের প্রকাশক হয় না। ফলে, স্ফোটের প্রকাশই এই মতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তারপর, যদি বর্ণের সমষ্টি বা মিলন সম্ভবপরই হয়, তবে সেই বর্ণসমষ্টিকে স্ফোটের প্রকাশক না বলিয়া, অর্থের প্রকাশক বলাই অধিকতর সঙ্গত হয় নাকি? অর্থ-বোধের জন্য "স্ফোট" নামে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ মানিয়া লওয়ার অনুকূলে কোন বলিষ্ঠ যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপে নৈয়ায়িক, শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়া, বর্ণগুলিই মিলিতভাবে পদের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই মত নানাবিধ যুক্তিমূলে উপপাদন করিয়াছেন।

শব্দের শক্তি-জ্ঞান বা মুখ্য অর্থ-বোধের উপায় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দার্শনিকগণ বলেন যে, পৌরুষেয় এবং অপৌরুষেয়, এই দুই প্রকার শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। আগমও সুতরাং দুই প্রকারের হইতে দেখা যায়। সত্য-সনাতন বেদই অপৌরুষেয় আগম। মহাভারত, স্মৃতি-সংহিতা প্রভৃতি পৌরুষেয় বা পুরুষ কর্তৃক রচিত আগম। বেদের সাহায্যেই বৈদিক শব্দার্থ-বোধের উদয় হইয়া থাকে। লৌকিক বা পৌরুষেয় শব্দের অর্থ-বোধ সর্ব্বপ্রথমে কি উপায়ে উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন, পিতা এবং মাতার কোলে অবস্থিত বালককে আঙ্গুল দিয়া যখন দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, উনি তোমার পিতা, ইনি তোমার মাতা, ঐ যে কলা খাইতেছে, এইটি তোমার ভাই,

শক্তিগ্রহ বা পদার্থ-জ্ঞানের উপায়

ঐ মেয়েটি তোমার ভগ্নী, এই প্রকার পরিচয়ের ফলেই অনভিজ্ঞ শিশু তাহার পিতা, মাতা প্রভৃতিকে চিনিয়া থাকে। এইরূপেই অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিতও বালকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটে।[১] শঙ্কর, রামানুজ, মাধবমুকুন্দ প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্য্যগণ দ্বৈত-বেদান্তী মাধ্বের উল্লিখিত আঙ্গুল দেখান পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, প্রাথমিক শব্দার্থ-বোধের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিগণের ব্যবহারের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। বৃদ্ধের ব্যবহারই কিছু শাব্দ-বোধের একমাত্র কারণ নহে। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকরণ, অভিধান, আপ্ত-বাক্য, সাদৃশ্য এবং প্রসিদ্ধ পদান্তরের সান্নিধ্য প্রভৃতি হইতেও শব্দার্থ-বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে।[২] এই পদ্ধতিতে শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে সেক্ষেত্রে বাক্যটি বক্তা কি তাৎপর্য্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। বাক্যের তাৎপর্য্য-বোধ যে বাক্যার্থ-জ্ঞানের অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা কোন দার্শনিকই

১। শক্তিগ্রহশ্চাঙ্গুলিপ্রসারণাদিপূর্ব্বকনির্দেশেনৈব ভবতি। তথাহি মাতুঃ পিতুর্বা অঙ্কে স্থিতং বালমন্যমনস্কং সন্তমঙ্গুলিপ্রসারণ-ছোটিকাবাদনাভ্যাং স্ববচন-শ্রবণাভিমুখং মাত্রাদ্যভিমুখঞ্চ বিধায় যদা ব্যুৎপাদয়িতা বাক্যং প্রযুঙ্‌ক্তে বাল ভবেয়ং মাতা তব পিতায়ং তেভ্রাতায়ং কদলীফলমস্যাবহরতীত্যাদি। তদাতেন নির্দেশেনৈব তস্য শব্দসমুদায়স্য তস্মিন্নর্থসমুদয়ে বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধং তাবৎ সামান্যতোঽবগচ্ছতিবাল ইদমনেনায়ং বোধয়তীতি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ব বিঃ সং ;

২। "শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোশাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্যশেষাদ্‌বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥"
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ৮১ কাঃ ; পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা ;

ধাতু, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতির শক্তি-জ্ঞান ব্যাকরণের সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গবয়-পশুতে গবয় শব্দের শক্তি-বোধ গো-সাদৃশ্য বশতঃ উদিত হয়। নীল-শুক্ল প্রভৃতি শব্দে যে নীল-শুক্ল প্রভৃতি রূপ এবং সেই রূপবিশিষ্টকে বুঝায়, তাহাতে কোষ বা অভিধানই প্রমাণ। পিক শব্দে যে কোকিলকে বুঝায় এবিষয়ে আপ্ত বাক্যই প্রমাণ বলিয়া জানিবে। বৃদ্ধের "গামানয়" এইরূপ কথানুসারে প্রৌঢ়ের গো-পশুর আনয়ন-ক্রিয়া দেখিয়া বালকের যে গোশব্দ প্রভৃতির শক্তি জ্ঞানোদয় হয়, এবিষয়ে বৃদ্ধের ব্যবহারই যে কারণ তাহাতে সন্দেহ কি? যবময়শ্চরু-র্ভবতি, এইরূপ বাক্যে যবশব্দে যে যব শস্যকে বুঝায়, তাহা বাক্যাঙ্গ অপরাপর পদ-গুলির তাৎপর্য্য বিচারের ফলেই সম্ভবপর হয়। ঘট আছে বলিলে ঘটশব্দে যে কলসকেও বুঝায়, ঘটের বিশদ বিবরণের জ্ঞানই তাহার কারণ। আম্রে মধুরং পিকো রৌতি, এইরূপ বাক্যে আম গাছে আছে বলিয়া পিকশব্দে কোকিলকে বুঝায়। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার কারণ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন শব্দার্থ-বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুক্তাবলী, ৮১ কারিকা ; পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা ;

অস্বীকার করিতে পারেন না। বাক্যের তাৎপর্য্য কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, কোনও নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে, সেস্থলে সেই অর্থে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য আছে বুঝিতে হইবে—তৎপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং তাৎপর্যম্। মাধ্ব, রামানুজ-সম্প্রদায়ও নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতেই বাক্য-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেঙ্কট-রচিত ন্যায়পরিশুদ্ধির টীকাকার শ্রীনিবাস তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন, কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বা কথিত বাক্যে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য-প্রকাশের স্বাধীন ইচ্ছা দেখা গেলেও, অনাদি বেদ-বাণী, যাহা সত্য-সনাতন এবং যাহা পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যসুধা বলিয়া ভবরোগীর পরম উপাদেয়, হিন্দুর যাহা চিরারাধ্য, সেই শাশ্বত বেদ-বাক্যে বক্তার স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশের কোনরূপ সুযোগ না থাকায়, সেখানে পূর্ব্বোক্ত (তৎপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বরূপ) বাক্য-তাৎপর্য্য থাকিবে না। ফলে, পরমেশ্বরের বেদময়ী বাণী অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বেঙ্কটনাথ এবং ন্যায়সার-রচয়িতা শ্রীনিবাস বলিয়াছেন যে, বেদ পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদ-বাক্যের অর্থ-নির্ণয়ে তোমার আমার স্বাধীন ইচ্ছার কোন বিকাশ না থাকিলেও, ঈশ্বরের উক্তিতে নিত্য অব্যাহত ঈশ্বরেচ্ছা বিকাশের যে সুযোগ আছে, তাহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অবস্থায় বেদ-বাক্যেও নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য থাকায়, উহা যে প্রমাণ হইবে তাহাতে আপত্তি কি?[১]

তাৎপর্য্য

তাৎপর্য্য-সম্পর্কে মাধ্ব এবং রামানুজ-মত

তাৎপর্য্যের উল্লিখিত ব্যাখ্যায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য মাধব-মুকুন্দ এবং অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রভৃতি কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, যেই ব্যক্তি কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা জানে না, কেবল পরের নিকট হইতে শুনিয়াই কথাটি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে, ঐরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির

তাৎপর্য্য-সম্পর্কে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত এবং অদ্বৈত-মত

১। নন্থ তাৎপর্যমপি ভবতাং শাব্দবোধে কারণং তচ্চ তৎপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং তচ্চ লৌকিকে সম্ভবতি, বেদেতু নিত্যে তদিচ্ছাজন্যত্বাভাবান্ন তদিতি-চেত্তত্রাহ। নিত্যেঽপীতি। ন্যায়সার, ৩৬৩ পৃষ্ঠা; নিত্যেঽপি বেদে নিত্যেশ্বর-শাসনাত্মনি তত্তদর্থতাৎপর্যাঽনপায়াৎ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৩ পৃষ্ঠা;

মুখের কথা শুনিয়াও পার্শ্বস্থ সুধী শ্রোতার কথাটির তাৎপর্য্য-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। শুক-সারীর মুখ হইতে শুক-সারীর কণ্ঠস্থ করা কথা শুনিয়াও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ঐ কথার তাৎপর্য্য-বোধ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অজ্ঞ বক্তার, শুক-সারী প্রভৃতির কোনরূপ অর্থ-জ্ঞান নাই, সুতরাং অর্থ বুঝাইবার ইচ্ছা বা চেষ্টাও নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাক্য উচ্চারণ করাকেই যদি "তাৎপর্য্য" বল, তবে অজ্ঞের বাক্যে, শুক-সারীর বাক্যে আর আলোচ্য তাৎপর্য্য থাকে না, এবং ঐরূপ অজ্ঞের কিংবা শুক-সারীর কথা শুনিয়া কাহারও কোনরূপ বাক্যার্থ-জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। গণ্ডমূর্খের কিংবা শুক-সারীর মুখস্থ করা কথা এবং ঐ সকল কথার অর্থ উহারা না বুঝিলেও বুদ্ধিমান্ শ্রোতা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই অবস্থায় ন্যায়োক্ত তাৎপর্য্যের লক্ষণ যে অসম্পূর্ণ, অব্যাপ্তি দোষে দূষিত হইবে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।[১] এইজন্য ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায়, মাধবমুকুন্দ তৎকৃত পরপক্ষগিরিবজ্রে বাক্য-তাৎপর্য্যের নির্দ্দোষ উপপত্তি করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বাক্যের অর্থ বুঝাইবার যোগ্যতার নামই তাৎপর্য্য। তৎপ্রতীতিজননযোগ্যত্বং তাৎপর্যম্, বেদান্তপরিভাষা, ২৫১ পৃষ্ঠা; গণ্ডমূর্খের উক্তির, শুক-সারী কর্ত্তৃক উচ্চারিত বাক্যের তাৎপর্য্য অজ্ঞ বক্তা, শুক-সারী না বুঝিলেও, ঐ বাক্যেরও অর্থ বুঝাইবার যোগ্যতা অবশ্যই আছে, এবং তাহা আছে বলিয়াই পণ্ডিত ব্যক্তির ঐরূপ বাক্য শুনিয়াও বাক্যের তাৎপর্য্য-বোধ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ন্যায়োক্ত তাৎপর্য্যের লক্ষণে যে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের

১। (ক) বেদান্তপরিভাষা, ২৫১ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

(খ) ন্যায়োক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত অব্যাপ্তি-দোষ পরিহার করিবার জন্য নৈয়ায়িক যদি বলেন যে, অজ্ঞের উক্তি, শুক-সারীর উক্তি প্রভৃতি স্থলে অজ্ঞের কিংবা শুক-সারীর বাক্যের তাৎপর্য্য-জ্ঞান না থাকিলেও, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে যে তাৎপর্য্য-জ্ঞান আছে, তাহার বলেই শাব্দ-বোধ উৎপন্ন হইবে। এইরূপ উত্তরে আপত্তি এই যে, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, সেই সকল নাস্তিক ব্যক্তিরও ঐরূপ অজ্ঞের উক্তি, শুক-সারীর উক্তি শুনিয়া অবশ্যই অর্থ-বোধ উৎপন্ন হইবে। সেই সকল ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকের ঐ উত্তর তো অচল হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় ন্যায়-মতকে কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না।

কিংবা মাধবমুকুন্দের তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যায় ইচ্ছার কথা না থাকায়, অব্যাপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। এখন প্রশ্ন এই যে, অর্থ বুঝাইবার যোগ্যতাকেই যদি তাৎপর্য্য বল, তবে কোন ব্যক্তি আহার করিতে বসিয়া "সৈন্ধব আন" বলিলে ঘোড়াকেইবা লইয়া আসে না কেন? সৈন্ধব শব্দে লবণকেও বুঝায়, সিন্ধুদেশে উৎপন্ন ঘোড়াকেও বুঝায়। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের ঘোড়া অর্থ বুঝাইবারও যে যোগ্যতা আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈত-বেদান্তী এবং মাধবমুকুন্দ বলেন, তাৎপর্য্যের লক্ষণের উল্লিখিত দোষ বারণ করিবার জন্য, আলোচ্য লক্ষণে আর একটি বিশেষণ-পদ জুড়িয়া দিতে হইবে; এবং সম্পূর্ণ লক্ষণটি দাঁড়াইবে এই যে, যেই বাক্য যেই অর্থ বুঝাইবার যোগ্য, সেই বাক্য যদি তদ্‌ব্যতীত অপর কোনও অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত না হয়, তবেই সেই বাক্যে তাৎপর্য্য আছে বলিয়া জানিবে।[১] ক্ষেত্রবিশেষে সৈন্ধব শব্দের সিন্ধুদেশীয় অশ্ব অর্থ বুঝাইবার যোগ্যতা থাকিলেও, আহার করিতে বসিয়া কেহ 'সৈন্ধব আন' বলিলে, স্থান-কাল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, লবণ আনাই যে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, লবণ ভিন্ন (অশ্ব প্রভৃতি) অন্য কোনও বস্তুর আনয়ন বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যে উক্ত বাক্যটি উচ্চারিত হয় নাই, তাহা সুধী ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন। শব্দার্থ-বোধ-বিহীন গণ্ড-মূর্খের কিংবা শুক-সারীর উচ্চারিত বাক্যে উহাদের কোনরূপ অর্থ-বোধ না থাকায়, বুদ্ধিমান্ শ্রোতা অজ্ঞের উক্তির এবং শুক-সারীর উক্তির যেই অর্থ বুঝিয়া থাকেন, তদ্‌ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অর্থ বুঝাইবার

১। (ক) নন্বু সৈন্ধবমানয়েত্যাদিবাক্যং যদা লবণানয়নপ্রতীতীচ্ছয়া প্রযুক্তং তদাপি অশ্বসংসর্গপ্রতীতিজননে স্বরূপযোগ্যতাসত্ত্বাল্লবণপরত্বদশায়ামপি অশ্বাদি-সংসর্গজ্ঞানাপত্তিরিতিচেন্ন, তদিতরপ্রতীতীচ্ছয়াঽনুচ্চরিতত্বস্যাপি তাৎপর্যং প্রতি বিশেষণীয়ত্বাৎ। তথাচ যদ্ বাক্যং যৎপ্রতীতিজননযোগ্যত্বে সতি যদন্যপ্রতীতীচ্ছয়া অনুচ্চরিতং তৎবাক্যং তৎসংসর্গপরমিত্যুচ্যতে।

বে: পরিভাষা, ২৫২ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

(খ) বিবক্ষিতার্থেতরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়াঽনুচ্চরিতত্বে সতি বিবক্ষিতার্থ-প্রত্যয়জননযোগ্যত্বং (তাৎপর্যম্) ভোজনপ্রস্তাবে সৈন্ধবমানয়েত্যুক্তে লবণ-প্রতীতিবদশ্বপ্রত্যয়স্যাপি সত্ত্বাৎ তত্রাপি যোগ্যতায়াস্তুল্যত্বাৎ তৎব্যাবৃত্তিফলকম্ পূর্বদলম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২৬ পৃষ্ঠা;

উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা অজ্ঞ ব্যক্তির কিংবা শুক সারীর নাই। সুতরাং সেই সকল ক্ষেত্রেও আলোচ্য তাৎপর্য্যের লক্ষণের প্রয়োগ করার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না।[১] একাধিক অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে, সেইরূপ ক্ষেত্রে যেই যেই অর্থ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বাক্যটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই সেই অর্থ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার অর্থ বুঝাইবার ইচ্ছায় বাক্যটি উচ্চারিত না হওয়ায়, ঐ সকল স্থলেও যে বাক্যের তাৎপর্য্য আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না।[২] এইরূপ বাক্য-তাৎপর্য্যের বোধ অপৌরুষেয় বৈদিক বাক্যে মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনোক্ত সত্য-জিজ্ঞাসার অনুকূল তর্কের সাহায্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লৌকিক, পৌরুষেয় অর্থাৎ তোমার আমার ন্যায় সাধারণ মানুষ কর্ত্তৃক উচ্চারিত বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, স্থান-কাল-পাত্র, এবং কি প্রসঙ্গে, কি উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য বক্তা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, উপসংহারেই বা কি সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছিয়াছেন, সেই সকল ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, তবেই বাক্যের অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিলে, যেই শব্দের যেই অর্থ আমাদের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, সেই শব্দের তাহাই বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ বলিয়া জানিবে।

এই বাচ্যার্থ বা শক্যার্থ ছাড়াও শব্দের আর এক প্রকার অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে বলে লক্ষ্যার্থ। যেখানে শব্দের শক্তিলভ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে, বাক্যাঙ্গ পদগুলির পরস্পর অন্বয় এবং ঐ অন্বয়মূলে কোনরূপ অর্থ-বোধ সম্ভবপর হয় না; কিংবা হইলেও বক্তার উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না, (তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি ঘটে) সেই সকল ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ-বোধের জন্য পদের মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া, গৌণ অর্থেরই

শব্দের শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ

১। শুকাদিবাক্যে অব্যুৎপন্নোচ্চারিতবেদবাক্যাদৌ চ তৎপ্রতীতীচ্ছায়া এবাভাবেন তদন্যপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বাভাবেন লক্ষণসত্ত্বান্নাব্যাপ্তিঃ।

বেদান্তপরিভাষা, ২৫২ পৃষ্ঠা;

২। (ক) নচোভয়প্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতেঽব্যাপ্তিঃ তদন্যমাত্রপ্রতীতীচ্ছয়া নুচ্চরিতত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। বেদান্তপরিভাষা, ২৫২ পৃষ্ঠা;

(খ) উভয়েচ্ছয়োচ্চারণেঽপি তদিতরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়া অনুচ্চারণস্য ভাবাৎ বক্ত্র ভিপ্রায়ো লৌকিকতাৎপর্যমিতিভাবঃ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২২৭ পৃষ্ঠা;

আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। ঐ গৌণ অর্থকেই শব্দের লক্ষ্যার্থ বা লক্ষণা-লভ্য অর্থ বলে।[১] গঙ্গা-শব্দে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে বুঝায়। ইহাই গঙ্গা-শব্দের বাচ্যার্থ (শক্যার্থ) বা মুখ্যার্থ। এখন কেহ যদি বলেন যে, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" গঙ্গায় গোয়ালারা বাস করে, এইরূপ বাক্য শোনামাত্রই সুধী শ্রোতার মনে হইবে যে, গঙ্গা-নদীর মধ্যে গোপকুলের বসতি থাকা তো কোনমতেই সম্ভবপর নহে। নিশ্চয়ই বক্তা এখানে পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে গোপগণ বাস করিয়া থাকে, ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে চাহেন। উল্লিখিত বাক্যে গঙ্গা-শব্দে গঙ্গা-নদীকে না বুঝিয়া গঙ্গা-তীরকেই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ তাহা ত্যাগ করিয়া, 'গঙ্গার

১। আলোচ্য লক্ষণার ব্যাখ্যায় যদিও অন্বয়ের অনুপপত্তি এবং তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি, এই উভয় প্রকার অনুপপত্তিকেই লক্ষণার বীজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তবুও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে সুধী পরীক্ষকের নিকট একমাত্র তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এইজন্যই ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায় জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, লক্ষণাবীজন্তু তাৎপর্য্যানুপপত্তিরেব, নতু অন্বয়ানুপপত্তিঃ। বেদান্তপরিভাষা, ২৮৩ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং; ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" প্রভৃতি যে সকল লক্ষণার দৃষ্টান্তে অন্বয়ের অনুপপত্তি বা বাধা আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে বক্তার তাৎপর্য্যেরও যে অনুপপত্তি আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কেননা, পবিত্র শান্ত শীতল গঙ্গাতীরে গোয়ালারা বাস করে, এই তাৎপর্য্য বুঝাইবার অভিপ্রায়েই বক্তা "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্য গঙ্গা-নদী অর্থ গ্রহণ করিলে, বাক্যের উক্ত তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় না। 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' প্রভৃতি লক্ষণার দৃষ্টান্তে কাক-শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলেও বাক্যাঙ্গ পদসমুদায়ের অন্বয়ের অনুপপত্তি ঘটে না। এই সকল স্থলে বক্তা যেই তাৎপর্য্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না বলিয়াই (তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃই) লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে। এই অবস্থায় তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই যে লক্ষণার বীজ, তাহাতে সন্দেহ কি? মাধ্ব-পণ্ডিতগণ মুখ্যার্থের অনুপপত্তিকেই লক্ষণার বীজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—মুখ্যার্থানুপপত্তির্লক্ষণাবীজম্। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬১ পৃষ্ঠা; রামানুজ-সম্প্রদায়ও মুখ্যার্থের বাধ বা অনুপপত্তিকেই লক্ষণার মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মুখ্যার্থবাধে সতি তদাসন্নেবৃত্তিরুপচারঃ।

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬৮ পৃষ্ঠা।

তীর' এইরূপ লক্ষ্যার্থ বা গৌণ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। আলোচ্য স্থলে গঙ্গা-নদীরূপ মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা-শব্দের তীরে লক্ষণা করিলেও, ঐ লক্ষিত অর্থও এক্ষেত্রে মুখ্যার্থ বিযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় না। গঙ্গা-নদীরূপ মুখ্য অর্থের সহিত লক্ষিত গৌণ-অর্থের (তীররূপ অর্থের) সাক্ষাৎ যোগই এখানে দেখা যায় ; অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দে এখানে শুধু তীরকে না বুঝাইয়া, গঙ্গার তীরকে বুঝায়। ফলে, গোপগণের বাসস্থল যে জাহ্নবী-বারি-বিধৌত বিধায় অতি পবিত্র, গঙ্গার মৃদু সমীরস্পর্শে সুশীতল, এই সকল তাৎপর্য্যার্থও এখানে উক্ত লক্ষণার দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। এই জাতীয় লক্ষণাকে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় "কেবললক্ষণা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১] —শক্য-সাক্ষাৎসম্বন্ধঃ, কেবললক্ষণা। বেদান্তপরিভাষা, ২৩৯ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;* ইহা ছাড়া আর এক প্রকার লক্ষণা আছে, তাহার নাম লক্ষিত-লক্ষণা। যে-সকল লক্ষণার স্থলে শক্যার্থ বা মুখ্যার্থের সহিত লক্ষ্যার্থের যোগটি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হইয়া পরম্পরা-সম্বন্ধে সংঘটিত হয়, সেই জাতীয় লক্ষণাকে লক্ষিত-লক্ষণা বলে। এইরূপ লক্ষণাবশেই দ্বিরেফ শব্দে মধুকরকে বুঝায়। দ্বিরেফ শব্দের শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ হইল, যাহার দুইটি রেফ বা 'র' আছে। ভ্রমর শব্দেও দুইটি রেফ বা 'র' আছে। এইঅবস্থায় দ্বিরেফ শব্দের দ্বারা প্রথমতঃ

১। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র প্রবাহসাক্ষাৎসম্বন্ধিনি তীরে গঙ্গা-পদস্য কেবললক্ষণা। বেদান্তপরিভাষা, ২৩৯ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

*গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি, এই স্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্য অর্থ গঙ্গা-নদী। নদীতে গোপকুলের বসতি সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ প্রতিবসতি এই পদের সহিত "গঙ্গায়াং" এই নদী অর্থ-বোধক গঙ্গা-পদের আধার হিসাবে অন্বয় অসম্ভব হয় বলিয়া, এইরূপ লক্ষণাকে অন্বয়ের অনুপপত্তিমূলক লক্ষণা বলা হয়। তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি-মূলক লক্ষণার স্থলে বাক্যস্থ পদসমূহের পরস্পর অন্বয়ে কোন বিরোধ ঘটে না। কেবল মুখ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া বাক্যের অর্থ বিচার করিলে, বক্তার ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করার যাহা তাৎপর্য্য তাহা প্রকাশ পায় না। যেমন "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" বলিলে, কাক, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি যে সকল প্রাণী দধি নষ্ট করিতে পারে তাহাদের সকলের নিকট হইতে দধি রক্ষা করাই এক্ষেত্রে বক্তার অভিপ্রেত, কেবল কাকের নিকট হইতে নহে। ঐরূপ বাক্যে বাক্যস্থ পদগুলির মধ্যে অন্বয়ের কোনরূপ বাধা ঘটে না। সুতরাং এই শ্রেণীর লক্ষণাকে অন্বয়ের অনুপপত্তিমূলক লক্ষণা বলা চলে না। বক্তার উক্তির তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিমূলক লক্ষণা বলিয়াই সাব্যস্ত করিতে হয়।

দুই রেফ বা 'র' যুক্ত অন্য কিছুকে না বুঝাইয়া, রেফদ্বয়বিশিষ্ট ভ্রমরকে লক্ষ্য করা গেল। তারপর পুনরায় লক্ষণাবশতঃ রেফদ্বয়যুক্ত ভ্রমর শব্দের দ্বারা মধুকরকে বুঝাইল। এইরূপে দ্বিরেফ শব্দের অর্থ দাঁড়াইল মধুকর। ভ্রমর শব্দের ন্যায় মধুকর শব্দের দুইটি রেফ বা 'র' নাই। সুতরাং দ্বিরেফ শব্দে সোজাসুজি মধুকরকে বুঝায় না। দ্বিরেফ শব্দের 'রেফদ্বয়যুক্ত' এইরূপ যে মুখ্য অর্থ তাহার সহিত মধুকর শব্দের সাক্ষাৎ কোনরূপ যোগ নাই। এই অবস্থায় দ্বিরেফ শব্দে মধুকরকে বুঝাইতে হইলে লক্ষণারই আশ্রয় লইতে হয়। এই ধরণের লক্ষণাকেই "লক্ষিত-লক্ষণা" বলা হইয়া থাকে। এইরূপ জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা প্রভৃতি লক্ষণার বিবিধ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে দেখা যায়। ঐ সকল লক্ষণার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে মূল গ্রন্থ আলোচনা করা আবশ্যক। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে-সকল স্থলে বাক্যোক্ত পদগুলি স্ব স্ব মুখ্য অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, সেই জাতীয় লক্ষণাকে জহল্লক্ষণা বলে—জহতি পদানি স্বমর্থং যস্যাং বৃত্তৌ সা জহৎস্বার্থলক্ষণা বৃত্তিঃ। যেক্ষেত্রে পদসকল স্বীয় অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াই অন্য অর্থ প্রকাশ করে, তাহার নাম "অজহল্লক্ষণা"। যে-স্থলে মুখ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়, অংশবিশেষে মুখ্যার্থ ঠিকই থাকে, তাহাকে "জহদজহল্লক্ষণা" বলে। আলোচিত ত্রিবিধ লক্ষণার দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, কোনও ব্যক্তিকে তাঁহার শত্রুর গৃহে আহার করিতে দেখিয়া, যদি ঐ ব্যক্তির কোন হিতৈষী সুহৃৎ তাঁহাকে বলেন যে, "বিষং ভুঙ্ক্ষ্," বিষ খাও, তবে সেক্ষেত্রে বক্তার উক্তির তাৎপর্য্য ইহাই দাঁড়াইবে যে, এইরূপ শত্রুর গৃহে আহার করা, আর বিষ হাতে ধরিয়া খাওয়া একই কথা। সুতরাং শত্রুর গৃহে ভোজন করিও না। এইরূপ অর্থই "বিষং ভুঙ্ক্ষ্" এই বাক্যের লক্ষ্যার্থ বলিয়া বুঝা যায়। শব্দের শক্তি বা মুখ্য অর্থ দৃষ্টে উক্ত বাক্যের অর্থ করিলে, বিষ খাও, এইরূপ অর্থই বুঝা যাইত। আলোচ্য বাক্যে মুখ্য অর্থকে একেবারে না বুঝাইয়া অন্যপ্রকার অর্থকে বুঝাইতেছে বলিয়া, এই শ্রেণীর লক্ষণাকে "জহল্লক্ষণা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "শ্বেতোধাবতি" শ্বেত (অশ্ব) দৌড়াইতেছে, এইরূপ বলিলে শ্বেত-শব্দে শুক্লগুণ-যুক্তকে বুঝায়। এস্থলে শ্বেত-শব্দের মুখ্য অর্থ (শ্বেত-গুণ) পরিত্যক্ত হয় নাই, ঐরূপ অর্থ বুঝাইয়াও শুক্লগুণ-শালী কোনও প্রাণী যাহা দৌড়াইতে পারে, তাহাকেই এক্ষেত্রে 'শ্বেত' শব্দে

লক্ষ্য করা হইতেছে। মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ না করায়, এই জাতীয় লক্ষণাকে বলে অজহল্লক্ষণা।[১] তত্ত্বমসি, "তুমিই সেই" এই বেদান্ত-মহাবাক্যের তৎশব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তি পরব্রহ্ম, আর "ত্বং" শব্দের অর্থ অল্পজ্ঞানী জীব। সর্ব্বজ্ঞের সহিত অল্পজ্ঞের ঐক্য বা অভেদ-বোধ অসম্ভব বিধায়, বেদান্ত-বেদ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বুঝিতে হইলে, এখানে জ্ঞানের অংশে সর্ব্ব এবং অল্প, এই যে দুইটি বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহার ফলে জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া, তৎ এবং ত্বং শব্দের দ্বারা কেবল বিশেষ্যাংশ চৈতন্যকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। এইরূপ লক্ষণাকে "জহদজহল্লক্ষণা" বলা হইয়া থাকে। উল্লিখিত বেদান্ত-মহাবাক্যে এই জাতীয় লক্ষণা যে স্বীকার করিতেই হইবে, এমন কথা অবশ্য জোর করিয়া বলা চলে না। কেননা, শব্দের শক্তির সাহায্যে যতটুকু অর্থ বুঝা যাইবে, তাহার সবটুকুই যে শব্দজ-জ্ঞানে প্রকাশ পাইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষণান্বিত বিশেষ্য-পদের বাক্যস্থ পদান্তরের সহিত অভেদান্বয় বা ঐক্য অসম্ভব দেখা গেলে, শব্দ-শক্তির বলেই সেক্ষেত্রে বিশেষণাংশকে বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্যাংশেরই অভেদ বা ঐক্যবোধের উদয় হইতে দেখা যায়।[২] যেমন 'ঘট অনিত্য' এই কথা বলিলে, ঘটের বিশেষ ধর্ম্ম ঘটত্ব নিত্য বিধায়, তাহার সহিত "অনিত্য" এই পদের অন্বয় সম্ভবপর নহে বলিয়া, বিশেষণ ঘটত্বকে বাদ দিয়া বিশেষ্য ঘটের সহিত অনিত্য পদের অন্বয় করিতে হইবে। ঘটই অনিত্য, ঘটত্ব অনিত্য নহে, ইহাই ঘট অনিত্য এই বাক্যের তাৎপর্য্য। এই দৃষ্টিতে আলোচ্য বেদান্ত-মহাবাক্যের মর্ম্ম বিচার করিলে, তৎ এবং ত্বম্, এই পদদ্বয়ের শক্তি-বিচারের ফলেই সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এইরূপ বিশেষণাংশকে বাদ দিয়া, বিশেষ্যাংশ চৈতন্যের অভেদ-বোধের উদয় হইবে। ঐরূপ ঐক্য-বোধের জন্য

১। জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণা, লক্ষণার এই দ্বিবিধ বিভাগ মাধ্ব-বেদান্তীও স্বীকার করিয়াছেন—লক্ষণাত্বমুখ্যা বৃত্তিঃ, শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা। সা দ্বিবিধা জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা চেতি। যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়াভাবঃ তত্র জহল্লক্ষণা যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ। যত্র বাচ্যার্থস্যাপ্যন্বয়ঃ তত্রাজহল্লক্ষণা যথা ছত্রিণো যান্তীত্যাদৌ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬০ পৃষ্ঠা ;

২। বেদান্তপরিভাষা, ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

সেক্ষেত্রে লক্ষণার আশ্রয় লইবারও কোন প্রয়োজন হইবে না।* বাচ্যার্থ (শক্যার্থ) এবং লক্ষ্যার্থ, এই দুই প্রকার পদার্থের পরিচয় দেওয়া গেল। উক্ত দ্বিবিধ পদার্থ-বোধ উৎপাদন করিয়াই বাক্য সকল বাক্যজন্য বাক্যার্থ-জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন হইয়া প্রমাণ আখ্যা লাভ করে। দুই প্রকার আপ্ত-বাক্যের পরিচয় পাওয়া যায়—(ক) দৃষ্টার্থ এবং (খ) অদৃষ্টার্থ। যেই বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য আমরা স্থূল চক্ষুর দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা দৃষ্টার্থ আপ্ত-বাক্য; আর যে-বাক্যের অর্থ আমাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না, তাহা অদৃষ্টার্থ আপ্ত-বাক্য। স্বর্গ, নরক, পরলোক, পরমেশ্বর প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বস্তু-সম্পর্কে যেই বাক্যের সাহায্যে আমাদের জ্ঞানোদয় হয় তাহা অদৃষ্টার্থ হইলেও, আপ্ত-বাক্য বিধায় দৃষ্টার্থ আপ্ত-বাক্যের ন্যায়ই তাহাকেও অবশ্যই প্রমাণ বলিয়া জানিবে। এইজন্যই ন্যায়গুরু গৌতম বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায়

*যে সকল সুধী আলোচ্য স্থলে লক্ষণা স্বীকার করেন না, শব্দের শক্তির সাহায্যেই বাক্যের অর্থ উপপাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মতে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত জহদজহল্লক্ষণার দৃষ্টান্তই নহে। "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" এইরূপ স্থলেই জহদজহল্লক্ষণা স্বীকার্য্য। এক্ষেত্রে কাক, বিড়াল, শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি দধির নাশক সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর কবল হইতে দধিকে রক্ষা করাই আলোচ্য বাক্যের মর্ম্ম। সুতরাং উক্ত বাক্যস্থ কাক শব্দে কাক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, দধির নাশক প্রাণীমাত্রকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। ফলে কাক, অকাক সকল প্রাণীকেই এখানে কাক শব্দে বুঝাইবে। এই শ্রেণীর লক্ষণাকেই "জহদজহল্লক্ষণা" বলা যুক্তিসঙ্গত। তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি ঘটিলে পদের যেরূপ লক্ষণা হয়, সমগ্র বাক্যেরও সেইরূপ লক্ষণা হইতে কোনও বাধা নাই। লক্ষণা চ ন পদমাত্রবৃত্তিঃ কিন্তু বাক্যবৃত্তিরপি। বেদান্তপরিভাষা, ২৪৩ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং; লক্ষণা-সম্পর্কে এইরূপ আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এইরূপ স্বল্পায়তন প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। সেই সকল কথা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু পাঠককে আমরা দার্শনিক ও আলঙ্কারিকগণের রচিত মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আলঙ্কারিকগণ লক্ষণার অনেক প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে লক্ষণার আশী প্রকার বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর, শক্তি এবং লক্ষণা ছাড়া ব্যঞ্জনা নামে আরও এক প্রকার বৃত্তি আলঙ্কারিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। দার্শনিকগণ কেহই ব্যঞ্জনাকে স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শক্তি এবং লক্ষণা, এই দুই প্রকার বৃত্তিই অঙ্গীকার করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণের রচিত গ্রন্থ হইতে ব্যঞ্জনা-বৃত্তির বিস্তৃত বিবরণ সুধী পাঠক জানিতে পারিবেন।

আপ্ত বা সত্যদর্শী মহাপুরুষের উক্তিকেই (আপ্ত-প্রামাণ্যাৎ) একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৃষ্টার্থ আপ্ত-বাক্যের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণান্তরের সাহায্যেও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অদৃষ্টার্থ আপ্ত-বাক্যের প্রামাণ্য অন্য কোনও প্রমাণের সাহায্যে পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। আপ্ত-বাক্য বলিয়াই তাহাকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সাংখ্য-কারিকার রচয়িতা ঈশ্বরকৃষ্ণ যথার্থই বলিয়াছেন, যেখানে অনুমানেরও প্রবেশ নাই, সেইরূপ পরোক্ষ তত্ত্ব-সম্পর্কে একমাত্র আপ্ত-বাক্যই হইবে প্রমাণ।

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥ সাংখ্যকারিকা, ৬;

বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি আগমের সাহায্যে বেদান্তী অবাঙ্‌মনস-গোচর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। এইজন্যই ব্রহ্মকে "শাস্ত্রযোনি" বলা হইয়া থাকে। সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়ই বেদ, উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় প্রমাণ বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় বেদান্তের আলোচনায় শব্দ বা আগম-প্রমাণ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্থাপত্তি

শব্দ-প্রমাণ নিরূপণ করা গেল, সম্প্রতি অর্থাপত্তি-প্রমাণ পরীক্ষা করা যাইতেছে। অর্থাপত্তি কাহাকে বলে? অর্থতঃ (তাৎপর্য্যবশতঃ) আপত্তি বা প্রাপ্তির নাম অর্থাপত্তি। যেখানে কোন বাক্য-দ্বারা কোনও বিশেষ অর্থ পরিজ্ঞাত হইলে, সেই পরিজ্ঞাত অর্থবশতঃই অর্থান্তরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে।[১] এই স্থূলকায় মানুষটি দিনে খান না, এই কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনে হইবে যে, এই লোকটি নিশ্চয়ই রাত্রে আহার করেন। কেননা, একেবারেই আহার না করিলে তাঁহার শরীর এইরূপ মোটা-সোটা থাকিতে পারিত না। ইঁহার এই স্থূল দেহ দেখিয়া নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, ইনি অবশ্যই আহার গ্রহণ করেন। তবে দিনে যখন আহার গ্রহণ করেন না শুনা গেল, তখন নিশ্চয়ই রাত্রিতে আহার করেন ইহাই বুঝা গেল। এখানে রাত্রিতে ভোজনের যে প্রসঙ্গ আমরা বুঝিলাম, তাহা আলোচ্য অর্থাপত্তি নামক প্রমাণের ফল। এই ব্যক্তির রাত্রিতে ভোজন করা সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞানোদয় হইল, তাহাই এক্ষেত্রে স্থূলত্ব-জ্ঞানের করণ, আর স্থূলত্ব-জ্ঞান সেই করণের ফল বা কার্য্য। দার্শনিকের ভাষায় (রাত্রি-ভোজনরূপ) করণ-জ্ঞানকে উপপাদক, (স্থূলত্বরূপ) কার্য্য-জ্ঞানকে উপপাদ্য বলা হয়। যাহা না হইলে কোনও বিষয় সম্ভবপর হয় না সেই বিষয়কে উপপাদ্য, আর যাহার অভাবে সেই বিষয়টি সম্ভব হইতে পারে না, তাহাকে উপপাদক বলে। দিনে যে ব্যক্তি ভোজন করেন না, তাঁহার রাত্রিতে ভোজন

১। বিনা কল্পনয়াঽর্থেন দৃষ্টেনানুপপন্নতাম্।
নয়তা দৃষ্টমর্থং যা সাঽর্থাপত্তিস্তু কল্পনা॥

প্রকরণপঞ্চিকা, ১১৩ পৃষ্ঠা;

প্রমাণষট্‌কবিজ্ঞাতো যত্রার্থোনান্যথা ভবেৎ।
অদৃষ্টং কল্পয়েদন্যং সাঽর্থাপত্তিরুদাহৃতা॥

শ্লোকবার্তিক, অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক;

ব্যতীত দৈহিক স্থূলত্ব সম্ভবপর হয় না, সুতরাং এই স্থূলত্ব এখানে উপপাদ্য; রাত্রি-ভোজনের অভাবে স্থূলত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া, রাত্রির ভোজন স্থূলত্বের উপপাদক। উপপাদ্যের অর্থাৎ ফলের জ্ঞান হইতে উপপাদকের অর্থাৎ কারণের যে কল্পনা অনুসন্ধিৎসুর মনে উদিত হয়, তাহারই নাম অর্থাপত্তি, উপপাদ্যজ্ঞানেনোপপাদককল্পনমর্থাপত্তিঃ। বেদান্ত-পরিভাষা, অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদ, ২৬৯ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং; উপপাদ্যের বা ফলের জ্ঞানই হেতু-কল্পনার মূল; সুতরাং ফল-জ্ঞান অর্থাপত্তি-প্রমাণ এবং হেতু-বিজ্ঞান অর্থাপত্তি-প্রমা বলিয়া জানিবে। অর্থাপত্তি-শব্দটির ব্যুৎপত্তি-অর্থ বিচার করিলে অর্থাপত্তি-শব্দটির দ্বারা উপপাদ্য এবং উপপাদক, ফল এবং হেতু, এই উভয়কেই বুঝান যাইতে পারে। অর্থাপত্তি-শব্দে যখন স্থূলত্বের উপপাদক রাত্রি-ভোজনরূপ হেতুকে বুঝায়, তখন (অর্থস্য আপত্তিঃ) রাত্রি-ভোজনরূপ অর্থের আপত্তি বা কল্পনা, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসের আশ্রয় লইতে হয়। উপপাদ্য স্থূলত্বকে যখন অর্থাপত্তি-শব্দে বুঝায়, তখন অর্থস্য (রাত্রি-ভোজনরূপস্য) আপত্তিঃ কল্পনা যস্মাৎ, রাত্রি-ভোজনরূপ অর্থের কল্পনা করা হয় যাহা হইতে, এইরূপ বহুব্রীহি-সমাসের অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাপত্তি-শব্দে এইরূপে যদিও হেতু এবং ফল, এই উভয়কেই বুঝাইতে পারে বটে, তবু দার্শনিক পরীক্ষায় ফল দেখিয়া হেতুর কল্পনার নামই অর্থাপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গণনা করার অনুকূলে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি আছে কি না, তাঁহাও এই প্রসঙ্গে বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রমাণ-বিশেষজ্ঞ নৈয়ায়িকগণ কার্য্য দেখিয়া কারণের কল্পনাকে একশ্রেণীর অনুমান বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অর্থাপত্তি নামে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দেখিয়া যেমন কার্য্য বৃষ্টির অনুমান করা যায়, সেইরূপ প্রভাতে গৃহ-প্রাঙ্গনে জল-প্রবাহ দেখিয়াও, ঐ জল-প্রবাহের কারণ হিসাবে রাত্রিতে বৃষ্টির অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন-ন্যায়ের ভাষায় ইহা শেষবৎ অনুমান; নব্য-নৈয়ায়িক-দিগের মতে উহা কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান। কেবল-ব্যতিরেকী-অনুমানের হেতু ও সাধ্যের অন্বয়-ব্যাপ্তি কোনস্থলেই সম্ভব নাই, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিই কেবল সম্ভবপর; ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিবলেই ঐ জাতীয়

অনুমানের উদয় হইয়া থাকে।[১] কপিল, পতঞ্জলি, মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির সিদ্ধান্তেও অর্থাপত্তি একজাতীয় অনুমানই বটে, স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে।[২] মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী কেবল-ব্যেতিরেকী অনুমান স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অনুমান সর্ব্বক্ষেত্রে অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলেই উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন অনুমানই ব্যতিরেকী নহে, সকল অনুমানই অন্বয়ী। ধূম দেখিয়া যে বহ্নির অনুমান হয়, সেক্ষেত্রে সাধ্য-বহ্নির অভাব হইতে হেতু-ধূমের অভাবের যে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহাকে অনুমানের কারণ বলিয়াই মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, অভাবমূলে কোনরূপ ব্যাপ্তি-জ্ঞানই কদাচ উৎপন্ন হয় না। ব্যাপ্তি-জ্ঞান সর্ব্বত্র ভাবমূলেই উৎপন্ন হয়। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হয়, ইহা সত্য কথা। ব্যতিরেক-স্থলে অদ্বৈত-বেদান্ত এবং মীমাংসার মতে "ধূমো বহ্নিং বিনা অনুপপন্নঃ," এইরূপ অনুপপত্তি-জ্ঞানেরই উদয় হয়। ইহারই নাম অর্থাপত্তি। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিস্থলে সর্ব্বত্রই ঐরূপ অর্থাপত্তি-

১। (ক) ন চার্থাপত্তিরনুমানতো ভিদ্যতে।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, তৃতীয় স্তবক, ৮২ পৃষ্ঠা. চৌখাম্বা সং ;

(খ) অর্থাপত্তিরিত্যনুমানস্য পর্যায়োঽয়ম্।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, তৃতীয় স্তবক, ৮৮ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সং ;

(গ) অর্থাপত্তিস্তু নৈবেহ প্রমাণান্তরমিষ্যতে।
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবুদ্ধ্যা চরিতার্থা হি সা যতঃ ॥

ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৪৪ শ্লোক ;

২। (ক) অর্থাপত্তিরপি ন প্রমাণান্তরম্। তথাহি—জীবতশ্চৈত্রস্য গৃহাভাবদর্শনেন বহির্ভাবস্যাঽদৃষ্টস্য কল্পনমর্থাপত্তিরভিমতা বৃদ্ধানাং, সাঽপ্যনুমানমেব।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ৫ম কারিকা, ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা, গুরুমণ্ডল-আশ্রম সং ;

(খ) অনুপপদ্যমানার্থদর্শনাত্তদুপপাদকে বুদ্ধিরর্থাপত্তিঃ। যথা জীবংশ্চৈত্রো গৃহে নাস্তীতি জ্ঞানে সতি বহির্ভাবজ্ঞানম্। অত্র যদ্যপি একৈকস্য বহির্ভাবলিঙ্গত্বং নোপপদ্যতে ব্যভিচারাৎ তথাপি, চৈত্রোবহিরস্তি জীবনবত্ত্বে সতি গৃহেঽসত্ত্বাৎ। যো জীবন্ যত্র নাস্তি স ততোঽন্যত্রাস্তি যথাঽহমিতি মিলিতয়োর্জীবনগৃহাভাবয়োর্লিঙ্গত্বমুপপদ্যত এব।

প্রমাণপদ্ধতি, ৮৬ পৃষ্ঠা ;

জ্ঞানেরই উদয় হইয়া থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিমূলে অনুমান স্বীকার করা অনাবশ্যক। এই যুক্তিতেই ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে অনুমানের অনুপযোগী বলিয়া বেদান্তপরিভাষায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির অনুমানের অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া, মীমাংসক ও অদ্বৈত-বেদান্তী পূর্ব্বোক্ত অর্থাপত্তি নামক স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ ব্যতিরেকী-অনুমান স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাপত্তি নামে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা ব্যতিরেকী-অনুমান মানেন, তাঁহারা অর্থাপত্তি মানেন না; আবার যাঁহারা অর্থাপত্তি মানেন, তাঁহারা ব্যতিরেকী-অনুমান মানেন না। অনুমান-প্রমাণ বাদী এবং প্রতিবাদী সকলেই স্বীকার করেন। অনুমানের প্রকারভেদ বলিয়া অর্থাপত্তির ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে, অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইবার যুক্তি কি? মীমাংসক ও অদ্বৈত-বেদান্তী অর্থাপত্তির এত পক্ষপাতী হইলেন কেন? এই প্রশ্নে মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন যে, অর্থাপত্তি-প্রমাণের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা অনুমানের সাহায্যে বুঝান যায় না। অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে অনুমান অচল। বিশেষতঃ নৈয়ায়িকদিগের যে অনুমান-প্রণালী তাহা নির্দ্দোষ নহে। জীবিত দেবদত্ত বাহিরে আছে, কেননা সে জীবিত আছে, অথচ গৃহে নাই—জীবন্ দেবদত্তো বহিরস্তি বিদ্যমানত্বে সতি গৃহে অভাবাৎ, উল্লিখিত স্থলটি অর্থাপত্তির একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তে দেবদত্তের গৃহে বর্ত্তমান না থাকাকে অনুমানের হেতুরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। অনুমানমাত্রেই পক্ষে হেতুটি বর্ত্তমান থাকা একান্ত আবশ্যক। হেতুটি পক্ষে না থাকিলে সেখানে কোনরূপ অনুমানেরই উদয় হয় না, হইতে পারে না। এখানে গৃহে দেবদত্তের যে অভাব আছে, সেই অভাবের অধিকরণ গৃহই বটে, দেবদত্ত নহে। আলোচ্য অনুমানে দেবদত্তই অনুমানের পক্ষ, সেই পক্ষে "গৃহে অভাবাৎ" এই হেতুটি থাকিতেছে না। উল্লিখিত স্থলে হেতুটি পক্ষবৃত্তি হয় নাই, এবং তাহা না হওয়ায়, হেতুটি অনুমানের যথার্থ

১। নাপ্যনুমানস্ত ব্যতিরেকিরূপত্বং সাধ্যাভাবে সাধনাভাবনিরূপিতব্যাপ্তি-জ্ঞানস্য সাধনেন সাধ্যানুমিতাবনুপযোগাৎ।

বেদান্তপরিভাষা, অনুমানপরিচ্ছেদ, ১৭৯ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং।

হেতুই হইতে পারে না, উহা হইবে হেত্বাভাস।[১] মীমাংসক ও অদ্বৈত-বেদান্তীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির কোনই মূল্য নাই। দেবদত্তের অভাবের অধিকরণ গৃহ হইলেও উহা দেবদত্তেরই অভাব, দেবদত্তই সেই অভাবের প্রতিযোগী। সুতরাং প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে সেই অভাবটি অবশ্যই দেবদত্তে থাকিবে। এই অবস্থায় হেতুটি পক্ষবৃত্তি হয় নাই, এইরূপ আপত্তি একেবারেই ভিত্তিহীন নহে কি? নৈয়ায়িকদিগের এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, উক্তরূপে হেতুর পক্ষধর্ম্মতা সাধন করিলেও, এই প্রকার অনুমানে "অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ" অপরিহার্য্য। অতএব এই জাতীয় অনুমান গ্রহণ-যোগ্য নহে। আলোচ্য অনুমান-দ্বারা দেবদত্ত যে ঘরের বাহিরে আছে তাহাই প্রমাণ করা হইতেছে। গৃহে অভাবাৎ, গৃহে নাই, এইটুকুমাত্র বলিলেই তাঁহার বহির্দ্দেশে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, সে যে জীবিত আছে ইহাও জানা আবশ্যক। এইজন্যই 'গৃহে অভাবাৎ, এই হেতুতে (বিদ্যমানত্বে সতি) বিদ্যমানতারূপ একটি বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন কথা এই যে, জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই, এইরূপ সম্পূর্ণ হেতুটিকে বুঝিতে হইলে, এবং এই হেতুর দেবদত্তরূপ পক্ষে অবস্থিতি জানিতে হইলে, দেবদত্ত যে গৃহের বাহিরে কোথায়ও আছে তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে, দেবদত্ত বাহিরে আছে ইহা বুঝিতে হইলেই, সে যে বিদ্যমান আছে ইহাও জানা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হেতুর অংশে প্রদত্ত বিদ্যমানতারূপ বিশেষণ পদের সহিত উক্ত অনুমানের সাধ্য বহিরস্তিত্বের "পরস্পরাশ্রয়-দোষ" সুধী কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, অনুমান-মাত্রেরই হেতুর পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান যখন অপরিহার্য্য অঙ্গ, তখন বিদ্যমানতারূপ বিশেষণান্বিত হেতুকে পক্ষে জানিলেই, দেবদত্তের বহিরস্তিত্ব অর্থাৎ আলোচ্য অনুমানের সাধ্যকেও জানা গেল। দেবদত্ত জীবিত আছে অথচ ঘরে নাই একথা বুঝিলেই, সে যে বাহিরে আছে ইহা বুঝা যায়। গৃহে অনুপস্থিত দেবদত্ত

১। বহির্ভাববিশিষ্টৈর্হে দেশে বা তদ্‌বিশেষিতে।
প্রমেয়ে যো গৃহাভাবঃ পক্ষধর্মস্তসৌ কথম্‌॥ ১১॥
তদভাববিশিষ্টংতু গৃহং ধর্মো ন কস্যচিৎ।
গৃহাঽভাববিশিষ্টস্তু তদাঽসৌ ন প্রতীয়তে॥ ১২॥

শ্লোকবার্তিক, অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদ;

বিদ্যমান আছেন ইহার অর্থই এই যে তিনি বাহিরে আছেন। অনুমান এখানে নূতন কিছুই জানায় না বলিয়া, তাহাকে অনুমানই বলা চলে না। হেতুটি পক্ষে থাকিয়া ঐ হেতুমূলে কোনও নূতন জ্ঞান উৎপাদন করাই অনুমান-প্রমাণের স্বভাব। অজ্ঞাত-জ্ঞাপনই প্রমাণ-ফল। পক্ষে হেতুর জ্ঞান অনুমান নহে। পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত ধূম পর্ব্বতরূপ পক্ষে ধূমের ব্যাপক অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমান উৎপাদন করে বলিয়াই তাহাকে অনুমান আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ অনুমান যদি কেবল পর্ব্বতে ধূমের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করিত, তবে তাহা অনুমান-প্রমাণই হইত না। কেননা, পর্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষতঃই দেখা যাইতেছে তাহার আর অনুমান হইবে কি? অগ্নিজন্য হইলেও ধূম-জ্ঞান অগ্নি-জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না, অগ্নির জ্ঞান ও ধূমের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। ধূম-জ্ঞান এবং অগ্নি-জ্ঞান, এই দুইটিই স্বতন্ত্র জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বয় পরস্পর আশ্রিত নহে। পর্ব্বতে ধূমের জ্ঞানই অগ্নি-জ্ঞান নহে। অগ্নি-জ্ঞান ধূম-জ্ঞান হইতে পৃথক্ একটি জ্ঞান। পর্ব্বতে ধূমকে জানিলেও অগ্নিকে জানা হয় না। তবে ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি ধূমের ব্যাপক; ব্যাপ্য থাকিলে, সেখানে ব্যাপক অবশ্যই থাকিবে। পর্ব্বতে বহ্নির ব্যাপ্য ধূম আছে, সুতরাং পর্ব্বতে ধূমের ব্যাপক বহ্নিও আছে। এইরূপে পর্ব্বতে প্রত্যক্ষ ধূম দেখিয়া, অপ্রত্যক্ষ বহ্নির জ্ঞানই অনুমান। অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে অনুমানের প্রয়োগ করিতে গেলে পরস্পরাশ্রয়-দোষ আসিয়া পড়ে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এইজন্যই মীমাংসকগণ অর্থাপত্তিকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মীমাংসকগণ ন্যায়োক্ত অনুমানে যে পরস্পরাশ্রয়-দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দোষ অর্থাপত্তি-প্রমাণের প্রয়োগেও আসিয়া পড়ে না কি? দেবদত্তকে গৃহে না দেখিলেই সে যে বাহিরে আছে এরূপ কল্পনা করা যায় না। কারণ, সে মরিয়াও যাইতে পারে। দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে ইহা জানা থাকিলেই, তাহাকে গৃহে না দেখিলে, সে বাহিরে আছে, এইরূপ কল্পনা করা যায়। এই কল্পনার মূল দেবদত্ত গৃহে নাই এই বুদ্ধি নহে, সে বাঁচিয়া আছে এইরূপ বোধ। গৃহে নাই অথচ বাঁচিয়া আছে, এই বুদ্ধির অন্তরালেই সে যে বাহিরে আছে, এই বুদ্ধিও প্রচ্ছন্ন আছে। বাঁচিয়া আছে, ঘরে নাই, সুতরাং বাহিরেই আছে। দেবদত্তকে গৃহে না দেখিলে এবং

সে বাহিরে আছে জানিলেই, সে যে বাঁচিয়া আছে তাহা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে, সে বাঁচিয়া আছে ইহা বুঝিলেই, সে যখন গৃহে নাই তখন অবশ্যই বাহিরে আছে এইরূপ নিশ্চয় করা যায়। এই অবস্থায় অর্থাপত্তি-প্রমাণবাদী অদ্বৈত-বেদান্তী এবং মীমাংসকের সিদ্ধান্তেও পরস্পরাশ্রয়-দোষ অবশ্যম্ভাবী নহে কি? এই আশঙ্কার উত্তরে মীমাংসক বলেন যে, অর্থাপত্তির স্থলে দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে, গৃহে নাই, এইরূপ বুদ্ধিই দেবদত্ত বাহিরে আছে ইহা বুঝাইয়া দেয়। কেননা, সে বাহিরে না থাকিলে জীবিত দেবদত্তের গৃহে না থাকার কোনই অর্থ হয় না। দেবদত্ত যখন জীবিত, তখন হয় সে ঘরে থাকিবে, না হয় বাহিরে থাকিবে। অন্য কোন তৃতীয় পন্থা এখানে নাই। যদি সে ঘরে না থাকে, তবে অবশ্যই সে বাহিরে থাকিবে। দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে অথচ গৃহে নাই, এই প্রতিজ্ঞাকে সম্ভব ও সার্থক করিতে হইলেই, দেবদত্ত বাহিরে আছে এইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্য কোনরূপ কল্পনা এক্ষেত্রে অচল। এইরূপ অন্যথা-অনুপপত্তিই অর্থাপত্তি-প্রমাণ বলিয়া জানিবে। দেবদত্তের বাহিরস্তিত্ব-কল্পনা ঐ প্রমাণের প্রমেয়। বাহিরের অস্তিত্ব-কল্পনা ব্যতীত "দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে গৃহে নাই" এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যই হয় নিরর্থক। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধের ফলে প্রতিজ্ঞাটিকে যে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই বিরোধের মীমাংসা করিয়া উক্ত প্রতিজ্ঞার সম্ভাবনা এবং সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্যই আলোচ্য অর্থাপত্তি প্রমাণ-কল্পনা অত্যাবশ্যক। অর্থাপত্তির স্থলে সর্ব্বত্রই আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধের সমাধানই অর্থাপত্তির লক্ষ্য। প্রতিজ্ঞার সম্ভাবনা অসম্ভাবনা বিচার করিয়াই সেই সমাধানের পথ অর্থাপত্তিতে খুঁজিয়া বাহির করা হয়। কোনরূপ অর্থাপত্তিই প্রতিজ্ঞা-বিযুক্ত নহে। প্রতিজ্ঞার্থের বিচার হইতেই উহার উদ্ভব হইয়া থাকে। এইজন্যই অর্থাপত্তিকে 'প্রতিজ্ঞাশ্রিত' বলে; এবং ইহা যথার্থ কথাই বটে। প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাপত্তিতে প্রতিজ্ঞার অন্তরালবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন কল্পনার উদয় হয়। প্রতিজ্ঞা ও কল্পনার মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ প্রদর্শনই অর্থাপত্তির অন্যতম বিচারাঙ্গ। সুতরাং পরস্পরাশ্রয়তা মীমাংসার সিদ্ধান্তে অর্থাপত্তির অনুকূলই বটে। ইহা দোষাবহ নহে।[১]

১। পক্ষধর্মাদিবিজ্ঞানং বহিঃ সংবোধতো যদি।
তৈশ্চ তদ্‌বোধতোঽবশ্যমন্যোন্যাশ্রয়তা ভবেৎ॥ ২৮॥

অর্থাপত্তি যে অনুমান নহে তাহার আর একটি কারণ এই যে, অর্থাপত্তির স্থলে অর্থাপত্তিলব্ধ জ্ঞানটির যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন "অনুমান করিলাম" (অনুমিনোমি) এইরূপে আমরা ঐ জ্ঞানটির প্রত্যক্ষ করি না, "ইহার ফলে এইরূপ কল্পনা করিলাম" (অনেন ইদং কল্পয়ামি) এইরূপেই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষগোচর হয়। ব্যাপ্তি-জ্ঞান অর্থাপত্তির মূল নহে, "ইহা ব্যতীত উহা হইতে পারে না" এই প্রকার অনুপপত্তি-বুদ্ধিই অর্থাপত্তির মূল। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উপপাদকের অভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাহার যাহা প্রতিযোগী তাহাই অর্থাপত্তি-প্রমাণ বলিয়া জানিবে। দিনে না খাওয়ার ফলে যদি কেহ ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে সে রাত্রেও খায় না ; যদি দিনে না খাইয়াও মোটা-সোটা থাকে, তাহা হইলে সে যে রাত্রে খায়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। রাত্রির ভোজন এক্ষেত্রে উপপাদক, আর দৈহিক স্থূলত্ব উপপাদ্য। রাত্রি-ভোজনের অর্থাৎ উপপাদকের অভাব ঘটিলে উপপাদ্য স্থূলতারও অভাব অবশ্যই ঘটিবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে রাত্রি-ভোজনের অভাবের ব্যাপক অভাব হইবে, দৈহিক স্থূলতার অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী দৈহিক স্থূলত্ব সম্ভবই হয় না, যদি না সে রাত্রিতে ভোজন করে। দৈহিক স্থূলত্ব দেখিয়া রাত্রিতে ভোজনের কল্পনা সহজেই দ্রষ্টার মনে আসে। ঐরূপ কল্পনাই অর্থাপত্তির লক্ষ্য।[১] দৈহিক স্থূলত্ব-

---

অন্যথাঽনুপপত্তৌ তু প্রমেয়ানুপ্রবেশিতা।
তাদ্রূপ্যেণৈব বিজ্ঞানান্ন দোষঃ প্রতিভাতিনঃ ॥ ২৮ ॥

শ্লোকবার্তিক, অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদ ;

মীমাংসক-শিরোমণি কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্তিকে অর্থাপত্তি-প্রমাণ সম্পর্কে ন্যায়ের মত খণ্ডন করিয়া মীমাংসার মত স্থাপন করিয়াছেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ৩য় স্তবকে উদয়নাচার্য্য মীমাংসার মত খণ্ডন করিয়া ন্যায়-সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। উভয় আচার্য্যই প্রতিপক্ষের মত-খণ্ডনে এবং স্বীয় মতের পোষণে গভীর বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাকে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। (ক) নন্বর্থাপত্তিস্থলে ইদমনেন বিনাঽনুপপন্নমিতি জ্ঞানং করণমিত্যুক্তং, তত্র কিমিদং তেন বিনাঽনুপপন্নত্বং তদভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বমিতি ক্রমঃ।

বেদান্তপরিভাষা, ২৭৫ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

(খ) যত্র রাত্রিভোজনাভাব স্তত্র দিবাঽভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাভাব ইতি রাত্রিভোজনাভাবব্যাপকো যো দিবাঽভুঞ্জানত্বসমানাধিকরণপীনত্বাভাবস্তৎপ্রতিযোগিত্ব-মিত্যর্থঃ। শিখামণি-টীকা মণিপ্রভা, ২৭৬ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

বোধ অর্থাৎ অর্থাপত্তি-প্রমাণ থাকিলে, ঐ প্রমাণের প্রমেয় রাত্রি-ভোজনও সেখানে অবশ্যই থাকিবে। ইহাই আমরা অর্থাপত্তির সাহায্যে জানিতে পারি।

আলোচ্য অর্থাপত্তি দুই প্রকার (ক) দৃষ্টার্থাপত্তি ও (খ) শ্রুতার্থাপত্তি। যেক্ষেত্রে উপপাদ্য বস্তু দ্রষ্টার প্রত্যক্ষের গোচর হইয়া থাকে এবং ঐ প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট উপপাদক পদার্থের কল্পনা করা হয়, তাহার নাম দৃষ্টার্থাপত্তি। দৈহিক স্থূলত্ব দেখিয়া রাত্রি-ভোজনের যে কল্পনা মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহা দৃষ্টার্থাপত্তি। "ইদং রজতম্" এইরূপে সম্মুখে ভ্রান্ত রজত প্রত্যক্ষ করার পর, "নেদং রজতং" ইহা রজত নহে, এইরূপ বাধ-জ্ঞান উদয় হওয়ার ফলে রজতের যে মিথ্যাত্ব কল্পনা করা হয়, ইহাও দৃষ্টার্থাপত্তিই বটে। এইরূপ দৃষ্টার্থাপত্তি রজতের এবং রজতমুখে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-বোধের সহায়ক হইয়া অদ্বৈত-বেদান্তীর সমর্থন লাভ করে। যেখানে শ্রুত বাক্যের অর্থ-বোধ সহজে উপপাদন করা যায় না বলিয়া অর্থান্তর কল্পনার আবশ্যক হয়, তাহাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলে। এই শ্রুতার্থাপত্তিও দুই প্রকার, (১) অভিধানানুপ-পত্তি এবং (২) অভিহিতানুপপত্তি। বাক্যের একাংশ শুনিয়া যেস্থলে অর্থ-বোধের জন্য অন্বয়-যোগ্য পদান্তরের কল্পনা করিতে হয়, তাহাকে অভিধানানুপ-পত্তি বলে। যেমন কোন ব্যক্তি "দ্বার" এই কথা বলিলেই, বাক্য-সমাপ্তির জন্য "বন্ধকর" এই কথাটি ধরিয়া লইতে হয়, ইহা "অভিধানানুপপত্তি"। যেক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং বাক্যার্থের যৌক্তিকতা উপপাদন করিবার জন্য অর্থান্তরের পরিকল্পনা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে হয়, তাহাকে "অভিহিতানুপপত্তি" বলা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, 'জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়,' এই বাক্যে জ্যোতিষ্টোম যাগকে যে স্বর্গের সোপান বলা হইয়াছে, সেখানে প্রশ্ন আসে এই, যজ্ঞ একটি ক্রিয়া; ক্রিয়ামাত্রই ধ্বংসশীল; যজ্ঞ-ক্রিয়াও সুতরাং ধ্বংসশীল। যজ্ঞ করিবার পরমুহূর্ত্তেই উহা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ বিধ্বস্ত যজ্ঞ বহুকাল পরে দেহান্তে যাজ্ঞিকের যে স্বর্গলাভ হইবে তাহার কারণ হইবে কিরূপে? কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া যাহা কার্য্য উৎপাদন করে, তাহাই কারণের মর্য্যাদা লাভ করে। কার্য্যের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা বর্ত্তমান থাকে না, তাহা কখনও কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যজ্ঞকে স্বর্গোৎপত্তির কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, যজ্ঞকে অবশ্যই

স্বর্গোৎপত্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান থাকিতে হইবে। যজ্ঞ তো করামাত্রই বিধ্বস্ত হয়, এইরূপ ধ্বংসশীল যজ্ঞ ভাবী স্বর্গোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকে না, থাকিতে পারে না ; সুতরাং যজ্ঞকে স্বর্গের সোপান বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না। এই অবস্থায় উক্ত বৈদিক নির্দ্দেশকে সার্থক করিবার জন্য যাগ এবং স্বর্গ-প্রাপ্তির মধ্যে যাগজন্য অপূর্ব্ব-ফলের কল্পনা করিতে হয়। যজ্ঞ বিনষ্ট হইলেও যাগজন্য অপূর্ব্ব তো বিনষ্ট হয় না, সেই অপূর্ব্বই স্বর্গোৎপত্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিদ্যমান থাকিয়া স্বর্গ উৎপাদন করতঃ বৈদিক নির্দ্দেশের সার্থকতা সম্পাদন করে। এই অপূর্ব্ব ফলের পরিকল্পনা আলোচ্য অর্থাপত্তির সাহায্যেই উদিত হয়। এই জাতীয় আরও অনেক প্রকার কল্পনা অর্থাপত্তির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য অর্থাপত্তি-প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুপলব্ধি

অনুপলব্ধি শব্দের অর্থ উপলব্ধির অভাব। উপলব্ধি শব্দের অর্থ জ্ঞান; সুতরাং জ্ঞানের অভাবই অনুপলব্ধি বলিয়া জানিবে। অভাবের বোধক প্রমাণকেও অনুপলব্ধি-শব্দে বুঝাইয়া থাকে। পণ্ডিত ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় অভাব-বোধের মুখ্য সাধনকে অনুপলব্ধি-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] এই অনুপলব্ধি-প্রমাণ অভাব পদার্থের বোধক হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে অভাব-প্রমাণও বলা হয়। অভাব অনুপলব্ধিরই নামান্তর। আচার্য্য শঙ্করের প্রিয়শিষ্য সুরেশ্বর তাঁহার মানসোল্লাস গ্রন্থে প্রমাণের সংখ্যা গণনায় বলিয়াছেন, ভট্ট-মতানুবর্ত্তী মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী অভাব-নামক ষষ্ঠ প্রমাণ মানিয়া লইয়াছেন—অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টাবেদান্তিনস্তথা। কুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে পাঁচটি প্রমাণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণের সাহায্যেই অভাব-পদার্থের বোধ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং অভাব-পদার্থের বোধের জন্য অভাব বা অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠ প্রমাণ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।[২] অভাব যে অনুপলব্ধিরই নামান্তর তাহা শাস্ত্রদীপিকার রচয়িতা পার্থসারথিমিশ্রও স্বীকার করিয়াছেন।

অভাব-সম্পর্কে প্রভাকরের মত

প্রভাকর-মতাবলম্বী মীমাংসকগণ অভাব-পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভাবই একমাত্র বস্তু। একটি ভাব-পদার্থ অন্য একটি ভাব-পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অভাব বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক অভাব বলিয়া কিছু নাই, অভাব কেবল কথার কথামাত্র। এই মতে অভাবও নাই, সুতরাং অভাবের জ্ঞানও নাই; অভাবের সাধক প্রমাণ-বিচারও অনাবশ্যক। জ্ঞাতব্য

১। জ্ঞানকরণাজন্যাভাবানুভবাসাধারণকারণমনুপলব্ধিরূপং প্রমাণম্।
বেদান্তপরিভাষা, অনুপব্ধিপরিচ্ছেদ, ২৭৮ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

২। প্রমাণপঞ্চকং যত্র বস্তুরূপে ন জায়তে।
বস্তুসত্তাঽববোধার্থং তত্রাভাবপ্রমাণতা॥
শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ, ১ শ্লোক;

বিষয়ই আদৌ না থাকিলে সে-বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় কি? প্রভাকর-সম্প্রদায় বলেন, অভাব-পদার্থ অধিকরণ হইতে কোনও পৃথক্ বস্তু নহে। ভূতলে যে ঘটাভাবের বোধ হয়, তাহাতো কেবল ভূতল দেখিয়াই উৎপন্ন হয়; সুতরাং ভূতলে যে ঘটাভাবের বোধ উহা ভূতলস্বরূপই বটে। ঘটশূন্য ভূতল বা কেবল ভূতল হইতে সেই অভাব কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। ঘটশূন্য ভূতলের কিংবা কেবল ভূতলের প্রত্যক্ষই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ। ঘটাভাব বস্তুতঃ অভাব-পদার্থ নহে, ইহা ভূতলরূপ ভাব-পদার্থ। অভাব অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে, ইহা অধিকরণাত্মক। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ববাদী নৈয়ায়িক বলেন যে, অভাব যদি অধিকরণ হইতে কোন অতিরিক্ত বস্তু না হয়, তবে ভূতলে ঘটের অভাব আছে, এইরূপ উক্তি অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় নাকি? এখানে ভূতল ঘটাভাবের অধিকরণ এবং ঘটাভাব আধেয়, এইরূপে বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকরণ ও আধেয় কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। এক এবং অভিন্ন হইলে সেখানে আধার-আধেয়-ভাবের প্রতীতিই জন্মে না। সর্ব্বানুভবসিদ্ধ আধার-আধেয়-ভাবের প্রতীতিবশতঃ অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ বলা চলে না। নৈয়ায়িকদিগের এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে প্রভাকর-মীমাংসক বলেন, আধার-আধেয়-ভাবের প্রতীতি হইলেই আধেয়-পদার্থ সেক্ষেত্রে অধিকরণস্বরূপ হইবে না, অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন পদার্থ হইবে, এমন কথা অভাবরূপ আধেয় সম্পর্কে নৈয়ায়িকগণও বলিতে পারেন না। অভাব-আধেয় যে আধার হইতে অতিরিক্ত নহে, তাহা নৈয়ায়িকদিগেরও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ঘটাভাবে বহ্নির অভাব, বহ্নির অভাবে জলের অভাব, জলের অভাবে পৃথিবীর অভাব, এইরূপে একই ঘটাভাবরূপ অধিকরণে অনন্ত আধেয়-অভাবের বোধ উদিত হইয়া থাকে। ঐ সকল আধেয়-অভাব নৈয়ায়িকদিগের মতেও ঘটাভাব হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। ঐ আধেয় অভাবগুলিকে উহাদের অধিকরণ ঘটাভাব হইতে অতিরিক্ত বলিলে, অনবস্থা-দোষ অপরিহার্য্য হয় বলিয়া, নৈয়ায়িকগণ ঐ সকল আধেয়-অভাবকে ঘটাভাবস্বরূপ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত বলেন নাই। নৈয়ায়িক অগত্যা প্রভাকর-মীমাংসকদিগের

।·।দ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে যেমন একই ঘটাভ ই অভাব
(ঘ) ধিকরণে ঐ অধিকরণাত্মক অনন্ত আধেয়-অভাবের আধার-আধে এবং
মধিদে র প্রতীতি সম্ভবপর হয়, সেইরূপ "ভূতলে ঘট নাই" এখানে
ঘটাভাবের ভূতলপ্রমুখ ভাবরূপ অধিকরণ-স্থলেও আধার-আধেয়-ভাবের প্রতীতি হইতে বাধা কি? আপত্তি হইতে পারে যে, "ভূতলে ঘট নাই," ভূতল ঘটাভাবশালী এই সকল স্থলে, কখনও ভূতল বিশেষ্য, ঘটাভাব বিশেষণ; কখনও ঘটাভাব বিশেষ্য, ভূতল বিশেষণ, এইরূপ বোধ সর্ব্বসাধারণেরই উদয় হইয়া থাকে। অভাব অধিকরণস্বরূপ হইলে উল্লিখিত বিশেষ্য-বিশেষণের বোধকে ব্যাখ্যা করা যায় কিরূপে? "দণ্ডী পুরুষঃ" এখানে দণ্ড বিশেষণ পুরুষ বিশেষ্য; বিশেষণ দণ্ড দেবদত্তেরই স্বরূপ, এইরূপ কথা বলা চলে কি? বিশেষণ যদি বিশেষ্যের স্বরূপই হয়, তবে বিশেষণ পদের প্রয়োগ করার তাৎপর্য্য কি? ভূতল আর ঘটাভাবশালী ভূতল, ইহার মধ্যে প্রতীতির যদি কোনরূপ পার্থক্যই না থাকে, তবে ভূতলকে ঘটাভাববিশিষ্ট বলিয়া চিহ্নিত করা হয় কেন? বিশেষ্য ও বিশেষণের অভেদ কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? এইরূপ আপত্তির উত্তরে প্রভাকর-মীমাংসক বলেন, ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল (ঘটাভাববদ্‌ভূতলম্) এই বিশিষ্ট-বুদ্ধিকেই যদি নৈয়ায়িকগণ অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে সেখানে বিবেচ্য এই যে, বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রই বিশেষ্য, বিশেষণ এবং বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ, এই তিনটি পদার্থকে অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। ঘটাভাব-বিশিষ্ট ভূতল এই বুদ্ধিও যেহেতু একটি বিশিষ্টবুদ্ধি, সুতরাং এখানেও বিশেষ্য, বিশেষণ এবং তাহাদের উভয়ের সম্বন্ধ এই ত্রিতয় অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঘটাভাবরূপ বিশেষণ এবং তাহার বিশেষ্য ভূতল, এই উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ আছে, ভূতলকে ঘটাভাববিশিষ্ট বলিয়া এখানে সেই সম্বন্ধেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধকে নিত্য বলা যায় না। ইহা নিত্য হইলে ভূতলে ঘট আনিবার পরেও ঐ সম্বন্ধের অর্থাৎ ভূতল ঘটাভাব-বিশিষ্ট এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইতে পারে। যদি অনিত্য বল, তবে অভাব ও ভূতলের অনন্ত বৈশিষ্ট্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, যতবার ভূতলে ঘটের অভাবের বোধ হইবে, ততবারই ঐ অনিত্য বৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধেরও ভান হইবে। এইজন্যই নৈয়ায়িকগণ ঘটাভাব এবং ভূতলের সম্বন্ধকে

বিষয়ই-বুদ্ধিকালে ভূতল প্রভৃতি অধিকরণস্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ প্রকারান্তরে মীমাংসা-মতেরই আশ্রয় লইয়াছেন। অভাবকে যখন ঘটের অনুপলব্ধিকালে নৈয়ায়িকগণ অধিকরণস্বরূপ বলিয়াই মানিয়া লয়, তবে নৈয়ায়িকের স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ স্বীকার করিবার মূলে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। 'অভাব অধিকরণস্বরূপ' এই সিদ্ধান্তই শোভন বলিয়া মনে হয়। অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধকে ভূতলস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, নৈয়ায়িকদিগের মতে যে কল্পনা-গৌরব অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায় তাহাও এই প্রসঙ্গে সুধীর স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অভাব-সম্পর্কে ভট্ট-মতাবলম্বী মীমাংসকের সিদ্ধান্ত প্রভাকর-সম্প্রদায়ের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র। ভট্ট-মতাবলম্বী মীমাংসকগণ অভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কুমারিল ভট্টের মতে বস্তু দুই প্রকার (১) ভাব ও (২) অভাব। এই ভাব ও অভাব এক বস্তুরই দুইটি বিভাবমাত্র। একই বস্তু হইতে কখনও ভাবের, কখনও অভাবের, কখনও বা ভাব এবং অভাব এই উভয়েরই প্রতীতি হইয়া থাকে। বস্তুমাত্রই নিজরূপে তাহা সৎ বা ভাব পদার্থ, আর পররূপে অর্থাৎ বস্ত্বন্তররূপে তাহা অসৎ বা অভাব পদার্থ। দধি নিজরূপে ভাব পদার্থ, দুগ্ধে দধির অভাব থাকে, সুতরাং দুগ্ধকে অপেক্ষা করিয়া দধি অভাব পদার্থ। গৃহে দেবদত্তই আছে, (অন্য কেহই নাই) ইহা গাছের গুড়িই বটে, (মানুষ নহে) এইভাবে যে-সকল জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা ভাব-জ্ঞান হইলেও ইহার অন্তরালে অভাব-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া, এই জাতীয় অনুভবকে অভাবানুবিদ্ধ ভাব-প্রতীতি বলা হয়। বস্তুমাত্রেরই ভাব-অংশ এবং অভাব-অংশ, এই দুইই তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে যখন ভাব-অংশ প্রধানভাবে প্রতীতিতে ভাসে, তখন ভাব-প্রতীতি জন্মে, যখন অভাব-অংশ প্রধান হয়, তখন অভাব-বোধের উদয় হয়। অভাব বস্তু নহে, অভাব নাই, এমন কথা কোনমতেই বলা যায় না। ইহা নাই, তাহা নাই, ঘরে চাউল নাই, লবণ নাই, তেল নাই, কাপড় নাই, এইরূপ অসংখ্য অভাবের তাড়নায় মানুষ প্রতিনিয়ত পীড়িত হইতেছে। অতএব কেমন করিয়া বলিব যে অভাব নাই; অভাবের

অভাব-সম্পর্কে কুমারিলের অভিমত

তাড়না হইতেই স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ প্রমাণিত হইয়া থাকে।[১] এই অভাব চার প্রকার (ক) প্রাগভাব, (খ) ধ্বংসাভাব, (গ) অন্যোন্যাভাব এবং (ঘ) অত্যন্তাভাব। দুগ্ধে দধির যে অভাব আছে, তাহা প্রাগভাব। দধিতে দুগ্ধের যে অভাব পাওয়া যায়, তাহা ধ্বংসাভাব। গরুতে যে অশ্বের অভাব আছে, তাহা অন্যোন্যাভাব; শশকে যে শৃঙ্গের অভাব আছে, জড় পৃথিবীতে যে চেতনার অভাব আছে, অরূপ আত্মায় যে রূপের অভাব আছে, তাহা অত্যন্তাভাব বলিয়া জানিবে।[২] অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তেও অভাব পূর্ব্বোক্ত চার প্রকার। অভাবের যখন জ্ঞান আছে, তখন ঐ জ্ঞানের বিষয় অভাবও আছে। জ্ঞান আছে অথচ জ্ঞানের বিষয় নাই, ইহা অসম্ভব কথা। অভাব-পদার্থ স্বীকার করিতেই হয়, অভাবের অস্তিত্বের অপলাপ করা যায় না। অনুপলব্ধি-প্রমাণের সাহায্যে অভাবের বোধ হইয়া থাকে। অভাব নাই সুতরাং তাহার সাধক প্রমাণ-বিচারেরও কোন আবশ্যকতা নাই, গুরু-সম্প্রদায়ের এইরূপ উক্তি ভট্ট-সম্প্রদায় মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন।

নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক পণ্ডিতগণ অভাব-পদার্থ ভাব-পদার্থের ন্যায় স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বস্তু নাই' এইরূপ নাস্তিত্ব-জ্ঞান-দ্বারায়ই স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ প্রমাণিত হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতম তদীয় ন্যায়সূত্রে স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ সমর্থন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন, "অচিহ্নিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর" এইরূপে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ দিলে, সে চিহ্নিত বস্ত্রগুলি পরিত্যাগ করিয়া, অচিহ্নিত বস্ত্রগুলিই লইয়া

অভাব-সম্পর্কে ন্যায়-বৈশেষিকের অভিমত

১। স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে।
বস্তুনি জ্ঞায়তে কৈশ্চিদ্রূপং কিঞ্চিৎকদাচন ॥১২
যস্য যত্র যদোদ্ভূতির্জিঘৃক্ষা বোপজায়তে।
চেত্যতেঽনুভবস্তস্য তেন চ ব্যপদিশ্যতে ॥১৩
তস্যোপকারকত্বেন বর্ত্ততেংশস্তদেতরঃ।
উভয়োরপি সংবিত্তাবুভয়ানুগমোঽস্তি হি ॥১৪
শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ;

২। ক্ষীরে দধ্যাদি যন্নাস্তি প্রাগভাবঃ স উচ্যতে ॥২
নাস্তিতা পয়সো দধ্নি প্রধ্বংসাভাব ইষ্যতে।
গবি যোঽশ্বাদ্যভাবস্তু সোঽন্যোন্যাভাব উচ্যতে ॥৩
শিরসোঽবয়বা নিম্না বৃদ্ধিকাঠিন্যবর্জিতাঃ।
শশশৃঙ্গাদিরূপেণ সোঽত্যন্তাভাব উচ্যতে ॥৪
শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ;

আসবে। এক্ষেত্রে চিহ্নের অভাবই হইবে আনীত বস্ত্রের পরিচায়ক। অভাব অবস্তু বা তুচ্ছ পদার্থ হইলে, বস্ত্র আনয়নের তাহা কারণ হইতে পারিত না। কেননা, যাহা অবস্তু এবং তুচ্ছ তাহা কদাচ কাহারও কারণ হয় না, হইতে পারে না। বস্ত্রের আনয়নে চিহ্নের অভাবই যে হেতু হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ফলে, অভাবের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়। বৈশেষিক-সূত্রে সূত্রকার মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়, এই ছয়টি ভাব-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; অভাব-পদার্থের পরিগণনা করেন নাই। আচার্য্য প্রশস্তপাদও তাঁহার *পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে* অভাব-পদার্থের উল্লেখ করেন নাই। বৈশেষিক-দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার আচার্য্য উদয়ন তৎকৃত কিরণাবলীতে পদার্থের গণনায় অভাব-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উক্ত ছয় প্রকার ভাব-পদার্থের প্রাধান্য বশতঃ সূত্রে তাহাদেরই কেবল উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাব-পদার্থের ন্যায় অভাব-পদার্থও আছে ইহা সত্য কথা ; তবে অভাবের জ্ঞান অভাবের প্রতিযোগী ভাব-পদার্থের জ্ঞানের অধীন বলিয়া, সূত্রকার মহর্ষি কণাদ পদার্থ-গণনায় অভাবের উল্লেখ করেন নাই, কেবল ভাব-পদার্থেরই গণনা করিয়াছেন। অভাব তুচ্ছ, অবস্তু বা নিঃস্বভাব, অভাব নাই, ইহা সূত্রকারের অভিমত নহে। ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্য এবং ন্যায়কদলী-রচয়িতা শ্রীধরাচার্য্য উদয়নের অনুরূপ যুক্তিবলেই অভাবকে ভাব-পদার্থের ন্যায় স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। অভাব যে অধিকরণ স্বরূপ নহে, স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিকদিগের যুক্তি এই যে, ভাব বস্তুরও যেমন স্বতন্ত্র প্রতীতি হয়, অভাবেরও সেইরূপ স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। অতএব প্রতীতি-বলে ভাব-পদার্থকে যেমন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অভাব-পদার্থকেও সেইরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ভাব-জ্ঞান সত্য, অভাব-বোধ অসত্য বা মিথ্যা, এইরূপ বলিবার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। তারপর, কেবল ভূতলই যদি ঘটাভাব হয়, তবে ভূতলকে ঘটশূন্য বলার তাৎপর্য্য কি ? ভূতলকে ঘটশূন্য বলায় ভূতলের কোনরূপ বিশেষ ভাবের বোধ হইবে নাকি ? যদি কোন বিশেষ ভাবের বোধ এখানে নাই হয়, তবে 'ঘটশূন্য' এইরূপ বলার কোনই অর্থ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ঘট-শালী ভূতল হইতে ঘটশূন্য ভূতলের যে পার্থক্য আছে, তাহাই বা

কিরূপে বুঝা যায় ? ভূতলে ঘটের অভাব আছে ; ভূতল ঘটাভাবের আধার, ঘটাভাব আধেয়, এইরূপ আধার-আধেয়-ভাবে যে বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অনুভব করে। এই অবস্থায় ঐরূপ বোধকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কোনমতেই চলে না। ভূতলে ঘটের অভাব থাকিলে, উহা ভূতল হইতে ভিন্ন ভূতলের কোনরূপ বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হইবে। ঘটাভাবকে ভূতলস্বরূপ বলিয়া প্রভাকর-মীমাংসায় যে-সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা চলিবে না। স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এই অভাব-পদার্থ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মতে প্রত্যক্ষগম্য। তাঁহারা বলেন, যেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেই পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই পদার্থের অভাবেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি যেমন প্রত্যক্ষ করি, আবার কোন স্থানে গরু, ঘোড়া, হাতী না থাকিলে, এখানে গরু নাই, ঘোড়া নাই, এইরূপে ঐ সমস্ত প্রাণীর অভাবেরও চক্ষুর দ্বারাই প্রত্যক্ষ করি। মনে মনেও আমরা এইরূপই বুঝি যে, এখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমি গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি পশুর অভাবকে প্রত্যক্ষ করিলাম। কোন গৃহে দৃষ্টি দিবার পর, গৃহে মানুষ না দেখিলে আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই বুঝিতে পারি যে, এখানে কোন মনুষ্য নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও বলি যে, "আমি চোখে দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে কেহ নাই"। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উল্লিখিত স্থলে ঐ সমস্ত অভাব-পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই জন্মে। এইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও বিবিধ বস্তুর অভাবের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষগম্য অভাব-পদার্থের সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ সম্বন্ধও অবশ্য স্বীকার্য্য। গৃহে গরু নাই, এইরূপে গৃহে গরুর অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের স্থলে প্রথমতঃ সেই গৃহের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। তারপর চক্ষুর গোচর গৃহের সহিত গরুর অভাবের বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ থাকায় (অর্থাৎ গরুর অভাব গৃহের বিশেষণ হওয়ায়) এই স্থলে 'সংযুক্ত-বিশেষণতারূপ' সন্নিকর্ষবশতঃ (চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইল গৃহ, গৃহের বিশেষণ হইল গরুর অভাব এইভাবে) অভাবের সহিত চক্ষুর যোগ ঘটে এবং উক্তরূপ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষবলে গৃহে গরুর অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উদয় হয়।[১]

১। (ক) ইন্দ্রিয়মভাবপ্রমাকরণং, তদ্‌বিপর্যয়করণত্বাৎ।

অভাবমাত্রই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। যেই বস্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সেই বস্তুর অভাবও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অন্ধকার গৃহে ঘট থাকিলে ঐ ঘট চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, সুতরাং ঐ ঘটের অভাবও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না। অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে, যাহা কখনও আমাদের ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের গোচর হয় না, হইতে পারে না, ঐ সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাবেরও কখনও প্রত্যক্ষ হইবে না। যে-পদার্থটি প্রত্যক্ষের যোগ্য, সেই পদার্থের অভাবই কেবল আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে। এই অবস্থায় অভাবের প্রত্যক্ষতা ব্যাখ্যা করিতে গেলেই ইহা বিচার করা আবশ্যক যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী বস্তুটি, অর্থাৎ যেই বস্তুটির অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই বস্তুটি আদৌ প্রত্যক্ষের যোগ্য কিনা? যদি সেই বস্তুটি প্রত্যক্ষের যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবেই সেই বস্তুর অভাবও প্রত্যক্ষগম্য হইবে। অভাব-প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী বস্তুর প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধির যোগ্যতা এক অপরিহার্য্য অঙ্গ; এবং এইরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট যে অনুপলব্ধি, তাহাই অভাব-প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ। যেমন ঘটের অনুপলব্ধি গৃহে ঘটের অভাব-প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ। ঐরূপ অনুপলব্ধি ব্যতীত কোন-মতেই গৃহে ঘটের অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আলোচ্য যোগ্যতাবিশিষ্ট অনুপলব্ধি বা যোগ্যানুপলব্ধি কাহাকে বলে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, যেখানে প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতি বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলে, তাহারই বলে ঐসকল বস্তুর অনুপলব্ধির প্রতিযোগী উপলব্ধির নির্ণয় সম্ভবপর হয়, সেই প্রকার অনুপলব্ধিকেই যোগ্যানুপলব্ধি বলে।[১] ন্যায়ের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় আলোচ্য অনুপলব্ধির যোগ্যতার স্বরূপটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা

যদ্‌যদ্বিপর্যয়ক?ং তৎ তৎপ্রমাকরণং যথা।
রূপপ্রমাকরণং চক্ষুরিতি।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৩য় স্তবক, ১০৩ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সং;

(খ) যাহি সাক্ষাৎকারিণী প্রতীতিঃ সেন্দ্রিয়করণিকা, যথা রূপাদি-প্রতীতিঃ। তথেহ ভূতলে ঘটো নাস্তীত্যপি। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৩য় স্তবক, ৯১ পৃষ্ঠা;

১। অনুপলব্ধের্যোগ্যতা চ প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জনপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্বরূপা। তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুপলব্ধ্যপ্রামাণ্যবাদ দ্রষ্টব্য;

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেক্ষেত্রে প্রতিযোগীর সত্তা থাকিলেই তন্নিবন্ধন অনুপলব্ধির প্রতিযোগী উপলব্ধির অস্তিত্ব নির্ণীত হয়, সেইরূপ অনুপলব্ধিকেই যোগ্যানুপলব্ধি বলিয়া জানিবে। যেই পদার্থের অভাব বুঝা যায়, সেই পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার অভাব সেখানে কোন মতেই থাকিতে পারে না। যাহার অভাব থাকে তাহাকেই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলে। ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট। অনুপলব্ধির অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবের প্রতিযোগী উপলব্ধি। গৃহে ঘট না দেখিলে চক্ষুষ্মান্ সুধীর মনে এইরূপ তর্ক অবশ্যই উঠিবে যে, গৃহে নিশ্চিতই ঘট নাই; ঘট থাকিলে ঐ ঘট অবশ্যই আমার উপলব্ধির গোচর হইত। উক্তরূপ তর্কই ঘটের সত্তানিবন্ধন ঘটের উপলব্ধির অস্তিত্ব আপাদন করে। প্রত্যক্ষতঃ গ্রহণযোগ্য ঘটের উপলব্ধিই আলোচ্য অনুপলব্ধির (উপলব্ধির অভাবের) প্রতিযোগী বটে। যে-সকল অনুপলব্ধিতে উল্লিখিতরূপে উপলব্ধির প্রতিযোগিত্ব আপাদন সম্ভবপর হয়, সেই সকল অনুপলব্ধিকেই যোগ্যানুপলব্ধি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।[১] অন্ধকারে ঘট প্রভৃতি চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ থাকিলেও উহাদের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয় না। অন্ধকারে আলোচ্য তর্কেরও সুতরাং কোন অবকাশ থাকে না; ঘটের সত্তানিবন্ধন উপলব্ধির অস্তিত্ব উপপাদনও সম্ভব হয় না। এইজন্য অন্ধকারে ঘটের অনুপলব্ধিকে যোগ্যানুলব্ধি বলা চলে না; এবং ঐরূপ অনুপলব্ধির দ্বারা ঘটের অভাবের নিশ্চয় করাও চলে না। অন্ধকার ঘরের ঘট চক্ষুর দ্বারা না দেখিলেও, হাত-পা প্রভৃতিতে ঘটের স্পর্শ হইলে অন্ধকারেও ঘটের অস্তিত্ব আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর প্রত্যক্ষে আলোকের কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং অন্ধকার ঘরেও "এখানে যদি ঘট থাকিত, তবে অবশ্যই ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটটি আমার অনুভবের গোচর হইত"; ঘট যখন ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবের গোচর হইতেছে না, তখন নিশ্চিতই এই অন্ধকার ঘরে ঘট নাই, এইরূপে ঘটের অভাব-বোধ অনায়াসেই উৎপন্ন হইতে

১। অনুপলব্ধের্যোগ্যতা চ তর্কিত প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্বম্। যস্যাভাবোগৃহ্যতে তস্য যঃ প্রতিযোগী তস্য সত্ত্বেন অধিকরণে তর্কিতেন প্রসঞ্জিত-মাপাদনযোগ্যং প্রতিযোগ্যুপলব্ধিস্বরূপং যস্যানুপলম্ভস্য তত্ত্বং তদনুপলব্ধের্যোগ্যত্বম্।
বেদান্তপরিভাষা, অনুপলব্ধিপরিচ্ছেদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং।

পারে। অন্ধকারে ঘটের এই প্রকার অনুপলব্ধিও যে যোগ্যানুপলব্ধি সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে-সকল বস্তু কদাচ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, সেই সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুপলব্ধিও কখনও যোগ্যানুলব্ধি বলিয়া বিবেচিত হয় না। ফলে, অনুপলব্ধির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাবের নিশ্চয় করাও চলে না। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, অনুপলব্ধির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাবের নির্ণয় না হইলেও, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুর সহিত অতীন্দ্রিয় বস্তুর যে ভেদ আছে, অতীন্দ্রিয় পদার্থের সেই ভেদের অবশ্যই নিশ্চয় করা চলে। ভেদের নিশ্চয়ে ভেদের অধিকরণটি অর্থাৎ যেই বস্তুতে ভেদের নিশ্চয় হয়, সেই বস্তুটি প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়া আবশ্যক। প্রত্যক্ষ-যোগ্য গাছের গুড়ি প্রভৃতি আধারে অতীন্দ্রিয় ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির যে ভেদ আছে, তাহা অনুপলব্ধির সাহায্যেই নিশ্চিত বুঝা যায়।[১] ফল কথা এই, "যে সকল পদার্থের অন্যত্র প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার অত্যন্তাভাবই পূর্ব্বোক্ত যোগ্যানুপলব্ধিরূপ কারণের সাহায্যে চক্ষুরাদি দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। আর যে সমস্ত অভাব-পদার্থ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহা যথাসম্ভব অনুমান বা শব্দ-প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ যোগ্যানুপলব্ধি সম্ভব না হওয়ায় ঐ কারণাভাবে তাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না"।[২]

ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায় অনুপলব্ধি-বেদ্য এই অভাব-বোধকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্য্যগণও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করিয়া ভূতলে ঘটাভাব প্রভৃতির বোধকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণমূলক প্রত্যক্ষ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ঘট প্রভৃতির সহিত যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ ঘটে, সেইরূপ ঘটের অভাবের সহিতও চক্ষুর সংযোগ ঘটে; এবং তাহারই বলে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পুরোবর্তিঘটাদ্যভাবপ্রমিতিস্তু ঝটিতি জায়মানা প্রত্যক্ষফলমেব। প্রমাণপদ্ধতি, ৮৯ পৃষ্ঠা; ভট্ট-মীমাংসকও অদ্বৈত-বেদান্তী কোনক্ষেত্রেই অভাব-পদার্থের বোধকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে অনুপলব্ধি-

১। বেদান্তপরিভাষা, অনুপলব্ধিপরিচ্ছেদ, ২৮০ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং;

২। বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, অনুপলব্ধিশব্দ দ্রষ্টব্য;

নামক স্বতন্ত্র প্রমাণের সাহায্যেই অভাব-বোধের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহাদের যুক্তির মর্ম্ম এই যে, অভাব নামে পৃথক্ পদার্থ থাকিলেও, অভাব-পদার্থের সহিত চক্ষুপ্রমুখ বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ কোনরূপ যোগ নাই। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মতে ভূতলে ঘটাভাবের যে প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে ভূতলের সহিতই দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে; এবং সেই সংযোগ ভূতলের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ উৎপাদন করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে। ঘটাভাবের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ কোনরূপ যোগ না থাকায়, ভূতলের সহিত চক্ষুর যে সংযোগ আছে ঐ সংযোগ কোনমতেই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না। যদি বল যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে অভাবের সহিত চক্ষুর সংযোগ না থাকিলেও, পরম্পরা-সম্বন্ধে (সংযুক্ত-বিশেষণতা-সম্বন্ধে, চক্ষুর সহিত সংযুক্ত ভূতল, তাহার বিশেষণ হইল ঘটাভাব এইরূপে) ঘটাভাবের সহিতও চক্ষুর যোগ থাকায় অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে বাধা কি? ন্যায়-বৈশেষিকের এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে ভট্ট-মীমাংসক এবং অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, চক্ষুর সংযোগকে আলোচ্য দৃষ্টিতে পরম্পরা-সম্বন্ধে গ্রহণ করিলে কেবল অভাবের কেন? আরও অসংখ্য অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোন-না-কোনরূপ যোগ থাকায়, ঐ সকল পদার্থেরও প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। ঐ দেওয়ালের অপর পীঠে অবস্থিত পুস্তকাধারে যে পুস্তকগুলি আছে, চক্ষুর সহিত সংযুক্ত দেওয়ালে যুক্ত থাকায়, ঐ পুস্তকগুলির সহিতও চক্ষুর পরম্পরায় যোগ অবশ্যই আছে। এই অবস্থায় ঐ পুস্তকগুলির প্রত্যক্ষতা ন্যায়-বৈশেষিক সমর্থন করিবেন কি? ন্যায়-বৈশেষিকের কল্পিত সেই সকল পরম্পরা-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষোৎপাদকতা-সম্পর্কেও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ-রূপে কল্পিত সেই বিশেষ সম্বন্ধ সিদ্ধও হয় না। সুতরাং অভাব-পদার্থের প্রত্যক্ষতা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান, হেতুর পক্ষে অবস্থিতি প্রভৃতি অনুমানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গের অভাব বশতঃ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেও অভাব-বোধের উপপাদন করা চলে না।[১]

১। ন চাত্রাপ্যনুমানত্বং লিঙ্গাভাবাৎপ্রতীয়তে।
ভাবাংশো নমু লিঙ্গং স্যাত্তদানীং নাঽভিসম্বন্ধণাৎ॥ ২৯॥
অগৃহীতে হ্যবগতেৰ্জন্ম ভাবাংশে হৃদ্রিবক্ষিতে।
তস্মিন্ প্রতীয়মানেতু নাভাবে জায়তে মতিঃ॥ ৩০॥

এই অবস্থায় অভাব-বোধের জন্য অনুপলব্ধি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য নহে কি ?[1]

অভাবের প্রত্যক্ষতার বিরুদ্ধে মীমাংসক ও অদ্বৈত-বেদান্তীর প্রদর্শিত যুক্তির সারবত্তা ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। আচার্য্য উদয়ন কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকে অভাবের প্রত্যক্ষত্ব-সিদ্ধির অনুকূলে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মীমাংসক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় অধিকরণ-গ্রহণে ব্যাপৃত থাকায়, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সেইখানেই উপক্ষীণ হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এইরূপ যুক্তি নিতান্তই অসার। "কোলাহল নিবৃত্তি হইয়াছে" এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান সকলেরই উদয় হয়। শব্দের অধিকরণ আকাশ স্বরূপতঃ অতীন্দ্রিয়। শ্রবণেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় আকাশরূপ অধিকরণে ব্যাপৃত হইয়াছে এমন কথা এখানে বলা

ন চৈষ পক্ষধর্মত্বং পদবৎপ্রতিপদ্যতে।
সহ সর্বৈরভাবৈশ্চ ভাবো নৈকান্ততোগতঃ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ ;

১। (ক) প্রত্যক্ষাদ্যবতারস্তু ভাবাংশো গৃহ্যতে যদা।
ব্যাপারস্তদনুৎপত্তিরভাবাংশে জিঘৃক্ষিতে ॥ ১৭ ॥
নতাবদিন্দ্রিয়ৈরেষা নাস্তীত্যুৎপদ্যতে মতিঃ।
ভাবাংশেনৈব সংযোগো যোগ্যত্বাদিন্দ্রিয়স্য হি ॥ ১৮ ॥

শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ ;

অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ইহা প্রদর্শন করিয়া কুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে ২৯-৩০ শ্লোকে অভাবের যে অনুমান হইতে পারে না তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসু পাঠককে কুমারিলের সেই আলোচনা দেখিতে অনুরোধ করি।

(খ) ইন্দ্রিয়স্য চাভাবেন সহ সন্নিকর্ষাভাবেন অভাবগ্রহাহেতুত্বাৎ। ইন্দ্রিয়ান্বয়-ব্যতিরেকযোরধিকরণজ্ঞানাদ্যুপক্ষীণত্বেন অন্যথাসিদ্ধেঃ। ননু ভূতলে ঘটোনেত্যাদ্য-ভাবানুভবস্থলে ভূতলাংশে প্রত্যক্ষত্বমুভয়সিদ্ধমিতি তত্র বৃত্তিনির্গমনস্য আবশ্যকত্বেন ভূতলাবচ্ছিন্নচৈতন্যবৎ তন্নিষ্ঠঘটাভাবাবচ্ছিন্নচৈতন্যস্যাপি প্রমাত্রভিন্নতয়া ঘটাভাবস্য প্রত্যক্ষতৈব সিদ্ধান্তেঽপীতি চেৎ সত্যম্, অভাবপ্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎ কারণস্যানুপলব্ধের্মানান্তরত্বাৎ।

বেদান্তপরিভাষা, অনুপলব্ধিপরিচ্ছেদ, ২৮১-৮২ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং ;

চলে না; শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দের অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়াছে এইরূপই বলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ অভাব-জ্ঞানে অধিকরণের প্রত্যক্ষজ্ঞানের কোনরূপ উপযোগিতাই দেখা যায় না। 'বায়ুতে রূপ নাই' ইহা চক্ষুষ্মান্ সুধীমাত্রেই অনুভব করেন; অথচ রূপের অভাবের অধিকরণ বায়ুর গ্রহণে চক্ষু সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত। এই অবস্থায় অধিকরণের প্রত্যক্ষজ্ঞান অভাব-জ্ঞানের কারণ এমন কথা বলা যায় কি? অধিকরণের প্রত্যক্ষজ্ঞান অভাব-জ্ঞানের কারণ ইহা স্বীকার করিলে, "ভূতলে ঘট নাই" এইরূপ জ্ঞানেরও উদয় হইতে পারে না। কেননা, 'ঘট নাই' ইহার অর্থ এই যে ভূতলের সহিত ঘটের সংযোগ নাই। সংযোগের আধার ঘট এবং ভূতল উভয়ই বটে, একমাত্র ভূতল নহে। যদি অধিকরণরূপে ভূতলের প্রত্যক্ষজ্ঞান অভাব-জ্ঞানের কারণ হয়, তবে ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানও যে কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কেবল ভূতলরূপ আধারের প্রত্যক্ষ হইলেই চলিবে না। ভূতলে তো ঘট নাই, ঘটের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এখানে জন্মিবে কিরূপে? ফলে, অধিকরণের প্রত্যক্ষ অভাব-জ্ঞানের কারণ হয় না, ইহাই অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অধিকরণ-প্রত্যক্ষে উপক্ষীণ হইয়া যায়; অভাব-গ্রহণে ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাপার নাই, ইহা মীমাংসকগণ কিরূপে বলিতে পারেন? নৈয়ায়িকগণের উল্লিখিত আপত্তির খণ্ডনে মীমাংসকগণ বলেন, অন্ধের বায়ুতে রূপের অভাব-জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হয় না, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ইহা হইয়া থাকে। চক্ষু বায়ুরূপ অধিকরণ-গ্রহণে অসমর্থ ইহা সত্য কথা। এইজন্যই আমরা (মীমাংসকগণ) রূপের অভাবের বোধকে চাক্ষুষ বলি না, অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণান্তর-গম্য বলি। রূপোপলব্ধির অনুৎপত্তিই রূপাভাব-জ্ঞানের কারণ। ইন্দ্রিয় রূপাভাব-জ্ঞানের কারণ নহে। কেবল রূপের উপলব্ধির যোগ্যতা সম্পাদন করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়-ব্যাপার আবশ্যক। 'বায়ুতে রূপ নাই' ইহা জানিতে হইলেই, রূপোপলব্ধির কারণ আলোক প্রভৃতি আছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করা দরকার; এবং তাহার জন্যই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারও অবশ্য স্বীকার্য্য। চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপোপলব্ধির যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াই সার্থকতা লাভ করে, স্বাধীনভাবে অভাব-প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে না। অভাব-প্রত্যক্ষের জন্য অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার না করিলে চলে না। কুমারিল-ভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্তিকে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত অভাব-প্রত্যক্ষ-বাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপনের জন্য নানাবিধ সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের

অবতারণা করিয়াছেন। ন্যায়োক্ত অভাব-প্রত্যক্ষবাদ খণ্ডন করিয়া কুমারিল বৌদ্ধ-তার্কিকদিগের অনুমোদিত অভাবের অনুমেয়তা-বাদও খণ্ডন করিয়াছেন।[১] প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তার্কিক ধর্ম্মকীর্ত্তি তদীয় ন্যায়-বিন্দু গ্রন্থে অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে উপন্যাস করিয়া অভাবের অনুমান করিয়াছেন; এবং অভাব-অনুমানের হেতু অনুপলব্ধিকে ধর্ম্মকীর্ত্তি স্বভাবানুপলব্ধি, কার্য্যানুপলব্ধি, ব্যাপকানুপলব্ধি প্রভৃতি একাদশ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন।[২] অভাব-পদার্থের অনুমান খণ্ডন করিতে গিয়া কুমারিল-ভট্ট বলিয়াছেন, অভাবের অনুমান কোনমতেই উপপাদন করা চলে না। কারণ, ঘটাভাবের সাধক হইবে কে? ঘট বা ঘটের আধার ভূতল ইহার কেহই ঘটাভাবের সাধক হেতু হইতে পারে না। কেননা, ইহাদের সহিত ঘটাভাবের কোনরূপ ব্যাপ্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ অভাব-জ্ঞান যদি অনুপলব্ধিরূপ হেতুর দ্বারা অনুমান-গম্যই হয়, তবে সেক্ষেত্রে হেতুর সিদ্ধির জন্যও হেতুর অন্তর্গত অভাবেরও পুনঃ পুনঃ অনুপলব্ধি-হেতুমূলে অনুমানই করিতে হইবে। ফলে, অনবস্থা-দোষই আসিয়া পড়িবে। যদি বল যে, ঘটের অনুপলব্ধি বশতঃই ঘটাভাবের অনুমান

১। শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ, ২০-৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য;

২। (১) স্বভাবানুপলব্ধির্যথা। নাত্র ধূম উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরিতি। (২) কার্যানুপলব্ধির্যথা। নেহাপ্রতিবদ্ধসামর্থ্যানি ধূমকারণানি সন্তি ধূমাভাবাৎ। (৩) ব্যাপকানুপলব্ধি র্যথা নাত্র শিংশপা বৃক্ষাভাবাদিতি। (৪) স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা নাত্র শীতস্পর্শোঽগ্নেরিতি। (৫) বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধির্যথা। নাত্র শীতস্পর্শো ধূমাদিতি। (৬) বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধির্যথা। ন ধ্রুবভাবী ভূতস্যাপি ভাবস্য বিনাশো হেত্বন্তরাপেক্ষণাদিতি। (৭) কার্যবিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা। নেহাপ্রতিবদ্ধ-সামর্থ্যানি শীতকারণানি সন্ত্যগ্নেরিতি। (৮) ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা। নাত্র তুষারস্পর্শোঽগ্নেরিতি। (৯) কারণানুপলব্ধির্যথা। নাত্র ধূমোঽগ্ন্যভাবাদিতি। (১০) কারণবিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা। নাস্য রোমহর্ষাদিবিশেষাঃ সন্নিহিতদহনবিশেষত্বা-দিতি। (১১) কারণবিরুদ্ধকার্যোপলব্ধির্যথা। রোমহর্ষাদিবিশেষযুক্তপুরুষবানয়ং প্রদেশো ধূমাদিতি।

ন্যায়বিন্দু, অনুমানপরিচ্ছেদ, ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি সং;

জয়ন্তভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতেও ধর্ম্মকীর্ত্তির কথিত উক্ত একাদশ প্রকার অনুপলব্ধির উল্লেখ পূর্ব্বক প্রত্যেকের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ন্যায়মঞ্জরী ৫০ পৃষ্ঠা, কাশী সং দেখুন;

হইয়া ঘটের অভাব-জ্ঞানের উদয় হইবে। ঘট নাই, যেহেতু ঘট প্রত্যক্ষ-যোগ্য, অথচ তাহা উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না ; যাহা প্রত্যক্ষ-যোগ্য হইয়াও উপলব্ধির বিষয় হয় না, সেই পদার্থের অভাবই নিশ্চিত হয়। এইরূপে অনুমানের সাহায্যে অভাব-সাধন করিতে গেলে, সেখানে অবশ্য যোগ্য-অনুপলব্ধিকেই অভাব-অনুমানের মূলে যে ব্যাপ্তি আছে, সেই ব্যাপ্তির গ্রাহক এবং অনুমানের সাধক বলিতে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে কুমারিল বলেন, অনুপলব্ধিকে অভাব-অনুমানের ব্যাপ্তির সহায়ক না বলিয়া, স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করাই লাঘবও বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। অভাব-প্রমাণবাদী কুমারিলের সিদ্ধান্তেও অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাবের বোধ যথাসম্ভব অনুমান এবং শব্দ-প্রমাণের সাহায্যেই উদিত হইয়া থাকে। জয়ন্তভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থেও বৌদ্ধোক্ত অভাব-অনুমানের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যেই জানা যায়, তাহার অবগতির জন্য অনুমানের আশ্রয় লওয়া কেবল নিষ্প্রয়োজন নহে, যুক্তিবহির্ভূতও বটে।

ভট্ট-মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তী ইঁহারা উভয়েই অভাবের বোধক অনুপলব্ধি বা অভাবনামক ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, অভাবের বোধ-সম্পর্কে উভয়ের মত তুল্য নহে। কুমারিল-ভট্ট প্রভৃতির মতে অভাব-বোধ কোন সময়েই প্রত্যক্ষ হয় না ; অভাবের সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে পরোক্ষ-জ্ঞানই উৎপন্ন হয়। অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে অভাব-বোধ অনুপলব্ধিনামক ষষ্ঠ প্রমাণ-গম্য হইলেও অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভূতলে ঘটাভাবের পরোক্ষ-জ্ঞান হয় না, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গত হইয়া ভূতলের যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, ভূতলস্থ ঘটাভাবেরও সেইরূপই প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষ এই যে, ভূতলের প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে চক্ষুরিন্দ্রিয়-পথে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গত হয় ; আর ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপ-লব্ধিরূপ সহকারী কারণের সাহায্যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি নির্গত হইয়া অভাবের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূতলের প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বৃত্তি নির্গত হয় বলিয়া তাহা হয় ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ ; অভাব-প্রত্যক্ষস্থলে যোগ্য-অনুপলব্ধির সাহায্যে বৃত্তি নির্গত হইয়া থাকে বলিয়া, উহাকে বলা হয় যোগ্যানুপলব্ধিরূপ প্রমাণমূলক প্রত্যক্ষ।

'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতি স্থলে শব্দ-জন্য যেমন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, অভাব-প্রত্যক্ষস্থলেও সেইরূপ অনুপলব্ধি-প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সাধন যে প্রত্যক্ষই হইবে, এইরূপ নিয়ম অদ্বৈত-বেদান্তী স্বীকার করেন নাই। এইজন্যই শব্দ-প্রমাণজন্য জ্ঞানকেও তাঁহারা ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষই বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-বিষয়ের জ্ঞানই তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান।[১] শব্দ-জন্য জ্ঞানের যেমন প্রত্যক্ষ হইতে বাধা নাই, সেইরূপ অনুপলব্ধি-প্রমাণজন্য অভাব-বোধেরও প্রত্যক্ষ হইতে কোন আপত্তি নাই। অভাব-বোধ প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তীর সিদ্ধান্ত। এই অংশে ইহা ন্যায়-বৈশেষিক-মতের তুল্য হইলেও, ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে অভাব-প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য, অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে অভাব-প্রত্যক্ষ অনুপলব্ধিরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণ-গম্য। অবশ্যই ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ও যোগ্য-অনুপলব্ধিকে অভাব-প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই সহকারী, স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। এই অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের সাহায্যেই অদ্বৈত-বেদান্তের মতে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে প্রপঞ্চাভাবের জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে; এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সিদ্ধি সম্ভবপর হয়। এইজন্যই অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বিচার একান্ত আবশ্যক।

অদ্বৈত বেদান্তোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয় প্রকার প্রমাণের স্বরূপ বিচার করা গেল। আলোচ্য ছয় প্রকার প্রমাণ ব্যতীত সম্ভব এবং ঐতিহ্য নামে আরও দুইটি অতিরিক্ত প্রমাণ পৌরাণিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। কোন পদার্থের অস্তিত্ব-নিবন্ধন অপর পদার্থের অস্তিত্ব-জ্ঞানকে সম্ভব-জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। যেমন ৮০ তোলায় এক সের, পাঁচ সেরে এক পাশুরী এবং ৮ আট পাশুরীতে এক মণ হয়। এক মণ বলিলে সেখানে মণের মধ্যে পাশুরী, সের, তোলার অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যায়। কেননা, সের, পাশুরী প্রভৃতি ব্যতীত এক মণ পরিমাণ জন্মে না, জন্মিতে পারে না। এক মণ ধান আছে বলিলেই, সেখানে আশী তোলা বা এক সের, এক পাশুরী বা আট পাশুরী ধান আছে, ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই তোলা, সের

১। এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বা পাগুরীর জ্ঞান সম্ভবনামক প্রমাণের সাহায্যে উদিত হয় বলিয়া সম্ভব-প্রমাণবাদীরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন, যেহেতু তোলা, সের, পাগুরী ব্যতীত এক মণ পরিমাণ জন্মিতে পারে না, অতএব এক মণে তোলা, সের, পাগুরীর 'অবিনাভাব'রূপ ব্যাপ্তি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ঐ ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলে এক মণের অস্তিত্ব-জ্ঞান-নিবন্ধনই তোলা, সের, পাগুরী প্রভৃতির অনুমান অতি সহজেই করা যাইতে পারে। সম্ভবনামক স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ স্বীকারের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। মীমাংসক-শিরোমণি কুমারিল এবং মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণও আলোচ্য সম্ভব-প্রমাণকে অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।[১] অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে অর্থাপত্তি-প্রমাণের সাহায্যেই মণ জ্ঞান হইতে সের, পাগুরী প্রভৃতির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে; স্বতন্ত্র সম্ভবনামক প্রমাণ মানিবার অনুকূলে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নাই।

"পুকুর পারের বট গাছে ভূত বাস করে" এইরূপ জনপ্রবাদ শুনিয়া ঐ বট গাছে যে ভূতের জ্ঞানোদয় হয়, তাহা ঐতিহ্যনামক এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রমাণমূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ঐতিহ্য-প্রমাণ যাহারা মানেন না তাঁহারা বলেন, ইহা শব্দ-প্রমাণেরই প্রকারভেদ, স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, প্রথমতঃ ঐরূপ ঐতিহ্যকে প্রমাণই বলা চলে না। কারণ, যাহা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের সাধন হয়, তাহাকেই প্রমাণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। আপ্ত বা সজ্জন ব্যক্তির উপদেশই শব্দ-প্রমাণ। সুতরাং যে ঐতিহ্য সাধু মহাপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথার্থ জ্ঞানের জনক হইয়া প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। আর যে ঐতিহ্যের কোনও বক্তার নিশ্চয় নাই, কেবল জনপ্রবাদের উপরেই যাহা চলিয়া

১। (ক) ইহ ভবতি শতাদৌ সম্ভবাখ্যাঽঽসহস্রা-
ম্মতিরবিযুতভাবাদ্ সাঽনুমানাদভিন্না। ৫৮॥
শ্লোকবার্তিক, অভাবপরিচ্ছেদ, ৪৯১ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সং;

(খ) বহুলজ্ঞানেঽল্পজ্ঞানং সম্ভবঃ।
যথা শতমস্তীতিজ্ঞানে পঞ্চাশজ্‌জ্ঞানং
তদপ্যনুমানমেব। দেবদত্তঃ পঞ্চাশদ্‌বান্
শতবত্ত্বাৎ। যথাঽহমিতি প্রয়োগসম্ভবাৎ।
প্রমাণপদ্ধতি, ৮৯ পৃষ্ঠা;

আসিতেছে তাহা প্রমাণই হইবে না।[১] উহা অপ্রমাণ। শব্দ-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলিয়া ঐতিহ্যকে শব্দ-প্রমাণই বলা চলে; স্বতন্ত্র ঐতিহ্য-প্রমাণ মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। কুমারিল-ভট্টের মতেও ঐতিহ্য শব্দ-প্রমাণ। বেদান্তীও ন্যায়ের অনুরূপ যুক্তিবশতঃ ঐতিহ্যকে শব্দ-প্রমাণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া পরিগণনা করেন নাই।

১। যং খলু অনির্দিষ্টপ্রবক্তৃকং প্রবাদ পারম্পর্যমৈতিহ্যং তত্তচেদাপ্তঃ কর্তা নাবধারিতঃ. তৎস্ফুৎ প্রমাণমেব ন ভবতি। তাৎপর্যটীকা. ২ অঃ ২ আঃ ২ সূত্র;

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানের প্রামাণ্য

বেদান্তোক্ত প্রমাণের লক্ষণ এবং স্বরূপ বিচার করা গেল। এই পরিচ্ছেদে ঐ সকল প্রমাণমূলে উৎপন্ন জ্ঞানের প্রামাণ্য বা সত্যতা পরীক্ষা করা যাইতেছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিয়া প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছি, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণমূলে আহৃত-জ্ঞান যে সব সময় সত্যই হয়, কখনও মিথ্যা হয় না; এবং ভুল বুঝাইয়া আমাদিগকে প্রতারিত করে না, এমন কথা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বলিতে পারেন না। প্রমাণের মধ্যে অপরাপর সর্ব্ববিধ প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ-প্রমাণকেই ধরা যাউক। চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে আমরা যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করি, তাহাই যে নির্ভুল তাহাই বা কে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারে? পথে চলিতে চলিতে পথের মধ্যে পতিত ঝিনুকের টুক্‌রাকে রূপার খণ্ড মনে করিয়া কোন্ সুধী না তাহার প্রতি ধাবিত হন? এই অবস্থায় জ্ঞানের সত্যতা (validity) এবং প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে, কেবল প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে চলে না। আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি অতএব তাহা সত্য, এইরূপ বলার কোনই মূল্য নাই। কেননা, তোমার চক্ষুও তো অনেক ক্ষেত্রেই তোমাকে প্রতারিত করে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় জ্ঞানের সত্যতার মাপকাঠি কি? এই সমস্যাই জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্ত্বের (epistemology) আলোচনায় প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা ক্রমে ঐ সকল সিদ্ধান্তের সার আমাদের সুধী পাঠক-পাঠিকাকে পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞানের প্রামাণ্যের

সমস্যা ভারতীয় দর্শনেরই সমস্যা, ইউরোপীয় দর্শনের নহে। কেননা, ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতে জ্ঞানের সত্যতার প্রশ্ন জ্ঞানের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, জ্ঞানের সত্যতা না থাকিলে সেই জ্ঞানকে জ্ঞান আখ্যাই দেওয়া চলে না। ইউরোপীয় দর্শনের সিদ্ধান্তে ভ্রম-জ্ঞান (false knowledge) জ্ঞানই নহে; ইহা নিছকই ভ্রান্তি; (error) ইহা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমা-জ্ঞানের স্বরূপ বিচার-প্রসঙ্গেই আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞান বলিতে সত্য এবং মিথ্যা, প্রমা এবং অপ্রমা, এই উভয় প্রকার জ্ঞানকেই বোঝেন। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য-নির্দ্ধারণের উপায় কি, তাহা এই মতে বিশেষভাবেই বিচার্য্য। জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রশ্নে ভারতীয় দর্শনে দুইটি অত্যন্ত বিরুদ্ধ মতের পরিচয় পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একটিকে বলে "স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ," দ্বিতীয় মতটিকে বলে "পরতঃ প্রামাণ্যবাদ"। স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীর মতে জ্ঞানের যাহা সাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও তাহাই সাধন। "স্বতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানের যাহা উপাদান বা সামগ্রী তাহা কেবল জ্ঞানই উৎপাদন করে না, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও উৎপাদন করে; এবং ঐ প্রামাণ্যকে আমাদের জ্ঞানের গোচরে আনে। পরতঃ প্রামাণ্যবাদীর অভিমত এই যে, জ্ঞানের যাহা সামগ্রী বা উপাদান তাহা জ্ঞানই কেবল উৎপাদন করে, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎপাদন করে না। "পরতঃ অর্থাৎ জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রী তাহা ব্যতীত অপর কোনও কারণবলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎপাদিত এবং পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রামাণ্য যেমন 'স্বতঃ' এবং 'পরতঃ' উৎপাদিত হয় এবং জানা যায়, জ্ঞানের অপ্রামাণ্যও সেইরূপ 'স্বতঃ' এবং 'পরতঃ' এই দুই প্রকারেই উৎপাদিত হয় এবং আমরা জানিতে পারি। অবশ্যই এই সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে নানাবিধ বিরুদ্ধ-মতের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্য-দার্শনিকগণ জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য (validity and invalidity) এই উভয়কেই "স্বতঃ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। নৈয়ায়িকদিগের মত সাংখ্য-মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের প্রমাণ্য এবং অপ্রামাণ্য, সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব, এই উভয়কেই "পরতঃ" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ বলেন, জ্ঞানের অপ্রামাণ্যই স্বতঃ এবং স্বাভাবিক; জ্ঞানের

জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনেরই সমস্যা, ইউরোপীয় দর্শনের নহে

প্রামাণ্য "পরতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানের যাহা সামগ্রী বা উপাদান তাহা ভিন্ন অপর কোনও কারণবলে জন্ম লাভ করে। মীমাংসক এবং বৈদান্তিক আচার্য্য-গণের অভিমত এই যে, জ্ঞান স্বতঃই প্রমাণ; জ্ঞানের অপ্রামাণ্য বা মিথ্যাত্ব পরতঃ, জ্ঞানের উপাদান ছাড়া অন্য কোনও হেতুমূলে চক্ষুর দোষ প্রভৃতি বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।[১] জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সম্পর্কে উপরে যে সকল বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা গেল, সেই সেই দর্শনোক্ত যুক্তির মর্ম্ম কি তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সাংখ্যোক্ত স্বতঃ প্রামাণ্য ও স্বতঃ অপ্রামাণ্য-বাদ

প্রথমতঃ সাংখ্যোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে সাংখ্যকারের বক্তব্য কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। সাংখ্য-দর্শন সৎকার্য্যবাদী। সকল কার্য্যই সাংখ্য-দর্শনের মতে সৎ বা সত্য। ঘট প্রমুখ বস্তুরাজি উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাদের উপাদান মাটি প্রভৃতির মধ্যে স্থুলদর্শীর অলক্ষিতে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে; ধ্বংসের পরেও বস্তু সকল স্ব স্ব কারণেই সূক্ষ্মরূপেই অবস্থান করে। সাংখ্য-মতে কোন বস্তুরই একেবারে বিনাশ হয় না; কোন অভিনব বস্তুরও উৎপত্তি হয় না। মৃৎশিল্পীর কলা-কুশলতায় ঘটের উপাদান মাটিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ঘট স্থুল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেমাত্র। এই স্থূলরূপে অভিব্যক্তির নামই উৎপত্তি; নতুবা যাহা সর্ব্বদাই সৎ বা সত্য তাহাতো আছেই, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? সত্য বস্তুর যেমন উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না, সেইরূপ তাহার বিনাশও কল্পনা করা যায় না। বিনশ্বর বস্তু কখনও সত্য হইতে পারে না, উহা সব সময়ই অসত্য। বিনাশ-শব্দে সাংখ্য-দার্শনিক স্ব স্ব উপাদানে বস্তুর তিরোভাব বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি বুঝিয়া থাকেন। উপাদানে বিলীন বস্তুর স্থুলরূপে আবির্ভাবই উৎপত্তি, সূক্ষ্মরূপে কারণে তিরোধানই বস্তুর বিলয়। সত্য বস্তুর যেমন বিনাশ হইতে পারে না, অসত্য বা অসদ্‌বস্তুরও

১। প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ।
নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ॥
প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং বেদবাদিনঃ।
প্রমাণত্বং স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাম্॥

সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, পুণা সং;

সেইরূপ উৎপত্তি হয় না। যাহা সৎ তাহা যেমন চিরকালই সৎ, সেইরূপ যাহা অসৎ তাহাও চিরকালই অসৎ। অসৎ কোনকালেই সৎ হয়ও নাই, হইবেও না। "Ex nihilo nihil fit" 'নাসদুৎপদ্যতে নচ সদ্ বিনশ্যতি,' ইহাই সাংখ্যোক্ত বস্তুবাদের মূল মন্ত্র। এই দৃষ্টিতে বস্তু-তত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যেখানেই উৎপন্ন জ্ঞানকে সত্য এবং স্বাভাবিক বলিয়া বুঝা যাইবে, সেক্ষেত্রেই সত্য-জ্ঞানের যাহা সাধন তাহার মধ্যেই জ্ঞানের ন্যায় তাহার সত্যতা বা প্রামাণ্যের বীজও যে নিহিত আছে, তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে হইবে; নতুবা সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যের মতে কোনরূপেই জ্ঞানের এবং তাহার প্রামাণ্যের স্ফুরণ হইতে পারে না। এইরূপে জ্ঞানকে যে-ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া বুঝা যায়, সেখানেও মিথ্যা-জ্ঞানের উপাদানের মধ্যেই যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের বীজ নিহিত আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এইজন্যই সাংখ্যকার জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, এই উভয়কেই "স্বতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানসামগ্রী-জন্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জ্ঞানসামগ্রীগ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বম্। সাংখ্যকারের ঐরূপ সিদ্ধান্তের মূলে সাংখ্যোক্ত "সৎকার্য্যবাদ"ই সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। কার্য্যমাত্রেরই সত্যতা মানিয়া লইলে, সাংখ্য-সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কোন মনীষীই অস্বীকার করিতে পারেন না।

জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য সম্পর্কে ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনের সিদ্ধান্ত আলোচিত সাংখ্য-মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকার জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য, এই উভয়কে "স্বতঃ" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ন্যায়-বৈশেষিক উভয়কেই "পরতঃ" বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের ব্যাখ্যায় সাংখ্যের বক্তব্য কি তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদই জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রভৃতির বিচারেও সাংখ্য-মতকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? ন্যায় ও বৈশেষিক সাংখ্যোক্ত "সৎকার্য্য-বাদ" খণ্ডন করিয়া অসৎকার্য্য-বাদ সমর্থন করিয়াছেন। উৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহাদের উপাদানের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে কার্য্য সকল অবস্থিত থাকে। কর্ত্তার ক্রিয়ার দ্বারা অভিনব কার্য্য জন্মে না; অব্যক্ত কার্য্য ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেমাত্র। এইরূপ সাংখ্য-সিদ্ধান্তের

জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে ন্যায় ও বৈশেষিক-মত

ন্যায়-বৈশেষিকের মতে কোনই মূল্যই অস্বীকার করা চলে না। এখানে মাটিতে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, তবে সে- মিথ্যা এই উভয় প্রকার এবং দণ্ড, চাকা, জল, সূতা প্রভৃতি ঘটের বিভিন্ন'র সর্ব্ববিধ সামগ্রী বা সামগ্রীর) ঘটের উৎপত্তি-সাধনে যে ভিন্ন ভিন্ন উপযো. সত্য, অপর যায়, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া দাঁড়ায় না কি? এইরূপ অ। সত্যতা উত্তরে সাংখ্যকার বলেন, উপাদানে সূক্ষ্ম, অব্যক্তরূপে অবস্থিত ঘটেরব স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে যে অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্তি সম্পাদন করে বলিয়াই, ঘটের বিভিন্ন কারণগুলির ব্যাপার বা স্ব স্ব ক্রিয়া (function) যে অর্থহীন নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। মাটি হইতেই ঘট হয়, অন্য কিছু হইতে হয় না; তিল হইতেই তেল হয়, বালু হইতে তেল জন্মে না; দুধ হইতেই দধি, মাখম, ঘৃত প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, জল হইতে হয় না। ইহা হইতে ঘট, তেল, দধি প্রভৃতির উপাদান কারণে ঐ সকল বস্তু সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সিদ্ধান্তই (সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদই) সমর্থিত হয় না কি? ইহার উত্তরে অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন, তিল হইতেই তেল হয়; দুধ হইতেই দধি হয়; মাটি হইতেই ঘট হয়, অন্য কিছু হইতেই হয় না, ইহা অবশ্য সত্য কথা। ইহা দ্বারা সাংখ্যোক্ত যে সৎকার্য্যবাদ অর্থাৎ কার্য্যসকল উৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহাদের কারণে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে, এমন কথা বলা চলে না। ইহা হইতে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, যেই বস্তুর যাহা উপাদান-কারণ, সেই উপাদান-কারণেই কেবল সেই বস্তু উৎপাদনের শক্তি বা সামর্থ্য রহিয়াছে। এই কার্য্যোৎপাদন-শক্তিকেই দার্শনিক পরিভাষায় উপাদান-কারণের স্বরূপ-যোগ্যতা বা কার্য্যোৎপাদন-যোগ্যতা বলা হইয়া থাকে। উপাদান-কারণে কার্য্য উৎপাদনের এই যোগ্যতাই থাকে; কার্য্য থাকে না, থাকিতে পারে না। কেননা, কার্য্য ঘট প্রভৃতি তাহাদের স্থূলরূপে, জল আহরণ করিবার উপযোগিতা প্রভৃতি লইয়া যখন আমাদের কাছে দেখা দেয়, তখন আমরা তাহাকে ঘট আখ্যা দান করি। সেই ঘটই যখন মুগুড়ের আঘাতে গুঁড়া হইয়া যায়, তখন তাহার স্থূলরূপ থাকে না। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ঐ অবস্থায় আর উহাকে ঘট বলেন না। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে শুধু মাটি থাকে, ধ্বংসের পরেও ঘট মাটিতেই মিলাইয়া

সেইরূপ উৎপত্তি হয় না। যা...ট আখ্যা দেওয়া চলে না। ঘট জল-
সেইরূপ যাহা অসৎ তাহা...ই ঘট বটে। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের
হয়ও নাই, হইবেও থাকে না; উহা তখন সদ্বস্তু নহে, অসদ্বস্তু।
সদ্ বিনশ্যতি. ...ঘটের উৎপত্তি হয় তাহা মৃৎশিল্পীর শিল্পকুশলতারই অবদান।
বিচার মৃৎশিল্পী মাটি, দণ্ড, চাকা, জল, সূতা প্রভৃতি ঘটের উৎপাদক
উপকরণ বা সামগ্রীর সাহায্যে অভিনব ঘট উৎপাদন করিয়া থাকেন।
এই ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে আর সৎ নহে, উহা তখন অসৎ। শিল্পীর
কুশলতায় অসৎ ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং ঘট জলাহরণ-যোগ্য
অভিনব ঘটরূপ প্রাপ্ত হয়। ঐ অভিনবরূপে উৎপন্ন বস্তুগুলি আমাদের
জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে এবং জ্ঞানকে রূপায়িত করে।

জ্ঞানের পরতঃ-প্রামাণ্যবাদের সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিকের বক্তব্য

জ্ঞানের 'পরতঃপ্রামাণ্যবাদের' সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিকের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের যাহা উপাদান বা সামগ্রী (constituents of knowledge) কেবল তাহা হইতেই সত্য এবং মিথ্যা-জ্ঞান, এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উৎপন্নও হয় না, জানাও যায় না। 'পরতঃ' (something other than the constituents of knowledge) অর্থাৎ জ্ঞানের যাহা উপাদান তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণমূলে জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উৎপন্ন হয় এবং জানা যায়। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রী হইতেই জন্ম লাভ করে, এমন সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে অর্থাৎ আলোচ্য 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ' গ্রহণ করিলে, জ্ঞানের সত্য-মিথ্যার আর কোন প্রভেদ থাকে না। অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানও প্রমা বা সত্য-জ্ঞানই হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, যেখানে অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের উদয় হইবে, সেখানেও জ্ঞানের সর্ব্ববিধ সামগ্রী বা উপাদান যে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভ্রম-জ্ঞানও তো এক প্রকার জ্ঞানই বটে। জ্ঞান দুই প্রকার—সত্য-জ্ঞান এবং মিথ্যা-জ্ঞান। সত্য-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেমন জ্ঞানের সর্ব্ববিধ সামগ্রী বা উপাদান বর্ত্তমান আছে, মিথ্যা-জ্ঞানের স্থলেও সেইরূপ জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার সাধন বা সামগ্রীই বিদ্যমান আছে। এই অবস্থায় জ্ঞানের যাহা উপাদান বা সামগ্রী তাহাই যদি জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও সাধন হয়, তবে মিথ্যা-জ্ঞানস্থলেও যে প্রামাণ্যের

আপত্তি আসে, তাহা তো কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। এখানে আরও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, সত্য ও মিথ্যা এই উভয় প্রকার জ্ঞানই যখন জ্ঞান, এবং উভয় ক্ষেত্রেই যখন জ্ঞানের সর্ব্ববিধ সামগ্রী বা উপাদান বিদ্যমান, এই অবস্থায় এক শ্রেণীর জ্ঞানকে সত্য, অপর জাতীয় জ্ঞানকে মিথ্যা বলা হয় কি হিসাবে?[১] জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের, প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের মাপকাঠি কি? ইহার উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, মিথ্যা-জ্ঞানের স্থলে জ্ঞানের কারণগুলি সকলই বর্ত্তমান আছে, ইহা সত্য কথা, নতুবা মিথ্যা-জ্ঞান জ্ঞান-পদবাচ্যই হইতে পারিত না। কিন্তু দেখা যায় যে, কেবল জ্ঞানের কারণগুলি থাকিলেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জন্মে না। চক্ষু প্রভৃতি প্রত্যক্ষের কারণবর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথায় কিছু দোষ (defects) লুক্কায়িত থাকে, সেইজন্যই ভ্রান্তদর্শী চক্ষুর সম্মুখে পতিত ঝিনুক-খণ্ড দেখিয়াও ইহাকে ঝিনুক বলিয়া বুঝিতে পারেন না, রূপার খণ্ড বলিয়া মনে করেন। চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃই যে ভ্রমের উদয় হয়, ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষের চক্ষু প্রভৃতি কারণগুলির কোথায়ও যদি কোনরূপ দোষ (defects) না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সত্য-জ্ঞানেরই উদয় হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমা বা সত্য-জ্ঞান যে জ্ঞানের যাহা হেতু তাহা হইতে অতিরিক্ত, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের উপাদানের 'দোষশূন্যতা' প্রভৃতি কারণমূলে উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।[২] কারণের এইরূপ দোষ-মুক্তিকে ন্যায়-

ন্যায়-মতে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি "পরতঃ" হইয়া থাকে

১ (ক) উৎপদ্যতেঽপি প্রমা পরতঃ নতু স্বতঃ জ্ঞানসামগ্রীমাত্রাৎ তজ্জন্যত্বেন অপ্রমাপি প্রমা স্যাৎ অন্যথা জ্ঞানমপি সা ন স্যাৎ।

তত্ত্বচিন্তামণি, ২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি (B. I.) সং;

(খ) যদি চ তাবন্মাত্রাধীনা (জ্ঞানসামান্যসামগ্রীমাত্রাধীনা) ভবেদ্ অপ্রমাঽপি প্রমৈব ভবেৎ। অস্তিচ তত্র জ্ঞানহেতুঃ। অন্যথা জ্ঞানমপি সা ন স্যাৎ।

উদয়ন-কৃত কুসুমাঞ্জলি, দ্বিতীয় স্তবক, ১ম পৃষ্ঠা, বেনারস সং;

(গ) প্রমায়া জ্ঞানসামান্যসামগ্রীজন্যতামাত্রাশ্রয়ত্বে জ্ঞানসামান্যসামগ্রীজন্যত্বেন অপ্রমাপি প্রমৈব স্যাদিত্যর্থঃ।

তত্ত্বচিন্তামণির মাথুরী, ২২৮ পৃষ্ঠা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি (B. I.) সং;

২। প্রমা জ্ঞানহেত্বতিরিক্তহেত্বধীনা, কার্যত্বে সতি তদ্বিশেষত্বাৎ। অপ্রমাবৎ।

উদয়ন-কৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক, ১ম পৃষ্ঠা;

তত্ত্বচিন্তামণি, প্রামাণ্যবাদ, ২৮৬ পৃষ্ঠা, (B. I.) সং;

বৈশেষিক আচার্য্যগণ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্যের উৎপাদক কারণের "গুণ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে প্রমা ও অপ্রমার, এবং তাহাদের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের উৎপত্তিতে উল্লিখিত "গুণ" এবং "দোষ", জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রীর সহকারী হইয়া কোন্ জাতীয় জ্ঞানটি প্রমা, কোন্ জাতীয় জ্ঞান অপ্রমা, তাহা জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেয়। দোষ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী ভ্রম-জ্ঞানের, এবং গুণ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী প্রমা বা সত্য জ্ঞানের জনক এবং বোধক হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকের সিদ্ধান্তে জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য, এই দুইই যে "পরতঃ" অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রী হইতে অতিরিক্ত, উপাদানের গুণ এবং দোষবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ।* তস্মাৎ প্রমাঽপ্রমযোর্বৈচিত্র্যাদ্‌গুণদোষজন্যত্বম্। তত্ত্বচিন্তামণি, ২৪৯ পৃষ্ঠা; সত্য ও মিথ্যা, এই উভয় প্রকার জ্ঞানই ন্যায়-বৈশেষিকের মতে ইন্দ্রিয়-জন্য। ফলে, সত্য এবং মিথ্যা জ্ঞানে, প্রমা এবং অপ্রমায় যে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য আছে, তাহার কারণও যথাক্রমে ইন্দ্রিয়ের গুণ এবং দোষই বটে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোনরূপ দোষ (defects) না থাকিলে, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ সেক্ষেত্রে প্রমা বা সত্যই হইয়া থাকে। চক্ষু কামলা-রোগদুষ্ট হইলে, শাদা শঙ্খকে হলুদ বর্ণের দেখায়। এই জ্ঞান সত্য নহে, মিথ্যা; প্রমা নহে, অপ্রমা। এই অপ্রমার মূলে আছে দ্রষ্টার চক্ষুর কামলা-রোগ। ঐ রোগ দ্রষ্টার চক্ষুকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই সে শাদাকে শাদা দেখে নাই, হলুদ বর্ণের দেখিয়াছে। অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই কোন-

---

* Cp. Russell ; Principles of Mathematics, p. 38

The question is how does a proposition differ by being actually true from what it would be as an entity if it were not true. It is plain that true and false propositions alike are entities of a kind but the true propositions have a quality not belonging to false ones—a quality which may be called being asserted.

Cp. Joachin : Nature of Truth, p. 38

For a true proposition, we may say, involves an element which is not contained in a false proposition ; and it is this additional element which constitues its truth. The element in question attaches to the proposition itself. We may adopt Mr. Russell's Termenology, and call this element 'assertion.'

না-কোনরূপ ইন্দ্রিয়-দোষ থাকিবেই থাকিবে। জ্ঞানের যাহা সামগ্রী তাহা হইতে অতিরিক্ত আলোচ্য ইন্দ্রিয়-দোষই অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ। প্রমা এবং অপ্রমা, এই দুইই জ্ঞান হইলেও, ইহারা যে এক জাতীয় জ্ঞান নহে, দুই শ্রেণীর জ্ঞান তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দুই জাতীয় জ্ঞান হইলে, এই দুই জাতীয় জ্ঞানের কারণ ও যে দুই জাতীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভিন্ন জাতীয় কারণ-ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় কার্য্য জন্মে না। কারণের বিজাতীয়তাই কার্য্য-বৈজাত্যের মূল। এক জাতীয় কারণ হইতে যে প্রমা এবং অপ্রমা, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, এই দুই জাতীয় কার্য্য জন্মিতে পারে না, ইহা সত্য কথা। প্রমা এবং অপ্রমা এই দুইই জ্ঞান হইলেও, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে জ্ঞানত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম থাকিলেও তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ঘট এবং কাপড় প্রভৃতি সকলই দ্রব্য বটে। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও, ঘটের উপাদান এবং কাপড়ের উপাদান বিভিন্ন বলিয়া, ঘট এবং কাপড় যে দুই জাতীয় দ্রব্য তাহা অস্বীকার করা যায় কি? এইরূপ প্রমা এবং অপ্রমা, সত্য ও মিথ্যা-জ্ঞান, ইহারা দুইই জ্ঞান হইলেও, প্রমা এবং অপ্রমার, সত্য ও মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ বিভিন্ন বিধায়, ইহারা যে দুই জাতীয় জ্ঞান হইবে, ইহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন।[১] ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের ফলের বিভিন্নতা (ফল-বৈজাত্য) লক্ষ্য করিয়াই, ইহাদের কারণ যে এক জাতীয় হইতে পারে না, ভিন্ন জাতীয় হইতে বাধ্য, তাহা (কারণ-বৈজাত্য) অনুমান করিয়াছেন;[২] এবং ইহাদের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের ব্যাখ্যায় কারণের গুণ ও দোষের আশ্রয় লইয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর

১। যৎকার্যং যৎকার্যবিজাতীয়ং তৎ তৎকারণবিজাতীয়কারণজন্যম্, যথা ঘটবিজাতীয়ঃ পটঃ। অন্যথা কার্যবৈজাত্যাকস্মিকত্বাপত্তেঃ।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলির বর্দ্ধমান-কৃত টীকা, ২য় স্তবক, ৩ পৃষ্ঠা;

তত্ত্বচিন্তামণি, ৩০৮ পৃষ্ঠা, (B. I.) সং;

২। এবমনিত্যপ্রমাত্বমনিত্যজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নকার্যত্বপ্রতিযোগিক কারণতাভিন্ন কারণতাপ্রতিযোগিককার্যতাবচ্ছেদকম্। অনিত্যজ্ঞানত্বব্যাপ্যকার্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মত্বাৎ-অপ্রমাত্ববদিত্যনিত্যপ্রমায়ামপ্রমাসাধারণহেতুব্যাবৃত্তানুগতহেতুসিদ্ধিঃ।

বর্দ্ধমান-প্রকাশ, ২য় স্তবক ৪ পৃষ্ঠা; তত্ত্বচিন্তামণি, ৩১১-৩১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;

জ্ঞান এবং তাহাদের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য যে 'স্বতঃ' অর্থাৎ কেবল জ্ঞান-সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হয় না, 'পরতঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রীর অতিরিক্ত, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার গুণ এবং দোষমূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন।*

ন্যায়-মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের জ্ঞানও হয় 'পরতঃ'

প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং মিথ্যা-জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি যে ন্যায়-বৈশেষিকের মতে 'স্বতঃ' (অর্থাৎ কেবল জ্ঞান-সামগ্রী জন্য) নহে, 'পরতঃ' তাহা দেখা গেল। জ্ঞানের ঐ প্রকার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, যাহার ফলে সত্য-জ্ঞানটিকে সত্য, মিথ্যা-জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহাও এই মতে 'স্বতঃ' নহে, 'পরতঃ'ই বটে। জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রী হইতেই জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব, প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জানা যায় না। জ্ঞানের সামগ্রীর অতিরিক্ত, অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেই জ্ঞান সত্য, না মিথ্যা, তাহা আমরা জানিতে পারি। ন্যায়-বৈশেষিকের সিদ্ধান্তে জ্ঞান মানস-প্রত্যক্ষ-বেদ্য। মানস-প্রত্যক্ষের যাহা সামগ্রী বা উপাদান তাহাই জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী বটে। মানস-প্রত্যক্ষের বলে জ্ঞানকে জানা গেলেও, ঐ জ্ঞান প্রমা কি অপ্রমা, সত্য কি মিথ্যা, তাহা মানস-প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানিবার উপায় নাই। দেখার পর দৃশ্য বস্তুকে গ্রহণ করিবার যে প্রবৃত্তি দর্শকের মনে উদিত হয়, সেই প্রবৃত্তি বা চেষ্টার সফলতা কিংবা বিফলতা দেখিয়া, অনুমান-বলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য নিশ্চিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী (মানস-প্রত্যক্ষের সামগ্রী) এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের গ্রাহক সামগ্রী (অনুমান-সামগ্রী) বিভিন্ন বিধায়, জ্ঞানের প্রামাণ্যের কিংবা অপ্রামাণ্যের বোধ যে 'পরতঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রাহক মানস-প্রত্যক্ষ সামগ্রীর অতিরিক্ত, অনুমান-সামগ্রীবলে উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। জ্ঞানের স্বতঃ

*প্রত্যক্ষ প্রভৃতির কারণের বিভিন্ন প্রকার গুণ ও দোষের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য অন্নম্ভট্টের তর্কসংগ্রহের উপর নীলকণ্ঠের দীপিকা নামে যে টীকা আছে ঐ টীকার ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণের প্রধান আপত্তি এই যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য যদি 'স্বতঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রীর সাহায্যেই উৎপন্ন হয় এবং জানা যায়, তবে আমার এই জ্ঞানটি প্রমা বা যথার্থ কিনা, এইরূপে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কোনও বস্তুর প্রাথমিক জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে যে সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায় তাহা সম্ভবপর হয় কিরূপে? জ্ঞানের সামগ্রী হইতে যেমন জ্ঞানোদয় হইবে, সেইরূপ জ্ঞানটি যে সত্য, মিথ্যা নহে, তাহাও 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীর' সিদ্ধান্তে জ্ঞানের সামগ্রী-বলেই নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ জ্ঞান যে সত্য, সেই বোধও উৎপন্ন হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানকে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলিয়া মানিয়া লইলে, (ইদং জ্ঞানং প্রমা নবা) এই জ্ঞানটি সত্য কিনা, এইরূপে মনীষীমাত্রেরই স্ব স্ব জ্ঞান-সম্পর্কে স্থলবিশেষে যে সন্দেহের উদয় হয়, তাহা কোনমতেই উপপাদন করা যায় না। এইজন্যই নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের 'স্বতঃ প্রামাণ্য' সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই। জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমানের সাহায্যে জানা যায় বলিয়া, জ্ঞানের 'পরতঃ প্রামাণ্যই' সমর্থন করিয়াছেন।[১] মীমাংসকগণ যেমন জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, নৈয়ায়িকগণ তাহা করেন না। তাঁহারা জ্ঞানকে স্বপ্রকাশও বলেন না; স্বতঃ প্রমাণ বলিয়াও স্বীকার করেন না। জ্ঞান ন্যায়-বৈশেষিকের মতে 'পর-প্রকাশ' এবং 'পরতঃ-প্রমাণ'। আমার চক্ষুর সম্মুখে একখণ্ড রূপা

১। (ক) প্রামাণ্যং ন স্বতো গ্রাহ্যং সংশয়ানুপপত্তিতঃ।

ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৬ শ্লোক;

(খ) প্রামাণ্যস্য স্বতো গ্রহে অনভ্যাসদশোৎপন্নজ্ঞানে তৎসংশয়ো নস্যাৎ জ্ঞানগ্রহে প্রামাণ্যস্যাপি নিশ্চয়াৎ, অনিশ্চয়ে বা ন স্বতঃ প্রামাণ্যগ্রহঃ।

তত্ত্বচিন্তামণি, (B.I.) ১৮৪ পৃষ্ঠা;

(গ) প্রামাণ্যং পরতো জ্ঞায়তে অনভ্যাসদশায়াং সাংশয়িকত্বাৎ। অপ্রামাণ্যবৎ। যদিচ স্বতো জ্ঞায়েত, কদাচিদপি প্রামাণ্যসংশয়ো নস্যাৎ।

উদয়ন-কৃত কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক, ৭ পৃষ্ঠা;

(ঘ) অনভ্যাসদশোৎপন্নজ্ঞানপ্রামাণ্যং ন স্বাশ্রয়গ্রাহ্যং তদন্যগ্রাহ্যং বা। স্বাশ্রয়ে সত্যপি তদুত্তরতৃতীয় ক্ষণবৃত্তিসংশয়বিষয়ত্বাৎ...অপ্রামাণ্যবৎ।

কুসুমাঞ্জলির বর্দ্ধমান-কৃত প্রকাশটীকা, ২য় স্তবক, ৯ পৃষ্ঠা; তত্ত্বচিন্তামণি, ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা;

পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, 'ইদং রজতম্' ইহা এক টুকরা রূপা, এইরূপে ঐ রূপার টুকরা সম্পর্কে আমার জ্ঞানোদয় হইল। এইরূপ জ্ঞানকে ন্যায়ের পরিভাষায় "ব্যবসায়-জ্ঞান" বলে। এইরূপ (ব্যবসায়) জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞেয় রূপার খণ্ডটুকু, আমার নিকট প্রতিভাত হইল। রূপার খণ্ডটি দেখামাত্র প্রত্যক্ষতঃ আমার যে জ্ঞান জন্মিল, সেই জ্ঞানের আলোক-সম্পাতেই যদিও জ্ঞেয়-রজত আমার নিকট প্রতিভাত হইল, তবুও সেই জ্ঞানের আলোক সেই সময় আমার চোখে ফুটিল না। জ্ঞান অপ্রকাশিত থাকিয়াই জ্ঞেয় বিষয়টিকে প্রকাশ করিল। তারপর, 'ইদং রজতম্' এইরূপ ব্যবসায়-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া 'রজতজ্ঞানবান্ অহম্' এইরূপে আমার আর একটি জ্ঞান উৎপন্ন হইল। নৈয়ায়িক ঐ দ্বিতীয় জ্ঞানকে আখ্যা দিলেন "অনুব্যবসায়"। ঐরূপ অনুব্যবসায়-জ্ঞানবলেই রজতের জ্ঞানটি আমার নিকট প্রকাশ পাইল। ফলে দেখা গেল, জ্ঞান ন্যায়-মতে স্বপ্রকাশ নহে, পর-প্রকাশ (অনুব্যবসায়-প্রকাশ্য) জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকাশ দেখিয়াই জ্ঞানের প্রকাশের অনুমান করা হইয়া থাকে। ন্যায়ের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক এবং মীমাংসক পণ্ডিতগণ সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, যেই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া দৃশ্য বিষয়টি জ্ঞাতার দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই জ্ঞানটি প্রকাশিত হইবে না, অপ্রকাশিত থাকিবে, অথচ জ্ঞেয় বিষয়টিকে সে প্রকাশ করিবে, এইরূপ মতবাদ কোন মনস্বী দার্শনিকই সমর্থন করিতে পারেন না। জ্ঞানই একমাত্র আলোক; জ্ঞান ব্যতীত সমস্তই অন্ধকার। অংশুমালীর কিরণ-ধারায় স্নাত হইয়া বিশ্বের তাবদ্‌বস্তু আমাদের নয়ন-গোচর হইয়া হইয়া থাকে। সেখানে অংশুমালী অপ্রকাশিত থাকিয়া সে তাহার স্পর্শের দ্বারা নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, কোনও সুধী এইরূপ হাস্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন কি? জ্ঞান-সূর্য্যও অপ্রকাশ নহে, সদা স্বপ্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ ন্যায়-মতে দেখা যায় যে, জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকাশক 'ব্যবসায়' যেমন এক জাতীয় জ্ঞান, ঐ ব্যবসায়-জ্ঞানের প্রকাশক 'অনুব্যবসায়'ও সেইরূপ এক প্রকার জ্ঞান। জ্ঞানকে যদি পর-প্রকাশ বলিয়াই মানা যায়, তবে 'অনুব্যবসায়-জ্ঞানকে'ও স্বপ্রকাশ বলা চলে না; তাহার প্রকাশের জন্যও পুনরায় 'অনুব্যবসায়ের' সাহায্য লইতে হয়, সেই 'অনুব্যবসায়ের' প্রকাশের জন্যও আবার একটি

অনুব্যবসায় মানিতে হয়, ফলে 'অনবস্থা-দোষ'ই আসিয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই বৈদান্তিক এবং মীমাংসক বলেন, জ্ঞানকে স্বপ্রকাশই বলিতে হইবে, পর-প্রকাশ বলা চলিবে না। এই জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণও বটে। নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের স্বীকৃত পরতঃপ্রামাণ্যের সমর্থনে বলেন যে, সম্মুখস্থ রূপার টুক্‌রা দেখিয়া 'ইহা এক টুক্‌রা রূপা', 'ইদং রজতম্', এইরূপে যেমন জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্‌চকে ঝিনুকের টুক্‌রা দেখিয়াও, 'ইহা এক টুক্‌রা রূপা', সময় সময় এইরূপ ভুল সকলেই করিয়া থাকেন। দুই ক্ষেত্রেই 'ইদং রজতম্' এইরূপেই জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রথম জ্ঞানটি সত্য, আর দ্বিতীয় জ্ঞানটি মিথ্যা ইহা বুঝিবার উপায় কি? নৈয়ায়িক বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিবার একমাত্র উপায় এই যে, তুমি ঐ রূপার টুক্‌রা দেখার পরে, রূপার খণ্ড আমার বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে এইরূপ মনে করিয়া, রূপার টুক্‌রাটিকে যদি হাতের মুঠার মধ্যে লইতে চেষ্টা কর এবং বস্তুতঃ তুমি হাত বাড়াইয়া রূপার টুক্‌রা সেখানে পাও, তবেই তুমি বুঝিবে যে, তোমার রূপার জ্ঞানটি সত্য; আর রূপা না পাইয়া রূপার বদলে যদি ঝিনুকের টুক্‌রা পাও, তখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পার যে, তোমার দেখাটি ভুল; তোমার রূপার জ্ঞান সত্য নহে, মিথ্যা। এইরূপে জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের, প্রামাণ্যের এবং অপ্রামাণ্যের উপলব্ধিকে নৈয়ায়িক এক প্রকার (কেবল-ব্যতিরেকী) অনুমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] নৈয়ায়িকের দৃষ্টির অনুরূপ দৃষ্টি আমরা প্রাগ্‌ম্যাটিক্ (Pragmatic) বা ব্যবহারবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও দেখিতে পাই। জেম্‌স্, (James) ডিউই, (Dewey) ওয়াট্‌স্ কানিংহাম, (Watts Cunningham) জোয়াকিম্ (Joachim) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের ন্যায় জ্ঞানের প্রামাণ্যকে 'পরতঃ' (validity of knowledge dependes upon something other than the constituents of knowledge) বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিষয়ের সংবাদ (harmony) এবং জ্ঞেয় বিষয়ের ব্যাবহারিক

১। (ক) পূর্বোৎপন্নং জলাদিজ্ঞানং প্রমা সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা অপ্রমা। অন্নংভট্ট-কৃত তর্কসংগ্রহের টীকা-দীপিকা, ৩৯ পৃষ্ঠা;

(খ) ইদং জলাদিজ্ঞানমপ্রমা বিসংবাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা প্রমা। উল্লিখিত দীপিকা-টীকা, ১৮৭ পৃষ্ঠা;

(গ) তত্ত্বচিন্তামণি, ২৫৩ পৃষ্ঠা, (B. I. Series)

জীবনে কার্য্যকারিতা (pragmatic efficiency, অর্থক্রিয়াকারিত্ব) প্রভৃতি দেখিয়াই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চিত হইয়া থাকে।*

বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ তার্কিকগণ ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, জ্ঞানের যে-ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বিষয়কে পাওয়াইবার সামর্থ্য থাকিবে, সেখানেই জ্ঞানকে সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে জ্ঞেয় বিষয়ের কার্য্যকারিতা (workability and practical efficiency)

জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে বৌদ্ধ-মত

*Cp. All congnitive experiences are knowledge of, not possession of, the existent known (if it is an existent) ; their validity must be tested by other means than the intuition of the moment.

Drake : Critical Realism, p. 32

Truth happens to an idea. It becomes true, is made true by events, Its verity is in fact an event, a process : the process namely of its verifying itself, its verification. Its validity is the process of its valid action.

James : Pragmatism, p. 201,
See also James' Meaning of Truth p. 200, 222,

Prof. Dewey says, The true means the verified and means nothing else.

Professor Watts Cunningham in his "Problems of Philosophy," p. 120, in explaining the pragmatic test of truth asserts, Utitity is the criterion of truth. A Judgment is made true by being verified and apart from its verification it cannot in any intelligible sense be said to be either true or erroneous.

A Judgment is true, if the thoughts whose union is the Judgment 'correspond' to the facts whose union is the 'real' situation which is to be expressed. My judgment is true if my ideas, asserted by me in my judgment, correspond to the facts. But my ideas are 'real' and 'real' not symply in the sense that they are certain events actually happening in my psychical history. For it is not qua psychical events that my ideas correspond with the facts and in corresponding are true.

Joachim : Nature of Truth. P. 19.

দেখিয়াই জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।[১] ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধের মতে ঐরূপ ব্যাবহারিক সত্য-জ্ঞানের উৎপত্তি এবং ভাতি যে 'স্বতঃ' নহে, 'পরতঃ,' ইহা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধ-মতে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক; যাহাকে আমরা দৃশ্য বস্তু বলি তাহাও প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিকই বটে। হীনযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়[২] অবশ্য ক্ষণিক দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্ঞানবাদী জ্ঞানের বাহিরে জ্ঞেয় বিষয়ের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না মানিলেও, ক্ষণিক বিজ্ঞান অঙ্গীকার করিয়াছেন। শূন্যবাদী মহাযানিক বৌদ্ধ বলেন, জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানকে রূপায়িত করিয়া থাকে। জ্ঞেয় বিষয় মিথ্যা হইলে, জ্ঞানও সে-ক্ষেত্রে মিথ্যা হইতে বাধ্য। ফলে, সর্ব্বশূন্যতাই হয় বৌদ্ধ দর্শনের শেষ কথা। তদভাবে তদভাবাচ্ছূন্যং তর্হি। সাংখ্যদর্শন, ১।৪৩ সূত্র; মহাশূন্যতাই বৌদ্ধ দর্শনের চরম কথা হইলে, জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এই তিনকে লইয়া আমাদের যে জ্ঞানোদয় হয় এবং জীবনের যাত্রা-পথে বিবিধ প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, জ্ঞেয় বিষয়কে যে স্থির, সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, সেই বোধ যে সত্য নহে, মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ কি? আলোচ্য ব্যাবহারিক জ্ঞান বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে স্বতঃ অপ্রমাণই হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞেয় বিষয়কে পাওয়াইয়া দেয় বলিয়াই জ্ঞানকে 'পরতঃ প্রমাণ' বলা হইয়া থাকে। ধর্ম্মকীর্ত্তি, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু প্রভৃতি ধুরন্ধর বৌদ্ধ তার্কিকগণ গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য, নাম, জাতি প্রভৃতি বিশেষ ভাবের বোধক সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে মিথ্যা এবং অপ্রমাণ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন; সর্ব্ববিধ কল্পনা-পরিশূন্য নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেই সত্য এবং স্বাভাবিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু,

---

১। অর্থক্রিয়াসমর্থবস্তুপ্রদর্শকং সম্যগ্‌জ্ঞানম্। যতশ্চ অর্থসিদ্ধিস্তৎসম্যগ্ জ্ঞানম্। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু, ১ম পরিচ্ছেদ, ১-২ পৃষ্ঠা;

২। হীনযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈভাষিক বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষতঃই দৃশ্য জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ জ্ঞানের বৈচিত্র্য দেখিয়া তন্মূলে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান করিয়া থাকেন। সৌত্রান্তিক বৈভাষিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক এই চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া "হীনযান" আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী যোগাচার (বিজ্ঞানবাদী) এবং মাধ্যমিক (শূন্যবাদী) বৌদ্ধ "মহাযান" বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

১ম পৃষ্ঠা; এইরূপ বৌদ্ধোক্ত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান যে অর্থ বা জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাপ্তির সহায়ক হইবে না; এবং 'স্বতঃ অপ্রমাণ' বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বৌদ্ধ তার্কিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই বৌদ্ধ-মতে মিথ্যা-কল্পনা-প্রসূত সুতরাং মিথ্যা। ঐ সকল কল্পনার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই।[১] তাহা না থাকিলেও, ঐরূপ মিথ্যা কল্পনার চিত্রে চিত্রিত হইয়াই জ্ঞান যে তথাকথিত প্রামাণ্য লাভ করে, অর্থ-সিদ্ধির সহায়তা সম্পাদন করিয়া আমাদের চিন্তার পরিধি বর্দ্ধিত করে, তর্কের খাতিরে বৌদ্ধ তার্কিকগণ তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ফলে, বৌদ্ধ-মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য "পরতঃ" এবং অপ্রামাণ্য "স্বতঃ" এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

উল্লিখিত নৈয়ায়িক-মত এবং বৌদ্ধ-মতের সমালোচনা

পাশ্চাত্যের 'প্রাগ্‌ম্যাটিক্' মতবাদী দার্শনিকগণের ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে যা কার্য্যকারিতার সামর্থ্যের উপর (practical efficiency) দাঁড়াইয়া নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধ তার্কিকগণ জ্ঞানের প্রামাণ্য-সাধনের যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 'সংবাদের' পরীক্ষার (verification) উপরই তাঁহারা অত্যধিক জোর দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, আলোচিত 'সংবাদের' পরীক্ষা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় কি? এমন অনেক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আছে যে-সকল ক্ষেত্রে ঐ 'সংবাদের' পরীক্ষা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ অতীত এবং অনাগত বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে অনুমান জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানে অতীত, অনাগত বস্তুর 'সংবাদের' পরীক্ষা তো অসম্ভব কথা। এই অবস্থায় অতীত ও অনাগত বস্তুর অনুমান-জ্ঞানকে নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সত্য, স্বাভাবিক (valid) বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিরূপে? এই প্রসঙ্গে ইহাও অবশ্য বিবেচ্য যে, আলোচিত 'সংবাদকে' (harmonyকে) তো কোনমতেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের

১। এবমেতাঃ প্রবর্ত্তন্তে বাসনামাত্রনির্ম্মিতাঃ।
কল্পিতালীকভেদাদিপ্রপঞ্চাঃ পঞ্চকল্পনাঃ॥ ন্যায়মঞ্জরী, ৯৪ পৃষ্ঠা, কাশী সং;
সর্বে অমী বিকল্পাঃ পরমার্থতোঽর্থং ন স্পৃশন্ত্যেব বিকল্পাঃ স্বভাবত এব বস্তুসংস্পর্শকৌশলশূন্যাত্মান ইতি। ন্যায়মঞ্জরী, ২৯৭ পৃষ্ঠা, কাশী সং;

জনক বলা যায় না। 'সংবাদের' দ্বারা ঐরূপ জ্ঞানের যে প্রামাণ্য আছে, তাহা পরীক্ষিত (tested) হইয়া থাকে এইমাত্র। জ্ঞানটি যে-ক্ষেত্রে প্রমা বা যথার্থ হইবে, সে-স্থলে সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য (validity) পরীক্ষিত হউক, কিংবা নাই হউক, তাহাতে প্রামাণ্যের আসে যায় কি ? পরীক্ষা দ্বারা কেবল প্রামাণ্য আমাদের জ্ঞানে ভাসে ; জ্ঞানটি যে যথার্থ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। ফলে, জ্ঞানের সত্যতা বা প্রমাণ্য যে 'সংবাদ' (correspondence) প্রভৃতি দ্বারা উৎপাদিত হয় না, পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেমাত্র, ইহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না।* এইজন্যই ন্যায়-বৈশেষিক জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং সেই উৎপন্ন প্রামাণ্যের অবগতি (জ্ঞপ্তি) এই দুই দিক হইতেই প্রামাণ্যের পরীক্ষা করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ ন্যায়-বৈশেষিকের মতে সত্য (real) বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে ইহা সত্য নহে, মিথ্যা (unreal)। দৃশ্য বস্তুসকল মিথ্যা হইলে জীবন-যাত্রা অচল হইয়া পড়ে। এইজন্য ধর্ম্মকীর্ত্তি, বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ তার্কিকগণ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রামাণ্য ব্যখ্যা করিয়াছেন এবং ন্যায়-বৈশেষিকের ন্যায় জীবনে জ্ঞানের কার্য্যকারিতা বা অর্থক্রিয়া-কারিত্বের (workability and practical efficiency) উপরই জোর দিয়াছেন। এখন কথা এই যে, অর্থক্রিয়া-কারিত্ব অর্থাৎ ব্যাবহারিক জীবনে জ্ঞানের কার্য্যকারিতা (pragmatic utility) দেখিয়া ন্যায়-বৈশেষিক জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের যে সত্যতার পরিমাপ করিয়াছেন, তাহাও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা চলে না। কেননা, মিথ্যা, অসত্য দৃষ্টিমূলেও ব্যাবহারিক জীবনে অনেক সময় সত্য শুভ ফল লাভ করিতে দেখা যায়। সত্য সাপ দেখিয়াও মানুষ যেরূপ ভয়ে চীৎকার করে এবং দৌড়ায়, রজ্জু-সর্প দেখিয়াও মানুষকে সময় সময় সেইরূপ চীৎকার করিতে এবং দৌড়াইতে দেখা যায়। কোনও মণির উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-পুঞ্জকে মণি ভ্রম করিয়া ঐ মণি আহরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে,

* (a) Truth is what it is independently, whether any mind recognises it or not. Joachim : The Nature of Truth, P. 13.

(b) We do not create truth, but only find it : we could not find it if it were not there and in a sense independent of our finding. Ibid P. 14.

(c) Truth is discovered not invented. Ibid P. 20.

ভ্রান্তদর্শীর সেই চেষ্টা সেক্ষেত্রে অবশ্য ফলপ্রসূ হইবে; মণিটি সে পাইবে। মণির জ্ঞানকে কিন্তু এখানে সত্য (অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী) বলা চলিবে না। মণির ভাস্বর আলোককেই এখানে মণি মনে করা হইয়াছে, মণিকে মণি মনে করা হয় নাই। এই অবস্থায় এইরূপ বোধকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে অযথার্থ ই বলিতে হইবে; সত্য, স্বাভাবিক বলা চলিবে না; এবং প্রবৃত্তির সফলতা সাধন করে বলিয়াই সেই জ্ঞান যে সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তেও পৌঁছান যাইবে না।[১] 'জ্ঞানম্ অর্থাব্যভিচারি সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ,' এইরূপ অনুমানমূলে নৈয়ায়িক জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য-সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে "সমর্থ-প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ" এইরূপ হেতু যে সাধ্য-সিদ্ধির সহায়ক হইবে না, তাহা উল্লিখিত মণির দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়। ঐ হেতু যে কেবল হেত্বাভাস হইবে তাহা নহে। ঐরূপ হেতুর প্রয়োগে যে "অন্যোন্যাশ্রয়"-দোষ অবশ্যম্ভাবী হইবে, তাহাও নৈয়ায়িক অস্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, জ্ঞানটি যদি প্রমা বা সত্য হয় (অর্থের অব্যভিচারী হয়) তবেই তাহা সফল প্রবৃত্তির (সার্থক চেষ্টার) জনক হইবে; পক্ষান্তরে, সফল প্রবৃত্তির জনক হইলেই তাহার বলে পরতঃ প্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িকের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চিত হইবে। এইরূপে ন্যায়-সিদ্ধান্তে যে 'পরস্পরাশ্রয়-দোষই' কেবল দাঁড়াইবে তাহা নহে;[২] অনাবস্থা প্রভৃতি দোষও আসিয়া পড়িবে। জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য-সাধনের জন্য ন্যায়োক্ত যে অনুমান-বাক্যটির (syllogism) আমরা উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে জ্ঞানটিকে পক্ষ, (minor) জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গতি বা মিলকে (harmony with facts) সাধ্য, (major) আর সমর্থ প্রবৃত্তির, সার্থক চেষ্টার জনকত্বকে (সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ) হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। হেতু এবং সাধ্যের যথার্থ ব্যাপ্তি-বোধ থাকিলেই, ঐরূপ ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলে

১। বিবাদাধ্যাসিতং জ্ঞানমর্থাব্যভিচারি। সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেবং নাভবিষ্যন্ন সমর্থাং প্রবৃত্তিমকরিষ্যদ্ যথা প্রমাণাভাস ইতি। নৈবং, হেতো-র্বিরুদ্ধত্বাৎ। দৃশ্যতে হি মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধ্যা প্রবর্তমানস্য মণিপ্রাপ্তেঃ প্রবৃত্তিসামর্থ্যং ন চাব্যভিচারিত্বম্। 'চিৎসুখী, ২২২ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

২। প্রমাত্বে জ্ঞাতে প্রবৃত্তিকারণত্বজ্ঞানম্, তেনৈবচ প্রমাত্বজ্ঞানমিত্য-ন্যোন্যাশ্রয়ঃ। ব্যাসরাজ-কৃত তর্কতাণ্ডব, ৫২ পৃষ্ঠা;

হেতুদৃষ্টে সাধ্যের অনুমানের উদয় হইবে। ইহাই ন্যায়োক্ত অনুমানের রহস্য। এখন প্রশ্ন যে, আলোচিত জ্ঞানের প্রামাণ্য-অনুমানের হেতু ও সাধ্যের জ্ঞান এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যাপ্তি আছে, ঐ ব্যাপ্তির বোধ যে সত্য, মিথ্যা নহে, তাহা পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িক বুঝিলেন কিরূপে? হেতু ও সাধ্যের স্বরূপের জ্ঞান এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যাপ্তি, পরামর্শ প্রভৃতি আছে তাহার প্রত্যেকটি জ্ঞান নির্ভুল, নিঃসংশয় না হইলে, সে-ক্ষেত্রে ঐ প্রকার অসিদ্ধ হেতু, সাধ্য, পক্ষ প্রভৃতির দ্বারা যে কোন প্রকার অনুমানই হইতে পারে না, তাহা অনুমান-বিশেষজ্ঞ নৈয়ায়িক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই অবস্থায় উল্লিখিত অনুমানের অঙ্গ হেতু, সাধ্য প্রভৃতির স্বরূপের জ্ঞান এবং হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে 'পরতঃপ্রামাণ্যবাদীকে' আবারও অনুমানের আশ্রয় লইতে হইবে। সেই অনুমানের অঙ্গ হেতু, সাধ্য প্রভৃতির জ্ঞানের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য পুনরায় অনুমান-প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে। ফলে, প্রামাণ্যের সাধন-সম্পর্কে যে অনাবস্থার (regressus ad infinitum) সৃষ্টি হইবে, তাহা কে বারণ করিবে? তারপর, ন্যায়োক্ত অনুমানের ফলে জ্ঞানের যে প্রামাণ্য-বোধ দৃঢ় হইবে, ঐ প্রামাণ্য-বোধ যে সত্য এবং নির্ভুল তাহা পরতঃপ্রামাণ্যবাদীকে কে বলিল? আলোচ্য প্রামাণ্য-জ্ঞানের সত্যতা উৎপাদনের জন্যও জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের সংবাদের ভিত্তিতে পুনরায় অনুমান-প্রয়োগ আবশ্যক হইবে; সেই অনুমানের ফলে যে জ্ঞানোদয় হইবে তাহার প্রামাণ্য উপপাদনের জন্যও আবার অনুমানের প্রয়োজন হইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুমানের প্রয়োগ করিতে হইলে, 'অনাবস্থার' কবল হইতে পরতঃপ্রামাণ্যবাদীর নিষ্কৃতি নাই। এইজন্যই অনুমানের সাহায্যে জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য-সাধনের প্রয়াসকে ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়াই মনে হইবে নাকি?[১] পরতঃপ্রামাণ্য-বাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত 'অনাবস্থা'-

---

১। (ক) পরতস্ত্বে প্রামাণ্যজ্ঞানস্যাপি প্রামাণ্যং সংবাদাদিলিঙ্গজন্যানুমিতিরূপেণ অন্যেন জ্ঞানেন গ্রাহ্যম্ এবং তৎপ্রামাণ্যমন্যেনেতি ফলমুখ্যৈকাঽনবস্থা; এবং প্রামাণ্যস্য অনুমেয়ত্বে লিঙ্গব্যাপ্ত্যাদিজ্ঞানপ্রামাণ্যস্যানিশ্চয়ে অসিদ্ধ্যাদিপ্রসঙ্গেন তন্নিশ্চয়ার্থং লিঙ্গান্তরং তজ্জ্ঞানপ্রামাণ্যনিশ্চয়শ্চ স্বীকার্য এবং তত্র তত্রাপীতি কারণমুখ্যপ্যপীত্যনবস্থাদ্বয়াপত্তেঃ। বাসরাজ-কৃত তর্কতাণ্ডব, ৪১ পৃষ্ঠা;

(খ) যদি সর্বমেব জ্ঞানং স্ববিষয়তাবধারণে স্বয়মসমর্থং বিজ্ঞানান্তরমপেক্ষতে

দোষের (regressus ad infinitum) খণ্ডনে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন, জ্ঞানের প্রামাণ্য-পরীক্ষার জন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে 'সংবাদের' (correspondence) কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য-বোধ সর্ব্বত্রই সংবাদ-সাপেক্ষ ; জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 'সংবাদ' দেখিয়াই জ্ঞানের প্রামাণ্যের নির্ণয় করিতে হইবে। 'সংবাদ' না থাকিলে জ্ঞানটি যে সত্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইবে। 'সংবাদের' তাৎপর্য্য ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতির মতে এই যে, যে-সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে সন্দেহ আসিবার উপযুক্ত কারণ আছে, সেই সকল স্থলে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের "সংবাদ" দেখিয়াই জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। জ্ঞানের-প্রামাণ্য পরীক্ষার জন্য "সংবাদ" সকল ক্ষেত্রেই অপেক্ষিত নহে বলিয়া, পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের বিরুদ্ধে উল্লিখিত "অনবস্থা" প্রভৃতি দোষের আপত্তি করা চলে না। পরতঃপ্রামাণ্যবাদীর এইরূপ উত্তর শুনিয়া জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসক এবং বেদান্তী বলেন, ন্যায়-বৈশেষিকের মতেও তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য-উপপাদনের জন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের "সংবাদের" কোনও প্রয়োজন নাই। কেবল যে-সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রতিবন্ধক কোনও প্রকার দোষের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং তাহার ফলে জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে সন্দেহের উদয় অবশ্যম্ভাবী হয়, সেই সকল স্থলেই সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 'সংবাদের' পরীক্ষা আবশ্যক হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্য তাহা হইলে এই মতেও "স্বতঃ"ই বটে ; অপ্রামাণ্যের আশঙ্কার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা দিলে, ঐ আশঙ্কা নিরাসের জন্যই 'সংবাদের' সহায়তা-গ্রহণ প্রয়োজন।[১] আরও এক কথা এই যে, 'সংবাদ'মূলে প্রামাণ্যের পরীক্ষাই হইয়া থাকে, 'সংবাদ' তো আর প্রামাণ্যকে উৎপাদন করে না। জ্ঞানটি যথার্থ বলিয়াই সেখানে জ্ঞানও জ্ঞেয়ের 'সংবাদ' পাওয়া

তদা কারণগুণসংবাদার্থক্রিয়াজ্ঞানান্যপি স্ববিষয়ীভূতগুণাদ্যবধারণে পরমপেক্ষেরন্, অপ্রামাপি তথেতি ন কদাচিদর্থো জন্মসহস্রেণাপ্যধ্যবসীয়েতেতি প্রামাণ্যমেবোৎ-সীদেৎ। শাস্ত্রদীপিকা, ২২ পৃষ্ঠা ;

(গ) শাস্ত্রদীপিকা ৪৮ পৃষ্ঠা, এবং তত্ত্বচিন্তামণি ১৮২ পৃষ্ঠা দেখুন।

১। নচ যত্র দোষশঙ্কাদিরূপাকাঙ্ক্ষা তত্রৈব সংবাদাপেক্ষেতি নানবস্থেতি বাচ্যম্ তথাত্বে প্রতিবন্ধনিরাসার্থমেব সংবাদাপেক্ষা নতু প্রামাণ্যগ্রহার্থমিতি।

তর্কতাণ্ডব, ৪১ পৃষ্ঠা ;

যায়। 'সংবাদ' জ্ঞানের প্রামাণ্যের জনক নহে, জ্ঞানে পূর্ব্ব হইতেই যে প্রামাণ্য আছে, তাহার প্রকাশকমাত্র। ফলে, জ্ঞান যে 'স্বতঃ প্রমাণ' এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায় নাকি? জ্ঞান স্বতঃই প্রমাণ হইলে, আমার এই জ্ঞানটি প্রমা বা সত্য কিনা, এইরূপে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে সন্দেহ আসে কেন? জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের বিরুদ্ধে পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতির এইরূপ আপত্তির বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া চলে না। কেননা, স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের সমর্থক মীমাংসক এবং বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ জ্ঞানের 'স্বতঃ প্রামাণ্য' সমর্থন করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বতঃ অপ্রামাণ্য তো সমর্থন করেন না। অপ্রামাণ্য তাঁহাদের মতেও ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতির মতের ন্যায় "পরতঃ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির কারণের কোন-না-কোন প্রকার দোষবশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রামাণ্যই স্বতঃ এবং অপ্রামাণ্য পরতঃ, ইহাই মীমাংসক এবং বৈদান্তিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। সংশয়ও এক প্রকার মিথ্যা-জ্ঞানই বটে। অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের মধ্যে সংশয়ের অন্তর্ভুক্তিতে কোন বাধা নাই। চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃ যেমন এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া, ঝিনুক-খণ্ডকে রূপার খণ্ড বলিয়া লোকে ভ্রম করিয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষুর দোষেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছের গোড়া দেখিয়া, 'মানুষ, না গাছের গোড়া,' এই প্রকার সংশয় দর্শকের মনের মধ্যে জাগরূক হয়। জ্ঞানের অপ্রামাণ্যকে 'পরতঃ' বলিয়া গ্রহণ করায়, 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী' বেদান্ত ও মীমাংসার মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে উদিত সন্দেহের উপপাদন করা চলে না, এইরূপ কথা উঠে না। দোষ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী হইতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য উদিত হয় এবং জানা যায়। অপ্রামাণ্য-সম্পর্কে ন্যায়-বৈশেষিক-মতের অনুরূপ অভিমতই মীমাংসক এবং বেদান্তী পোষণ করেন; কিন্তু জ্ঞানের প্রামাণ্যকে তাঁহারা ন্যায়ের দৃষ্টিতে 'পরতঃ' বলিতে কখনই প্রস্তুত নহেন।

প্রামাণ্যের পরতঃ উৎপত্তি-সম্পর্কে ন্যায় ও বৈশেষিকের মতের সমালোচনা

অপ্রমার দৃষ্টান্তে প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের পরতঃ উৎপত্তি সমর্থন করিতে গিয়া, নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক পণ্ডিতগণ নিম্নোদ্ধৃত অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন—প্রমা জ্ঞানহেত্বতিরিক্ত-হেত্বধীনা কার্য্যত্বে সতি তদ্‌বিশেষত্বাদপ্রমাবৎ।* কুসুমা-

*True knowledge depends on some causes (*e. g.*, absence of defects, etc.) other than the common constituents of knowledge and is an effect just as false or wrong knowledge is an effect originated by causes other than the elements giving rise to cognition.

গুলি, ২য় স্তবক, ১ম পৃষ্ঠা ; ঐ অনুমান-সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রমা বা সত্য-জ্ঞান (minor বা উল্লিখিত অনুমানের যাহা পক্ষ তাহা) 'জ্ঞানের হেতুর অতিরিক্ত হেতুমূলে উৎপন্ন হয়,' (major) এই কথা দ্বারা পরতঃপ্রামাণ্যবাদী কি বুঝাইতে চাহেন ? আলোচ্য সাধ্যের (major) মধ্যে যে 'জ্ঞান' পদটি দেখা যায়, ইহাদ্বারা কি সকল প্রকার জ্ঞানেরই ইঙ্গিত করা হইতেছে না ? জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য-সাধনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অনুমানে সাধ্য (major) বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি ইহাই দাঁড়াইতেছে না যে, জ্ঞানের যাহা সাধন তদ্‌ব্যতীত অন্য কোনও সাধন-বলেই প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুমানের সাধ্যটিকে এই মর্ম্মে গ্রহণ করিলে, আলোচ্য অনুমানটির কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্ঞান জ্ঞানের যাহা সাধন তন্মূলে উৎপন্ন না হইয়া, তদ্‌ভিন্ন কারণমূলে উৎপন্ন হইবে, ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে ? উল্লিখিত সাধ্যের সহিত উক্ত অনুমানের পক্ষের, কিংবা হেতুর কোনরূপ যোগও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনুমানোক্ত হেতু (middle term) ও পক্ষের (minor) সহিত সাধ্যের (major) বিরোধই (contradiction) স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। প্রমার (পক্ষের) উৎপত্তি প্রমা-জ্ঞানের যাহা হেতু তাহারই অধীন ; তদ্‌ভিন্ন অন্য কোনরূপ হেতুর অধীন নহে। এই অবস্থায় আলোচ্য অনুমানের ('জ্ঞান-হেত্বতিরিক্ত-হেত্বধীনা' এই) সাধ্যটি পক্ষে (প্রমা-জ্ঞানে) কোনমতেই থাকিতে পারে না ; পক্ষে সাধ্যের বাধই আসিয়া পড়ে।[১] 'কার্যত্বে সতি তদ্‌বিশেষত্বাৎ' এইরূপ হেতুর প্রয়োগের দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বদা সকল বস্তু-সম্পর্কে যে নিত্য জ্ঞান আছে, সেই নিত্য ঈশ্বর-জ্ঞানকে বাদ দিয়া, ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের সংযোগ প্রভৃতির ফলে ইন্দ্রিয়লব্ধ যে অনিত্য জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকেই অবশ্য এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই ঐন্দ্রিয়ক বিজ্ঞান জ্ঞানের যাহা হেতু বা সাধন তন্মূলেই উৎপন্ন হয়, জ্ঞানের হেতুর অতিরিক্ত কোনও হেতুমূলে উৎপন্ন হয় না। ন্যায়োক্ত অনুমানের প্রয়োগে যাহাকে হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই হেতুর সহিত অনুমানোক্ত সাধ্যের (major) কোনরূপ 'ব্যাপ্তি'ও দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায়

১। প্রমায়া জ্ঞানত্বেন তদ্ধেতোর্জ্ঞানহেতুতয়া তদতিরিক্তজন্যত্বসাধনে বাধাৎ। তর্কতাণ্ডব, ৬২ পৃষ্ঠা ;

অনুমানের হেতুটি প্রকৃত হেতু না হইয়া হেত্বাভাসই হইয়া দাঁড়াইবে নাকি? প্রদর্শিত অনুমানে অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অপ্রমাও ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতির মতে এক জাতীয় জ্ঞানই বটে। এই শ্রেণীর জ্ঞানের উৎপত্তিও মিথ্যা-জ্ঞানের যাহা হেতু তাহারই অধীন, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও হেতুর অধীন নহে। ফলে, উল্লিখিত দৃষ্টান্তে সাধ্যের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[১] (The major will be inconsistent with the example) তারপর, সাধ্যের অন্তর্গত জ্ঞান-শব্দের দ্বারা যদি জ্ঞানমাত্রকেই ধরা যায় (যাহা না ধরিবার কোনও কারণ নাই) তবে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার বস্তু-সম্পর্কে জগৎপিতা পরমেশ্বরের যে নিত্য সত্য-জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানকেও সাধ্যস্থ জ্ঞান-শব্দে বুঝা যায়। পরমেশ্বরের জ্ঞান সত্য তো বটেই, নিত্য বিধায় তাহা কোনরূপ হেতুরও অধীন নহে। সেইরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমানের সাধ্যই অপ্রসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে নাকি?[২] সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি দোষ অনিবার্য্য হয় বলিয়া যদি সাধ্যস্থ জ্ঞান-শব্দে নিত্য সত্য ঈশ্বর-জ্ঞানকে না ধরিয়া, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণমূলে উৎপন্ন বিশেষ জ্ঞানকে গ্রহণ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রেও আলোচ্য অনুমানটি যে "সিদ্ধসাধন-দোষে" দূষিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে অনুমান-জ্ঞানের কিংবা অপরাপর সর্ব্ব-প্রকার বিশেষ জ্ঞানের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত দ্রষ্টব্য বিষয়ের সংযোগ প্রভৃতির অধীন, অনুমান যে অনুমানভিন্ন প্রত্যক্ষ, আগম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিশেষ জ্ঞানের হেতুর অতিরিক্ত ব্যাপ্তি-জ্ঞান, পরামর্শ প্রভৃতির অধীন, তাহা তো কোন সুধী দার্শনিকই অস্বীকার করিতে পারেন না। আলোচ্য অনুমান তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যাহা সিদ্ধ তাহাই সাধন করে, নূতন

১। গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি, ২০১ পৃষ্ঠা ;
ব্যাসরাজের তর্কতাণ্ডব, ৬২ পৃষ্ঠা ;

২। জ্ঞানত্বস্তেশ্বরজ্ঞানবৃত্তিত্বেন করণাপ্রয়োজ্যতয়া তৎপ্রয়োজক সামগ্র্যপ্রসিদ্ধ্যা সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ।

তর্কতাণ্ডবের রাঘবেন্দ্র-কৃত *টিপ্পণ*, ৬২ *পৃষ্ঠা* ; এবং তত্ত্বচিন্তামণি, ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ;

কোন তথ্য উপপাদন করে না।[১] উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য-সাধনের উদ্দেশ্যে যেই অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন।[২] সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে সেই অনুমানে বিরোধ, সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, সিদ্ধ-সাধনতা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দোষ আসিয়া পড়ে বলিয়া, উল্লিখিত অনুমান যে ন্যায়োক্ত পরতঃপ্রামাণ্য-সাধনের পক্ষে অচল, তাহা মনীষীমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞান যে, জ্ঞানের যাহা হেতু, সেই হেতুর অতিরিক্ত চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার দোষবশে উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য যে পরতঃ, অর্থাৎ জ্ঞানের সামগ্রীর অতিরিক্ত বিবিধ ইন্দ্রিয়-দোষ-মূলে উদিত হয়, তাহা মীমাংসক, বৈদান্তিক আচার্য্যগণও অবশ্য অস্বীকার করেন না। জ্ঞানের যাহা সাধন (সামগ্রী) তদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-দোষ প্রভৃতি-মূলে অপ্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, প্রমা বা সত্য-জ্ঞানকেও যে জ্ঞানের উপাদানের (জ্ঞান-সামগ্রীর) অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বিবিধ প্রকার 'গুণ'মূলে উৎপন্ন হইতে হইবে; কেবল জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান হইতে সত্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে না, এইরূপ যুক্তির জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদীর মতে কোনই মূল্য নাই। সত্য এবং মিথ্যা-জ্ঞান, এই উভয়ই জ্ঞান হইলেও (উভয়ের মধ্যে জ্ঞানত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও) ইহারা একজাতীয় জ্ঞান নহে, দুই জাতীয় বা বিজাতীয় জ্ঞান। জ্ঞানদ্বয় পরস্পর বিজাতীয় হইলে, ইহাদের কারণও যে বিজাতীয় হইবে, এক জাতীয় হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণের বৈজাত্যই কার্য্য-বৈজাত্যের মূল। কার্য্যদ্বয় পরস্পর ভিন্ন-জাতীয় হইলে, তাহাদের কারণও যে ভিন্ন-জাতীয় হইবে, তাহা কে না জানে? ঘট এবং কাপড় ইহারা উভয়েই দ্রব্য হইলেও, ইহারা দুই জাতীয় দ্রব্য। ঘটের উপাদান মাটি, কাপড়ের উপাদান সূতা। মাটি ও সূতা এক জাতীয় নহে, বিজাতীয়; ঐ বিজাতীয় উপাদানে প্রস্তুত ঘট এবং কাপড়ও এক জাতীয় দ্রব্য নহে, বিজাতীয় দ্রব্য। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ

১। যৎকিঞ্চিজ্জ্ঞানহেত্বপেক্ষয়া সর্বতদ্ধেত্বপেক্ষয়া বা অতিরিক্তত্বে ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সিদ্ধসাধনত্বাৎ। তত্ত্বচিন্তামণি, ২৯৩ পৃষ্ঠা; তর্কতাণ্ডব, ৬৩ পৃষ্ঠা;

২। প্রমা জ্ঞানহেত্বতিরিক্তহেত্বধীনা কার্যত্বে সতি তদ্‌বিশেষত্বাদপ্রমাবৎ। কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক, ১ম পৃষ্ঠা;

করিয়া নৈয়ায়িকগণ সত্য ও মিথ্যা-জ্ঞানকে (ঘট এবং কাপড় প্রভৃতির ন্যায়) বিজাতীয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া, তাহাদের কারণের বৈজাত্যের যে অনুমান করিয়াছেন, সেখানে জিজ্ঞাস্য এই, সত্য এবং মিথ্যা-জ্ঞানকে 'বিজাতীয় জ্ঞান' বলিয়া নৈয়ায়িকগণ কি বুঝাইতে চাহেন? ঘট, কাপড় যেইরূপ বিজাতীয়, প্রমা এবং অপ্রমাকে সেই দৃষ্টিতে বিজাতীয় বলা চলে কি? ঝিনুক খণ্ডকে যখন রূপার খণ্ড মনে করিয়া ভ্রান্তদর্শী 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে মিথ্যা-রজতের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই মিথ্যা-জ্ঞানের 'ইদম্' অংশ মিথ্যা নহে, সত্যই বটে। 'ইদম্' অর্থাৎ সম্মুখস্থিত বস্তুকে রজতরূপে দেখা, 'ইদমের' সঙ্গে রজতের অভেদ আরোপ করাই এক্ষেত্রে মিথ্যা। এই অবস্থায় প্রমা এবং অপ্রমা, সত্য এবং মিথ্যা-জ্ঞানকে ঘট ও কাপড়ের ন্যায় বিজাতীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা, এবং ইহাদের কারণও যে এক জাতীয় নহে, ভিন্ন-জাতীয়; দোষ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী (constituents of knowledge plus some defects) মিথ্যা-জ্ঞানের এবং গুণ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী (extra-qualities in addition to the common elements of knowledge) প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের সাধন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় কি?[১] কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে, প্রমা এবং অপ্রমা, সত্য এবং মিথ্যা-জ্ঞান, এই উভয়ই জ্ঞান বিধায়, জ্ঞানের যাহা সাধন, তাহা যে উভয় ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহারা দুই জাতীয় জ্ঞান, এক জাতীয় জ্ঞান নহে। জ্ঞানের সত্য এবং মিথ্যা, এই জাতি-বিভাগেরও তো একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে। চক্ষুর কোনরূপ দোষ থাকিলে প্রত্যক্ষ সেখানে ঠিক ঠিক হয় না। জ্ঞানের যাহা সাধন তাহার সহিত চক্ষুর দোষ প্রভৃতি মিলিয়া (দোষ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী) অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। চক্ষু প্রভৃতি প্রত্যক্ষের কারণবর্গের কোথায়ও যদি কোনরূপ দোষ-স্পর্শ না থাকে, প্রত্যক্ষের চক্ষু প্রভৃতি সাধনগুলি যদি নির্দ্দোষ বা সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হয়, তবে সেই সদ্‌গুণশালী চক্ষুপ্রভৃতি সাধনের সাহায্যে (অর্থাৎ গুণ-সহকৃত জ্ঞান-সামগ্রী হইতে) প্রমা

১। তর্কতাণ্ডব ৬৪ পৃষ্ঠা; এবং তর্কতাণ্ডবের রাঘবেন্দ্র-কৃত টিপ্পণ, ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;

বা যথার্থ-জ্ঞানের উদয় হয়, ইহাই জ্ঞানের 'পরতঃ প্রামাণ্যবাদী' নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক আচার্য্যগণের মূল বক্তব্য।[১]

উল্লিখিত ন্যায়-বৈশেষিক-মতের সমালোচনা করিয়া জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদী মীমাংসক এবং বৈদান্তিকগণ বলেন যে, চক্ষু প্রমুখ প্রত্যক্ষের সাধনে কোথায় কিছু দোষ (defects) থাকিলে তাহার ফলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, ইহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। এই অবস্থায় জ্ঞানের অপ্রামাণ্য যে 'স্বতঃ' অর্থাৎ কেবল জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান হইতে উৎপন্ন হয় না, জ্ঞানের সামগ্রীর সহিত দোষ প্রভৃতি মিলিত হইয়া 'পরতঃ' উৎপন্ন হয়, ইহা দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। জ্ঞানের সামগ্রীতে কোথায়ও কোনরূপ দোষ থাকিলেই, জ্ঞানকে সেক্ষেত্রে মিথ্যা হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে জ্ঞান-সামগ্রীই সত্য-জ্ঞান বা প্রমা-জ্ঞানের জনক; দোষ সত্য-জ্ঞানের উৎপত্তিতে বাধার সৃষ্টি করিয়া জ্ঞানকে মিথ্যায় পরিণত করে; এইরূপে জ্ঞানের 'স্বতঃ প্রামাণ্য' এবং 'পরতঃ অপ্রামাণ্য' স্বীকার করাই (মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়াই) সর্ব্ব প্রকারে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানের সাধনের মধ্যে কোথায়ও কিছু দোষ থাকার দরুণই যে জ্ঞান মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা অবশ্য মীমাংসক এবং বৈদান্তিকগণও অস্বীকার করেন না: অর্থাৎ দোষকে মিথ্যা-জ্ঞানের কারণের মধ্যে গ্রহণ করিতে মীমাংসক এবং বৈদান্তিকেরও কোনরূপ আপত্তি নাই। কিন্তু কথা এই যে, দোষকে মিথ্যা-জ্ঞানের সাধন হইতে দেখা যায় বলিয়াই, দোষের অভাবকে কিংবা প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ন্যায়োক্ত গুণরাজিকে (extra qualities) যে জ্ঞানের প্রামাণ্য-বিচারে অন্যতম সাধন হিসাবে জ্ঞান-সামগ্রীর সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, জ্ঞানের 'পরতঃ প্রামাণ্যবাদী' ন্যায় ও বৈশেষিকের এইরূপ যুক্তির কোনও মূল্য দিতে মীমাংসক এবং বৈদান্তিক আচার্য্যগণ প্রস্তুত নহেন।

মীমাংসোক্ত স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ

১। (ক) দোষাভাবসহকৃতত্বেন সামগ্র্যাং সহকৃতত্বে সিদ্ধে অনন্যথাসিদ্ধান্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধতয়া দোষাভাবস্য কারণতায়া বজ্রলেপায়মানত্বাৎ। সর্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনি-দর্শন ;

(খ) বিশেষদর্শনস্য ভ্রমনিবৃত্তিহেতুত্বে তদ্বিপর্যয়স্য ভ্রমহেতুত্ববদ্দোষসহকৃত-জ্ঞানসামগ্রীজন্যংজ্ঞানমপ্রমেত্যঙ্গীকুর্বতা প্রমাং প্রতি দোষাভাবস্য হেতুতায়া অনিরাকার্যত্বাৎ। চিৎসুখী, ১৫৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং ;

তাঁহাদের মতে জ্ঞানের যাহা সামগ্রী বা সাধন তাহাই কেবল ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও সাধন; তদতিরিক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ন্যায়োক্ত গুণরাজিকে কিংবা প্রত্যক্ষের সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির দোষাভাবকে জ্ঞানের প্রামাণ্যের সাধনের মধ্যে টানিয়া আনা গৌরবও বটে, অসঙ্গতও বটে। 'দোষ' যে অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ তাহা দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে 'দোষাভাব' যে অপ্রমার প্রতিবন্ধক (যেই বস্তুর যাহার কারণ হয়, তাহার অভাবকে সেই বস্তুর প্রতিবন্ধক বলা হইয়া থাকে) এইটুকু পর্য্যন্তই বুঝা যায়। জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপাদনে 'দোষাভাব' যে অন্যতম সাধন হইবে, এমন বুঝা যায় না। জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তিতে দোষাভাব প্রভৃতি "অন্যথাসিদ্ধ" (irrelevant antecedent বা 'কারণাভাস') ইহাই শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়ায়।[১] এইজন্য ন্যায়োক্ত পরতঃপ্রামাণ্য-বাদকে কোনমতেই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা চলে না।

বারট্র্যাণ্ড রাসেল্ (Bertrand Russell) জি. ই. মুর্ (G. E. moore) প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনীষীও জ্ঞানের প্রামাণ্য যে "পরতঃ" নহে, "স্বতঃ", এইরূপ মত-বাদ সমর্থন করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বিষয়ের সারূপ্য বা সংবাদ (correspondence or harmony) জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎপাদন করে না। জ্ঞানে স্বতঃ-সিদ্ধ যে প্রামাণ্য আছে তাহা জানাইয়া দেয় মাত্র। জ্ঞানের প্রামাণ্য সংবাদ প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষিত হউক, কিংবা নাই হউক, তাহাতে প্রামাণ্যের কিছুই আসে যায় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য ঐরূপ পরীক্ষার পূর্ব্বেও আছে, পরেও থাকিবে। পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানে স্বতঃ-সিদ্ধ যে প্রামাণ্য আছে, তাহা (উৎপাদিত হয় না) জিজ্ঞাসুর নিকট অভিব্যক্ত হয়, এইটুকুইমাত্র বলা যায়। জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যের

১। ন চৌদয়নমনুমানং পরতস্ত্বসাধকমিতি শঙ্কনীয়ং প্রমাদোষব্যতিরিক্ত-জ্ঞানহেত্বতিরিক্তজন্যা ন ভবতি জ্ঞানত্বাদপ্রমাবদিতি প্রতিসাধনগ্রহগ্রস্তত্বাৎ। জ্ঞান-সামগ্রীমাত্রাদেব প্রমোৎপত্তিসম্ভবে তদতিরিক্তস্য গুণস্য দোষাভাবস্য বা কারণত্ব-কল্পনায়াং কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ। ননু দোষস্য অপ্রমাহেতুত্বেন তদভাবস্য প্রমাং প্রতি হেতুত্বং দুর্নিবারমিতিচেৎ ন, দোষাভাবস্য অপ্রমাপ্রতিবন্ধকত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ।

সর্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনি-দর্শন;

সমর্থক মীমাংসক আচার্য্যগণ বলেন, জ্ঞানের যাহা উপাদান বা সামগ্রী তাহা যেমন জ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ সেই জ্ঞানের যে প্রামাণ্য আছে, সেই প্রামাণ্যেরও উৎপাদন করে। প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের প্রামাণ্য কোনরূপ বিশেষ গুণ কিংবা জ্ঞানের সামগ্রীর অতিরিক্ত, জ্ঞানের করণ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দোষশূন্যতা প্রভৃতি বশতঃ উদিত হয় না। উদয়নাচার্য্য প্রমুখ ধুরন্ধর তার্কিকগণ জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য সাধনের উদ্দেশ্যে যেই অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন (ন্যায়োক্ত অনুমান আমরা ৩৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি) তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ (সৎপ্রতিপক্ষ) অনুমান প্রয়োগ করিয়া, মীমাংসক এবং বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত 'পরতঃ প্রামাণ্যবাদের' খণ্ডন পূর্ব্বক জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তি যে 'পরতঃ' নহে, 'স্বতঃ'; জ্ঞানের সামগ্রী হইতেই জ্ঞানের প্রামাণ্য আত্মলাভ করিয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন।[১] জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসকদিগের মতেও 'স্বতঃ' নহে 'পরতঃ'; অর্থাৎ জ্ঞানের যাহা উপাদান বা সামগ্রী তদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকার দোষবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের দোষই জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের হেতু, ইহা নৈয়ায়িক, মীমাংসক সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে যাহা অপ্রমা নহে, অর্থাৎ প্রমা, তাহার উৎপত্তি যে 'পরতঃ' নহে 'স্বতঃ', এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায় নাকি? জ্ঞানের যাহা উপাদান (উৎপাদক-সামগ্রী) তাহাই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও উৎপাদক-সামগ্রী বটে। জ্ঞানের যাহা সাধন তাহা কেবল জ্ঞানই

১। (ক) বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্তহেত্বজন্যত্বং প্রমায়াঃ স্বতস্ত্বমিতি নিরুক্তিসম্ভবাৎ।

সর্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনি-দর্শন;

(খ) অস্তিচাত্রানুমানং বিমতা প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্তজন্যা ন ভবতি অপ্রমাত্বানধিকরণত্বাৎ ঘটাদিবৎ।

সর্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনি-দর্শন;

Origination of validity may well be defined logically as "due to the common causal conditions of knowledge and is not produced by any condition other than these." Validity is not produced by any other causal condition than those of knowledge, because it is some thing which cannot be receptacle of invalidity, e. g. a jar etc,

See my Studies in Post-S'amkara-Dealectics, p. 123.

উৎপাদন করে না, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও উৎপাদন করে। ইহাই জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির মর্ম্ম। প্রামাণ্যের উৎপত্তিও যেমন 'স্বতঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী হইতেই জন্ম লাভ করে, সেইরূপ স্বতঃ উৎপন্ন জ্ঞানের প্রামাণ্যের অবগতিও হয় 'স্বতঃ'। জ্ঞানের যাহা গ্রাহক-সামগ্রী তাহার বলেই উৎপন্ন জ্ঞানের প্রামাণ্য-বোধ উদিত হইয়া থাকে। (validity is known through the elements of knowledge itself) আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিলে বলিতে হয় যে, যেই সামগ্রী বা সাধন-বলে উৎপন্ন জ্ঞানটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেই সামগ্রী হইতেই (তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী-বলে নহে) ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও আমাদের গোচরে আসে। জ্ঞানটিকে যেমন আমরা চিনিতে পারি, সেইরূপ ঐ জ্ঞানটি যে সত্য (প্রমা) তাহাও আমরা জানিতে পারি; (অর্থাৎ জ্ঞানের যাহা গ্রাহক-সামগ্রী, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও তাহাই গ্রাহক-সামগ্রী বটে) জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী কেবল জ্ঞানকেই জানায় না, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানাইয়া দেয়।[১] জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী বিভিন্ন মীমাংসক-সম্প্রদায়ের মতে ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রীর ভিন্নতা বশতঃ জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং অবগতিও যে প্রভাকর, মুরারি মিশ্র এবং কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মতে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

মীমাংসার গুরু-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য প্রভাকরের মতে প্রত্যেক জ্ঞানই জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, এই তিনকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয় এবং জানা যায়। জ্ঞানের সামগ্রী বলিতে প্রভাকরের মতে জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, এই তিন প্রকার সামগ্রীকে এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধকে বুঝায়। 'ঘটমহং জানামি,' এইরূপে জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতিকে জ্ঞাতা-'আমির' নিকট প্রকাশ করাইয়াই 'জ্ঞান' জ্ঞান-পদবী লাভ করে। জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই তিনটির যে-কোন

প্রভাকরোক্ত ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষবাদ

১। তদপ্রামাণ্যাগ্রাহকযাবজ্জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্বম্ (জ্ঞপ্তৌ স্বতস্ত্বম্,) তত্ত্বচিন্তামণি, ১২২ পৃষ্ঠা, (B. I. Series);

Self-validity is cognisable by all the common causal conditions of knowledge which at the same time are exclusive of the conditions which make wrong apprehension intelligible.

Studies in Post-S'amkara Dialectics, by the same author, p. 124.

একটিকে বাদ দিলেই, জ্ঞান সেক্ষেত্রে পঙ্গু হইয়া পড়ে। জ্ঞাতা না থাকিলে, জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়কে কাহার নিকট প্রকাশ করিবে? জ্ঞেয় না থাকিলে, জ্ঞান প্রকাশ করিবে কাহাকে? তারপর জ্ঞানই তো আলোক, সেই আলোক না থাকিলে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি কাহারই প্রকাশ কখনও সম্ভবপর হয় না। অজ্ঞানের সূচিভেদ্য অন্ধকারেই নিখিল বিশ্ব আবৃত থাকিয়া যায়। বিষয় এবং জ্ঞাতার সম্পর্কে না আসিলে সেই জ্ঞানও হয় মূক। এই অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই তিনটি যে সমকালেই জ্ঞানে ভাসে এবং জ্ঞানকে রূপায়িত করিয়া জ্ঞানের মর্য্যাদা দান করে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ঐ ত্রিপুটীর সাহায্যেই জ্ঞানটি এবং সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞাতা-'আমি'র নিকট প্রতিভাত হয়। জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, এই তিনই মিলিত-ভাবে এই মতে জ্ঞানকে এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জানাইয়া দেয়।[১]

মুরারি মিশ্রের মতে অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হইয়া থাকে

প্রভাকরের মতে জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই ত্রয়ীকে লইয়াই উদিত হয়, এবং উক্ত ত্রিপুটীর সাহায্যেই জ্ঞানকে এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও আমরা জানিতে পারি। প্রভাকরের এইরূপ সিদ্ধান্ত মুরারি মিশ্র অনুমোদন করেন না। মুরারি মিশ্রের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখনই সেই জ্ঞানকে জানা যায় না, তাহার প্রামাণ্যও বুঝা যায় না। 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপে ঘটের ব্যবসায়-জ্ঞানোদয়ের (primery cognition) পর, 'ঘটমহং জানামি' এইরূপ অনুব্যবসায়ের (introspection) সাহায্যে ঘট, ঘটের ধর্ম্ম ঘটত্ব, এবং ঘটত্ব ও ঘটের মধ্যে বিদ্যমান যে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের এবং তাহাদের দ্বারা রূপায়িত জ্ঞানের স্বরূপটি জ্ঞাতার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে। 'ঘটত্বেন ঘটমহংজানামি', ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটকে আমি জানিয়াছি, এইরূপে জ্ঞাতার যে

১। (ক) জ্ঞানস্য ঘটাদিবিষয়স্বরূপাত্মরূপাধিকরণৈতত্ত্রিতয়বিষয়কত্বাদেব ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষতাপ্রবাদঃ। ন্যায়কোষ, ৫১৮ পৃষ্ঠা;

(খ) মিতি-মাতৃ-মেয়ানাং জ্ঞানস্য একসামগ্রীকত্বাৎ ত্রিপুটী তৎপ্রত্যক্ষতা। ন্যায়কোষ, ৫১৮ পৃষ্ঠা;

(গ) প্রামাণ্যে স্বতস্ত্বং নাম যাবৎ স্বাশ্রয়বিষয়কজ্ঞানগ্রাহ্যত্বম্। স্বস্যৈব স্বপ্রামাণ্যবিষয়কতয়া স্বজনকসামগ্র্যৈব স্বনিষ্ঠপ্রামাণ্যনিশ্চায়িকেতি গুরবঃ। তত্ত্ব-চিন্তামণির মাথুরী-টীকা, ১২৬ পৃষ্ঠা, (B. I.) সং;

জ্ঞানোদয় (introspection) হয়, তাহারই বলে জ্ঞানটি জ্ঞাতার গোচরে আসে এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও জ্ঞাতা বুঝিতে পারেন। মুরারি মিশ্রের মতে ব্যবসায়-জ্ঞানের (primery cognition) সাহায্যে জ্ঞানটি জ্ঞাতার নিকট ভাসে না। অনুব্যবসায়ের সাহায্যেই জ্ঞানটি জ্ঞাতার দৃষ্টিতে ভাসে, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। আলোচ্য অনুব্যবসায়ই এই মতে জ্ঞানের গ্রাহক এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও বোধক বটে। জ্ঞানের যাহা গ্রাহক-সামগ্রী তাহাই (সেই অনুব্যবসায়-সামগ্রীই) জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও গ্রাহক বিধায়, মুরারি মিশ্রের মতেও জ্ঞানের প্রামাণ্য যে 'স্বতঃ' তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।[১] ন্যায়-বৈশেষিকের মতের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের মতেও 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ ব্যবসায়-জ্ঞান-বলে জ্ঞানকে জানা যায় না। ব্যবসায়-জ্ঞানের সাহায্যে কেবল জ্ঞানের বিষয় ঘট প্রভৃতিকেই জানা যায়। এই ব্যবসায়-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া 'ঘটমহং জানামি' এইরূপে যে অনুব্যবসায়-জ্ঞান (introspection) উৎপন্ন হয়, সেই অনুব্যবসায়ের সাহায্যেই জ্ঞানটি জ্ঞাতা-আমির নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিকের ব্যাখ্যায় আলোচ্য অনু-ব্যবসায়ই ব্যবসায়-জ্ঞানের প্রকাশক হইলেও, ঐ ব্যবসায়-জ্ঞানটি যে সত্য, মিথ্যা নহে, অনুব্যবসায়ের সাহায্যে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দেখার পর জ্ঞেয় বস্তুকে যিনি হাতের মুঠার মধ্যে পাইতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ ব্যক্তির প্রবৃত্তি বা চেষ্টার সাফল্য দেখিয়া, নৈয়ায়িক জ্ঞানের প্রামাণ্যের অনুমান করিয়া বলেন যে, 'জ্ঞানটি প্রমা বা যথার্থ'; জ্ঞানটি যদি এখানে সত্য না হইত, তবে অনুসন্ধিৎসুর অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর গ্রহণের চেষ্টা কোন-ক্রমেই সফল হইত না—জ্ঞানমর্থাব্যভিচারি সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, যদি পুনরেবং নাভবিষ্যন্ন সমর্থাং প্রবৃত্তিমকরিষ্যৎ। চিৎসুখী, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা;

১। (ক) ঘটমহং জানামীত্যনুব্যবসায়স্তু ঘটং ঘটত্বং সমবায়ঞ্চ বিষয়ী-কুর্বন্নাত্মনি প্রকারীভূতঘটমাত্মানং তৎসম্বন্ধীভূতব্যবসায়ং বিষয়ীকরোতি এবং পুরোবর্তিপ্রকারসম্বন্ধস্যৈব প্রমাত্বপদার্থত্বেন স্বত এব প্রামাণ্যং গৃহ্লাতীতি।

ন্যায়কোষ, ৫১৮ পৃষ্ঠা;

(খ) স্বোত্তরবর্তিস্ববিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষস্য স্বনিষ্ঠ প্রামাণ্যবিষয়কতয়া স্বজন্যস্ববিষয়কপ্রত্যক্ষসামগ্রী স্বনিষ্ঠপ্রামাণ্যনিশ্চায়িকেতি মিশ্রাঃ। তত্ত্বচিন্তামণি, মাথুরী-টীকা, ১২৬ পৃষ্ঠা, (B. I. Series);

উল্লিখিত অনুমানের সাহায্যে ন্যায়-বৈশেষিকের মতে জ্ঞানটি যে সত্য (প্রমা) তাহা বুঝা যায় এবং আলোচ্য অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জ্ঞানটি জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী (অনুব্যবসায়-সামগ্রী) এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক-সামগ্রী (আলোচিত অনুমান-সামগ্রী) বিভিন্ন বিধায়, ন্যায় ও বৈশেষিক-মত 'পরতঃ প্রামাণ্যবাদ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুরারি মিশ্রের মতে একমাত্র অনুব্যবসায়ের সাহায্যেই জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য, এই উভয়েরই বোধ উদিত হইয়া থাকে বলিয়া, (জ্ঞানের এবং তাহার প্রামাণ্যের গ্রাহক-সামগ্রী অভিন্ন বিধায়) মুরারি মিশ্র স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীর মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন।

জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে কুমারিল ভট্টের সিদ্ধান্ত

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যের ব্যাখ্যায় কুমারিল ভট্ট প্রভাকরোক্ত ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষবাদ, কিংবা মুরারি মিশ্রের কথিত অনুব্যবসায়মূলে জ্ঞানের এবং তাহার প্রামাণ্যের প্রত্যক্ষতা প্রভৃতি অনুমোদন করেন নাই। ভট্ট কুমারিলের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নহে। ফলে, ব্যবসায় বা অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জ্ঞানের ও উহার প্রামাণ্যের প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে। জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইলেও, কোনও বিষয়-সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সেই জ্ঞানের ফলে যেই বিষয়টি পূর্ব্বে আমার অগোচরে ছিল, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে আমার দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে; এবং ঘট প্রমুখ জ্ঞেয় বিষয়ের ঐরূপ অতিস্পষ্ট প্রকাশের দ্বারা 'বিষয়টি আমি জানিয়াছি' 'জ্ঞাতো ময়া ঘটঃ' এইরূপ (জ্ঞাততা-) বোধের উদয় হয়। যে-সকল বস্তু-সম্পর্কে 'আমি এই বস্তুটিকে জানিয়াছি' এইরূপ (জ্ঞাততা-)[১] বোধ উৎপন্ন হয়, সেই সকল বস্তু-সম্পর্কে আমার যে জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ঐ সকল বস্তু-সম্পর্কে আমার জ্ঞান না জন্মিলে, ঐ বস্তুগুলি আমার নিকট এত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না এবং 'আমি ঐ বস্তুগুলি জানিয়াছি' এইরূপ বুদ্ধিরও উদয় হইত না। 'জ্ঞাতো ঘটঃ' এইরূপে ঘটের জ্ঞাততা-বোধই ঘট-সম্পর্কে আমার জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যের

১। জ্ঞাততা চ জ্ঞাত ইতি প্রতীতিসিদ্ধো জ্ঞানজন্যো বিষয়সমবেতঃ প্রাকট্যাপরনামাতিরিক্তপদার্থবিশেষঃ।

তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য, ১২৬ পৃষ্ঠা, (B. I. Series);

অনুমান উৎপাদন করিয়া থাকে। জ্ঞান এবং তাহার প্রামাণ্য কুমারিল ভট্টের মতে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য না হইলেও, অনুমান-গম্য হইতে বাধা কি? 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ ব্যবসায়-জ্ঞানের সাহায্যে ঘট পরিজ্ঞাত হইবার পর, 'ঘটজ্ঞানবান্ অহম্,' 'আমি ঘটকে জানিয়াছি' এইরূপে ঐ ব্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া যে অনুব্যবসায়ের উদয় হয়, সেই অনুব্যবসায়কে মুরারি মিশ্র প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ফলে, তাঁহার মতে জ্ঞান এবং তাহার প্রামাণ্য, এই উভয়ই যে প্রত্যক্ষ-গম্য, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। কুমারিল ভট্ট আলোচ্য অনুব্যবসায়-জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিতে প্রস্তুত নহেন। জ্ঞানমাত্রই যখন তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয়, তখন কুমারিল আলোচ্য অনুব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ বলিবেন কিরূপে?[1] ঐ অনুব্যবসায়ও কুমারিলের মতে অনুমান-গম্য, প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নহে। 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ ব্যবসায়ের ফলে ঘটে যে জ্ঞাততা-বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাই জ্ঞানের ও তাহার প্রামাণ্যের অনুমানে হেতু হইয়া থাকে।[2] ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণ জ্ঞেয় বিষয়কে পাইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টার সাফল্য দেখিয়া জ্ঞানের প্রামাণ্যের অনুমান করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি। ন্যায় ও বৈশেষিক-মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমান-গম্য হইলেও, জ্ঞাতার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ অনুমানের সাহায্যে হয় না, 'জ্ঞানবানহম্' এইরূপ অনুব্যবসায়ের সাহায্যেই উদিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের গ্রাহক (-সামগ্রী) আলোচিত অনুব্যবসায় এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক-সামগ্রী (ন্যায়োক্ত অনুমান) ন্যায়-বৈশেষিকের মতে অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। এইজন্যই ন্যায়-

---

১। ব্যবসায়োৎপত্ত্যব্যবহিতোত্তরক্ষণেনোৎপন্নানুব্যবসায়ব্যক্তেরেব ভাট্টৈঃ জ্ঞাতত্তালিঙ্গকানুমিতিত্বেন মিশ্রাদিভিশ্চ সাক্ষাৎকারিত্বেনাভ্যুপগমাৎ।

তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য, ১৪৮ পৃষ্ঠা;

২। (ক) ভাট্টৈরপি ব্যবসায়পূর্বোৎপন্নেন ব্যবসায়সমকালোৎপন্নেন বা স্মরণাত্মাত্মকপরামর্শেণ ব্যবসায়োৎপত্তিদ্বিতীয়ক্ষণে জনিতয়া অহং জ্ঞানবান্ জ্ঞাততা-বত্ত্বাদিত্যনুমিত্যৈব প্রামাণ্যগ্রহাভ্যুপগমাৎ।

তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য, ১৪৮ পৃষ্ঠা (B. I. Series),

(খ) জ্ঞানস্যাতীন্দ্রিয়তয়া প্রত্যক্ষাসম্ভবেন স্বজন্যজ্ঞাততালিঙ্গকানুমিতিসামগ্রী স্বনিষ্ঠ প্রামাণ্যনিশ্চায়িকেতি ভাট্টাঃ। তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য, ১২৬ পৃষ্ঠা (B. I. Series);

(গ) ঘটো ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানবিষয়ঃ ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞাতত্ববত্ত্বাৎ।

ভীমাচার্য-কৃত ন্যায়কোষ, ৫১৭ পৃষ্ঠা;

বৈশেষিককে বলে পরতঃ প্রামাণ্যবাদী। কুমারিল ভট্টের মতে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের ফলে ঘট প্রমুখ দৃশ্য বস্তুসকল জ্ঞাত হওয়ার পর, পরিজ্ঞাত ঘটে যে জ্ঞাততা-বোধ জন্মে, সেই জ্ঞাততাকেই হেতুরূপে উপন্যাস করিয়া, 'ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘটকে আমি জানিয়াছি' এইরূপে যে অনুমানের উদয় হইয়া থাকে, সেই অনুমান-বলেই ঘট প্রভৃতির জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য জানা যায়। জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী (elements which make knowledge intelligible) এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক-সামগ্রী (causal conditions which make validity known) অভিন্ন বিধায়, কুমারিলের এই অভিমত 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আমরা বিভিন্ন মীমাংসকের সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলাম এবং তাহাতে মীমাংসায় এই একই নীতি দেখিতে পাইলাম যে, জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী (elements which make knowledge intelligible) কুমারিল, প্রভাকর প্রভৃতি বিভিন্ন মীমাংসকের মতে বিভিন্ন হইলেও, যেই সামগ্রী বা উপাদানের সাহায্যে ঐ জ্ঞানটিকে আমরা জানিতে পারি, সেই একই সামগ্রীর সাহায্যেই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও আমরা বুঝিতে পারি। ইহাই জ্ঞানের 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের' মূল সূত্র। কোন মীমাংসকের মতের আলোচনায়ই 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের' ঐ মূল সূত্র ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং কুমারিল, প্রভাকর এবং মুরারি মিশ্র, এই সকল মীমাংসকের অভিমতই 'স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য সম্পর্কে বেদান্তের বক্তব্য

মীমাংসকদিগের ন্যায় বিভিন্ন বৈদান্তিক-সম্প্রদায়ও জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য এবং পরতঃ অপ্রামাণ্যই সমর্থন করেন। অদ্বৈত-বেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র 'অনধিগত' এবং 'অবাধিত' জ্ঞানকে প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা আমরা প্রথম-পরিচ্ছেদে প্রমা-জ্ঞানের স্বরূপ-বিচার প্রসঙ্গেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রমা-জ্ঞানকে 'অবাধিত' (not contradicted) বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, অদ্বৈত-বেদান্তের মতে বাধ বা বিরোধই (contradiction) যে জ্ঞানের অসত্যতা বা অপ্রামাণ্যের হেতু, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।* মীমাংসার ন্যায়

*According to the Advaitins truth and validity of knowledge consist in its non-contradiction (abādhitatva). The Vedantins proceed to criticise the different theories showing their inadequacies and point out how

বেদান্তের মতেও জ্ঞানে অপ্রামাণ্য সেই ক্ষেত্রেই আসিতে দেখা যায়, যেখানে জ্ঞানের উপাদান বা কারণ-সামগ্রীর (causal constituents) মধ্যে কোথায়ও কিছু-না-কিছু দোষের সংস্পর্শ থাকে। জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী (elements which originate knowledge) এবং তাহা ছাড়া জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে দোষ (defects) থাকিলে (জ্ঞানের কারণে দোষ থাকার দরুণ) জ্ঞান সেক্ষেত্রে সত্য হয় না, মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। কেবল জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী-বলেই যেখানে জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের দোষ প্রভৃতি যেখানে জ্ঞানের মূলে বর্তমান থাকে না, সেখানেই জ্ঞান প্রমা বা সত্য হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির রহস্য। জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির এইরূপ লক্ষণে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতির কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না।

---

ultimately all of them might be reduced to their own theory of non-contradictedness. The correspondence theory cannot prove itself ; for the question might be urged how do you know that knowledge and objects known correspond ? The only way to prove such correspondence is to infer it from the harmony with facts (or S'ambāda as we have seen in the Nyaya explanation of validity of knowledge). But even this does not help much. For all we can infer from the harmony with facts is not that knowledge is absolutely free from error, that it is not yet contradicted. But what is the guarantee that the future will not contradict and thus falsify it. To meet this objection Vedantins argue that knowledge should be such as to be incapable of being contradicted at all times. The pragmatic test of causal efficiency is also rejected by the Advaitins on the ground that some times even a false cognition may lead to fulfilment of purpose as when mistaking the lustre of a distant jewel for the jewel itself we approach and get the jewel. In this case, the mistaken impression viz., the lustre-as-jewel leads to the fulfilment of purpose i. e., the attainment of the jewel itself. Here it is clear that the falsity of the initial cognition which caused our action is due to its being contra-dictedness. This criticism of the Advaitins against the sister schools of Indian philosoply runs on similar lines with porf. Alexander's criticism against the correspondence theory of the western Realists ; in which be shows how it reduces itself inevitably to the Coherence Theory. Vide Alexander's Space Time and Deity :

Vol II p. p. 252-253.

সুতরাং প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির ঐরূপ লক্ষণই হয় নির্দ্দোষ লক্ষণ।[১] সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ বস্তু সম্পর্কে যে নিত্য সত্য-জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান কখনও জ্ঞানের সামগ্রী-বলে কিংবা তদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের দোষ প্রভৃতি মূলে উৎপন্ন হয় না। অতএব পরমেশ্বরের সেই নিত্য জ্ঞানের বিকাশকেও 'স্বতঃ' বলিতে কোন বাধা নাই। অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞান বিজ্ঞান-সামগ্রীমূলে উৎপন্ন হইলেও, মিথ্যা-জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-সামগ্রীর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-দোষ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপত্তিকে আর 'স্বতঃ' বলা চলে না, 'পরতঃ'ই বলিতে হয়।[২] প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তি নিম্নলিখিত অনুমানের সাহায্যেও প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'প্রমা কেবল বিজ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রীজন্যই বটে, বিজ্ঞান-সামগ্রীর অতিরিক্ত, জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার দোষমূলে উৎপন্ন নহে, যেহেতু প্রমা অপ্রমা নহে। পট (বস্ত্র) প্রমুখ বস্তুরাজি যেমন অপ্রমা হইতে ভিন্ন, প্রমাও সেইরূপ অপ্রমা হইতে বিভিন্ন। প্রমার উৎপত্তিও সুতরাং অপ্রমার ন্যায় 'পরতঃ' নহে, 'স্বতঃ'—প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্ত জন্যা ন ভবতি অপ্রমাতিরিক্তত্বাৎ পটাদিবৎ। চিৎসুখী, ১২২ পৃষ্ঠা; ন্যায়াচার্য্য উদয়ন তাঁহার কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থে জ্ঞানের প্রামাণ্যের 'পরতঃ' উৎপত্তি সমর্থন করিতে গিয়া যেই অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন, সেই অনুমানের বিরুদ্ধ (সৎপ্রতিপক্ষ) অনুমান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, উদয়নাচার্য্যোক্ত জ্ঞানের প্রামাণ্যের পরতঃ উৎপত্তির সমর্থক অনুমান যে গ্রহণ-যোগ্য নহে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ন্যায়-মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়াছি। অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির সাধক আলোচ্য অনুমানের অনুকূলে যুক্তিও দেখা যায় এই যে, জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী হইতেই যখন জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও উৎপত্তি

১। বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্তহেত্বজন্যত্বং প্রমায়াঃ স্বতস্ত্বং নাম। চিৎসুখী, ১২২ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

২। ন চাজন্যত্বাদব্যাপ্তিরীশ্বরজ্ঞানে। তস্যাজন্যত্বেঽপি জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সত্যতিরিক্তকারণজন্যত্বলক্ষণবিশিষ্টধর্ম্মবত্ত্বাভাবাৎ। নাপ্যতিব্যাপকম্। অপ্রমায়া বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্তহেতুজন্যত্বাৎ।

চিৎসুখী, ১২২ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

সম্ভবপর, তখন জ্ঞানের প্রামাণ্যের পরতঃ উৎপত্তি উপপাদনের জন্য ন্যায়োক্ত কারণের গুণ বা দোষের অভাব প্রভৃতিকে অন্যতম সাধন হিসাবে গ্রহণ করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই, আর তাহা গৌরবও বটে।[১] জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি যে চক্ষু প্রভৃতি কারণের দোষমূলক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, যেহেতু অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপত্তি দোষমূলক, সুতরাং প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের উৎপত্তিও দোষের অভাবমূলক। যাহা না থাকিলে কার্য্য কোনমতেই উৎপন্ন হইতে পারে না, সেই একান্ত আবশ্যকীয় মূল কারণের অন্বয় ও ব্যতিরেক-দৃষ্টে কারণের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, কারণের মধ্যে কোথায়ও কিছু দোষ থাকিলে, সেক্ষেত্রেই অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের উদয় হয়। কারণে দোষ-স্পর্শ না থাকিলে, জ্ঞান কখনও মিথ্যা হয় না। ইহা হইতে দোষের অভাব অপ্রমার প্রতিবন্ধক এইটুকুই মাত্র বুঝা যায়; দোষাভাব যে প্রমার উৎপত্তির কারণ, এমন বুঝা যায় না।[২] এইজন্যই নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তিকে 'পরতঃ' বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তি যে পরতঃ নহে, স্বতঃ, তাহা দেখা গেল। এখন জ্ঞানের প্রামাণ্যের অবগতিও যে স্বতঃ অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী হইতেই উদিত হয়, তাহা উপপাদন করা যাইতেছে।

জ্ঞানের প্রামাণ্যের বোধও জন্মে স্বতঃ

জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী (elements which make knowledge intelligible) বিভিন্ন মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সকল মীমাংসকের মতেই জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রীই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও গ্রাহক-সামগ্রী বটে। জ্ঞানের

১। (ক) বিজ্ঞানসামগ্রীমাত্রাদেব প্রমোৎপত্তিসম্ভবে তদতিরিক্তস্য গুণস্য দোষাভাবস্য বা কারণত্বকল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গো বাধকস্তর্কঃ। চিৎসুখী, ১২৩ পৃষ্ঠা;

(খ) জ্ঞানসামগ্রীত এব প্রমোদ্ভবসম্ভবে দোষাভাবস্যাপি তদ্ধেতুত্বকল্পনা নিষ্প্রামাণিকা, তস্মাৎ প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীমাত্রাদেব জায়ত ইতি সিদ্ধম্। চিৎসুখী, ১২৪ পৃষ্ঠা;

২। দোষস্য অপ্রমাহেতুত্বে তদভাবস্য গলে পাদুকান্যায়েন প্রমাং প্রতি হেতুত্বং স্যাদিতিচেৎ, স্যাদেবং যদ্যনন্যথাসিদ্ধাবন্বয়ব্যতিরেকৌ কারণত্বাবেদকৌ স্যাতাং, তৌ তু বিরোধ্যপ্রমাপ্রতিবন্ধকত্বেনোপক্ষীণৌ ন কারণমাত্রত্বমাবেদয়তঃ। চিৎসুখী, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

গ্রাহক-সামগ্রী এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক-সামগ্রী কোন মীমাংসকের মতেই বিভিন্ন নহে, অভিন্ন। স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের এই মূল সূত্র মীমাংসক এবং বেদান্তী কেহই অস্বীকার করেন না। মীমাংসকের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া অদ্বৈত-বেদান্তীও বলেন—প্রমাজ্ঞপ্তিরপি বিজ্ঞানজ্ঞাপকসামগ্রীত এব। চিৎসুখী, ১২৪ পৃষ্ঠা; জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী-বলেই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যের অবগতিও সম্ভবপর হয়। যেই কারণে জ্ঞানকে জানা যায়, সেই কারণ-বলেই যদি সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায়, তবে 'এই জ্ঞানটি প্রমা কিনা' (ইদং জ্ঞানং প্রমা নবা) এইরূপে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে সংশয়ের উদয় হয় কেন? জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও উদয় এবং অবগতি সম্ভবপর হইলে, স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীর মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে সন্দেহ জাগিবার অবকাশই তো দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এইমতে ঝিনুক দেখিয়া ক্ষেত্রবিশেষে যে সত্য ঝিনুক-জ্ঞানের উদয় না হইয়া, মিথ্যা রজত-জ্ঞানের উদয় হয়, এই ভ্রম-জ্ঞানের উৎপত্তিই বা জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী সমর্থন করেন কিরূপে? জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্তের অনুকরণে বেদান্তী বলেন যে, জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী-বলে জ্ঞানটি সত্য হওয়াই স্বাভাবিক; তবে যে-ক্ষেত্রে জ্ঞানের উপাদানের মধ্যে জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যের প্রতিবন্ধক প্রবলতর দোষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, কিংবা সুদৃঢ় বাধ-বুদ্ধির উদয় হয়, জ্ঞান সেক্ষেত্রে সত্য হয় না, অপ্রমা বা মিথ্যাই হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং অবগতিকে 'স্বতঃ' বলিলেও, অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং অবগতিকে তো মীমাংসক এবং বৈদান্তিক কেহই 'স্বতঃ' বলেন না। অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং তাহার অবগতিকে 'পরতঃ' অর্থাৎ কারণের দোষ এবং বাধ-বুদ্ধি-মূলক বলিয়াই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসক এবং বৈদান্তিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা আমরা মীমাংসকদিগের মতের বিচার-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং কারণের বিভিন্ন প্রকার দোষ এবং বাধ-বুদ্ধি মূলে সন্দেহ এবং ভ্রম-জ্ঞানের উদয় হইতে বাধা কোথায়?[১] কারণের দোষ এবং

১। ন চ জ্ঞানজ্ঞাপকাদেব প্রামাণ্যগ্রহণে মিথ্যারজতাদিবুদ্ধিষু প্রামাণ্য-গ্রহণপ্রসঙ্গঃ। প্রসক্তস্যাপি প্রামাণ্যগ্রহণস্য কারণদোষাবগমবাধবোধাভ্যামপনয়াৎ। ন চ তাভ্যামপনয়ে তয়োরভাবজ্ঞানস্য প্রামাণ্যগ্রহণহেতুত্বোপপত্তৌ পরতঃ-প্রামাণ্যাপত্তিরিতি বাচ্যম্। দোষবাধবোধয়োরনুদয়মাত্রেণ প্রামাণ্যস্ফুরণোররী-করণাৎ। চিৎসুখী, ১২৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

বাধ-বুদ্ধিবশতঃ সন্দেহ এবং ভ্রম-জ্ঞান প্রভৃতির উদয় হয় বলিয়াই, তাহাদের অভাবকে যে প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্যবাদীর এই যুক্তির কোন মূল্য আছে বলিয়া, স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদীর মতে দোষ এবং বাধ-বুদ্ধি না থাকিলে, জ্ঞান সেক্ষেত্রে স্বতঃই প্রমাণ হইবে—দোষবাধবোধয়োরনুদয়মাত্রেণ প্রামাণ্যস্ফুরণোররী-করণাৎ। চিৎসুখী, ১২৫ পৃষ্ঠা; পরতঃপ্রামাণ্যবাদীর যুক্তি অনুসরণ করিয়া দোষ এবং বাধ-বুদ্ধির অভাবকে যদি জ্ঞানমাত্রেরই প্রামাণ্যাব-গতির অপরিহার্য্য সাধন বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে কারণের ঐ দোষাভাব-জ্ঞান এবং বাধ-জ্ঞানের অভাব-বুদ্ধির প্রামাণ্য-স্থাপনের জন্য তাহাদেরও দোষাভাব-জ্ঞান এবং বাধক-জ্ঞানের অভাবকে প্রামাণ্যের হেতু বলিয়া অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে, 'অনবস্থা-দোষই' আসিয়া দাঁড়াইবে,[১] এবং প্রামাণ্যের কারণ নিরূপণও সেক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এইজন্যই কারণের দোষাভাব-জ্ঞান এবং বাধ-জ্ঞানের অভাব-বোধকে স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী জ্ঞানের প্রামাণ্যাবগতির হেতু বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। জ্ঞানের প্রামাণ্য-বোধকে 'স্বতঃ' না বলিয়া 'পরতঃ' অর্থাৎ বিজ্ঞান-সামগ্রীর অতিরিক্ত অনুমান প্রভৃতি মূলে উদিত হয় বলিয়া, পরতঃপ্রামাণ্যবাদী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানেও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য-বোধের সমর্থক ঐ অনুমানটি যে প্রমাণ, তাহা তোমাকে (পরতঃপ্রামাণ্যবাদীকে) কে বলিল? ঐ অনুমানের প্রামাণ্য-স্থাপনের জন্যও পরতঃপ্রামাণ্যবাদীকে পুনরায় অনুমানের আশ্রয় লইতে হইবে; সেই অনুমানের প্রামাণ্য উপপাদনের জন্যও আবার অনুমানের প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে পরতঃপ্রামাণ্যবাদী 'অনবস্থার' হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন না। আর এক কথা এই, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি যে-সকল প্রমাণ পরতঃপ্রামাণ্যবাদী স্বীকার করিয়াছেন, ঐ প্রমাণ-গুলির কোনটাই তাঁহার মতে স্বতঃপ্রমাণ নহে। ঐ সকল প্রমাণের

১। যেন হি দোষাভাবজ্ঞানেন আদ্যস্য প্রামাণ্যমবগম্যতে তৎপ্রামাণ্যা-বগমার্থমপি দোষাভাবজ্ঞানান্তরং গবেষণীয়ম্, এবংকারমুপর্যপীত্যনবস্থা।

তত্ত্বপ্রদীপিকা-টীকা, নয়নপ্রসাদিনী ১২৫ পৃষ্ঠা;

প্রামাণ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে তিনি যেই অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের উপন্যাস করিবেন তাহাও তাঁহার মতে স্বতঃপ্রমাণ হইবে না। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রামাণ্যের সাধক সেই সকল অনুমানের প্রামাণ্য-স্থাপনের জন্যও পুনরায় অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের অবতারণা অত্যাবশ্যক হইবে। সকল ক্ষেত্রেই 'অনবস্থা-দোষ' আসিয়া পরতঃপ্রামাণ্যবাদীর সিদ্ধান্তকে কলুষিত করিবে। এই জন্যই দেখিতে পাই, ন্যায়-বৈশেষিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টার সফলতা প্রভৃতি দেখিয়া জ্ঞানের প্রামাণ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে যেই অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন, 'অনবস্থা' প্রভৃতি দোষমুক্ত করিবার জন্য ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার রচয়িতা অসামান্য মনীষী পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র সেই অনুমানকে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] ভ্রান্তি, সন্দেহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা-নির্ম্মুক্ত অনুমানকে বাচস্পতি যেই যুক্তিতে 'স্বতঃ-প্রমাণ' বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই যুক্তিতেই স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী মীমাংসক এবং বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রমাণ এবং ঐ সকল প্রমাণমূলে উৎপন্ন প্রমা-জ্ঞানকে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মীমাংসক এবং অদ্বৈত-বেদান্তীর দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া দ্বৈত-বেদান্তী মাধ্ব-সম্প্রদায়ও প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন এবং ঐ প্রামাণ্যের অবগতিকেও 'স্বতঃ' বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের যাহা কারণ, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তিরও তাহাই কারণ; এবং যাহার দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, তাহার দ্বারাই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানিতে পারা যায়। ইহাই মাধ্ব-সিদ্ধান্তে জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তি এবং স্বতঃ অবগতির রহস্য। অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং অবগতি মাধ্ব-মতেও 'স্বতঃ' নহে, 'পরতঃ'। জ্ঞানের কেবল উৎপাদক-সামগ্রী এবং গ্রাহক-সামগ্রী-বলেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি এবং ঐ অপ্রামাণ্যের অবগতি

জ্ঞানের প্রামাণ্য ও মাধ্ব-মত

১। উক্তঞ্চৈতদনুমানাদেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যমাচার্য্যবাচস্পতিনা ন্যায়বার্ত্তিক-টীকায়াম্। 'বিমতং জ্ঞানমর্থাব্যভিচারি সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ যদিপুনরেবং ন্না-ভবিষ্যন্ন সমর্থাং প্রবৃত্তিমকরিষ্যৎ যথা প্রমাণাভাস' ইতি ব্যতিরেকী। অন্বয়ব্যতিরেকী বা। 'অনুমানস্য স্বতঃ প্রমাণতয়া অন্বয়স্যাপি সম্ভবাৎ। তথাহনুমানস্য তু পরিতো নিরস্তসমস্তবিভ্রমাশঙ্কস্য স্বতএব প্রামাণ্যম্'। চিৎসুখী, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা,

সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী হইতে পৃথক, জ্ঞানের কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির বিবিধ দোষ বশতঃই জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; এবং জ্ঞানের যাহা গ্রাহক-সামগ্রী তদ্‌ব্যতীত অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্যকে জানা যায়। চেষ্টার বিফলতা দেখিয়াই জ্ঞানের অপ্রামাণ্য অনুমিত হইয়া থাকে।[১] জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির এবং স্বতঃ অবগতির কারণ (জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী এবং গ্রাহক সামগ্রীর স্বরূপ—elements which originate knowledge and make knowledge known) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, মাধ্ব পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যেই প্রত্যক্ষ প্রমুখ জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যেমন জ্ঞানের জনক শক্তি আছে, সেইরূপ সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের জনক শক্তিও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আছে। ইন্দ্রিয়ের এই জ্ঞান-জনন-শক্তি এবং প্রামাণ্যের জনক শক্তি, একই শক্তি বটে, ভিন্ন শক্তি নহে। সেই শক্তি বশতঃই জ্ঞানের এবং তাহার প্রামাণ্যের উৎপত্তি একই কারণমূলে (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে) উদিত হইয়া থাকে, ইহাই মাধ্ব-মতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তির মর্ম্ম।[২] জ্ঞান এবং তাহার প্রামাণ্য উভয়ই সাক্ষি-বেদ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সাক্ষীই জ্ঞানকে এবং তাহার প্রামাণ্যকে প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানমাত্রই সাক্ষি-বেদ্য বিধায়, অপ্রমা-জ্ঞানও যে সাক্ষি-বেদ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু ঐ অপ্রমা-জ্ঞানে যে অপ্রামাণ্য আছে, তাহা সাক্ষি-বেদ্য নহে। প্রবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুকে পাইবার চেষ্টার বিফলতা দেখিয়া, অপ্রমা-জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের অনুমান হইয়া থাকে (ইদং

১। তত্র উৎপত্তৌ স্বতস্ত্বং নাম জ্ঞানকারণমাত্রজন্যত্বম্। যেন জ্ঞানং জায়তে তেনৈব তদ্‌গতপ্রামাণ্যং জায়ত ইতি। জ্ঞপ্তৌ স্বতস্ত্বং নাম জ্ঞানগ্রাহক-মাত্রগ্রাহ্যত্বম্। যেন জ্ঞানং গৃহ্যতে তেনৈব তদ্‌গতপ্রামাণ্যমপি গৃহ্যত ইতি। অপ্রামাণ্যস্য পরতস্ত্বমপি দ্বিবিধম্। উৎপত্তৌ জ্ঞপ্তৌ চেতি। তত্রোৎপত্তৌ পরতস্ত্বং নাম জ্ঞানকারণাতিরিক্তকারণজন্যত্বম্। জ্ঞপ্তৌ পরতস্ত্বং নাম জ্ঞানগ্রাহকাতি-রিক্তগ্রাহ্যত্বমিতি বস্তুস্থিতিঃ।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬৫ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং ;

২। তথাচ জ্ঞানজনকত্বশক্তি প্রামাণ্যজনকত্বশক্ত্যোরেকত্বমেব প্রামাণ্যস্যোৎপত্তৌ স্বতস্ত্বমিতি ভাবঃ।

প্রমাণপদ্ধতির জনার্দন-কৃত টীকা, ৯১ পৃষ্ঠা ;

জ্ঞানমপ্রমা বিসংবাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ) এখানে অপ্রমা-জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী (সাক্ষী) এবং ঐ জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের গ্রাহক-সামগ্রী (উল্লিখিত অনুমান) এক বা অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। এইজন্য অপ্রামাণ্যের বোধকে কিছুতেই 'স্বতঃ' বলা চলে না, 'পরতঃ' বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এইরূপ অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তিও 'স্বতঃ' নহে, 'পরতঃ'। অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি কেবল ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জন্য নহে। জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার দোষ বশতঃই অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জ্ঞানের জনক যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত জ্ঞানের প্রামাণ্যের জনক শক্তির বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকায়, ইন্দ্রিয়-শক্তি-বলে জ্ঞান প্রমা হওয়াই স্বাভাবিক, এবং প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তিই স্বীকার্য্য। তবুও এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে নানারূপ দোষ থাকায়, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের জনক যে শক্তি আছে ঐ শক্তি তিরোহিত হইয়া, তাহার স্থলে জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের জনক এক বিরুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব হয়। ঐ শক্তির প্রভাবেই জ্ঞান ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রমা হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জ্ঞানের জনক যে শক্তি আছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক বিরুদ্ধ শক্তি বশতঃই জ্ঞানে অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্যই অপ্রমা-জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের উৎপত্তিকে 'পরতঃ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১] জ্ঞানের প্রামাণ্যের অবগতিকে স্বতঃ বা সাক্ষি-বেদ্য না বলিয়া, পরতঃ অর্থাৎ নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে অনুমান-গম্য বলিয়া স্বীকার করিলে যে গুরুতর অনবস্থা প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে জ্ঞানের প্রামাণ্য-বোধের উপপাদনই যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আমরা মীমাংসা এবং অদ্বৈত-বেদান্তের মতের বিচার-প্রসঙ্গেই বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। পরতঃপ্রামাণ্যবাদে 'অনবস্থার' হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই দেখিয়াই, ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-রচয়িতা সর্ব্বতন্ত্র-

---

১। (ক) করণানাম্ভ জ্ঞানজনকত্বশক্তিরেব স্বকারণাসাদিতপ্রামাণ্যজনকত্ব-শক্তিঃ। অপ্রামাণ্যজননেত্বন্যা শক্তির্দোষবশাদাবির্ভবতি। জ্ঞপ্তিস্তু পরত এব।

প্রমাণপদ্ধতি, ৯১ পৃষ্ঠা;

(খ) জ্ঞানজনকত্বশক্ত্যপ্রামাণ্যজনকত্বশক্ত্যো র্ভেদ এব করণগতাৎ প্রামাণ্যস্যোৎপত্তৌ পরতস্ত্বমিতি ভাবঃ।

প্রমাণপদ্ধতির জনার্দন-কৃত টীকা, ৯১ পৃষ্ঠা;

স্বতন্ত্র পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্যের সাধক ন্যায়োক্ত অনুমানকে যে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও আমরা ইতঃপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার সূত্র ধরিয়াই মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন, পরতঃপ্রামাণ্যবাদীকে অনবস্থা-দোষ-বারণের জন্য যদি কোন জ্ঞানকে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলিয়া মানিতেই হয়, তবে সাক্ষি-বেদ্য প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানকে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলাই যে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মাধ্বের-মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য-বোধকে সাক্ষি-বেদ্য বলায়, স্বয়ম্প্রকাশ, চিন্ময় সাক্ষী স্বীয় চিদ্রূপতাকে এবং তাহার প্রামাণ্যকে এক সময়েই গোচর করে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, উল্লিখিত অনবস্থার কোন প্রসঙ্গই উঠে না। জ্ঞান নিজেই নিজেকে এবং নিজের প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে ইহা না বলিয়া, সাক্ষী (witnessing Intelligence) জ্ঞান ও জ্ঞানগত প্রামাণ্যকে জ্ঞাপন করে, মাধ্বের এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, মাধ্ব-সিদ্ধান্তে জড় অন্তঃ-করণের বৃত্তিকেই (function of the internal organ) জ্ঞান-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। জড় অন্তঃকরণের বৃত্তিও জড় এবং পরপ্রকাশ এই জন্যই সে নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। স্বপ্রকাশ সাক্ষী-চৈতন্যই জ্ঞান এবং তাহার প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে। জ্ঞানের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রামাণ্যের প্রকাশের জন্য জ্ঞানের প্রকাশক ব্যতীত অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই, এই দৃষ্টিতেই জ্ঞানকে 'স্বতঃ প্রমাণ' বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[১]

রামানুজ-বেদান্ত-সম্প্রদায়ও জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য-সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। জ্ঞেয় বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যেই রূপ, সেইরূপেই যখন উহা আমাদের জ্ঞানে ভাসে, তখনই আমরা জ্ঞানকে প্রমা বা সত্য বলি। এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে জ্ঞানগোচর হইলেই সেই জ্ঞানকে বলি মিথ্যা বা অপ্রমাণ। ঝিনুক-খণ্ড দেখিয়া তাহাকে ঝিনুক-খণ্ড বলিয়া চিনিলে, সেক্ষেত্রেই জ্ঞান 'প্রমা' বা সত্য আখ্যা প্রাপ্ত হইবে; আর ঝিনুকের

জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য-সম্পর্কে রামানুজ-সম্প্রদায়ের অভিমত

১। ন চ সাক্ষিবেদ্যত্বেঽপ্যনবস্থানপ্রসঙ্গঃ সমান ইতি বাচ্যম। সাক্ষী স্বয়ম্প্রকাশঃ স্বাত্মানং স্বপ্রামাণ্যঞ্চ গোচয়তীত্যঙ্গীকারাৎ। জ্ঞানস্যৈব তথা ভাবোঽভ্যুগম্যতামিতিচেন্ন। অন্তঃকরণবৃত্তের্জ্ঞানস্য জড়ত্বেন স্বয়ম্প্রকাশত্বাঽযোগাদিতি। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৬৬ পৃষ্ঠা ;

টুক্‌রাকে রূপার টুক্‌রা মনে করিলে, জ্ঞানটি সেখানে জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ রূপের পরিচয় দিতে পারে নাই বলিয়া, মিথ্যা বা অপ্রমাণ হইবে। ইহাই জ্ঞানের সত্য ও মিথ্যার, প্রামাণ্য এবং অপ্রমাণ্যের রহস্য। তথাভূতার্থ-জ্ঞানংহি প্রামাণ্যমুচ্যতে, অতথাভূতার্থজ্ঞানংহি অপ্রামাণ্যম্। মেঘনাদারি-কৃত নয়দ্যুমণি, পুথি; প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের যাহা স্বভাব দেখা গেল, তাহা হইতেই তাহার প্রামাণ্যের (validity) নিশ্চয় করা চলে, তথাত্বাবধারণাত্মকং প্রামাণ্যমাত্মনৈব নিশ্চীয়তে। নয়দ্যুমণি, পুথি; জ্ঞানের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জন্য সেই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের কিংবা বাহিরের কারণের উপর নির্ভর করিতে হয় না। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানে রামানুজ বলেন, জ্ঞেয় বস্তুর যে প্রকৃত রূপের অবধারণ আছে, ইহাই প্রমা-জ্ঞানের প্রমাত্ব বা প্রমাণ্য বলিয়া জানিবে। এতদ্‌ব্যতীত প্রামাণ্য বলিয়া অন্য কোন পদার্থ নাই, যাহার সাধনের জন্য প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের সাধন ছাড়িয়া, অপর কোন সাধনের কিংবা প্রমাণের শরণ লওয়া আবশ্যক। সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল বাহিরের সাধনেরও প্রামাণ্য যাচাই করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে, 'অনবস্থা দোষই' আসিয়া দাঁড়ায়। এই 'অনবস্থা-দোষের' পরিহারের জন্য জ্ঞানের প্রামাণ্যের সাধক প্রামাণান্তরকে অগত্যা 'স্বতঃ প্রমাণ' বলিয়া মানিতে গেলেই, পরতঃ প্রামাণ্যবাদীর 'পরতঃ প্রামাণ্যবাদ' অচল হইয়া পড়ে। অনবস্থা-পরিহারায় কস্যচিৎ স্বতস্ত্বাঙ্গীকারেচ ন পরতঃপ্রামাণ্যম্। নয়দ্যুমনি, পুথি; প্রবৃত্তি বা চেষ্টার সাফল্য দেখিয়া পরতঃপ্রামাণ্যবাদী যে জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্যের অনুমান করিয়া থাকেন, সেখানেও প্রশ্ন আসে এই যে, বুদ্ধিমান্ দর্শকের বস্তু-প্রাপ্তির এইরূপ চেষ্টা বা প্রবৃত্তির মূল কি? তাঁহার এই প্রবৃত্তি কি জ্ঞানমূলক, না অজ্ঞানমূলক? যখন কোনও ব্যক্তিকে আমরা কোনও বস্তু দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইতে দেখি, তখন সহজভাবে এই কথাই মনে হয় যে, ঐ ব্যক্তির ঐরূপ প্রবৃত্তির মূলে আছে তাঁহার প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য-বোধ। তাঁহার দেখাটা ঠিক ইহা না বুঝিলে, কখনই ঐ ব্যক্তি ঐ বস্তুটি পাইবার জন্য উহার প্রতি ধাবিত হইত না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াই চেষ্টা করেন, না জানিয়া করেন না। কোনও ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রামাণ্যে সন্দেহের কারণ ঘটিলে, ঐ সন্দেহ দূর করিবার জন্যও লোকের

প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইতে দেখা যায়। ঐরূপ চেষ্টার মূলে জিজ্ঞাসুর যে জ্ঞান আছে, তাহাকে তো স্বতঃপ্রমাণই বলিতে হইবে, নতুবা সে-স্থলেও তো 'অনবস্থার' আপত্তি উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বক্ষেত্রেই যদি জ্ঞানের প্রামাণ্যকে 'পরতঃ' বা সংবাদমূলক, অনুমান-গম্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে সকলস্থলে সংবাদের পরীক্ষা সম্ভবপর হয় না বলিয়া, আমাদের জ্ঞানের বড় অংশেরই প্রামাণ্য নিরূপণ করা যায় না। সেই অবস্থায় জ্ঞানের কোন মূল্যও দেওয়া যায় না। সর্ব্বত্র সন্দেহবাদই (scepticism) জ্ঞানের রাজ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। এইজন্য জ্ঞানের 'স্বতঃপ্রামাণ্য'-সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, জ্ঞান যে-ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বস্তুর সত্যতা প্রকাশ করতঃ স্বীয় 'প্রমা'রূপের পরিচয় দেয়, সে-ক্ষেত্রে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রামাণ্যের বোধও জ্ঞান-সামগ্রী-বলেই উদিত হয়। ইহাই রামানুজ-মতে জ্ঞানের 'স্বতঃ প্রামাণ্যের' মর্ম্ম বলিয়া জানিবে। পূর্ব্ব-অনুভবসাপেক্ষ বলিয়া স্মৃতি রামানুজের মতে 'স্বতঃপ্রমাণ' নহে। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিলে, জ্ঞানে প্রামাণ্যের সন্দেহের উদয় হয় কেন? পরতঃপ্রামাণ্যবাদীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ-সম্প্রদায় বলেন, যে-সকল সাধনমূলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জানা যায়, ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও তাহাদের সাহায্যেই উৎপন্ন হয় এবং জানা যায়। জ্ঞানের উৎপাদক-সামগ্রী এবং গ্রাহক-সামগ্রীই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও উৎপাদক এবং গ্রাহক বটে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞান-সামগ্রীর মধ্যে কোথায়ও কিছু দোষ (defects) থাকার দরুণ জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত রূপের পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না ; জ্ঞানের 'তথাভূতার্থাবধারণ'-ক্ষমতা সেখানে ব্যাহত হয়, এবং তাহারই ফলে কোন কোন স্থলে জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কেও সংশয় জাগরূক হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য-সিদ্ধান্তের অপলাপ হয় না।[১]

জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য-সম্পর্কে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত

জ্ঞানের 'স্বতঃপ্রামাণ্য'-সিদ্ধান্ত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরও অভিপ্রেত। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যের অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে বলিয়াছেন, প্রামাণ্য শব্দের অর্থ প্রমাত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের যথার্থতা। জ্ঞানের

১। ন্যায়কুলীশ পুঁথি, ২৭ পৃষ্ঠা;

এই যথার্থতা বা প্রমাত্ব সেই ক্ষেত্রেই শুধু দেখা যায়, যেখানে জ্ঞেয় বস্তুর সত্য রূপকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রূপার খণ্ড দেখিয়া 'ইহা একখণ্ড রূপা' এইরূপে যে জ্ঞানোদয় হয়, সেই জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ঐ জ্ঞানকে (তদ্‌বতি তৎ-প্রকারক-জ্ঞান বা) 'প্রমা-জ্ঞান' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ঝিনুক খণ্ডকে রূপার খণ্ড মনে করিলে, (ঐ জ্ঞান 'তদ্‌বতি তৎপ্রকারক' হয় না, অর্থাৎ) ঐরূপ জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জন্য ঐ জাতীয় জ্ঞানকে প্রমা-জ্ঞান বলা যায় না, উহা অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞান। জ্ঞানের ঐরূপ সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের, প্রামাণ্যের এবং অপ্রামাণ্যের মাপকাঠি কি? ইহার উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলেন, জ্ঞান প্রমা বা যথার্থ হওয়াই স্বাভাবিক। জ্ঞানের উপাদানের মধ্যে কোথায়ও কোনরূপ দোষস্পর্শ না থাকিলে, জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান জ্ঞানকে যেমন উৎপাদন করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও উৎপাদন করিয়া থাকে। তারপর যেই সামগ্রী বা উপাদানমূলে জ্ঞানটি আমাদের গোচর হয়, সেই সামগ্রী-বলেই জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও আমরা জানিতে পারি।[১] দোষ অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞান উৎপাদন করে। মিথ্যা-জ্ঞানও এক শ্রেণীর জ্ঞান। সুতরাং ভ্রম-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান বিদ্যমান আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে সেখানে জ্ঞানের সামগ্রীতে দোষ থাকার দরুণই সেই শ্রেণীর জ্ঞানকে অপ্রমা বা ভ্রম বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান সত্য এবং মিথ্যা, উভয় প্রকার জ্ঞানের স্থলেই বিদ্যমান থাকে; জ্ঞানের সামগ্রীর সহিত দোষ মিলিত হইয়া জ্ঞানকে অপ্রমায় পরিণত করে। জ্ঞানের সামগ্রীতে কোনরূপ দোষ-সংস্পর্শ না থাকিলে, জ্ঞান সে-ক্ষেত্রে প্রমা বা যথার্থই হইবে, ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে দোষাভাব-সহকৃত অন্যনিরপেক্ষ জ্ঞান-সামগ্রীকেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের জনক এবং গ্রাহক বলা হইয়া থাকে। দোষাভাবে সত্যন্যনিরপেক্ষত্বে চ সতি যাবৎ স্বাশ্রয়ভূতপ্রমাগ্রাহকসামগ্রী-গ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বম্। তেন প্রামাণ্যং গৃহ্যতে। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৫৩ পৃষ্ঠা;

১। প্রামাণ্যং স্বত এব গ্রাহ্যং প্রামাণ্যং নাম তদ্‌যাথাত্ম্যং তত্ত্বঞ্চ তদ্‌বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানত্বম্... ....বস্তুতস্ত যাবৎ স্বাশ্রয়ভূত॰মাগ্রাহকসামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যত্বম্ স্বতস্ত্বম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৫২-২৫৩ পৃষ্ঠা;

পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িকের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দোষের অভাবকে প্রামাণ্যের সহকারী কারণ হিসাবে গণনা করিলে, (জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান ছাড়াও দোষের অভাবকে প্রামাণ্যের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিলে) নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এই মত তো পরতঃ প্রামাণ্যবাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ মতকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের মর্য্যাদা দান করেন কি হিসাবে ? এইরূপ আপত্তির উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলেন যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য-সাধনের জন্য জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদানের অতিরিক্ত আগন্তুক কোন ভাবরূপ (positive) কারণের অপেক্ষা থাকিলেই, সেক্ষেত্রে জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য-সিদ্ধান্ত করা চলে না। জ্ঞানকে ঐরূপ ক্ষেত্রে 'পরতঃ প্রমাণ' বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। আগন্তুক ভাবরূপ হেত্বপেক্ষায়াং পরতস্ত্বাভ্যুপগমাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৫৩ পৃষ্ঠা ; আগন্তুক কোন ভাবরূপ কারণের অপেক্ষা না থাকিলে, দোষের অভাবরূপ কারণকে সহকারী বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তাহা দ্বারা জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যের ব্যাঘাত জন্মে না। ইহাই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞানের 'স্বতঃপ্রামাণ্যের' মূল কথা। জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্যের সমর্থক নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকের মতে অনুব্যবসায়ের (introspection) সাহায্যে জ্ঞানকে জানা যায়, অনুমানের সাহায্যে জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হয়। এই মতে জ্ঞান-সামগ্রী হইতে পৃথক্ ভাবরূপ অনুব্যবসায়-জ্ঞানকে জ্ঞানের গ্রাহক, এবং সার্থক-চেষ্টার (সফল-প্রবৃত্তির) জনক অনুমানকে জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক বলিয়া অঙ্গীকার করায়, এই মত 'পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরতঃ প্রামাণ্যবাদের উল্লিখিত তাৎপর্য্যই নিম্বার্কপন্থী বৈদান্তিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।[1]

১। পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৫৩ পৃষ্ঠা ;

নবম পরিচ্ছেদ

অপ্রমা-পরিচয়

জ্ঞানের প্রামাণ্য পরীক্ষা করা গেল। এই প্রবন্ধে অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। অপ্রমা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বনাথ তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, তচ্ছূন্যে তন্মতির্যাস্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১২৭ কারিকা; যে-বস্তু প্রকৃতপক্ষে যেখানে নাই, সেখানে সেই অবিদ্যমান বস্তু-সম্পর্কে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জ্ঞানই অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞান বলিয়া জানিবে। আলোচ্য অপ্রমা-জ্ঞান প্রধানতঃ দুই প্রকার—(ক) ভ্রম এবং (খ) সংশয়। ভ্রম ও সংশয় ছাড়া, অযথার্থ স্মৃতি, স্বপ্ন, অনধ্যবসায়, উহ প্রভৃতিও অপ্রমারই নানারূপ রকমান্তর বটে। অপ্রমার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা ঐ সকলেরও পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। সংশয়ের ব্যাখ্যায় ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, 'বিমর্শঃ সংশয়ঃ,' 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ জ্ঞান; কোন একটি পদার্থে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ নানাপ্রকার জ্ঞানোদয়ের নাম সংশয়।[১] এই সংশয়ও যে এক শ্রেণীর জ্ঞান, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। কেননা, যেই বিষয়-সম্পর্কে আমাদের কোনরূপ জ্ঞানই নাই, সেই বিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব আছে, কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ে তো কাহারও কখনও কোনরূপ সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায় না। একই কালে একই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্ম থাকে না, থাকিতে পারে না। একই পদার্থে একই সময়ে যাহা থাকিতে পারে না সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্মের একত্র জ্ঞান জন্মিলেই সেই জ্ঞান সংশয়াত্মকই হইবে। নৈয়ায়িকের আলোচ্য দৃষ্টির অনুরূপ দৃষ্টিতে সংশয়ের লক্ষণ এবং বিভাগ করিতে গিয়া দ্বৈতবেদান্তী মাধ্ব-সম্প্রদায় বলেন, যেই জ্ঞানে বস্তুর প্রকৃত রূপের অবধারণ বা নিশ্চয় নাই, তাহাকেই সংশয় বলে।

১। একধর্ম্মিকবিরুদ্ধভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ।
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৩০ কারিকা;

প্রমিদং সংশয়ত্বম্? অনবধারণত্বং তদিতি, প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩২ পৃষ্ঠা, এবকাতা বিশ্বঃ বিঃ সং; উল্লিখিত 'অনবধারণ' কথাটির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া সংশয়ের একটি নির্দ্দোষ সংজ্ঞা দিতে গিয়া শ্রীমচ্ছলারি শেষাচার্য্য তাঁহার প্রমাণচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন যে, 'একই পদার্থে প্রতিভাত পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যেই জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকেই সংশয় ('অনবধারণ-জ্ঞান') বলিয়া জানিবে।[১] জ্ঞানমাত্রই কিছু সংশয় নহে, তাহা হইলে পুস্তকাধারে অবস্থিত আমার এই পুস্তকের সত্য-জ্ঞানও সংশয়-লক্ষণাক্রান্তই হইয়া দাঁড়ায় না কি? সংশয়-জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ-প্রদর্শনের জন্যই জ্ঞানকে 'একাধিক বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট' এইরূপে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সংশয়কে কেবল 'একাধিক ধর্ম্মবিশিষ্ট' হইলেই চলিবে না, সেই ধর্ম্মগুলি আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হওয়া চাই; নতুবা 'ঘটো দ্রব্যম্' 'বটো বৃক্ষঃ' এই প্রকার জ্ঞানে ঘটে ঘটত্ব এবং দ্রব্যত্ব, বটে বটত্ব এবং বৃক্ষত্ব, এইরূপ একাধিক ধর্ম্মের ভাতি হওয়ায়, ঐরূপ জ্ঞানও সংশয়ই হইয়া পড়ে। আলোচ্য ধর্ম্মসকল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নহে বলিয়াই, ঐরূপ জ্ঞানকে সংশয় বলা চলে না। সংশয়ের প্রকাশক বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সকল কোন একটিমাত্র পদার্থকে (ধর্ম্মীকে) আশ্রয় করিয়া যেখানে আত্মপ্রকাশ লাভ করে, সেই ক্ষেত্রেই সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায়। ফলে, বৃক্ষপুরুষৌ, বৃক্ষ এবং পুরুষ, ঘট-পট-স্তম্ভ-কুম্ভাঃ, ঘট, পট, খুটি এবং ঘড়া, এইরূপ সমূহালম্বন-জ্ঞানের (collective cognition) ক্ষেত্রে সংশয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন আসে না। সমূহালম্বন জ্ঞানে (collective cognition) নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ভাতি হয় বটে, তবে সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ভাতি কোন একটি পদার্থকে (ধর্ম্মীকে) আশ্রয় করিয়া উদিত হয় না। বিভিন্ন ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই সমূহাবলম্বন-জ্ঞানকে (collective cognition) কোনমতেই সংশয়ের লক্ষ্য বলা চলে না। সংশয়ের স্থলে যেই ব্যক্তির সংশয় জন্মে, তাঁহার দৃষ্টিতে একই সময়ে সংশয়ের মূল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশি-

---

১। একস্মিন্ ধর্মিণি ভাসমানবিরুদ্ধানেকাকারাবগাহি জ্ঞানস্যৈব অনবধারণ-পদেন বিবক্ষিতত্বাৎ।

প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩২ পৃষ্ঠা, কলিঃ বিশ্বঃ বিঃ সং;

হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই বস্তুতে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রকাশ একই সময়ে সমানভাবে না ঘটিলে, সেক্ষেত্রে সংশয়ের উদয় হয় না, হইতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্যই মাধ্বোক্ত সংশয়ের লক্ষণে 'ভাসমান' পদটির অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পথে চলিতে চলিতে পথের উপর পতিত ঝিনুকের টুক্‌রা দেখিয়া, 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে ভ্রম-জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানে একই ঝিনুক-খণ্ডে পরস্পর-বিরুদ্ধ শুক্তি-ধর্ম্মের এবং রজতের ধর্ম্মের বোধ হয় বটে; কিন্তু সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটি একই সময়ে জ্ঞাতার দৃষ্টিতে ভাসে না। যখন ভ্রান্ত ব্যক্তির ঝিনুক-খণ্ডে মিথ্যা-রজত বোধের উদয় হয়, তখন সেখানে রজতের বিরুদ্ধ ঝিনুক-খণ্ডের জ্ঞান জন্মে না, আবার যখন ঝিনুক-খণ্ডের বোধ উৎপন্ন হয়, তখন রজত-জ্ঞানের উদয় হয় না; অর্থাৎ একই সময়ে শুক্তি ও রজত, এই দুইটি পদার্থের পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বোধ শুক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভ্রমের স্থলে প্রকাশ পায় না। এইজন্য 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রম-জ্ঞানকে কোনমতেই সংশয় বলা চলে না।[১] এই সংশয়কে ন্যায়-সূত্রকার গৌতম (ক) সাধারণ-ধর্ম্মজন্য সংশয়, (খ) অসাধারণ-ধর্ম্মজন্য সংশয়, (গ) বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যমূলক সংশয়, (ঘ) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় এবং (ঙ) অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, এই পাঁচ প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে আমরা ঐ সকল সংশয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের ধারে উচ্চতায় এবং বিস্তৃতিতে মানুষেরই সমান একটি মুড়া-গাছের গুঁড়ি দেখিয়া, গাছের গুঁড়ি এবং মানুষের কোনরূপ বিশেষ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াও অপারগ হইয়া পথিক সংশয় করিয়া থাকেন, অদূরে ঐ যে দেখা যাইতেছে, উহা কি একটি গাছের গুঁড়ি, না একটি মানুষ? এই প্রকার সংশয়ের মূলে

১। জ্ঞানং সংশয় ইত্যুক্তে অয়ংঘট ইতি জ্ঞানেঽতিব্যাপ্তিঃ, অতোঽনেকা-র্থাবগাহীত্যুক্তম্। তাবত্যুক্তে স্থাণুপুরুষৌ ঘটপটস্তম্ভকুম্ভা ইত্যাদি সমূহালম্বনেঽতি-ব্যাপ্তিঃ, তৎপরিহারার্থং একস্মিন্ ধর্ম্মিণীতি। তাবত্যুক্তে বৃক্ষঃ শিংশপা, ঘটো-দ্রব্যমিত্যাদিজ্ঞানেঽতিব্যাপ্তিঃ, অতো বিরুদ্ধেতি। তাবত্যুক্তে ইদং রজতমিতি ভ্রমেঽতিব্যাপ্তিঃ, অতো ভাসমানেতি। অত্র বিরোধে ভাসমানত্বস্য বিবক্ষিতত্বান্নোক্ত-দোষইত্যবধেয়ম্। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩২ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং;

রয়েছে মুড়া-গাছের গুঁড়ি এবং মানুষ, এই উভয়েরই যাহা সাধারণ-ধর্ম্ম (common mark) সেইরূপ উচ্চতা, বিস্তৃতি প্রভৃতির বোধ। এইজন্য এই জাতীয় সংশয়কে নৈয়ায়িক সাধারণ-ধর্ম্মজন্য সংশয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে অসাধারণ ধর্ম্মের ভিত্তিতেও সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায়। যেমন শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্ব, এই শব্দত্ব কেবল শব্দেই থাকে, শব্দ ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইহা থাকে না। সুতরাং শব্দত্ব যে শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম (uncommon characteristics) তাহাতে সন্দেহ কি? এখন এই শব্দে যদি নিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্মের, কিংবা অনিত্য পদার্থের কোনও বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকে, তবে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপে যে সংশয়ের উদয় হইবে, তাহাকে এই ক্ষেত্রে শব্দত্বরূপ অসাধারণ-ধর্ম্মজন্য সংশয় বলাই যুক্তিযুক্ত হইবে নাকি? একজন দার্শনিকের মুখে 'জগৎ মিথ্যা', আর একজনের মুখে 'জগৎ সত্যম্', এইরূপ বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, তৃতীয় ব্যক্তির জগৎ সত্য, কি মিথ্যা, এইরূপে যে সংশয় জন্মে, তাহাকে বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-উক্তিমূলক সংশয় বলা যায়। পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, আবার বিদ্যমান না থাকিলেও, ভ্রান্তি বশতঃ স্থলবিশেষে সেই পদার্থের উপলব্ধি হইতে দেখা যায়। সুতরাং উপলব্ধির কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় কূপ খনন করিয়া জল দেখিয়া সংশয় জন্মিল যে, জল কি পূর্ব্ব হইতেই কূপের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, না খননের ফলে কূপে পূর্ব্বে অবিদ্যমান জলের উদ্ভব হইল। এইরূপে যে সংশয়ের উদয় হইয়া থাকে, তাহাকে উপলব্ধির অব্যবস্থা-জন্য সংশয় বলে। বস্তুর উপলব্ধির যেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, বস্তুর অনুপলব্ধিরও সেইরূপ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। হিমগিরি-কিরীটিনী রত্নপ্রসবিনী ধরণীর গর্ভে কত অমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত আছে, তাহা আমাদের উপলব্ধির গোচরে আসে না। তারপর, যাহার উৎপত্তি হয় নাই, কিংবা চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে তাহারও উপলব্ধি হয় না। এইরূপ অবস্থায় কোন পদার্থের উপলব্ধি না হইলেই, ঐ বস্তু আছে, কি নাই,

---

১। স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিণাহৌ পশ্যন্ পূর্ব্বদৃষ্টঞ্চ তয়োর্বিশেষং বুভুৎসমানঃ কিংস্বিদিত্যন্যতরং নাবধারয়তি, তদনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ।

ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়ন-ভাষ্য, ১।১।২৩;

এইরূপ সংশয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মহাশ্মশানের নিকটবর্ত্তী বটগাছে ভূত বাস করে, এইরূপে যিনি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, তিনি যদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও ঐ বট গাছে ভূত দেখিতে না পান, তবে তাঁহার মনে এইরূপ সংশয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, ভূত কি বস্তুতঃ নাই, সেইজন্যই আমি ভূত দেখিতে পাইতেছি না, কিংবা ভূত গাছে থাকিয়াও তাহার তিরোধান-শক্তি বশতঃ তিরোহিত হইয়া আছে, এইজন্যই বৃক্ষে অবস্থিত ভূত আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এইরূপে যে সংশয়ের উদয় হয়, তাহাকে অনুপলব্ধির অব্যবস্থামূলক সংশয় বলা হইয়া থাকে।[১] উল্লিখিত গৌতমের মতের সমালোচনা করিয়া মাধ্ব-বেদান্তী বলেন যে, মহর্ষি গৌতম আলোচ্য দৃষ্টিতে সংশয়কে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিলেও, ধীরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অনবস্থামূলে সংশয়ের যে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনই মূল্য নাই। কেননা, সর্ব্বপ্রকার সংশয়ই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উহা সংশয়মাত্রেরই কারণ, কোন প্রকার বিশেষরূপ সংশয়ের কারণ নহে। যে দুইটি বিরুদ্ধ কোটিকে লইয়া সংশয়ের উদয় হয়, তাহার যে-কোন একটির নিশ্চয়ের হেতু না থাকাই উপলব্ধির অব্যবস্থা, এবং যে-কোন একটির অভাবের নির্ণয়ের প্রবলতর হেতু না থাকাই অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিয়া নৈয়ায়িক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশয়মাত্রেই এই দুইটি থাকা একান্ত আবশ্যক। গাছের গোড়া, কি মানুষ, ইহার একটার নিশ্চয় হইলে, কিংবা উহার একটার অভাব বুঝা গেলে, সেক্ষেত্রে গাছের গোড়া, না মানুষ, এইরূপ সংশয় কিছুতেই জন্মিবে না। গাছের গোড়া এবং মানুষের দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি প্রভৃতি সাধারণ-ধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলেও, বিশেষ নিশ্চয় থাকিলে, ঐ অবস্থায় সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া, আলোচ্য উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের সাধারণ কারণ

১। (ক) সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ। ন্যায়সূত্র, ১।১।২৩,

(খ) তস্য সংশয়স্য নির্ণায়কাভাবসহকৃতাঃ সাধারণধর্ম্মাসাধারণধর্ম্মবিপ্রতিপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধয়ঃ পঞ্চ কারণানীতি কেচিদাহুঃ। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১০২ পৃষ্ঠা ;

জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ৯-১০ পৃষ্ঠা ;

বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ফলে, সংশয় পাঁচ প্রকার না হইয়া তিন প্রকারই হইয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ মাধ্ব-পণ্ডিতগণ উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থামূলক সংশয়কে, এমন কি ন্যায়োক্ত বিপ্রতিপত্তি-জন্য[১] এবং অসাধারণ-ধর্ম্মজন্য সংশয়কেও সাধারণ-ধর্ম্মমূলক সংশয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, সংশয়কে সাধারণ-ধর্ম্মজন্য এক প্রকার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অন্তর্ভাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন, অন্ধকার-গৃহে বিদ্যমান ঘটের আলোক-আনয়ন প্রভৃতির ফলে উপলব্ধি হইয়া থাকে। আবার অবিদ্যমান ঘটেরও মৃৎশিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের ফলে উপলব্ধি হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় উপলব্ধিকে বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান, এই উভয় প্রকার ঘটের সাধারণ-ধর্ম্ম হিসাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। তারপর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরেরও যেমন প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ আকাশ-কুসুম প্রভৃতি অলীক বস্তুরও প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইতে দেখা যায় না। অনুপলব্ধিকেও এই অবস্থায় নিত্য পরমেশ্বরের এবং অলীক আকাশ-কুসুম প্রভৃতির সাধারণ-ধর্ম্ম বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করা যায় এবং সেই সাধারণ-ধর্ম্মমূলেই ঐ সকল সংশয়ের উপপাদন করা চলে। অসাধারণ-ধর্ম্মের জ্ঞানমূলে আকাশের গুণ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপে যে সন্দেহের উদয় হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় যে, উহাও বস্তুতঃপক্ষে সাধারণ-ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য সংশয়ই বটে। প্রথমতঃ কথা এই যে, 'শব্দ একমাত্র আকাশের গুণ' এইরূপ শুনিয়া তো কাহারও কোনরূপ সন্দেহেরই উদয় হইবে না। কেননা, সন্দেহের দুইটি কোটি অবশ্য থাকা চাই ; এইটা না এইটা, এইরূপ কোটিদ্বয়ের ভান না হইলে, সেখানে সংশয়ের কথাই উঠে না। অসাধারণ-ধর্ম্মমূলে যেখানে সংশয়ের উদয় হইবে, সেক্ষেত্রেও সংশয় উপপাদনের জন্যই সংশয়ের দুইটি কোটিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। আলোচ্য স্থলে 'নিত্য, কি অনিত্য', ইহাই সেই কোটিদ্বয়। শব্দত্ব শব্দের অসাধারণ-ধর্ম্ম। ইহাকে শব্দের অসাধারণ-ধর্ম্ম বলা হয়, কারণ, ঐ শব্দত্ব ধর্ম্মটি একমাত্র শব্দেই আছে, শব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিত্য বস্তুতেও ঐ (শব্দত্ব) ধর্ম্ম নাই, এবং অনিত্য বস্তুতেও উহা নাই। শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্বে অপরাপর নিত্য

মাধ্ব-মতে সংশয়ের বিবরণ

১। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩৩ পৃষ্ঠা ; প্রমাণপদ্ধতি, ১০ পৃষ্ঠা ;

এবং অনিত্য এই উভয়বিধ পদার্থের অভাবরূপ সাধারণ-ধর্ম্মই আছে। ফলে, শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়কেও সাধারণ-ধর্ম্মমূলক সংশয়ই বলা চলে। পার্থক্য শুধু এই যে, 'স্থাণুর্বা পুরুষোবা', মানুষ, না গাছের গোড়া, এইপ্রকার সংশয়ের স্থলে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ-ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি প্রভৃতির বোধ হয় ভাবমূলে, (positively) আর শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ স্থলে শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্বে নিত্য এবং অনিত্য, এই উভয় কোটির অভাবরূপ সাধারণ-ধর্ম্মের বোধ হয় অভাবমুখে (negatively)[১] তারপর, বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তি প্রভৃতি তো দেখা যায় সংশয়ের প্রযোজকমাত্র, সাক্ষাৎ সাধন নহে। ঐ সকল স্থলেও যে সাধারণ-ধর্ম্মের জ্ঞানবশতঃই সংশয়ের উদয় হয়, ইহা ন্যায়-বৃত্তির রচয়িতা বিশ্বনাথ প্রভৃতিও স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও সংশয়কে সাধারণ-ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য এক প্রকার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক-সূত্রের উপস্কারে পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, ন্যায়াচার্য্য গৌতম তাঁহার ন্যায়-দর্শনে অসাধারণ-ধর্ম্ম প্রভৃতির জ্ঞানমূলে সংশয়ের পাঁচ প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিলেও, বৈশেষিকাচার্য্য কণাদ তাহা অনুমোদন করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, মহর্ষি কণাদ সংশয়ের ন্যায় 'অনধ্যবসায়' (indecision) নামে এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।[২] কণাদের সিদ্ধান্তে আলোচ্য অসাধারণ-ধর্ম্মের জ্ঞান 'অনধ্যবসায়' নামক জ্ঞানেরই কারণ, সংশয়ের তাহা কারণ নহে। সাধারণ-ধর্ম্মের (common character) বোধই সংশয়ের কারণ। কণাদোক্ত 'অনধ্যবসায়' নামক জ্ঞানকে মহামুনি গৌতম এক শ্রেণীর সংশয় বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশয়ের গৌতমোক্ত পাঁচ প্রকার বিভাগ উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক আচার্য্যগণের

১। বয়স্তুক্রমঃ, অসাধারণধর্ম্মবিপ্রতিপত্ত্যোরপি সাধারণধর্ম্মএবান্তর্ভাবঃ। অসাধারণধর্ম্মোহি ন স্বরূপেণ সংশয়হেতুঃ, কিন্তু ব্যাবৃত্তিমুখেনৈব। তথাচ নিত্য-ব্যাবৃত্তত্বমনিত্যস্য, অনিত্যব্যাবৃত্তত্বঞ্চ নিত্যস্য ধর্ম্ম ইতি সাধারণ এব। প্রমাণ-পদ্ধতি এবং প্রমাণপদ্ধতির জনার্দন-কৃত টীকা, ১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;

২। কণাদ-কৃত বৈশেষিক-সূত্রে কোথায়ও 'অনধ্যবসায়' (indecision) নামক জ্ঞানের উল্লেখ দেখা যায় না। কণাদ-রচিত বৈশেষিক-দর্শনের ব্যাখ্যাতা আচার্য্য প্রশস্তপাদ তাঁহার পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ নামক গ্রন্থে অনধ্যবসায় জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুমোদন লাভ করে নাই। কিং সংজ্ঞকোঽয়ং বৃক্ষঃ? এই গাছটির নাম কি? এই প্রকার 'অনধ্যবসায়' (বা অনিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান এবং প্রাঙ্গনে ঐ যে দাঁড়ান দেখা যায়, উহা সম্ভবতঃ একটি পুরুষই বটে, এই প্রকার উহ বা সম্ভাবনা-জ্ঞান যে সংশয়ই বটে, সংশয় ব্যতীত অপর কিছু নহে, তাহা দ্বৈত-বেদান্তী জয়তীর্থ তাঁহার প্রমাণপদ্ধতি নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রবীণ আচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়-পরিশুদ্ধি গ্রন্থে সংশয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রামানুজ-মতে সংশয়ের বিশ্লেষণ

বেঙ্কটের সংশয়ের ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বেঙ্কটনাথ সংশয়ের বিভাগ কত প্রকার হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি সংশয়ের ক্ষেত্রে মানসিক ভাব-প্রবাহের কি প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, মনোবিজ্ঞানের কি অবস্থায় সংশয়ের চিত্র মানবের চিত্ত-পটে নানা বর্ণে ফুটিয়া উঠে, নিপুণ শিল্পীর ন্যায় তাহারই অতি সুন্দর এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানমাত্রই দোষমূলক। সংশয়ও একজাতীয় মিথ্যা-জ্ঞানই বটে। সুতরাং সংশয়ের মূলেও যে জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কোন-না-কোন প্রকার দোষ অবশ্যই থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। রজঃ এবং তমোগুণের ধূলি-জালে মন যখন আচ্ছন্ন হয়, মনে তখন সত্ত্ব গুণের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে, চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ইন্দ্রিয়জ-বিজ্ঞানের সঙ্গে দৃশ্য বিষয়ের যেই প্রকার ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে বস্তুর যথার্থ-জ্ঞান মানুষের মনে উদিত হয়, সেই প্রকার সংযোগের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে; এবং তাহারই ফলে বস্তুর সত্য-জ্ঞানোদয় বাধা-প্রাপ্ত হয়, ভ্রম, সংশয় প্রভৃতির উদয় হইয়া জ্ঞান-রাজ্যে আবিলতার সৃষ্টি হয়। বস্তুর সত্য-জ্ঞান বাধা-প্রাপ্ত হইলেই, মানুষের মন তখন বস্তুর প্রকৃতরূপ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, সেই বস্তু-সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ ভাবের কল্পনা করিতে থাকে। সত্য-নির্ণয়ে অক্ষম এরূপ মনকে দোলার সহিত তুলনা করা যায়। দোলা যেমন দুই দিকে ঘুরিতে থাকে; একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়, কোন এক দিকেই স্থিতি লাভ করে না। সেইরূপ দোলা-চঞ্চল মানব-চিত্তও অদূরে যে মুড়া গাছটি দেখা যাইতেছে

তাহা কি গাছের গুঁড়ি, না একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে? (স্থাণুর্বা পুরুষো বা) এইরূপ ভাবে একদিকে গাছের গুঁড়ি এবং অপর দিকে মানুষ, এই দুই দিকেই ঘুরিতে থাকে।[১] দোলাবেগবদত্রস্ফুরণ-ক্রমঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৫৮ পৃষ্ঠা: একই গাছের গুঁড়ি একই সময়ে মানুষ এবং গাছের গুঁড়ি, এই দুই হইতে পারে না, ইহা বুদ্ধিমান্ মানুষ বুঝিলেও, একের অনুকূলে এবং অপরের প্রতিকূলে কোন প্রবল যুক্তি সে খুঁজিয়া পায় না বলিয়া, সংশয়ের দোলায় চড়িয়া বেড়ান ভিন্ন তাহার তখন আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না। এইরূপ সংশয়ের কারণ সাধারণ-ধর্ম্মের (common character) জ্ঞান এবং বিশেষ নিরূপণের চেষ্টা থাকিলেও বিশেষ-ধর্ম্মের (special mark) অজ্ঞান। গাছের গুঁড়ি এবং পুরুষের মধ্যে যে একই প্রকার দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি প্রভৃতি সমান-ধর্ম্ম বা সাধারণ-ধর্ম্ম (common character) আছে, তাহা সংশয়াতুর দর্শকের স্মৃতি-পটে জাগরূক হয় বটে, কিন্তু গাছের গুঁড়ি এবং মানুষের কোনরূপ বিশেষ-ধর্ম্ম, (special mark) যেই বিশেষ-ধর্ম্মের জ্ঞানের ফলে ইহা গাছের গুঁড়ি, না মানুষ, তাহা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়, সেইরূপ (স্থাণু এবং পুরুষের) কোন বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায় না। এই অবস্থায়ই সংশয় আসে, ইহা কি মুড়া গাছ, না একটি মানুষ? এইরূপ সংশয় একই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক কোটিকে অবলম্বন করিয়া উদিত হইয়া থাকে। এই বিরুদ্ধ কোটিকে নব্য-নৈয়ায়িকগণ ভাব ও অভাবরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িকগণের মতে "স্থাণুর্নবা"? ইহা স্থাণু কিনা? ইহাই হইবে সংশয়-জ্ঞানের আকার (form)। ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধ-কোটি ব্যতীত, পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবরূপ কোটিদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া "স্থাণুর্বা পুরুষো বা" এইরূপে যে সংশয়ের স্ফুরণ হইতে পারে, তাহা নব্য-নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন-মতে দুই বা ততোধিক পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব কোটিকে লইয়াও সংশয়ের উদয় হইতে কোন বাধা নাই। দুইটি

১। যথা একমেবদোলাপ্রেরণং পরস্পরোপমর্দকসম্বন্ধমানদিগ্দ্বয়সংযোগ-হেতুত্বে ভানং জনয়তি। তথা এক এবেন্দ্রিয়সংযোগঃ পরস্পরোপমর্দকসম্বন্ধমান-ভাবাভাবগোচরজ্ঞানপরম্পরাং জনয়তীতি ভাবঃ।

ন্যায়পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-কৃত টীকা, ৫৮ পৃষ্ঠা;

কোটির ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ বহু ভাব-কোটিকে লইয়াও যে সংশয়ের উদয় হইতে পারে, তাহা বেঙ্কটনাথও অনুমোদন করিয়াছেন; এবং ইহা বুঝাইবার জন্যই বেঙ্কট তাঁহার সংশয়ের লক্ষণে 'অনেক' পদটির অবতারণা করিয়াছেন। সংশয়ের ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরুদ্ধ একাধিক কোটির সমানভাবে স্ফুরণ একান্ত আবশ্যক। তুল্যভাবে বিরুদ্ধ কোটিগুলির স্ফুরণের ফলেই, সংশয় যে 'পীতঃ শঙ্খঃ' এই প্রকার বিপর্য্যয় বা ভ্রম-জ্ঞান নহে, কিংবা ঘটে 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ ঘট-বুদ্ধির ন্যায় প্রমা বা সত্য-জ্ঞানও নহে, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। আলোচিত সংশয়ের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বেঙ্কট তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন, যে-ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট বস্তুর উচ্চতা, বিস্তৃতি প্রভৃতি সাধারণ-ধর্ম্মের স্ফুরণ হয়, এবং ঐ উচ্চতা, বিস্তৃতি প্রভৃতি সাধারণ-ধর্ম্মের সহিত যাহাদের বিরোধ নাই, অথচ যাহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ, এইরূপ স্থাণুত্ব, পুরুষত্ব প্রভৃতির বোধ যদি একই সাধারণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকে, স্থাণু কিংবা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া উদিত হয়; এবং স্থাণু কিংবা পুরুষ, এইরূপ বিশেষভাবে নিশ্চয় করিবার অনুকূল কোনরূপ বলিষ্ঠ হেতু যদি সেই ক্ষেত্রে না থাকে, তবে ঐরূপ জ্ঞানকে সংশয়-জ্ঞান বলিয়া জানিবে।[১] এখন কথা এই যে, সামান্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন বস্তুতে (ধর্ম্মীতে) পরস্পর-বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্মের স্ফুরণকেই যদি সংশয় বলা হয়, তবে যে-ক্ষেত্রে সংশয়ের সূচক বিরুদ্ধ-কোটি-গুলির সুস্পষ্ট স্ফুরণ হয় না, সাধারণ-ধর্ম্মেরও (common characteristic) অবগতি সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ স্থলে সংশয় জাগে কিরূপে? উল্লিখিত

১। সামান্যধর্মিস্ফুরণে সত্যপ্রতিপন্নতদবিরোধপ্রতিপন্নমিথোবিরোধানেক-বিশেষস্ফুরণং সংশয়ঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৫৭ পৃষ্ঠা;

গোত্ব এবং অশ্বত্ব, এই দুইটি ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ (গোত্বাশ্বত্বে পরস্পর-বিরুদ্ধে) এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক যথার্থ-জ্ঞানে সংশয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংশয়ের লক্ষণে 'ধর্মিস্ফুরণেসতি' এই (সত্যন্ত) পদটির অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উল্লিখিত স্থলে গোত্ব এবং অশ্বত্ব, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের স্ফুরণ কোনও একটি ধর্ম্মীকে (বিশেষ্য পদার্থকে) আশ্রয় করিয়া উদিত হয় নাই; সুতরাং ঐরূপ জ্ঞানকে সংশয় বলা চলে না। সংশয়ের স্থলে কেবল ধর্ম্মীর স্ফুরণ হইলেই চলিবে না। ঐ ধর্ম্মীটিকে (বিশেষ্য পদার্থটিকে) সংশয়ের সূচক পরস্পর বিরুদ্ধ কোটির মধ্যে যে সকল (দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি প্রভৃতি) সাধারণ-ধর্ম্ম (common mark) দেখা যায়, সেই সকল সাধারণ-ধর্ম্মবিশিষ্টও হইতে হইবে, নতুবা সংশয় সেখানে

সংশয়ের লক্ষণের সঙ্গতিই বা হয় কিরূপে? দৃষ্টান্তস্বরূপে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, না জ্ঞাতা? জ্ঞান কি আত্মার ধর্ম্ম, না স্বতন্ত্র পদার্থ? এই শ্রেণীর সংশয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল স্থলে 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এইরূপ সংশয়ের ন্যায় বিরুদ্ধ কোটির সুস্পষ্ট স্ফুরণ নাই, কোনরূপ সাধারণ-ধর্ম্মেরও জ্ঞানোদয় স্পষ্টতঃ ঘটে নাই। এই অবস্থায় আলোচ্য স্থলে সংশয়ের উপপাদন সম্ভবপর হয় কিরূপে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, আত্মার স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে দার্শনিক পরমাচার্য্যগণের মধ্যে নানা-প্রকার মত-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ফলে, আত্মার স্বরূপ প্রভৃতি তর্কিত বিষয়-

জন্মিবেই না। এইজন্যই ঘট-পটৌ মিথো ভিন্নৌ, ঘট, এবং পট ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, এইরূপ যথার্থ জ্ঞানে সংশয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিল না। কেননা, এস্থলে ধর্ম্মী, বা বিশেষ্য ঘট, পট প্রভৃতির স্ফুরণ থাকিলেও, সংশয়ের সূচক বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, সেই সামান্য-ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ধর্ম্মীর এখানে স্ফুরণ হয় নাই। ভাল, ঘট-পটৌ মিথো ভিন্নৌ, এই কথার পর যদি 'তুল্যপরিমাণৌ' এইরূপ একটি বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়া হয়, তবে এস্থলে তুল্যপরিমানস্বরূপ সাধারণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীরই অবশ্য স্ফুরণ হইবে। এইরূপ জ্ঞানকে সংশয়-জ্ঞান বলা যাইবে কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়পরি-শুদ্ধির টীকাকার শ্রীনিবাস বলেন যে, ঐরূপ জ্ঞানে সংশয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াই, আলোচ্য সংশয়ের লক্ষণে দুই বা বহু কোটির যে স্ফুরণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (অনেকবিশেষস্ফুরণম্) তাহাকে এইভাবে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সংশয়ের স্থলে যে সকল ধর্ম্মের স্ফুরণ হইবে, সেই ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর যদি বিরোধ প্রতীতি-গোচর না হয়, তবেই, সেক্ষেত্রে সামান্য-ধর্ম্মের জ্ঞান বশতঃ সংশয়ের উদয় হওয়া সম্ভবপর হইবে। এক্ষেত্রে তুল্য-পরিমানস্বরূপ ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মী ঘট-পট প্রভৃতির বিরোধ না থাকিলেও, উক্ত বাক্যে "ঘট পটৌ মিথো ভিন্নৌ" এইরূপে পরস্পর যে ভেদ-কোটির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে, ঘট এবং পট এই ধর্ম্মিদ্বয়ের পরস্পর ভেদ বা বিরোধেরই স্পষ্টতঃ স্ফুরণ হইবে। ফলে, এরূপ ক্ষেত্রে সংশয়ের লক্ষণের সঙ্গতি পাওয়া যাইবে না। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই সংশয়ের লক্ষণে 'অপ্রতিপন্ন তদ্‌বিরোধ' এইরূপ একটি বিশেষণ-পদ অনেক ধর্ম্মের স্ফুরণের (অনেকবিশেষস্ফুরণম্) অংশে জুড়িয়া দেওয়া হয়াছে। সংশয়ের ক্ষেত্রে সংশয়ের ঘটক পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক কোটির একই সময়ে তুল্যভাবে স্ফুরণ ভ্রম-জ্ঞানে সংশয়ের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই অত্যাবশ্যক। 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রম-জ্ঞানে রজত-কোটি এবং শুক্তি-কোটি, এই কোটিদ্বয়ের বোধ 'ইদং' পদার্থকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইলেও, একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধরূপে উহাদের স্ফুরণ হয় নাই। এইজন্যই ভ্রম-জ্ঞানকে সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। দুইটি বিরুদ্ধ কোটির স্ফুরণ হইলে যেরূপ সংশয়ের উদয় হইবে, সেইরূপ বহু বিরুদ্ধ কোটির জ্ঞানোদয় হইলেও সেক্ষেত্রে সংশয়ের উদয় হইতে কোন বাধা নাই, ইহা সূচনা করিবার জন্যই সংশয়ের লক্ষণে 'অনেক' পদটির অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সম্পর্কেও পরস্পর বিরুদ্ধ কোটির জ্ঞানোদয় হওয়া এবং তন্মূলে সংশয়ের উদয় হওয়া বিচিত্র কিছু নহে। উচ্চতা, বিস্তৃত প্রভৃতি সমান-ধর্ম্মের জ্ঞান থাকিয়া বিশেষ নিশ্চয়ের কোনরূপ হেতু না পাওয়া গেলে, সেখানে যেমন 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এইরূপ সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায়। সেইরূপ দার্শনিক পরমাচার্য্যগণের মুখে পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত শুনা গেলে, সেক্ষেত্রেও কাহার মতটি সত্য, কাহার মতটি মিথ্যা, এইরূপ সন্দেহ হওয়া সুধী-মাত্রেরই স্বাভাবিক। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, সমান-ধর্ম্ম বা সাধারণ-ধর্ম্মের (common characteristic) জ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রণেতৃগণের পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি, এই দুইকেই সংশয়ের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া বেঙ্কট তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে উল্লেখ করিয়াছেন। সমানধর্ম-বিপ্রতিপত্তিভ্যামেবাসাধারণকারণাভ্যাং যথাসম্ভবমুদ্ভবঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৬০ পৃষ্ঠা; সংশয়ের অন্যতর প্রধান কারণ বিপ্রতিপত্তির (বিরুদ্ধ উক্তির) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, মনীষার মূর্ত্তবিগ্রহ দার্শনিক পরমাচার্য্যগণের মুখেও কোন কোন তত্ত্ব-সম্পর্কে পরস্পর নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ সেই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য, কোন্‌টি সবল, কোন্‌টি দুর্ব্বল, কোন্‌টি বিচারসহ, কোন্‌টি যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা বুঝিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন দার্শনিকের মুখে শুনা গেল, আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে, আবার কেহ বলিলেন, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনম্, নাস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনম্। শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে জানিলাম, আত্মা বা ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ, নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ; ভক্তচূড়ামণি শ্রীরামানুজাচার্য্যের মুখে শুনিলাম, আত্মা সগুণ, সবিশেষ, অনন্তকল্যাণগুণ-নিলয় শ্রীকৃষ্ণই জগদাত্মা পরব্রহ্ম, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান এবং শক্তির আধার। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত শুনিবার পর, ঐ প্রকার সিদ্ধান্তের অনুকূল এবং প্রতিকূল যুক্তির বল-তারতম্য বিচার করিবার পথ যদি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে সেই পথ অনুসরণ করিয়া সুধী কোনও দার্শনিকের সিদ্ধান্তকে দুর্ব্বল যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন, কাহারও সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া গ্রহণ করেন। প্রবল যুক্তির গতিবেগের মুখে পড়িয়া দুর্ব্বল যুক্তিজাল যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে

সেখানে আর সংশয় জাগে না। প্রবল যুক্তিসিদ্ধ সত্যকে জিজ্ঞাসু নিঃসংশয়ে মানিয়া লন। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সমর্থক বিভিন্ন যুক্তিলহরী আলোচনা করিয়াও যুক্তিজালের বল-তারতম্য বিচার করিতে অনুসন্ধিৎসু অপারগ হন, সেই ক্ষেত্রে ঐ সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের দুইটি অবশ্য সত্য হইতে পারিবে না, একটিই সত্য হইবে। এখন দুইটির কোন্‌টি সত্য? এইরূপ সংশয়ের ধূলিজালে সত্য জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; তখন তিনি কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। ইহাই বিপ্রপত্তি অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যজ সংশয়ের রহস্য। এইরূপ সংশয় যে কেবল দুইটি কোটিকে অবলম্বন করিয়াই উদিত হইবে এমন নহে। যত রকমের বিরুদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তি শুনা যাইবে, ততটাই সংশয়ের ভিন্ন ভিন্ন কোটি হইয়া দাঁড়াইবে।[১] এইরূপ সংশয়ের মূল-কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের স্ব স্ব প্রমেয় বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ-প্রকাশের অক্ষমতাকেই দায়ী করিয়াছেন। জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের সুদৃঢ় সংযোগ সত্য জ্ঞানের, অদৃঢ় সংযোগ যে সংশয়ের মূল, তাহা বেঙ্কট ন্যায়পরিশুদ্ধিতে অতিস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা এই যে, এই সুদৃঢ়, এবং অদৃঢ় সংযোগের অর্থ কি? যেখানে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় বিষয়টিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে, সেইক্ষেত্রে জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের সুদৃঢ় সংযোগ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আর যেখানে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ প্রমেয়কে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না; প্রমেয়-সম্পর্কে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের (কোটির) উদয় হয়, সেখানে জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সংযোগকে অদৃঢ় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ যথাযথভাবে প্রমেয়কে প্রকাশ করে বলিয়াই প্রমাণ-সংজ্ঞা লাভ করে। এই অবস্থায় যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ প্রমেয় বস্তুটিকে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। প্রমেয়-সম্পর্কে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। সেখানে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণকে প্রমাণের মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রমাণ নহে, 'প্রমাণাভাস' মাত্র। প্রমাণ যে-

---

১। দ্বয়োস্ত্রয়াণাং চতুর্ণাং পঞ্চানামধিকানাং বা জ্ঞাপকানামুপস্থাপনে তাবৎ-কোটিকাঃ সংশয়াঃ স্যুরিত্যর্থঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধির শ্রীনিবাস-কৃত টীকা, ৬০ পৃষ্ঠা;

ক্ষেত্রে 'প্রমাণাভাস' হয়, সেক্ষেত্রে যথার্থ-জ্ঞানের উদয় না হইয়া সংশয় প্রভৃতির উৎপত্তিই অবশ্যম্ভাবী হয়। প্রত্যক্ষতঃ দেখিলাম একরকম, আবার প্রত্যক্ষাভাস বা দুষ্ট-প্রত্যক্ষ তাহাকে দেখাইল আর এক রকম, তাহার সম্বন্ধে জন্মাইল বিরুদ্ধ জ্ঞান। প্রত্যক্ষাভাস-জনিত এই বিরুদ্ধ কোটির বোধকে সত্য-প্রত্যক্ষ অপেক্ষায় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল না। ফলে, প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষাভাসের বাধিল দ্বন্দ্ব, সংশয় জাগিল ইহাদের কোন্‌টি সত্য? এইরূপে প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষাভাসের বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-জ্ঞান; অনুমানের সহিত প্রত্যক্ষাভাস এবং অনুমানাভাসের বিপ্রতিপত্তি; শ্রুতিবাক্যে বিপ্রতিপত্তি, আচার্য্য-গণের উক্তিতে বিপ্রতিপত্তি, অসত্যবাদীর উক্তি শুনিয়া বিপ্রতিপত্তি, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে বিপ্রতিপত্তি এবং প্রত্যক্ষ ও আগমের বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি অনেক রকমের বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, সম্মুখস্থ আয়নায় আমার নিজের মুখ প্রতিফলিত দেখিলাম, ভাবিলাম সত্যই কি উহা আমার নিজের মুখ? পরে হাত বাড়াইয়া পাইলাম আয়নাখানি, বুঝিলাম উহা আমার নিজের মুখ নহে, উহা নিজের মুখের প্রতিবিম্ব-মাত্র। আবার সংশয় আসিল, আয়নায় আমার মুখখানি কি ঠিক ঠিক ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে, না উল্টাভাবে দেখা যাইতেছে? এইরূপ সংশয় প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষাভাসের দ্বন্দ্বের ফল। ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করা গেল, আবার আলোকের অভাবদৃষ্টে পর্ব্বতকে অগ্নিশূন্য মনে করিয়া সংশয় হইল, পর্ব্বত কি বহ্নিযুক্ত, না বহ্নিশূন্য? এই শ্রেণীর সংশয় অনুমান এবং অনুমানাভাসের ফলে উদিত হইয়া থাকে। জীব এবং ব্রহ্মের ভেদের এবং অভেদের বোধক বিরুদ্ধ-শ্রুতি দেখিয়া সংশয় হইল, জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন? ইহা শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি। বৈশেষিক পণ্ডিতগণ বলিলেন ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক, সাংখ্য দার্শনিক বলিলেন ইন্দ্রিয়গুলি অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ বিরুদ্ধ দার্শনিক-সিদ্ধান্ত শুনিবার ফলে সত্য জিজ্ঞাসুর মনে ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক, না অভৌতিক, এইরূপে যে সংশয় জাগে, তাহার মূলে রহিয়াছে দার্শনিক পরমাচার্য্যগণের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত। ইহাকেই বলে বাদি-বিপ্রতিপত্তি। কোন অসত্যভাষীর মুখে "নদীর

তীরে পাঁচটি ফল আছে” শুনিয়া সংশয় হইল, বাস্তবিকই নদীর তীরে পাঁচটি ফল আছে কি? এইরূপ সংশয় অসত্যভাষীর উক্তি শ্রবণেরই ফল। চক্ষুর দ্বারা দেখিলাম শঙ্খ শাদা নহে, হলুদবর্ণ, অনুমান করিয়া জানা গেল, শঙ্খ শাদা বর্ণের। প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের এইরূপ বিরোধ হওয়ায় সংশয় হইল—কিময়ংশঙ্খঃ পীতঃ সিতো বেতি, শঙ্খ বস্তুতঃ শাদা, না হলুদবর্ণের? ইহা প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের মধ্যে বিপ্রতিপত্তি। নিজেকে স্থূলোঽহং বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম, অথচ উপনিষৎপাঠে জানিলাম যে অহং বা আত্মা স্থূল নহে, অস্থূল। এইরূপ বিপ্রতিপত্তিকে প্রত্যক্ষ এবং আগমের বিপ্রতিপত্তি বলা হয়। অনুমানের সাহায্যে বুঝা গেল যে, জগতের উপাদান পরমাণু, শ্রুতির লেখায় জানা গেল, জগতের উপাদান মায়া। এই অবস্থায় অনুমানের সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ অপরিহার্য্য। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার বিপ্রতিপত্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বিপ্রতিপত্তি বলিলে যে কেবল বাদি-বিপ্রতিপত্তিই বুঝা যায় তাহা নহে; যত প্রকার বিরুদ্ধ-জ্ঞান আমাদের গোচরে আসে, সকল প্রকার বিরোধকেই বিপ্রতিপত্তি-শব্দে বুঝা যায়। অতএব ন্যায়াচার্য্যগণ বিপ্রতিপত্তি বলিতে যে কেবল বাদি-বিপ্রতিপত্তিকেই বুঝিয়াছেন, তাহা গ্রহণ-যোগ্য নহে। সর্ব্বপ্রকার বিপ্রতিপত্তির মূলেই আছে “অগৃহ্যমাণ বলতারতম্য” অর্থাৎ যুক্তিবিচারের ফলে বিপ্রতিপত্তির বিভিন্ন কোটির মধ্যে কোন্ কোটিটি সবল এবং গ্রহণ-যোগ্য; আর কোন্ কোটিটি দুর্ব্বল বা বাধিত তাহার নির্ণয়ের অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্য প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রমাণের ক্ষেত্রে সময় বিশেষে অতিস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। সুতরাং বাদি-বিপ্রতিপত্তির ন্যায় প্রমাণের বিপ্রতিপত্তিকেই বা বিপ্রতিপত্তি বলিয়া মানিয়া লইতে বাধা কি? বিপ্রতিপত্তি নানা কারণে সম্ভব বলিয়া, বিভিন্ন প্রকার বিপ্রতিপত্তি বশতঃ সংশয়ও যে বহু প্রকারের হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

বেঙ্কটনাথ সংশয়ের ব্যাখ্যায় সংশয়ের অবস্থায় দোদুল্যমান মনোবৃত্তির বিষয়ই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়ের কারণ এবং সংশয়-সঙ্কুল মনোবৃত্তির বিশ্লেষণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় গৌতমোক্ত সংশয়ের পাঁচ প্রকার বিভাগ বেঙ্কটের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। বেঙ্কট বলেন, সংশয়ের উপযুক্ত কারণ থাকিলে

সংশয়ের বিভাগ

সংশয় পাঁচ প্রকার কেন, বহু প্রকারেরই হইতে পারে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য বরদনারায়ণ তাঁহার প্রজ্ঞাপরিত্রাণ নামক গ্রন্থে সংশয়কে যে সাধারণ-ধর্ম্মমূলক, অসাধারণ-ধর্ম্মমূলক, বাদী এবং প্রতিবাদীর পরস্পর বিপ্রতিপত্তিমূলক, এই তিন প্রকারে বিভাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,[১] তাহা বেঙ্কটের মতে ন্যায়-মতের অনুকরণ মাত্র—তদপিনূনং পরানুকরণ-মাত্রম্। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৬২ পৃষ্ঠা; ন্যায়-মতের অনুকরণ, এই কথা বলিয়া গৌতমোক্ত সংশয়ের বিভাগের প্রতি বেঙ্কটনাথ তাহার উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ যাহাকে "অসাধারণ-ধর্ম্মমূলক" সংশয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সেই সকল সন্দেহের মূলেও কোন-না-কোন প্রকার সাধারণ-ধর্ম্মই বিরাজ করে। সুতরাং তাহাও সামান্য-ধর্ম্মমূলক সংশয়ই বটে। অসাধারণ-ধর্ম্মমূলে কোন সংশয়ই কখনও উদয় হয় না, হইতে পারে না। ইহা আমরা মাধ্ব-মতের বিচার-প্রসঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছি। বেঙ্কটও এই সম্পর্কে মাধ্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, 'গন্ধবত্ত্বাৎ পৃথিবী নিত্যা, অনিত্যা বা' এইরূপ সংশয়-রহস্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, গন্ধ একমাত্র পৃথিবীরই অসাধারণ ধর্ম্ম; পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন নিত্য বস্তুরও (আত্মা প্রভৃতিরও) গন্ধ নাই, অনিত্য জল প্রভৃতিরও গন্ধ নাই। এই অবস্থায় এইরূপ সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে গন্ধময়ী পৃথিবী যখন নিত্য আত্মা প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, তখন উহা অনিত্য বস্তু কি? পক্ষান্তরে, পৃথিবী যখন অনিত্য জল প্রভৃতি পদার্থ হইতে বিভিন্ন, তখন পৃথিবী নিত্য কি? ন্যায়োক্ত এই প্রকার সংশয় বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন যে, আলোচ্য সংশয়ের হেতু কি? গন্ধবত্তা কি? গন্ধ দেখা যায় নিত্য পার্থিব পরমাণুতে আছে, আবার অনিত্য মাটির ঢেলাতেও আছে। এই অবস্থায় পৃথিবী নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে কোন একতর পক্ষের নির্ণয়ে 'গন্ধবত্তাকে' হেতুরূপে গ্রহণ করার তো কোনই অর্থ হয় না। কেননা, গন্ধবত্তা পৃথিবীর অসাধারণ-ধর্ম্ম হইলেও, ইহা দ্বারা কোন কালেও

১। সাধারণাকৃতের্দৃষ্ট্যানেকাকারগ্রহাত্তথা।
বিপশ্চিতাং বিবাদাচ্চ ত্রিধা সংশয় ইষ্যতে॥
ন্যায়পরিশুদ্ধির ৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রজ্ঞাপরিত্রাণ নামক গ্রন্থের শ্লোক;

পৃথিবী নিত্য, কি অনিত্য, এই প্রকার সংশয়ের মীমাংসা হইবে না। এই সংশয়ের মীমাংসা শুধু তখনই সম্ভবপর হইবে, যখন নিত্য এবং অনিত্য, এই উভয় প্রকার পদার্থের যাহা সাধারণ-ধর্ম্ম (common mark) পৃথিবীতে তাহার উপলব্ধি হইবে; এবং নিত্য, অনিত্য এই উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষকে বুঝিবার অনুকূল প্রবল যুক্তিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর যাহা অসাধারণ-ধর্ম্ম (uncommon characteristic) সেই গন্ধবত্তার স্ফুরণই যদিও আলোচ্য সংশয়ের মূল, তাহা হইলেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই সংশয় সাধারণ-ধর্ম্মমূলক সংশয়ই বটে, অসাধারণ-ধর্ম্মমূলক সংশয় নহে। বৈশেষিক-মতের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, বৈশেষিক-পণ্ডিতগণ সংশয়ের অনুরূপ 'অনধ্যবসায়' (indecision) নামে এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ 'অনধ্যবসায়' নামক জ্ঞানের সাহায্যেই বৈশেষিক-আচার্য্যগণ অসাধারণ-ধর্ম্মমূলক সংশয়ের উপপাদন করিয়াছেন। বৈশেষিকের-মতে অসাধারণ-ধর্ম্মমূলে কখনও কোনরূপ 'সংশয়' জন্মে না, 'অনধ্যবসায়ই' (indecision) জন্মে। সংশয় একমাত্র সাধারণ-ধর্ম্মমূলেই উদিত হয়। এমনও কতকগুলি সংশয় দেখা যায়, যে-সকল স্থলে সংশয়ের আবশ্যকীয় বিরুদ্ধ কোটিগুলির স্ফুরণ স্পষ্টতঃ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে "কিং সংজ্ঞকোঽয়ং বৃক্ষঃ" এই গাছটির নাম কি? এই প্রকার সংশয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে সংশয়াঙ্গ পরস্পর বিরুদ্ধ কোটির স্ফুরণ না থাকায়, কোন কোন পণ্ডিতগণ ঐ জাতীয় সংশয়কে 'অনধ্যবসায়ের'ই অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। বেঙ্কটনাথ ঐ মত অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মতে সংশয় ব্যতীত 'অনধ্যবসায়' নামে স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান মানিবার কোনই যুক্তি নাই। সর্ব্বপ্রকার 'অনধ্যবসায়ের' ক্ষেত্রে সংশয়েরই উদয় হয়। এই গাছটির নাম কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন এইরূপ প্রশ্ন করেন, তখন এই গাছটি কি বট, না অশ্বত্থ, না অন্য কিছু, এইরূপ মনে মনে অবশ্যই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ঐ প্রকার আলোচনা করিয়াও তিনি যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন না, তখনই প্রশ্ন করেন, এই গাছটির নাম কি? তাঁহার এই প্রশ্নটিকে একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহার অন্তরালে সংশয়ের অঙ্গ 'বটো বা অশ্বত্থো বা,' এইরূপ বিরুদ্ধ-কোটির এবং ঐ সকল বিরুদ্ধ-

কোটির মধ্যে অবস্থিত সাধারণ-ধর্ম্মের বিকাশ এবং 'দোলা-বেগবৎ' তাঁহার চিত্তের সংশয়াতুর অবস্থা সুধী সহজেই লক্ষ্য করিবেন।[১] ফলে, আলোচ্য অনধ্যবসায়-জ্ঞান (indecision) যে সংশয় ভিন্ন অপর কিছু নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ন্যায়গুরু গৌতমও অনধ্যবসায়কে সংশয়-জ্ঞান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। 'কিংসংজ্ঞকোঽয়ং বৃক্ষঃ,' এইরূপ অনধ্যবসায় এবং 'প্রায়ঃ পুরুষেণ অনেন ভবিতব্যম্,' সম্ভবতঃ উহা একটি মানুষই হইবে, এই প্রকার উহ বা সম্ভাবনা-জ্ঞানকে মাধ্ব-পণ্ডিতগণও সংশয় বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'উহ' নামক সম্ভাবনা-জ্ঞানে "প্রায়ঃ" শব্দ থাকার দরুণ কতকটা অবধারণের আভাস থাকায়, উহকে আর অনিশ্চয়াত্মক 'অনধ্যবসায়' বলা চলিল না, ভিন্নরূপেই উল্লেখ করিতে হইল। উহ বা সম্ভাবনা-জ্ঞানে 'অনধ্যবসায়ের' ন্যায় সংশয়াঙ্গ বিরুদ্ধ-কোটির সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উহাকে এক শ্রেণীর সংশয় বলিয়াই অবশ্য মনে হইবে। উহকে যে-ক্ষেত্রে অনুমানাঙ্গ তর্ক বলা হইয়া থাকে, তাহাও এক প্রকার অনুমানই বটে। ইহা আমরা অনুমান-পরিচ্ছেদে তর্কের স্বরূপবিচার-প্রসঙ্গেই বিবৃত করিয়াছি। মাধ্ব-মতের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয়কে সাধারণ-ধর্ম্মজন্য সংশয় হিসাবেই গণনা করিয়াছেন; এবং সংশয়কে একমাত্র সাধারণ-ধর্ম্মমূলক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন নৈয়ায়িকও ঐ মত অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার মত বেঙ্কটের সমর্থন লাভ করে নাই। বেঙ্কটনাথ সংশয়াতুর মনোবৃত্তির বিচিত্র বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিই সংশয়ের প্রাণ। বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ-জ্ঞানোদয় না হইলে, কোনরূপ সংশয়ই সেখানে জন্মিবে না। এই বিপ্রতিপত্তি বলিতে বেঙ্কট নৈয়ায়িকের ন্যায় বাদী এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-উক্তিকেই মাত্র বোঝেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি সংশয়াতুর মনের দোলা-বেগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সম্মুখে গাছের গুঁড়ি দেখিয়া তাহাকে গাছের গুঁড়ি বলিয়া বোধ হইল না। মানুষের সমান উচ্চতা, বিস্তৃতি প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি এবং মানুষের সাধারণ-ধর্ম্মেরই (common characteristic) কেবল বোধ উদিত

১। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৬৭ পৃষ্ঠা;

হইল। মনের ধর্ম্ম তর্ক করা; মন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল, সম্মুখে ঐ যে দেখিতেছি ঐটি কি গাছের গুঁড়ি, না মানুষ? সংশয়ের এই প্রকার বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল যে, সাধারণ-ধর্ম্মের (common mark) বোধ এবং বিপ্রতিপত্তি, এই দুইই সংশয়ের মুখ্য সাধন।[১] বিপ্রতিপত্তিকে ছাড়িয়া সংশয় চলিতেই পারে না। সংশয়ের প্রাণ এই বিপত্তিপত্তি কোথায়ও থাকে অন্তর্নিহিত, (যেমন কিংসংজ্ঞকোহয়ং বৃক্ষঃ, এই গাছটির নাম কি? এই স্থলে বিপ্রতিপত্তি এবং বিপ্রতিপত্তির অঙ্গ বিরুদ্ধ কোটির স্ফূরণ অন্তর্নিহিত অবস্থায় আছে) আবার কোথায়ও থাকে অতিস্পষ্ট। এমনও কতকগুলি সংশয়ের স্থল দেখা যায়, যেখানে একাধিক বিপ্রতিপত্তির উন্মেষও সম্ভবপর হয়। ফলে, ঐ সকল স্থলে একাধিক সংশয়েরও উদয় হইতে কোন বাধা নাই (সংশয়দ্বয়সমাহারঃ)। সংশয়ের এইরূপ সমাহারের দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, যদু ও মধু, এই দুই জনের একজন চোর, ইহা যখন নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তখন দুই জনের মধ্যে কে চোর তাহা জানা না থাকায়, 'অয়ং চোরোঽয়ং বা চোরঃ' এই প্রকার সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী। এই সন্দেহটিকে আপাত-দৃষ্টিতে একাধিক ব্যক্তিতে (দুই ব্যক্তিতে) একই চোরত্ব ধর্ম্মের প্রকাশক বলিয়া মনে হইলেও, বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি সন্দেহ নহে, দুইটি সন্দেহেরই সমাহার। অয়ং চোরঃ, অয়ং বা চোরঃ, দুই ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এইরূপ চোরত্বের সন্দেহ এখানে প্রকাশ পায়। ইহাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিলে বুঝা যায় যে, 'অয়ং চোরো নবা', 'অয়ং চোরো নবা' এইরূপই হইবে আলোচ্য সংশয়ের আকার (form)। 'নবা' শব্দের দ্বারা সংশয়ের অনুকূল ভাব এবং অভাবরূপ দুইটি বিরুদ্ধ কোটি সূচিত হইয়া থাকে। ফলে, আলোচ্য স্থলটি যে একটি সংশয়ের ইঙ্গিত করে না, দুইটি সংশয়ের সমাহারই সূচনা করে, (সংশয়দ্বয়সমাহারঃ,) তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। কোন কোন সুধী আলোচ্য স্থলটিকে দুইটি সংশয়ের সমাহারের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, আমরা যেক্ষেত্রে জানি যে, এই দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি অবশ্যই চোর, তৃতীয় কোন ব্যক্তি চোর নহে;

১। আস্তেবাস্ত সমানধর্মবিপ্রতিপত্তিভ্যামসাধারণকারণাভ্যাং যথাসম্ভবং (সংশয়স্ত) উদ্ভবঃ। বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৬০ পৃষ্ঠা;

কিন্তু কে চোর তাহা জানি না, তখন 'চোরত্বমেতন্নিষ্ঠমেতন্নিষ্ঠং বা' এই প্রকার সন্দেহ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। যে চুরি করে চোরত্ব ধর্ম্মটি তাহাতেই থাকে। এক্ষেত্রে চোরত্ব ধর্ম্ম যদু এবং মধু এই উভয়েরই সাধারণ-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া, সেই চোরত্ব যখন হয় যদু, না হয় মধু, এই দুইএর একে অবশ্যই থাকিবে, তখন চোরত্বকে কিংবা চোরত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট চোরকে সংশয়ের ধর্ম্মী হিসাবে ধরিয়া লইয়া, যদু এবং মধু, এই দুইটিকে সন্দেহের দুইটি বিরুদ্ধ কোটি মনে করিয়া, 'চোরত্বমেতন্নিষ্ঠমেতন্নিষ্ঠং বা,' 'যশ্চোরঃ সোহয়ময়ং বা' এইরূপে একটি সংশয় স্বীকার করিয়াই তো উল্লিখিত প্রতীতির উপপাদন করা যাইতে পারে। অতএব এক্ষেত্রে একাধিক সংশয়ের সমাহার স্বীকার করিবার কোনই বলিষ্ঠ যুক্তি দেখা যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলোচ্য স্থলে দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি যে চোর তাহাতে তো কোনই সন্দেহ নাই। কেবল কে চোর? যদু না মধু চোর? এই বিষয়েই সন্দেহ আছে। এই অবস্থায় এখানে একই জ্ঞানে অংশভেদে সংশয় এবং নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞানের, প্রমা এবং অপ্রমা-জ্ঞানের সমাবেশ স্বীকার করিতে হয় নাকি? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন যে, হ্যাঁ, সংশয়ের স্থলে সর্ব্বত্রই সংশয়-জ্ঞান এবং নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞানের স্ব স্ব অংশে সমাহার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কোনমতেই তাহা অস্বীকার করা চলিবে না। সন্দেহের ক্ষেত্রে যেই বস্তুতে (ধর্ম্মীতে) পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বোধের উদয় হইয়া থাকে, সেই বস্তুর (ধর্ম্মীর) জ্ঞান সর্ব্ববিধ সংশয়ের স্থলেই অত্যাবশ্যক। ধর্ম্মীর অর্থাৎ সংশয়ের আলম্বন বিশেষ্য-বস্তুটির জ্ঞান না থাকিলে, কোন ক্ষেত্রেই কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় না, হইতে পারে না। কোন একই বস্তুতে (ধর্ম্মীতে) পরস্পর বিরুদ্ধ-কোটির জ্ঞানোদয়কেই সংশয় বলা হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ্য-পদার্থের (ধর্ম্মীর) জ্ঞানটি নিশ্চয়াত্মক না হইলে, সংশয়-জ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইবে? এইজন্য সংশয়মাত্রেই বিশেষ্য-বস্তুর (ধর্ম্মীর) নিশ্চিত-জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। নিশ্চয়াত্মক এবং সংশয়-জ্ঞানের স্ব স্ব অংশভেদে সমাহার দোষাবহ নহে।[১] এখানে মনে

১। ন চ কস্যাপি জ্ঞানস্য সংশয়নির্ণয়াত্মতাবিরোধঃ। সর্বস্মিন্নপি সংশয়ে ধর্ম্যংশাদৌ নির্ণয়স্য দুস্ত্যজত্বাৎ।

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৩৬ পৃষ্ঠা;

রাখিতে হইবে যে, সংশয়ের ক্ষেত্রে যেই বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সংশয়ের উদয় হইয়াছে, সংশয়ের সেই আলম্বন বস্তুটির জ্ঞান সেখানে বস্তুর সাধারণ-ধর্ম্মকে লইয়া উদিত হইয়াছে, বিশেষ-ধর্ম্মকে লইয়া নহে। গাছের গুঁড়িকে যদি গাছের গুঁড়ি বলিয়াই চিনিতে পারা যায়, অর্থাৎ গাছের গুঁড়ির সবিশেষ পরিচয়ই যদি জ্ঞানে ভাসে, তবে সেইস্থলে সম্মুখে যাহা দেখিতেছি তাহা গাছের গুঁড়ি, না একটা মানুষ, এইরূপ সংশয় জন্মিবে কিরূপে? গাছের গুঁড়ি দেখিয়া উহাকে গাছের গুঁড়ি বলিয়া প্রত্যক্ষ হইল না; উচ্চতা, বিস্তৃতি প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি এবং মানুষের যাহা সাধারণ-ধর্ম্ম (common character) সেই ধর্ম্মেরই শুধু প্রত্যক্ষ হইল, বস্তুর বিশেষ পরিচয় প্রচ্ছন্নই রহিয়া গেল। এইজন্যই বুদ্ধিমান্ দর্শকের মনে সন্দেহ জাগিল, ইহা কি গাছের গুঁড়ি. না মানুষ? দৃশ্য বস্তুর সামান্যরূপে জ্ঞান এবং বিশেষভাবে বস্তু-পরিচিতির অভাবই যে, সন্দেহ এবং বিভ্রম, এই দুই প্রকার অপ্রমা বা মিথ্যা-জ্ঞানের মূল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ঝিনুক-খণ্ডকে ঝিনুক-খণ্ড বলিয়া চিনিলে, সেক্ষেত্রে ইহা ঝিনুক, না রূপার টুকরা? এইরূপ সংশয় কখনও জন্মিতে পারে না। কোনরূপ আধার বা আশ্রয়কে অবলম্বন না করিয়া, নিরাশ্রয়ে (নিরাধারে) কাহারও কোনরূপ ভ্রমও জন্মে না, সংশয়েরও উদয় হয় না। ভ্রম এবং সংশয়, এই উভয় প্রকার অপ্রমার উদয়ে আধার বা আশ্রয়ের সাধারণ ভাবের জ্ঞান এবং বিশেষ পরিচয়ের অজ্ঞান যে আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গ. তাহা ভুলিলে চলিবে না। সংশয়ের স্থলে যে সকল বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সন্দিগ্ধ বস্তুর বিশেষণরূপে প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে সংশয়ের 'কোটি' বলে। 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এই প্রকার সংশয়ে স্থাণু এবং পুরুষ, অথবা স্থাণুত্ব এবং পুরুষত্ব, ইহারা সংশয়ের এক একটি 'কোটি' বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ সকল বিরুদ্ধ-কোটির সুস্পষ্ট স্ফুরণ সংশয়ে অত্যাবশ্যক; এবং ঐ পরস্পর বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের কোন একটি কোটি যদি স্থাণুর কিংবা পুরুষের বিশেষ-জ্ঞানোদয়ের ফলে বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ একতর কোটির, স্থাণুর বা পুরুষের বাধা-প্রাপ্তির দরুণই অপর কোটিটি যে যথার্থ; স্থাণু-কোটি বাধিত হইলে পুরুষ-কোটি যে সত্য, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এই শ্রেণীর সংশয়কে বেঙ্কটনাথ তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে 'অন্যতর কোটি-পরিশেষ-যোগ্য,

সংশয় আখ্যা দিয়াছেন। এমনও কতকগুলি সংশয়ের স্থল পাওয়া যায়, যেখানে সংশয়ের উভয় কোটিরই বাধের উদয় হইতে দেখা যায়। একতর কোটির বাধে অন্যতর কোটির সত্যতার নিশ্চয় করা সেক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত, জ্বলন্ত তৃণরাশি-সঞ্জাত মসীকৃষ্ণ ধূমরাজি দেখিয়া, ইহা কি একটি হাতী, না পর্ব্বতেরই কোন শৃঙ্গ, 'দ্বিরদো গিরিশিখরং বা', এইরূপে দর্শকের মনে যে সন্দেহের উদয় হয়, সেই সন্দেহের দুইটি কোটিই ধূমের জ্ঞানোদয়ের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পর্ব্বত-গাত্রোত্থিত ধূমরাজি হাতীও নহে, গিরিশৃঙ্গও নহে, ইহাই শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হয়। আলোচ্য স্থলে 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা', এই জাতীয় সন্দেহের ন্যায় এক কোটির নিষেধে অপর কোটির সত্যতার নিশ্চয় করা চলে না। এইজন্য এই শ্রেণীর সন্দেহকে 'অন্যতর কোটির পরিশেষের অযোগ্য' সংশয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কোনও বস্তুতে বিরুদ্ধ একাধিক কোটির প্রত্যক্ষবশতঃ যেরূপ সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায়, সেইরূপ বিরুদ্ধ কোটির স্মরণ, অনুমান প্রভৃতি মূলেও সংশয়-জ্ঞানোদয় হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। ফলে, বিরুদ্ধ কোটির প্রত্যক্ষমূলক সংশয়, স্মৃতি, অনুমান প্রভৃতি মূলে উৎপন্ন সংশয় এইরূপে সংশয়ের বিবিধ বিভাগও অবশ্য কল্পনা করা যায়।

যোগদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহামতি পতঞ্জলি সংশয় এবং ভ্রম, এই দুই শ্রেণীর অপ্রমা-জ্ঞানকেই বিপর্য্যয়-জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিপর্য্যয়-জ্ঞানের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। যোগদর্শন, ১।১।৮; টীকাকার বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার প্রসিদ্ধ যোগবার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত 'বিপর্য্যয়' কথাটি লক্ষ্য, আর 'মিথ্যা-জ্ঞানম্', ইহাই বিপর্য্যয়ের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মিথ্যা-জ্ঞানের পরিচয় কি? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি বলেন—মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্; যে-জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করে না; জ্ঞানে জ্ঞেয় বিষয়ের যেই রূপ প্রকাশ পায়, জ্ঞেয় বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে যদি সেইরূপ না হয়, তবেই সেই প্রকার জ্ঞানকে মিথ্যা বা বিপর্য্যয়-জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ঝিনুক-খণ্ড দেখিয়া 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে-জ্ঞানোদয় হয়, সেক্ষেত্রে ঐ জ্ঞানের ফলে জ্ঞেয় বস্তুটিকে রজত বলিয়া বুঝা যায়। আসলে কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুটি

রূপা নহে, ইহা এক টুকরা ঝিনুক। আলোচ্য জ্ঞানে জ্ঞেয় বিষয়ের যেই রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, দৃশ্য বিষয়ে সেই রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। রজত-রূপটি এক্ষেত্রে ঝিনুকের রূপের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছে। এইজন্যই 'ইদং রজতম্' এই প্রকার জ্ঞানকে বলা হইয়াছে বিপর্য্যয়-জ্ঞান বা মিথ্যা-জ্ঞান। এইটি কি মানুষ, না গাছের গুঁড়ি? (স্থাণুর্বা পুরুষো বা) এই প্রকার সংশয়ের স্থলেও জ্ঞেয় বস্তুর পরস্পর বিরুদ্ধ যে-স্বরূপটি প্রকাশ পায়, তাহাও জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ রূপের পরিচয় প্রদান করে না। এইজন্য সংশয়াত্মক-জ্ঞানও পতঞ্জলির মতে এক শ্রেণীর বিপর্য্যয়ই বটে। বিপর্য্যয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই মতে সংশয় এবং ভ্রম, এই দুই প্রকার।[১] পতঞ্জলি ব্যতীত বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি কোন দার্শনিকই সংশয়-জ্ঞানকে বিপর্য্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। যে-বস্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা নহে, তাহাকে সেইরূপে জানাই হইল বিপর্য্যয়-জ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান—অতদ্‌বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং বিপর্যয়ঃ। আর একই বস্তুকে অবলম্বন করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক কোটির জ্ঞানকে বলে সংশয়। এইরূপ সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের ভেদ অনস্বীকার্য্য।

সংশয়ের স্বরূপ বিচার করা গেল, সম্প্রতি বিপর্য্যয় বা ভ্রম-জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। বিপর্য্যয় বা ভ্রম-জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন যে, তদভাববত্যেব তৎ-প্রকারাবধারণরূপজ্ঞানং বিপর্যয়ঃ। প্রমাণ-চন্দ্রিকা ১৩৩ পৃষ্ঠা; যে-স্থলে যেই বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে নাই, যে-বস্তুর অভাবই আছে, সেখানে সেই বস্তুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ, এইরূপে বিপর্য্যয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে সংশয়ও একজাতীয় জ্ঞান বিধায়, সংশয়-জ্ঞানে বিপর্য্যয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আসিয়া দাঁড়ায় বলিয়া, (সংশয় যাহাতে বিপর্য্যয় না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে) জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক

মাধ্ব-মতানুসারে বিপর্য্যয় বা মিথ্যা-জ্ঞানের বিবরণ

১। বিপর্যয় ইতি লক্ষ্যনির্দেশো মিথ্যাজ্ঞানমিতি লক্ষণম্। মিথ্যেত্যস্য বিবরণমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠমিতি। ন তদ্রূপো ন স্বসমানাকারো যো বিষয়স্তৎপ্রতিষ্ঠং তদ্‌বিশেষ্যকমিত্যর্থঃ। ভ্রমস্থলে জ্ঞানাকারস্যৈব বিষয়ে সমারোপ ইতি ভাবঃ। সংশয়স্যাপ্যত্রৈবান্তর্ভাবঃ। যোগবার্ত্তিক, ১।১।৮ সূত্র;

বা 'অবধারণরূপ' এইরূপে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। 'অবধারণরূপ' জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলিলে, নিশ্চয়াত্মক সত্য-জ্ঞানও বিপর্য্যয়ই হইয়া পড়ে। এইজন্যই বিপর্য্যয়ের লক্ষণে 'তদভাবতি তৎপ্রকারক' এইরূপ একটি বিশেষণ অবধারণের অংশে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, সত্য-জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর বিপর্য্যয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা ঘটিল না। কোন একটি বৃক্ষের শাখায় একটি বানর বসিয়া আছে, ঐ বৃক্ষের গোড়ায় বানর নাই; অর্থাৎ একই বৃক্ষে অংশভেদে কপি-সংযোগ আছেও বটে, নাইও বটে। এই অবস্থায় বৃক্ষ-শব্দে ঐ বৃক্ষের শাখা ধরিয়া 'বৃক্ষঃ কপি-সংযোগী' এইরূপে যে সত্য-জ্ঞানের উদয় হইবে, সেখানে সেই জ্ঞান কপি-সংযোগের অভাবেরও আধার বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া উদিত হওয়ায়, ঐরূপ সত্য-জ্ঞানে বিপর্য্যয়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া, তাহা বারণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য লক্ষণে 'এব' শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'তদভাববত্যেব' অর্থাৎ ভ্রম-জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা-বস্তুর অভাবই কেবল যেখানে আছে, আধারের কোন অংশবিশেষেও যাহার অস্তিত্ব নাই এইরূপ আধার-পদার্থে সেই বস্তুর অস্তিত্ব-বোধের উদয় হইলে, ঐরূপ বোধকে বিপর্য্যয় বা মিথ্যা-জ্ঞান বলিয়া জানিবে।[১] মাধ্ব-সিদ্ধান্তে শুক্তিতে রজতের জ্ঞান যেমন বিপর্য্যয়-জ্ঞান, শুক্তি-রজতের বিভ্রমের স্মৃতিও সেইরূপ বিপর্য্যয়-জ্ঞানই বটে। স্বপ্নে যে ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে মনেরই কল্পনা, বাস্তব কিছু নহে। ঐ মনোরাজ্যের ঘোড়া, হাতী প্রভৃতিকে বহির্জগতের ঘোড়া, হাতীর ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে এবং কালে সঞ্চরণশীল বলিয়া যে বোধ হয়, তাহাও বিপর্য্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে।[২] আলোচ্য বিপর্য্যয়ের হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বলেন, সচ (বিপর্যয়ঃ) প্রত্যক্ষানুমানাগমাভাসেভ্যো জায়তে। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩৪ পৃষ্ঠা; জ্ঞানের সাধন প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ যখন উহাদের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দোষ বশতঃ প্রমাণাভাস (false proof) বা দুষ্ট-প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন ঐ সকল দূষিত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণমূলে উৎপন্ন

১। প্রমাণচন্দ্রিকা, ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা;
জয়তীর্থ-কৃত প্রমাণপদ্ধতি, ১১ পৃষ্ঠা;

২। স্বপ্নেঽপি গজাদিদর্শনং চেদ্‌যথার্থমেব মানসবাসনাজন্যত্বাদ্ গজাদীনাং। তেষু যদ্‌বাহ্যত্বজ্ঞানং স বিপর্যয় এব। প্রমাণপদ্ধতি, ১৩ পৃষ্ঠা;

জ্ঞান প্রমা বা সত্য না হইয়া, বিপর্য্যয় বা বিভ্রমাত্মকই হইয়া দাঁড়ায়। ঝিনুকের টুক্‌রায় রজতের জ্ঞান দুষ্ট (faulty) প্রত্যক্ষবশে উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাকে বলে 'প্রত্যক্ষাভাসমূলক' বিপর্য্যয়। পর্ব্বত-গাত্র হইতে উত্থিত ধূলিজালকে ধূম ভ্রম করিয়া, যেই পর্ব্বতে বহ্নি নাই সেখানে অনুমান-বলে বহ্নির সাধন করিতে গেলে, তাহা হইবে 'অনুমানাভাসমূলক' বিপর্য্যয়। অসত্যভাষী প্রতারকের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে ঐরূপ অসত্য বাক্যমূলে যে মিথ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহাকে 'আগমাভাসমূলক' বিপর্য্যয় বলিয়া জানিবে। প্রমাণাভাসই যে বিপর্য্যয়ের মূল তাহা অবশ্য কোন দার্শনিকই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে কথা এই যে, বিপর্য্যয় যে কেবল প্রমাণাভাস বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে এমন নহে। প্রমাণাভাসের ন্যায়, প্রমাতা কিংবা প্রমেয়ের বিবিধ দোষকেও ক্ষেত্রবিশেষে বিপর্য্যয়ের কারণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহা ছাড়া, যে সকল বস্তু দেখিতে অনেকটা একই রকম সেই সকল বস্তুর সংস্কার, ভ্রমের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব, চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের তিমির প্রভৃতি দোষও যে বিভ্রমের কারণ হইয়া থাকে, তাহা কোন মনীষীই অস্বীকার করিতে পারেন না। রামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বেঙ্কটনাথও তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে বিপর্য্যয় বা মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপত্তির কারণসমূহ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ, অনুমানাঙ্গ ব্যাপ্তি, হেতু, সাধ্য, পক্ষ প্রভৃতির দোষ, প্রতারকের বাক্যে আস্থা-স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শব্দ-দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ঐ সকল দোষ ছাড়াও প্রতিবাদী বৌদ্ধ এবং শঙ্কর প্রভৃতির কলুষিত দর্শনের সদোষ যুক্তিজালকে নির্দ্দোষ মনে করিয়া ঐ সকল দুষ্ট যুক্তির পুনঃ পুনঃ আলোচনা (অভ্যাস) করার ফলে মানুষের সত্য দৃষ্টির মালিন্য ঘটে। মানুষ যেই বস্তু দেখে, সেই বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না, অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করে। রামানুজের মতে সর্ব্ববিধ বিভ্রমের মূলে আছে জীবের অধর্ম্ম—অধর্মঃ সর্ববিপর্যয়হেতুঃ সামান্যকারণম্। ন্যায়পরিশুদ্ধির টীকা, ৫৬ পৃষ্ঠা; অধর্ম্ম, পাপাচরণ প্রভৃতির ফলে জীবের তত্ত্ব-দৃষ্টি কলুষিত হয়, বিজ্ঞান-

---

১। অধর্মেন্দ্রিয়দোষদুস্তর্কাভ্যাসদুর্ব্যাপ্ত্যনুসন্ধানবিপ্রলম্ভকবাক্যশ্রবণাদিভিস্তত্ত্বা-গ্রহসহকৃতৈর্বিপর্যয়স্য যথাসম্ভবমুদ্ভবঃ। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৫৭ পৃষ্ঠা;

নদ শুষ্ক হয়, জ্ঞানের রাজ্যে অজ্ঞান মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। এই অজ্ঞান (ক) স্বরূপাজ্ঞান, (খ) অন্যথা-জ্ঞান এবং (গ) বিপরীত-জ্ঞান, এই তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। যেক্ষেত্রে দৃশ্য বস্তু-সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞানোদয়ই হয় না, জ্ঞেয় বস্তুকে চেনাই যায় না, তাহাকে স্বরূপাজ্ঞান বলে। যেখানে এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া, শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝা যায়, তাহাকে 'অন্যথা-জ্ঞান' বলা হইয়া থাকে। আর যে-স্থলে পদার্থটি বস্তুতঃ যেরূপ সেইরূপে উহা জ্ঞানের গোচর হইলেও, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তিজালের প্রভাবে সেই পদার্থ-সম্পর্কে বিরুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়, যেমন আত্মা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতা হইলেও, মায়াবাদী দার্শনিকগণের কুযুক্তি বা অসদ্‌যুক্তির সাহায্যে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ বলিয়া যে বোধ হইয়া থাকে, ইহাকে 'বিপরীত-জ্ঞান' বলে।[১] অন্যথা-জ্ঞান এবং বিপরীত-জ্ঞান, এই দুই জাতীয় অজ্ঞানেই বস্তুর প্রকৃতরূপের জ্ঞান না হইয়া, অন্যরূপে বস্তুর জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ দুই প্রকার অজ্ঞানই যে 'বিপর্য্যয়' বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? রামানুজের মতে উল্লিখিত তিন প্রকার অজ্ঞানের বিশ্লেষণ শুধু অপ্রমার ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নতুবা যেই রামানুজ-সম্প্রদায় অজ্ঞানই আদৌ মানেন না, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকেই যাঁহারা যথার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন—যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতিবেদবিদাম্ মতম্, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিবলে প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অজ্ঞানের বিশ্লেষণ স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় নাকি? রামানুজ-সম্প্রদায় ভ্রম-স্থলে সর্ব্বত্র 'সৎখ্যাতিবাদের'ই উপপাদন করিয়াছেন। ইহা আমরা খ্যাতিবাদের ব্যাখ্যায় পরে প্রকাশ করিতেছি। রামানুজ-সম্প্রদায় ব্যতীত মীমাংসকগণও ভ্রম-জ্ঞান স্বীকার করেন নাই,

---

১। ত্রিবিধমজ্ঞানম্। স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানমিতি। স্বরূপাজ্ঞানং নাম বস্তুনোঽপ্রতিপত্তিঃ। অন্যথাজ্ঞানং বস্তুনোবস্ত্বন্তরতয়া ভাসনম্। যথা শুক্তৌ রূপ্যতয়া। বিপরীতজ্ঞানন্তু যথাবদ্বস্তুনি ভাসমানে যুক্তিভিস্তস্যান্যথোপপাদনম্। যথা জ্ঞাতৃতয়া অহন্ত্বেন আত্মনি ভাসমানেঽপি কুযুক্তিভিরস্য ভ্রান্ততোপপাদনং কুদৃশামিতি। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা ;

ভ্রম-জ্ঞানের বিবরণ দিতে গিয়া ‘অখ্যাতিবাদ’ সমর্থন করিয়াছেন। এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া আর সকল দার্শনিকই ভ্রম-জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন এবং ভ্রম-জ্ঞানের ব্যাখ্যায় পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভ্রম-সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মতকে প্রসিদ্ধ পাঁচ প্রকার খ্যাতিবাদে রূপায়িত করিয়া নিম্নোক্ত কারিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে :—

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাঽনির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎখ্যাতিপঞ্চকম্॥

ভ্রমের স্থলে বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতি, শূন্যবাদী বৌদ্ধ অসৎ-খ্যাতি, মীমাংসক-সম্প্রদায় অখ্যাতি, ন্যায়-বৈশেষিক অন্যথাখ্যাতি, এবং অদ্বৈত-বেদান্তী অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি সমর্থন করিয়া থাকেন। এতদ্‌ব্যতীত রামানুজ-সম্প্রদায় সৎখ্যাতি, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি সাংখ্য-পণ্ডিতগণ সদসৎখ্যাতি স্বীকার করেন। ক্রমে আমরা ঐ সকল খ্যাতি-বাদের নাতিবিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভ্রমের স্থলে শুক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষে শুক্তিতে রজত বস্তুতঃ থাকে না। সম্মুখে পতিত ঝিনুকের টুক্‌রায় রজতের খ্যাতি বা প্রকাশই কেবল থাকে। এইজন্যই ভ্রম-সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদকে বিভিন্ন ‘খ্যাতি-বাদ’ বলে। শুক্তিতে রজতের যে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অনুভব করেন। এখন কথা এই যে, শুক্তিতে যখন রজতের প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই রজত শুক্তিতে কোথা হইতে কি ভাবে আসিল? কিরূপে উহা চক্ষুর গোচর হইল, এবং প্রত্যক্ষ হইল, এই প্রশ্নই ভ্রম-প্রত্যক্ষের আসল প্রশ্ন। কেননা, দৃশ্য বিষয় ইন্দ্রিয়ের গোচরে না আসিলে সেই বিষয়ের জ্ঞানকে তো প্রত্যক্ষ বলা যায় না। ভ্রমের ক্ষেত্রে সকলেই ঝিনুক-খণ্ডকে রূপার খণ্ড বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। শুক্তিতে রজতের ঐ ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ দার্শনিক আচার্য্যগণ তাঁহাদের দার্শনিক পরীক্ষার অনুকূল বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে বিচার করিয়া উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্যই ভ্রমের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতিবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে।

বৌদ্ধ-মতানুসারে ভ্রমের লক্ষণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, তং কেচিদন্যত্র

অন্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। এখানে 'কেচিৎ' পদটির দ্বারা সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচার এবং শূন্যবাদী বা মাধ্যমিক, এই চার প্রকার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের এই সম্প্রদায়-ভেদের মূলে আছে বুদ্ধদেবেরই নিম্নলিখিত বাণী—"সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যম্ শূন্যম্।" বুদ্ধ-শিষ্যগণ তথাগতের ঐ রহস্যোক্তির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রধান চারটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধগণ ক্ষণিক জ্ঞান এবং জ্ঞানাতিরিক্ত ক্ষণিক জ্ঞেয় বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। পার্থক্য শুধু এই যে, সৌত্রান্তিকগণ বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বলেন না। জ্ঞানের বৈচিত্র্য দেখিয়া বাহ্য-বস্তু অনুমিত হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। বৈভাষিক-সম্প্রদায় বাহ্য-বস্তুকে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বলিয়াই মানিয়া লন। এই দুই প্রকার মতবাদীরা অপেক্ষাকৃত স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে "হীনযান" আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সূক্ষ্মতর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় দেওয়ায়, যোগাচার এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধ-মত "মহাযান" নামে অভিহিত হইয়াছে। যোগাচার বা বিজ্ঞান-বাদীর মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য বস্তু, জ্ঞানভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই মায়ার খেলা এবং অসত্য। জ্ঞানের বাহিরে জ্ঞেয় বলিয়া কিছুই নাই। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানেরই এক একটি বিশেষ আকার (Form) ছাড়া অন্য কিছু নহে; জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুতঃ অভিন্ন। অনাদি বাসনা বশতঃ ক্ষণিক বিজ্ঞানই নানাবিধ জ্ঞেয় বস্তুর আকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জ্ঞেয় বস্তুই জ্ঞানকে রূপায়িত করে, আবার জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়াই জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশিত হয়। একে অন্যের অভিন্ন সহচর। একাকে ছাড়িয়া অপরের ভাতি হয় না। দুইই 'নিয়ত-সহচর' বিধায়, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ইহারা একই সময়ে জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এইরূপ অবিচ্ছেদ্য সাহচর্য্য ইহাদের অভেদেরই সূচনা করে। জ্ঞেয় যে বিশেষ আকারধারী ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছু নহে, এই সত্যই ঘোষণা করে। ক্ষণিক জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয়ও নাই, জ্ঞাতাও নাই। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যার সৃষ্টি এবং মিথ্যা।[১]

বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতি ও শূন্যবাদীর অসংখ্যাতিবাদের পরিচয়

১। সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥

বিজ্ঞানবাদীর উল্লিখিত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া শূন্যবাদী বলেন, যাহা জ্ঞানকে রূপায়িত করে সেই জ্ঞেয় বস্তুরাজিকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলে, জ্ঞানও সেই ক্ষেত্রে মিথ্যাই হইয়া দাঁড়াইবে এবং মহাশূন্যতাই হইবে বৌদ্ধ-দর্শনের শেষ কথা। ইহাই হইল বিভিন্ন বৌদ্ধ-মতের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। এই সকল মতের সমর্থকগণ শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয় তাহার উপপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ভ্রমের স্থলে 'অন্যত্র' শুক্তি প্রভৃতিতে অন্য-ধর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম রজত প্রভৃতির অধ্যাস বা আরোপ হইয়া থাকে। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধগণ বাহ্য-বস্তুকে সত্য-স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে সত্য-শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই ভ্রম-জ্ঞানের উদয় হয়। বিজ্ঞানবাদী এবং শূন্যবাদীর মতে বাহ্য-বস্তু অসত্য এবং কল্পিত; ঐ কল্পিত, অসত্য শুক্তি প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়াই 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রমের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। বিজ্ঞানবাদী এবং শূন্যবাদীর সিদ্ধান্তে নিরধিষ্ঠানেই (অর্থাৎ কোনরূপ সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীতই) ভ্রম-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। ভ্রম-স্থলে 'ইদম্' পদার্থে যাহা আরোপিত হইয়া থাকে, সেই রজত প্রভৃতি যে মানসকল্পনা-প্রসূত এবং মিথ্যা, ইহা কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেন না। বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেন যে, যেই বস্তু যেইরূপে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই বস্তু প্রকৃতপক্ষে সেইরূপই বটে। ইহাই হইল জ্ঞানের সাধারণ নিয়ম। যেক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, কোনও প্রবলতর জ্ঞানের সাহায্যে পূর্ব্বে উৎপন্ন জ্ঞানটি বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে পূর্ব্বের জ্ঞানটি যে নিছক ভ্রান্তি, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। 'ইদং রজতম্' এই প্রকার জ্ঞানোদয়ের পর 'নেদং রজতম্' ইহা রজত নহে, এইরূপে যে বাধক-জ্ঞান জন্মে, তাহার দ্বারা 'ইদং রজতম্' এইরূপ জ্ঞানটি যে ভ্রম তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কিন্তু এখন কথা এই যে, 'নেদং রজতম্' এই বাধক-

অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥
যশ্চায়ং গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তীনাং পৃথগবভাসঃ
স একস্মিংশ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাসইব ভ্রমঃ।

সর্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন;

জ্ঞান কোন্ অংশে কাহার বাধ সাধন করিল? যাহার ফলে 'ইদং রজতম্' জ্ঞানটি ভ্রম বলিয়া সাব্যস্ত হইল, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। 'নেদং রজতম্' ইহার দ্বারা পূর্ব্বে উৎপন্ন 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানের রজতাংশের নিষেধ হইল? না 'ইদম্' অংশের নিষেধ হইল? এখানে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ বলেন যে, 'নেদং রজতম্' এই প্রকার বাধ-বুদ্ধির উদয়ের ফলে ইদমের সহিত রজতের অভেদ-বুদ্ধিই বাধা-প্রাপ্ত হয়। ভ্রমের ক্ষেত্রে 'ইদম্' অংশেরই বাধ হইয়া থাকে, 'রজত' অংশ বাধা-প্রাপ্ত হয় না। রজতের (ধর্ম্মীর বা বিশেষ্যের) বাধ স্বীকার করিতে গেলে, সেক্ষেত্রে রজতের ধর্ম্ম 'ইদমের' বাধও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, ধর্ম্মী বা বিশেষ্য রজত না থাকিলে, তাহার ধর্ম্ম সেখানে থাকিবে কিরূপে? এই অবস্থায় রজতের বাধ স্বীকার না করিয়া, কেবল রজতের বাহ্য-ধর্ম্ম 'ইদন্তার' বাধ স্বীকার করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত নহে কি? একের (ইদন্তা-ধর্ম্মের) বাধের দ্বারাই যে-ক্ষেত্রে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে; সে-ক্ষেত্রে উভয়ের বাধের কল্পনা করিতে যাওয়া গৌরবও বটে, নিষ্প্রয়োজনও বটে। আলোচ্য স্থলে রজতের 'ইদম্'রূপে বহিঃপ্রকাশ বাধিত হওয়ায়, রজত যে বাহিরের কোন বস্তু নহে, মনের বস্তু, জ্ঞানেরই এক প্রকার ধর্ম্ম, এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'নেদং রজতম্' এই প্রকার বাধ-বুদ্ধির উদয়ের ফলে আলোচ্য ভ্রম-জ্ঞানের 'ইদম্' অংশটি মাত্র অপসৃত হইয়া থাকে, রজতাংশ অপনীত হয় না। রজতের 'ইদন্তা' বা বহির্বর্ত্তিতা বাধিত হওয়ায়, রজত জ্ঞানের ধর্ম্ম হিসাবে মনোরাজ্যে বিজ্ঞানের আকার বা অংশ হিসাবেই থাকিয়া যায়। ইহাই ভ্রমের ব্যাখ্যায় আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধের বক্তব্য।

বিজ্ঞানবাদীর মতে এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'ইদমে' আরোপিত রজত দেখিয়া যেখানে 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রান্তির উদয় হয়, সেখানে মনোময় রজতকে মনোরাজ্যের বাহিরে অস্তিত্বশীল বলিয়া বোধ হওয়ায়, ঐরূপ জ্ঞান মিথ্যা হইতে বাধ্য। দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে মনোময়। মনোময় জাগতিক বস্তুর বহিঃপ্রকাশ শুক্তি-রজতের ন্যায়ই বিভ্রম বটে। এই যে শ্যামলা বিশ্বপ্রকৃতির কোটি কোটি বিচিত্র বস্তু আমরা আমাদের চারিদিকে ছড়ান দেখিতেছি, ইহাও বিশেষ বিশেষ আকারধারী এক একটি বিজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। বিজ্ঞান-বাদী মনোময় জগৎপ্রপঞ্চকে যখন মনোরাজ্যের বাহিরে জড় প্রপঞ্চরূপে দেখেন,

তখন তাঁহার সেই দৃষ্টিকে ভ্রান্তি বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। উল্লিখিত ('অন্যত্র অন্যধর্মাধ্যাসঃ' এইরূপ) ভ্রমের লক্ষণের শুক্তি-রজত যেমন লক্ষ্য, তথাকথিত সত্য-রজতও সেইরূপই লক্ষ্য বলিয়া জানিবে। জ্ঞেয়মাত্রই জ্ঞানের বিশেষ আকার ছাড়া অন্য কিছু নহে। বিজ্ঞান ব্যতীত এই মতে আর কোনও পদার্থ নাই। সুতরাং 'ইদংরূপে' উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার বস্তু-জ্ঞানই এই মতে অলীক-কল্পনাপ্রসূত এবং মিথ্যা হইবে বৈ কি! এই বিজ্ঞান নদী-স্রোতের ন্যায় জীবের মনোরাজ্য প্লাবিত করিয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য জল-কণা মিলিয়া যেমন নদী-প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-কণা (ক্ষণিক-বিজ্ঞান) মিলিয়াই বিজ্ঞান-ধারার সৃষ্টি হয়; এবং এই ধারাই বিশেষ বিশেষ আকার (form) প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞেয় বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং জ্ঞাতা 'আমি' প্রভৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। 'আমি' 'আমি' (অহমহম্) এইরূপ বিজ্ঞান-ধারার নামই 'আলয়-বিজ্ঞান'। এই 'আলয়-বিজ্ঞান'কেই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে জীবের আত্মা বলা হইয়া থাকে। জ্ঞেয় বিষয়ের দ্বারা বিজ্ঞানের যেই বিশেষ রূপ (particular form) প্রকাশ পায়, তাহাকে বিজ্ঞানবাদী 'প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[১] বিষয়-বিজ্ঞান বা প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানরূপে রজত-জ্ঞানও অবশ্য সত্য, কেবল মনোময় রজতকে 'ইদং'রূপে মনের বাহিরে দেখাই এই মতে ভ্রম।

শূন্যবাদী মাধ্যমিক দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে যেমন মিথ্যা বলেন, সেইরূপ বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞানকেও মিথ্যা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে। জ্ঞানের রূপদানকারী জ্ঞেয় বিষয় মিথ্যা হইলে, মাধ্যমিকের মতে তথাকথিত বিজ্ঞানও মিথ্যা হইতে বাধ্য। জ্ঞেয়ও মিথ্যা, জ্ঞাতাও মিথ্যা, জ্ঞানও মিথ্যা; ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় শুক্তিও মিথ্যা, আরোপ্য রজতও মিথ্যা, রজত-জ্ঞানও মিথ্যা, রজতকে যিনি প্রত্যক্ষ করেন সেই প্রত্যক্ষকারীও মিথ্যা। সর্ব্বত্র মিথ্যার খেলাই চলিতেছে। ফলে, শূন্যই দাঁড়ায় শেষ কথা। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি সকলেরই মহাশূন্যতায়ই শেষপর্য্যন্ত পর্য্যবসান হয়। এইজন্যই এই মাধ্যমিক মত 'অসদ্‌বাদ'

অসৎখ্যাতিবাদ —বা— শূন্যবাদের পরিচয়

১। তৎস্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ ভবেদহমাস্পদম্।
তৎস্যাৎপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেদিতি ॥
সর্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন;

বা 'শূন্যবাদ' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধের চরম সিদ্ধান্ত এই শূন্যতা যে কি, তাহা লইয়া বৌদ্ধ-পণ্ডিত সমাজেও গুরুতর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধ যাহাদিগকে গৌতম বুদ্ধেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, এমন কি ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, তাঁহারা শূন্যকে "অসৎ" বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। আলোচ্য অসৎখ্যাতিবাদ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে নাগার্জ্জুন প্রভৃতি আচার্য্যগণ বৌদ্ধোক্ত মহাশূন্যকে সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, সদসদ্ ভিন্নও নহে, এইরূপে (উল্লিখিত চার প্রকারের কোন প্রকারই নহে বলিয়া) ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শূন্যবাদীর সিদ্ধান্তে মহাশূন্যে যে জগদ্‌বিভ্রম হইয়া থাকে, তাহা অনাদি অজ্ঞান-বাসনার কুফল ; দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চকে অবিদ্যা-কল্পিত (সাংবৃতিক) বলিয়াই মাধ্যমিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ঐ অবিদ্যা-কল্পিত মিথ্যা জগতের সঙ্গে আলোচ্য মহাশূন্যতার কোনরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করা চলে কি ? শূন্যবাদে জগতের উৎপত্তিই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় ? জগৎকে আবিদ্যক বলিয়া কল্পনা করিলে, ঐরূপ শূন্যতা স্বীকার করার প্রয়োজনই বা সেক্ষেত্রে কি ? আর ঐরূপ মহাশূন্য অনির্ব্বাচ্য-স্থানীয়ই হইয়া দাঁড়ায় নাকি ? এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর আলোচিত শূন্যবাদে পাওয়া যায় না। এই কারণে বৌদ্ধোক্ত শূন্যবাদকে কোন মতেই গ্রহণ করা চলে না।

বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতি-বাদ এবং শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতি-বাদের সমালোচনা করিতে গিয়া প্রভাকর-মতাবলম্বী মীমাংসক বলেন, বৌদ্ধ-তার্কিকগণ শুক্তি-রজতের রজতকে জ্ঞানেরই এক বিশেষ আকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, ভ্রমের স্থলে আত্মখ্যাতি-বাদ উপপাদন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন,[১] সেখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ প্রমাণের সাহায্যে বৌদ্ধ-তার্কিকগণ রজতকে জ্ঞানের ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন ? যদি বল যে প্রত্যক্ষের সাহায্যে, তবে সেখানে প্রশ্ন এই যে, সেই প্রত্যক্ষের আকারটি (Form) কিরূপ বলিবে ? 'ইদং রজতম্'

আলোচিত আত্মখ্যাতি-বাদ ও অসৎখ্যাতি-বাদের সমালোচনা

১। বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ-ভ্রমস্থলে জ্ঞানের আকার মনোময় রজত প্রভৃতি বহিঃস্থ 'ইদম্' পদার্থে আরোপিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞান-

এই প্রকার প্রত্যক্ষ কি? এইরূপ প্রত্যক্ষ তো সম্মুখে 'ইদম্'রূপে যে-বস্তুটি আমাদের চক্ষুর গোচর হইতেছে, তাহা যে একখণ্ড রূপা, অন্য কিছু নহে, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দেয়। 'ইদং' বস্তু এক্ষেত্রে রজতের আধার বলিয়াই প্রতিভাত হয়। রূপার টুকরাকে হাতের মুঠায় লইবার জন্য রজতার্থীকে ঐ দিকে ধাবিত হইতেও দেখা যায়। রজত যে জ্ঞানের ধর্ম্ম বা আকার, মনোরাজ্যের বস্তু তাহাতো বুঝা যায় না। যদি ঐ প্রকার প্রত্যক্ষের ফলেই রজত যে জ্ঞানের ধর্ম্ম বহির্জগতের বস্তু নহে, তাহা বুঝা যাইত, তবে প্রত্যক্ষের আকারটি (Form) সে-ক্ষেত্রে 'ইদম্ রজতম্' 'ইহা রজত', এই প্রকারের না হইয়া, 'অহং রজতম্' 'আমি রজত', এইরূপই হইত। রজত ইদং পদার্থের ধর্ম্ম না হইয়া জ্ঞানের ধর্ম্ম হইলে, অহংরূপ আলয়-বিজ্ঞানই এখানে রজতের ধর্ম্মী বা আশ্রয় হইয়া প্রকাশ পাইত। কেননা, সর্ব্বপ্রকার বৌদ্ধ-মতে জ্ঞানকেই আত্মা বলা হইয়া থাকে। ক্ষণিক বিজ্ঞান ছাড়া "আমি" বা আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। 'আমিরূপ' (অহমাকার) বিজ্ঞান-ধারাই জীবের আত্মা বা আলয়-বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঐ আলয়-বিজ্ঞান বা আত্ম-বিজ্ঞান যখন রজতকে নিজের ধর্ম্মরূপে প্রকাশ করে, তখনই কেবল রজত-জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রজত জ্ঞানে ভাসিলে, তাহা 'ইদম্' পদার্থের ধর্ম্ম হইয়া 'ইদং রজতম্' এইরূপে কোনমতেই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে ভাসিতে পারে না, আমি রজত, বা আমার রজত, (অহং রজতম্, মম রজতম্) এইরূপেই কেবল ভাসিতে পারে। বিজ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং আমি-বিজ্ঞান বা আলয়-বিজ্ঞানও যে ক্ষণিক,

---

ব্যতীত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও. জ্ঞানের আকার রজত প্রভৃতিই যে বাহ্য 'ইদং' বস্তুতে আরোপিত হইয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করেন। বিশেষ শুধু এই যে, বিজ্ঞানবাদীর মতে বাহ্য বস্তু কল্পিত, আর সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকের মতে বাহ্য বস্তু বাস্তব। শূন্যবাদী মাধ্যমিক অসৎখ্যাতিবাদী হইলেও, ব্যবহারিক ভ্রম-স্থলে শূন্যবাদীও যে আত্মখ্যাতি-বাদ অনুমোদন করেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, শূন্যবাদীর মতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব যেমন কল্পিত, জ্ঞানের অস্তিত্বও সেইরূপই কল্পিত। তাঁহার মতে বস্তুতঃ জ্ঞেয়ও নাই, জ্ঞানও নাই। কেবল কল্পিত বাহ্য বস্তুতে ভ্রম-স্থলে কল্পিত জ্ঞানের আকারের আরোপ হইয়া থাকে। অসৎখ্যাতির অর্থই এই যে, *ভ্রান্ত রজত এবং 'ইদং' বস্তু উভয়ই অসৎ, উভয়ই মিথ্যা।*

তাহা নিঃসন্দেহ। মানব-জীবন-নদে ক্ষণিক 'অহম্'-বিজ্ঞানের যে ধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই ধারার সহিত মিশিয়াই রজত প্রমুখ বস্তুরাজি জ্ঞানের গোচরে আসে। আরও স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, 'আমি'-বিজ্ঞান-ধারা যদি কখনও রজত-বিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে, তবে সেখানে রজতের প্রকাশের জন্য রজত-বিজ্ঞানের সহিত 'অহং' বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ বা মিলনই হয় একান্ত প্রয়োজন। 'ইদ'মের সহিত রজতের সংমিশ্রণ রজতের প্রকাশের জন্য বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে অপেক্ষিত নহে, আর তাহা হয়ই বা কিরূপে ? 'ইদং রজতম্' এইরূপ মিথ্যা-প্রত্যক্ষের দ্বারা রজত যে আত্মার ধর্ম্ম বা জ্ঞানের ধর্ম্ম, তাহা বুঝা যায় না। পক্ষান্তরে, বহির্বর্ত্তী ইদমের সহিত রজতের মিশ্রণ এবং ইদমের ধর্ম্মরূপে রজতের প্রকাশ রজত যে আত্মার ধর্ম্ম নহে, এইরূপ বৌদ্ধ-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই সূচনা করে।

'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রম-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইদমের সহিত রজতের মিলনের ফলে রজতের বহির্বর্ত্তিতা সূচিত হইলেও, পর মুহূর্ত্তে 'নেদং রজতম্' 'ইহা রজত নহে', এইরূপে যে বাধ-বুদ্ধি (রজতের অভাব-বোধ) উদিত হয়, তাহা দ্বারা রজত যে 'ইদম্' পদার্থের ধর্ম্ম নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। রজত বাহিরের বস্তু না হওয়ায় উহা যে মনের বস্তু, জ্ঞানের ধর্ম্ম, তাহাই সাব্যস্ত হয়। 'নেদং রজতম্' ইহা রজত নহে, এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা রজত যে 'ইদং' পদার্থ হইতে ভিন্ন, তাহা বেশ বুঝা যায়। 'ইদম্' শব্দে যখন বাহ্য বস্তুকে বুঝায়, তখন 'নেদং রজতম্' এই প্রকার নিষেধটি ফলতঃ রজত যে বাহিরের বস্তু নহে, অন্তরের বস্তু, জ্ঞানের ধর্ম্ম, তাহাই সূচনা করে নাকি ? বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে প্রভাকরপন্থী মীমাংসকগণ বলেন, 'নেদং রজতম্' এইরূপ নিষেধ-বুদ্ধির দ্বারা 'ইদম্' পদার্থ যে রজত নহে, তাহা অবশ্যই বুঝা যায়। কিন্তু সম্মুখে বিরাজমান 'ইদম্' বস্তুটি রজত না হইলেই, রজত যে অন্তরের বস্তু এবং জ্ঞানের ধর্ম্ম হইবে, তাহা বৌদ্ধকে কে বলিল ? 'ইদং'রূপে সম্মুখে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা রজত না হইলেও, অপর কোন বাহ্য বস্তু যে রজত হইতে পারিবে না, তাহা তুমি (বৌদ্ধ) বুঝিলে কিরূপে ? জ্ঞানের ধর্ম্ম এবং 'ইদং' পদার্থের ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোনও পদার্থের কি কোন ধর্ম্ম নাই যে, 'ইদং' পদার্থের ধর্ম্ম না হইলেই তাহা

অগত্যা জ্ঞানের ধর্ম্ম হইবে? যদি বল, ঐ রজত যে জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে, ইহা যখন বুঝা যাইতেছে না, তখন 'ইদমের' ধর্ম্ম না হইলে জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতেই বা বাধা কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, রজত বাহ্য 'ইদম্' বস্তুর ধর্ম্ম নহে, ইহা হইতে রজত অন্তরের বস্তু ইহা কোন-মতেই প্রমাণিত হয় না, বরং 'ইদং' রূপে প্রকাশিত এই বাহ্য বস্তুটি রজত নহে, এইরূপ নিষেধের দ্বারা অপর কোন বাহ্য বস্তু রজত এইরূপ বুঝানই স্বাভাবিক। রজতের মনোময়তা সাধন, জ্ঞান-ধর্ম্মতা উপপাদন স্বাভাবিক নহে, প্রমাণ-গম্যও নহে। এই অবস্থায় ভ্রমের স্থলে মনোময় রজত, যাহা জ্ঞানেরই একটি বিশেষ আকার, বহিঃস্থ 'ইদং' পদার্থে আরোপিত হইয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে, এইরূপ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না।

সত্য কথা এই যে, 'নেদং রজতম্' এই নিষেধের দ্বারা আমরা এইটুকুই বুঝিতে পারি যে, ভ্রমের স্থলে প্রকৃতপক্ষে রজতের নিষেধ হয় না, 'ইদমের'ও নিষেধ হয় না। কেবল রজতের সহিত 'ইদমের' বস্তুতঃ যে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; 'ইদম্' এবং 'রজত,' এই উভয়ের পরস্পর অসম্বন্ধ বা ভেদই স্পষ্টতঃ আছে, সেই অসম্বন্ধের বা ভেদের জ্ঞানাভাব (অগ্রহ) বশতঃই দুইকে মিশাইয়া 'ইদং রজতম্' এই প্রকার মিথ্যা-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। 'নেদং রজতং' এইরূপ বাধ-বুদ্ধি 'ইদম্' বস্তু এবং রজতের মধ্যে পরস্পর ভেদ-জ্ঞানের যে অভাব আছে তাহার নিষেধেরই শুধু ইঙ্গিত করে না, রজত যে বস্তুতঃ 'ইদমে' নাই, ইহাও বুঝাইয়া দেয়। রজত যে জ্ঞানের ধর্ম্ম, অন্তরের বস্তু তাহা বুঝায় না। 'ইদম্' এবং 'রজতের' ভেদ-বুদ্ধির অনুদয়ের ফলে 'ইদং রজতম্' এইরূপে (বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) ভাষায় প্রয়োগ এবং ভ্রান্তদর্শীর রজতকে হাতের মুঠায় লইবার যে চেষ্টা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও নিষেধ 'নেদং রজতম্' এই প্রকার বাধ-বুদ্ধির দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। ইদং এবং রজতের পরস্পর ভেদ-জ্ঞানের অভাব-মূলে (ভেদাগ্রহমূলে) প্রভাকর-মীমাংসার মতানুসারে ভ্রমের লক্ষণ নির্ব্বচন করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক-মীমাংসা ভাষ্যের মুখবন্ধে (অধ্যাস-ভাষ্যে) বলিয়াছেন যে, যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। যে-বস্তুতে যেই বস্তুর অধ্যাস বা ভ্রম জন্মে, সেই উভয় বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে ভেদ

প্রভাকরোক্ত অখ্যাতিবাদ

বর্ত্তমান আছে, ঐ ভেদের জ্ঞানোদয় না হওয়ার দরুণই এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া লোকে বুঝিয়া থাকে। উভয়ের বিভেদ ভুলিয়া অভেদের বোধক 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভাষা ব্যবহার করে। ইহাকেই ভ্রম বলে।[১] বস্তুতঃ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই, সমস্ত জ্ঞানই সত্য-জ্ঞান বা প্রমা-জ্ঞান। সর্বং জ্ঞানং সমীচীনমাস্থেয়ম্। ভামতী, অধ্যাস-ভাষ্য; ভ্রম-জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। আলোচ্য ভ্রমের লক্ষণটির শুক্তি-রজতের স্থলে প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, শুক্তিতে রজতের অধ্যাস বা ভ্রম হয় বলিয়া লোকে যে ব্যবহার করে তাহার রহস্য শুধু এই যে, শুক্তি এবং রজতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে ভ্রান্তদর্শী তাহা ভুলিয়া যায়; 'ইদং'শব্দ-বাচ্য শুক্তিটিকে রজতের বোধক রজত-শব্দের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করে এবং রজতকে 'ইদম্' বলিয়া শুক্তির সহিত অভিন্ন করিয়া নির্দ্দেশ করে। এইরূপে শব্দের প্রয়োগ এবং ভেদে অভেদের নির্দ্দেশই ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।[২] জ্ঞান বস্তুতঃ পক্ষে জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত রূপেরই পরিচয় প্রদান করে। জ্ঞানোদয়ের ফলে আমাদের দৃষ্টিতে যে বস্তু যেইরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা যদি ঠিক সেইরূপ না হয়, তবে আমাদের কোন জ্ঞানের উপরই কখনও নির্ভর করা চলে না। সকল জ্ঞানেরই প্রামাণ্য-সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হয়। ফলে, জ্ঞানের দ্বারা কোনক্ষেত্রেই জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভবপর হয় না। আমাদের জীবন যাত্রাই অচল হইয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই যে স্বতঃপ্রমাণ এবং যথার্থ, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এখন কথা এই যে, জ্ঞানমাত্রই যদি সত্য হয়, তবে ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া লোকে যে একটা কথা বলে, তাহার অর্থ কি? ইহার উত্তরে প্রভাকর-মীমাংসক বলেন, ঝিনুকের টুক্‌রা দেখিয়া 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে তথাকথিত ভ্রম-জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়

১। যস্মিন্ শুক্তিকাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাস ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ নাসাবন্যথা-খ্যাতিনিবন্ধনা, কিন্তু গৃহীতস্য রজতাদেস্তৎস্মরণস্য চ গৃহীতাংশপ্রমোষেণ, গৃহীতমাত্রস্য চ ইদমিতি পুরোঽবস্থিতাদ্ ব্যমাত্রাত্তৎপ্রজ্ঞানাচ্চ বিবেকঃ, তদগ্রহনিবন্ধনো ভ্রমঃ।
ভামতী, ২৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

২। (ক) ভ্রান্তত্বঞ্চ গ্রহণস্মরণয়োরিতরেতরসামানাধিকরণ্যব্যপদেশো রজতাদি-ব্যবহারশ্চেতি। ভামতী, অধ্যাস-ভাষ্য, ২৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

(খ) অখ্যাতিমতে হি রজতস্য অসংন্নিধানাগ্রহঃ সংনিহিতত্বেন ব্যবহারহেতুত্বাদ্ ভ্রমঃ। অমলানন্দ-কৃত বেদান্তকল্পতরু, ২৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং;

যে, লোকে যাহাকে ভ্রম-জ্ঞান বলে, তাহা একটি জ্ঞান নহে, দুইটি জ্ঞান; এবং সেই দুইটি জ্ঞানই সত্য, কোনটিই মিথ্যা নহে। সেই দুইটি সত্য জ্ঞানকে দুইটি জ্ঞান বলিয়া ভ্রান্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। জ্ঞান দুইটিকে একাইয়া ফেলিয়া, একটি জ্ঞান বলিয়া সে ভ্রম করিয়া থাকে। 'ইদম্ রজতম্' ইহাও একটি জ্ঞান নহে—তথাচ রজতম্, ইদমিতি চ দ্বে বিজ্ঞানে স্মৃত্যনুভবরূপে, অধ্যাস-ভাষ্য-ভামতী; একটি 'ইদং'-বিষয়ক জ্ঞান, আর একটি রজত-বিষয়ক জ্ঞান। ইদং-বিষয়ক জ্ঞানটি এখানে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। কেননা, 'ইদং' জ্ঞানটি চক্ষুর গোচরে অবস্থিত কোনও বস্তুকে বুঝায়। চক্ষুর দোষ বশতঃ সম্মুখস্থ বস্তুটির বিশেষরূপ (শুক্তি প্রভৃতি স্বরূপ) দ্রষ্টার দৃষ্টিপথে ভাসে না। 'ইদং' রূপেই কেবল তাহা জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে; এবং ঐ একটা কিছু দেখিতেছি, এই ভাবেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরিদৃষ্ট বস্তুর চাক্‌চিক্য প্রভৃতি অবিকল রূপারই মত। এইজন্য 'ইদং' বস্তুর ঐরূপ প্রত্যক্ষই দর্শকের মনে পূর্ব্বে অনুভূত রজতের সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে; এবং সেই জাগ্রত (উদ্‌বুদ্ধ) রজত-সংস্কারই রজতের স্মৃতি জন্মায়। সুপ্ত সংস্কার কোনও কারণে উদ্‌বুদ্ধ (জাগরিত) হইলে তাহা যে স্মৃতি উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? রজতের স্মৃতি এক্ষেত্রে যথার্থই হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিশেষ এই যে, স্মৃতির যেইরূপ আকার (Form) আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই, তদনুসারে 'সেই রজত' 'তদ্‌রজতম্' এইরূপেই রজতের স্মৃতির উদয় হওয়া স্বাভাবিক; শুধু 'রজত' এইরূপে কোথায়ও রজতের স্মৃতির উদয় হইতে দেখা যায় না। স্মৃতির ইহা একাংশমাত্র। 'সেই' অংশটি স্মৃতিতে এখানে ভাসে নাই বলিয়া, ইহা পূর্ণ স্মৃতি নহে। এই শ্রেণীর স্মৃতিকে দার্শনিক পণ্ডিতগণ অস্ফুট-স্মৃতি (প্রমুষ্ট-স্মৃতি) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্ষুর দোষ বশতঃ সম্মুখে অবস্থিত ঝিনুক-খণ্ড যেমন ঝিনুকের টুক্‌রা বলিয়া জ্ঞানের গোচর না হইয়া, 'ইদং' রূপেই কেবল তাহা জ্ঞানে ভাসে, সেইরূপ স্মৃতির উপাদানের মধ্যে কোথায়ও কোনরূপ দোষ থাকার দরুণই রজতের স্মৃতি পূর্ণভাবে পরিস্ফুট না হইয়া, অর্থাৎ 'সেই রজত' 'তদ্‌রজতম্' এইরূপে উদিত না হইয়া, 'তদ্' অংশটি অপরিস্ফুট থাকিয়া কেবল 'রজত' এইরূপেই রজতের স্মৃতি হইয়া থাকে।[১]

১। তথাচ রজতং, ইদমিতিচ দ্বে বিজ্ঞানে স্মৃত্যনুভবরূপে, তত্র ইদমিতি পুরোবর্তি দ্রব্যমাত্রগ্রহণং, দোষবশাত্তদ্‌গতশুক্তিত্বসামান্যবিশেষস্যাগ্রহাৎ, * * * * সন্নিহিত-রজতগোচরজ্ঞানস্বারূপ্যেণ, ইদং রজতমিতি ভিন্নেহপি গ্রহণ-স্মরণে অভেদব্যবহারঃ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঃ চ প্রবর্ত্তয়তঃ। ভামতী, ২৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

'ইদং রজতম্' এখানে 'ইদমের' যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাও সত্য, রজতের যে স্মৃতি হয় তাহাও সত্য। 'ইদমের' প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি-জ্ঞান, ইহারা এক জাতীয় জ্ঞান নহে, তুই জাতীয় জ্ঞান। এই তুই জাতীয় জ্ঞান তুইটির জাতিগত, আকারগত এবং বিষয়গত যে পার্থক্য আছে, ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না। এই তুইটি জ্ঞান (ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি) তাহার নিকট তুইটি জ্ঞান বলিয়া 'খ্যাতি' লাভ করে না; 'একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান' বলিয়াই সে মনে করে এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকে। 'ইদং রজতম্' এইরূপে ইদম্ এবং রজতের অভেদ উপলব্ধি করিয়া, ভ্রান্তব্যক্তি রজত-প্রাপ্তির আশায় রজতের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানকে সে রজতে রজতের প্রত্যক্ষের ন্যায় সত্য, স্বাভাবিক বলিয়াই ধরিয়া লয়। তথাকথিত ভ্রম-জ্ঞান এবং সত্য-জ্ঞানের পূর্ণ সাদৃশ্যই যে তাহার এইরূপ ধরিয়া লইবার মূল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তুইটি জ্ঞান একত্রিতভাবে 'ইদম্ রজতম্' এইরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা যে একটি জ্ঞান নহে, তুইটি জ্ঞান, তাহা ভ্রান্তদর্শীর মনে জাগে না; সুতরাং মিথ্যা 'ইদং রজতম্' জ্ঞানকে সত্য 'ইদং রজতম্' জ্ঞান মনে করিয়া, সে তদনুরূপ ব্যবহার করিলে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ভ্রম-জ্ঞানের সমর্থক দার্শনিকগণ 'ইদম্ রজতম' এই স্থলে প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, এইরূপ তুইটি জ্ঞান স্বীকার করেন না: এই জ্ঞানদ্বয়ের অখ্যাতিও (অগ্রহ) সমর্থন করেন না। ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া তাঁহারা একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। আলোচ্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, এই তুইটি জ্ঞানের অখ্যাতি স্বীকার করিলেই, 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রমের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া তৃতীয় একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান ভ্রান্তির ক্ষেত্রে মানিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া অখ্যাতিবাদী মীমাংসক মনে করেন না।

এখানে এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রমের স্থলে যেমন প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, এই জ্ঞানদ্বয়ের 'অখ্যাতি' হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানদ্বয়ের যাহা বিষয়—ইদম্ এবং রজত, তাহাদের পরস্পর পার্থক্যও ভ্রান্তদর্শীর জ্ঞানে ভাসে না। জ্ঞানদ্বয়ের ভেদও যেমন গৃহীত হয় না, জ্ঞেয়-বিষয়ের পরস্পর যে পার্থক্য আছে তাহাও বুঝা হয় না। এইজন্যই ভ্রান্তি জন্মে। ঐ জ্ঞান তুইটি ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান: ইদং-জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ, রজত-জ্ঞানটি

স্মৃতি, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুইটি বিজাতীয় জ্ঞানের ভেদ গৃহীত হয় নাই বলিয়াই, অভেদের সূচক 'ইদং রজতম্' এইরূপ বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কতকগুলি ভ্রমের ক্ষেত্র আবার এমনও আছে যে, সেখানে দুইটি জ্ঞানই হয় এক জাতীয় জ্ঞান, দুই জাতীয় জ্ঞান নহে। ঐ এক জাতীয় জ্ঞান দুইটিরও ভেদ বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু তাহাদের জ্ঞেয় বিষয়ের যে প্রভেদ আছে, তাহা অগৃহীত থাকে না; জ্ঞানদ্বয়ের জ্ঞেয় বিষয় দুইটি পরস্পর পৃথক্‌ভাবেই ভ্রান্তদর্শীর প্রতীতির গোচর হইয়া থাকে, শুধু জ্ঞানদ্বয়ের ভেদ অগৃহীত থাকিয়াই তথাকথিত বিভ্রম উৎপাদন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'পীতঃ শঙ্খঃ' এইরূপ ভ্রমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে অদূরস্থ শঙ্খের প্রতি ধাবমান নেত্ররশ্মির মধ্যে আমাদের দূষিত পিত্তের যে ভাগ বা অংশ আছে, তাহা আমরা দেখিনা বটে, কিন্তু সেই অলক্ষিত পিত্তের হলুদ-বর্ণকে আমরা শঙ্খের গায়ে স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই; শঙ্খের প্রত্যক্ষেও কেবল শঙ্খটিকেই দেখিতে পাই, চক্ষুর দোষে শঙ্খের দুগ্ধধবল শুভ্রবর্ণ আমাদের দৃষ্টিতে ভাসে না। নেত্ররশ্মির অন্তরালবর্ত্তী পিত্তের হলুদ-বর্ণ এবং সমীপে অবস্থিত শঙ্খের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া পিত্তের পীত-বর্ণকে শঙ্খের বর্ণ মনে করিয়াই আমরা ভ্রম করি; এবং 'পীতঃ শঙ্খঃ' এইরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকি। এক্ষেত্রে পীত-বর্ণের জ্ঞান এবং শঙ্খ-জ্ঞানের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু হলুদ-বর্ণ এবং শঙ্খ, এই বিষয় দুইটি যে পরস্পর পৃথক্ তাহা বেশ বুঝা যায়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকের দৃষ্টিতে 'পীতঃ শঙ্খঃ' এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ এবং ব্যবহারের তথ্য যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যে, হলুদ-বর্ণের একটি ফুল দেখিয়া যখন আমরা উহাকে হলুদ-বর্ণের বলিয়া বুঝি, তখন হলুদ-বর্ণের সহিত ঐ ফুলের সম্বন্ধ নাই ইহা আমরা বুঝি না; ঘনিষ্ঠ (তাদাত্ম্য) সম্বন্ধ আছে ইহাই বুঝি। ফলে, ফুলটিকে হলুদ-বর্ণের বলিয়া ব্যবহারও করিয়া থাকি। এই ব্যবহারে যেমন হলুদ-বর্ণ এবং তাহার আধার পুষ্পের অসম্বন্ধ আমাদের দৃষ্টিতে ভাসে না, ঘনিষ্ঠ (তাদাত্ম্য) সম্বন্ধই ভাসে। সেইরূপ 'পীতঃ শঙ্খঃ' এই স্থলেও পীত-বর্ণ এবং ঐ পীত-বর্ণের আশ্রয় শঙ্খের মধ্যে যে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, চক্ষুর দোষ প্রভৃতি বশতঃ তাহা আমরা বুঝি না, নিকট সম্বন্ধই বুঝিয়া থাকি। প্রকৃত হলুদ-বর্ণের দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-স্থলে হলুদ-বর্ণ এবং হলুদে বস্তুর যেমন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের কথা

মনে আসে, অসম্বন্ধের কথা মনে আসে না,—'পীতঃ শঙ্খঃ' এই ভ্রমের স্থলেও সেইরূপ পীত-বর্ণের জ্ঞান এবং শঙ্খ-জ্ঞান, ইহারা দুইটি পৃথক্ জ্ঞান হইলেও, ঐ জ্ঞানদ্বয়ের ভেদের অগ্রহ বা জ্ঞানাভাব বশতঃ পীত-বর্ণ এবং শঙ্খের মধ্যে যে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তাহা ভ্রান্তদর্শীর দৃষ্টিতে ভাসে না, ঘনিষ্ঠ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই ভাসে। পীত-বর্ণ এবং পীত দ্রব্যের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের বোধ কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, এই উভয় প্রকার পীত বস্তুর জ্ঞানের স্থলেই সমানভাবে প্রকাশ পায়। তাহারই ফলে, পীত-বর্ণ এবং শঙ্খ, এই বিষয় দুইটি পরস্পর পৃথক্ হইলেও, পীত-বর্ণের জ্ঞান এবং শঙ্খ-জ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান একত্র মিলিত হইয়া, 'পীতঃ শঙ্খঃ' এইরূপ ভ্রম-জ্ঞান, অভেদের বোধক শব্দের প্রয়োগ, অভেদমূলক ব্যবহার প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন কোন ভ্রমের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়, এই উভয়েরই ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া, তথাকথিত ভ্রান্তি উদিত হইয়া থাকে। 'ইদম্'-এর প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এই উভয়বিধ জ্ঞানের এবং ঐ দুইটি জ্ঞানের বিষয় ইদম্ এবং রজত, ইহাদের পরস্পর যে পার্থক্য আছে, এই উভয় প্রকার পার্থক্য অনুভবের গোচরে না আসিয়া, 'ইদং রজতম্' এই প্রকার বিভ্রান্তি ঘটে। কখনও জ্ঞানের বিষয় দুইটি পরস্পর পৃথক্ বলিয়া বোধ হইলেও (অর্থাৎ বিষয়দ্বয়ের অভেদ-বোধ না থাকিলেও) জ্ঞানদ্বয়ের অভেদ-বুদ্ধি (ভেদাগ্রহ) বশতঃই ভ্রমের উদয় হইতে দেখা যায়। 'পীতঃ শঙ্খঃ' এই প্রকার বিভ্রম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে পীত-বর্ণের জ্ঞান এবং শঙ্খ-জ্ঞান, এই জ্ঞানদ্বয় পরস্পর অভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, ঐ জ্ঞানের জ্ঞেয় শঙ্খ এবং পীত-বর্ণ যে অভিন্ন নহে, বিভিন্ন, তাহাতো স্বীকার করিতেই হইবে। এক্ষেত্রে জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ থাকিলেও, জ্ঞান দুইটির মধ্যে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি না থাকায়, ভেদ-জ্ঞানের অখ্যাতি (অগ্রহ) নিবন্ধনই যে উক্তরূপ ভ্রান্তি জন্মিতেছে তাহাতে সন্দেহ কি?

ভ্রমবাদিগণ যাহাকে ভ্রম-জ্ঞান বলেন, তাহা বস্তুতঃ সত্য নহে, জ্ঞানমাত্রই যথার্থ। ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া অখ্যাতিবাদীর মতে কিছুই নাই। সংশয় বা ভ্রম বলিয়া লোকে যে ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে সেই সকল ব্যবহারের মূলে যে জ্ঞান আছে, তাহা যে যথার্থ-জ্ঞান, ইহাই শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া বস্তুতঃ কিছু না থাকায়, 'ইদং রজতম্', এইরূপ ভেদে অভেদের ব্যবহার এবং তদনুরূপ

শব্দ-প্রয়োগই কেবল হইতে দেখা যায়। 'নেদং রজতম্' এই প্রকার জ্ঞানকে যে ভ্রম-জ্ঞানের বাধক-জ্ঞান বলে, তাহাও সত্য কথা নহে। জ্ঞান কোন-কালেই বাধা-প্রাপ্ত হয় না, চিরকাল অবাধিতই থাকে, ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। কেবল 'ইদং রজতম্' এইরূপ অভেদের বোধক শব্দের প্রয়োগ এবং অভেদমূলক ব্যবহারের বাধ সাধন করে বলিয়াই, পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন 'নেদং রজতম্' এই জ্ঞানকে বাধক-জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের বাধক বলিয়া ইহাকে বাধক-জ্ঞান বলে না, অভেদ-বুদ্ধিমূলে উৎপন্ন ব্যবহারের বাধ সাধন করে বলিয়াই, গৌণভাবে ইহাকে বাধক-জ্ঞান বলে। জ্ঞানমাত্রই যে অবাধিত এবং সত্য, এমন কি 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ-ব্যবহারের মূলে যে জ্ঞান আছে, তাহাও যে যথার্থ-জ্ঞানই বটে, ইহা অখ্যাতিবাদের সমর্থক মীমাংসক আচার্য্যগণ নিম্নলিখিত অনুমান-প্রয়োগের সাহায্যে উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

(ক) 'ইদং রজতম্' এই প্রকার ব্যবহারের কারণ জ্ঞান যথার্থই বটে, (প্রতিজ্ঞা)

(খ) যেহেতু তাহাও জ্ঞান, (হেতু)

(গ) জ্ঞানমাত্রই যথার্থ বা সত্য হইয়া থাকে, যেমন বাদী মীমাংসক প্রতিবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতির অভিমত ঘট প্রভৃতির জ্ঞান, (উদাহরণ)

(ঘ) 'ইদং' রজতম্ এই প্রকার ব্যবহারের মূল জ্ঞানেও জ্ঞানত্বরূপ হেতু বিদ্যমান আছে, (উপনয়)

(ঙ) সুতরাং 'ইদং রজতম্' এই ব্যবহারের কারণ জ্ঞানও যে যথার্থই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?[১] (নিগমন)

ইহাই হইল জ্ঞানমাত্রের সত্যতার সমর্থক অখ্যাতিবাদের মূল কথা।

রামানুজোক্ত সৎখ্যাতিবাদ

অখ্যাতিবাদী মীমাংসক যেমন 'ইদং রজতম্' এই প্রকার ভ্রমের স্থলে একটি বিশিষ্ট-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে 'ইদমের' প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি-জ্ঞান, এইরূপ দুইটি সত্য-জ্ঞান মানিয়া লইয়া, ঐ জ্ঞান দুইটির অখ্যাতি বা অগ্রহ বশতঃ 'ইদং রজতম্' এই প্রকার ভ্রমের ব্যাখ্যা করিয়া, জ্ঞানমাত্রেরই সত্যতার অনুমান করিয়াছেন, সেইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তী শ্রীরামানুজাচার্য্যও তাঁহার শ্রীভাষ্যে

১। তস্মাদ্‌যথার্থাঃ সর্বে বিপ্রতিপন্নাঃ, সন্দেহবিভ্রমা, প্রত্যয়ত্বাৎ ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ। অধ্যাস-ভাষ্য-ভামতী, ২৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়-সাগর সং ;

'যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতিবেদবিদাংমতম্' এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, অখ্যাতিবাদীর ভিন্ন দৃষ্টিতে জ্ঞানমাত্রেরই সত্যতা উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায় তাঁহাদের সৎখ্যাতিবাদ-সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেন যে, ঝিনুক-খণ্ড দেখিয়া 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে রজত-জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা ঝিনুকের মধ্যে রজতের যে অংশ আছে, সেই রজতাংশকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, ঐ রজত-জ্ঞান যে যথার্থই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? রামানুজের বক্তব্য এই, যেই সকল বস্তুর পরস্পর সাদৃশ্য-বোধের উদয় হয়, তাহাদের ঐ সাদৃশ্যের মূল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, উহাদের উপাদান মৌলিক পরমাণুগুলিও পরস্পর সদৃশই বটে। সদৃশ পরমাণু-সকল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহার ফলেই সদৃশ বস্তুগুলির পরস্পর সাদৃশ্য বোধের উদয় হয়। ঝিনুকে ঝিনুকের পরমাণুও আছে, রজতের পরমাণুও আছে; এইরূপ রজতে রজতের পরমাণুও আছে, ঝিনুকের পরমাণুও আছে। যেই বস্তুতে যেই বস্তুর মৌলিক পরমাণু অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, তদনুসারে বস্তুর নামকরণ হইয়া থাকে। ঝিনুকে ঝিনুকের পরমাণু অধিক মাত্রায় আছে এইজন্য উহা ঝিনুক, রজতে রজতের পরমাণুর বাহুল্য আছে সুতরাং উহা রজত। ঝিনুক-খণ্ড দেখিয়া যেখানে 'ইহা রজত', এইরূপে জ্ঞানোদয় হয়, সেক্ষেত্রে চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃ ঝিনুকে ঝিনুকের মৌলিক পরমাণুর আধিক্য থাকিলেও, তাহা জ্ঞানের গোচর হয় না, তিরোহিতই থাকে। ঝিনুকের মধ্যে অল্পমাত্রায় বর্ত্তমান রজতাংশই জ্ঞানে ভাসে, এবং রজতেই রজতের জ্ঞানোদয় হয়। রজত দেখিয়া রজতার্থীকে তাহার প্রতি ধাবিত হইতেও দেখা যায়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ যে-ক্ষেত্রে থাকে না, সেখানে ঝিনুকের ঝিনুক-ভাগই নেত্রগোচর হয়। ফলে, ঝিনুককে ঝিনুক বলিয়া লোকে চিনিতে পারে, রজত বলিয়া বোঝে না। এইজন্য ঐ জ্ঞানকে সত্য, আর ঝিনুক-খণ্ডে অল্প মাত্রায় অবস্থিত রজত-ভাগের জ্ঞানকে মিথ্যা বলে। ঝিনুকের জ্ঞানের দ্বারা রজতের জ্ঞানকে বাধা-প্রাপ্ত হইতেও দেখা যায়।[১] শুক্তি-রজতের রজত-জ্ঞান শুক্তির রজত-ভাগকে আশ্রয়

১। রূপ্যাদিসদৃশশ্চায়ং শুক্ত্যাদিরুপলভ্যতে।
অতস্তত্রাত্রসদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ॥
কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্ত্যংশবর্জিতঃ।
রজতাংশো গৃহীতোঽতো রজতার্থী প্রবর্ত্ততে।

করিয়া উৎপন্ন হইলেও, শুক্তি-রজতের রূপার দ্বারা রূপার কায হয় না, রূপার বাসন, রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুত করা চলে না। সুতরাং রূপার খণ্ড দেখিয়া রূপা বলিয়া জানা, আর শুক্তি-রজতের রূপার ভাগকে রূপা বলিয়া জানা, এক প্রকারের জানা নহে। প্রথম জ্ঞানটিকে সত্য-জ্ঞান, আর দ্বিতীয় জ্ঞানটিকে মিথ্যা-জ্ঞান বলা হয়। রামানুজের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় জ্ঞানটির ক্ষেত্রেও রজতেই (শুক্তির রজত-ভাগেই) রজত-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বলিয়া উহাও যে যথার্থ জ্ঞানই হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতে ভ্রমের স্থলে সর্ব্বত্র সত্য বস্তুরই খ্যাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে বলিয়া, এই মত 'সৎখ্যাতিবাদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামানুজ তাঁহার সৎখ্যাতিবাদ সমর্থনের জন্য বস্তুমাত্রেরই মূল সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জড় বস্তুমাত্রই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, এই ভূতত্রয়াত্মক বা পাঞ্চভৌতিক। সকল বস্তুর মধ্যেই সকল মৌলিক বস্তুর সত্তা আছে; ক্ষিতির মধ্যে জল ও তেজ প্রভৃতির, তেজের মধ্যে ক্ষিতি, জল প্রভৃতির, জলের মধ্যেও ক্ষিতি এবং তেজ প্রভৃতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; এবং বস্তুভাগের আধিক্য বশতঃই ক্ষিতি, জল, তেজঃ প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় রামানুজের দৃষ্টিতে মরু-মরীচিকায় জলের জ্ঞান, ঝিনুক-খণ্ডে রজতের জ্ঞান প্রভৃতি কিছুই অসদ্‌বস্তুর জ্ঞান নহে। সৌর-কিরণের মধ্যে জলের যে-ভাগ আছে, ঝিনুকের মধ্যে রূপার যে-অংশ আছে, সেই সকল সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, অসত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া হয় না। 'পীতঃ শঙ্খঃ' প্রভৃতি প্রতীতি বিশ্লেষণ করিলেও শ্বেত শঙ্খের পীততা-বোধ যে রামানুজের মতে অযথার্থ বোধ নহে, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। শুভ্র শঙ্খকে কামলারোগী হলুদ-বর্ণের দেখে। তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে, কামলা-পীড়িত ব্যক্তির নেত্রান্তর্গত দূষিত পিত্তের পীততার সহিত তাহার নয়ন-রশ্মিসমূহ মিশ্রিত হইয়া পড়ে। পিত্তের পীত-বর্ণের দ্বারা শঙ্খের স্বভাবসিদ্ধ শুক্লতা অভিভূত হইয়া থাকে। সেইজন্য শঙ্খের শুভ্রতা আর কামলারোগীর নেত্রগোচর হয় না। শঙ্খটিকে সোনার

দোষহানৌতু শুক্ত্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ত্ততে।
অতো যথার্থং রূপ্যাদিবিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু॥
শ্রীভাষ্য, ২০০ পৃষ্ঠা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সং;

শঙ্খের ন্যায় সে হলুদ-বর্ণের দেখে। এক্ষেত্রে কামলা-পীড়িত ব্যক্তির নেত্রস্থ পিত্তের পীততাই শঙ্খগত হইয়া কামলারোগীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। পিত্তের পীত-বর্ণকে অবলম্বন করিয়াই এক্ষেত্রে পীততা-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। সুতরাং কামলা-পীড়িত ব্যক্তির ঐরূপ জ্ঞান যে সত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই উদিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। স্ফটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ-শুভ্র হইলেও, সমীপস্থ জবা-কুসুমের লোহিত প্রভায় স্ফটিকের শুভ্রতা যখন অভিভূত হয় এবং স্ফটিককে রক্তবর্ণের দেখায়, সেখানে জবা-কুসুমের রক্তিমাই দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে এবং ঐ রক্তিমা স্ফটিকের সহিত মিলিত হইয়া প্রতীতি-গোচর হয় বলিয়া, 'রক্তঃ স্ফটিকঃ' এইরূপ বোধের উদয় হয়। রামানুজের সিদ্ধান্তে এই বোধও অযথার্থ নহে, যথার্থ ই বটে। এইরূপ বিবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া রামানুজ সর্ব্ব-প্রকার বিভ্রমেরই যথার্থতা উপপাদন করিয়া, স্বীয় সৎখ্যাতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় জীবের যে-সকল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও সৎখ্যাতিবাদীর মতে সত্য বস্তুরই জ্ঞান। জীবের পাপ-পুণ্য প্রভৃতির তারতম্যানুসারে স্বপ্নাবস্থায় ঐ জীবের তৎকালোচিত ভোগ্য এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ জগৎপিতা পরমেশ্বরই দয়া করিয়া সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর-সৃষ্ট সত্য বস্তুই জীব স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পায় এবং ভোগ করে। ঐ সকল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, যেই জীবের জন্য দয়াময় শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করেন, সেই শুধু তাহা দেখিতে পায় এবং ভোগ করে। অন্যে তাহা জানিতে পারে না, ভোগও করে না। ভোক্তা জীবের পক্ষে সেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সত্যই বটে।

রামানুজোক্ত সৎখ্যাতিবাদের সমালোচনা

রামানুজ 'সৎখ্যাতিবাদ' উপপাদন করিতে গিয়া, স্বপ্নাবস্থায় জীব যাহা দেখে বা ভোগ করে তাহার সত্যতা সাধন করিবার জন্য, ভ্রমের ব্যাখ্যায় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছেন, জীবের পাপ, পুণ্য, অদৃষ্ট প্রভৃতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। দার্শনিক চিন্তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইহাকে কোনমতেই শোভন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ভ্রমের ব্যাখ্যায় যদি ভগবৎসৃষ্টি এবং ভগবৎপ্রসাদের উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে সেই ব্যাখ্যাকে মননের উন্নত স্তরে অবস্থিত, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারা যায় কি? দ্বিতীয়তঃ মরীচিকা-জল, শুক্তি-রজত প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, সৎখ্যাতির সমর্থক রামানুজ সৃষ্টির মূলতত্ত্ব

বিচার করিয়া বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুকেই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ এই ভূতত্রয়াত্মক অথবা পঞ্চভূতের মিশ্রণে গঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, সকল বস্তুতে সকল বস্তুর সত্তা প্রমাণ করিয়াছেন। সদৃশ বা তুল্য বস্তুর (শুক্তি-রজত প্রভৃতির) সাদৃশ্য উপপাদন করিতে গিয়া, শুক্তির পরমাণু-সমূহের মধ্যে রজতের পরমাণুর আংশিক অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া শুক্তি-রজত প্রভৃতিতে যে সত্য রজতের খ্যাতি উপপাদন করিয়াছেন, সেখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যেহেতু উহা শুক্তি, রজত নহে, সুতরাং শুক্তির অংশ বা উপাদান যে সেখানে বেশীমাত্রায় বিদ্যমান আছে, রজতের উপাদানের মাত্রা অল্প, ইহা তো রামানুজও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই অবস্থায় যাহা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান সেই শুক্তি-অংশের জ্ঞান না হইয়া, অল্পমাত্রায় বিদ্যমান রজতাংশের জ্ঞানোদয় কেন হইল? মরু-মরীচিকায় যে জলের জ্ঞানোদয় হয়, সেখানে বহুল মাত্রায় বর্ত্তমান সৌর-কিরণমালার প্রতীতি না হইয়া, অতি অল্পমাত্রায় বর্ত্তমান জলের জ্ঞান কেন উৎপন্ন হইল? ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর আমরা সৎখ্যাতিবাদীর মুখে শুনিতে পাই না। তারপর, শুক্তি-রজতের রজত সত্য রজতের ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে কার্য্যকর হয় না। ফলে, শুক্তি-রজতের রজত যথার্থ হইলেও, প্রকৃত রূপার খণ্ডের ন্যায় তাহাকে সত্য বলা কোন মতেই চলে না। সৎখ্যাতিবাদে এই সকল দোষ আসিয়া দাঁড়ায় বলিয়া, অপর কোন দার্শনিকই আলোচ্য সৎখ্যাতিবাদ অনুমোদন করেন নাই।

বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রমুখ সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণ ভ্রমের ব্যাখ্যায় সৎখ্যাতিবাদ গ্রহণ করেন নাই, 'সদসৎখ্যাতি' সমর্থন করিয়াছেন।

সাংখ্যোক্ত সদসৎখ্যাতি

ঝিনুকের টুকরা দেখিয়া 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে ভ্রম-জ্ঞানের উদয় হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সেখানে চক্ষুর দোষে ঝিনুকের বিশেষ ধর্ম্মের ভাতি না হইয়া, 'ইদং'রূপে ঝিনুকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সৎ বা সত্য বস্তুরই জ্ঞান বটে। 'ইদমে' অনুপস্থিত রজতের যে-জ্ঞান তাহা সত্য বস্তুর জ্ঞান নহে, অসতেরই জ্ঞান। ভ্রমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশে সর্ব্বত্রই এইরূপ সৎ এবং অসতেরই জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। রূপা বস্তুতঃ পক্ষে সত্য বস্তু হইলেও, 'ইদমে' (ইদংরূপে প্রতীয়মান শুক্তিতে) রজতের আরোপকে তো কোনমতেই সত্য বলা

চলে না। ইদমে অধ্যস্ত রজত সৎ নহে, অসৎ। 'ইদং রজতং' এইরূপ ভ্রান্তিতে ইদমংশে সত্য বস্তুর এবং ইদংরূপ আধারে অসৎ রজতের ভাতি হয় বলিয়া, এই মতকে 'সদসৎখ্যাতি' বলা সঙ্গতই হইয়া থাকে। ইদমে অসৎ বা অবিদ্যমান রজতের সত্তা উপপাদনের জন্য আলোচ্য সাংখ্যের ব্যাখায়ও রজতের অস্ফুট স্মৃতি, অর্থাৎ 'তদ্‌রজতম্' 'সেই রজত' এইরূপে রজতের স্মৃতি না হইয়া, শুধু 'রজত' এইরূপে রজতের অপরিস্ফুট স্মৃতি, স্মৃতির পরিচায়ক সেই অংশটুকুর অপলাপ এবং ইদং-পদার্থে রজতের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।[১]

সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যের সিদ্ধান্তে অসতের জ্ঞান মানিয়া লইতে হয় বলিয়াই, এইমত গ্রহণ করা যায় না। অসতের জ্ঞান স্বীকার করিতে গেলে আকাশ-কুসুম প্রভৃতি অসদ্ বস্তুর জ্ঞান হইতেই বা বাধা কি? অসতের খ্যাতি অসম্ভব কল্পনা। খ্যাতি সতেরই কেবল হয়, অসতের খ্যাতি হয় না, হইতে পারে না; অসৎখ্যাতি কথার কথা মাত্র।

অখ্যাতিবাদী মীমাংসক পণ্ডিতগণ 'ইদং রজতম্' এই ভ্রম-জ্ঞানের ব্যাখ্যায় 'ইদমের' প্রত্যক্ষ এবং 'রজতের' স্মৃতি, এইরূপ দুইটি

অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক কর্তৃক মীমাংসোক্ত অখ্যাতিবাদের খণ্ডন

যথার্থ-জ্ঞান মানিয়া লইয়া, ঐ জ্ঞান দুইটির মধ্যে পরস্পর যে ভেদ আছে, সেই ভেদের অগ্রহ বা জ্ঞানাভাব নিবন্ধন 'ইদং রজতম্', এইরূপ অভেদের বোধক শব্দের প্রয়োগ এবং সত্য রজতের ন্যায় ব্যবহার প্রভৃতি উপপাদনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক বলেন, 'ইদং রজতম্' এইরূপ জ্ঞানোদয়ের পর রজতেচ্ছু ব্যক্তিকে 'ইহা একখণ্ড রূপা' এইরূপ মনে করিয়া, রূপার টুক্‌রা সংগ্রহ করিবার জন্য

১। সদসৎখ্যাতির্বাধাবাধাৎ। সাংখ্য-দর্শন, ৫।৫৫ সূত্র;

বাধশ্চ প্রতিপন্নধর্মিণি নিষেধবুদ্ধিবিষয়ত্বম্। ন চ সদসত্ত্বয়োর্বিরোধ ইতি বাচ্যম্। প্রকারভেদেনাবিরোধাৎ। তথাহি লৌহিত্যং বিম্বরূপেণ সৎ স্ফটিকগত প্রতিবিম্ব-রূপেণ চাসদিতি দৃষ্টম্। যথা রজতং বণিগ্‌বীথীস্থরূপেণ সৎ শুক্ত্যধ্যস্তরূপেণ চাসৎ; তথৈব সর্বং জগৎ স্বরূপতঃ সৎ চৈতন্যাদাবধ্যস্তরূপেণ চাসদিতি।

বিজ্ঞান ভিক্ষু-কৃত সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য, ৫।৫৬ সূত্র;

যত্নশীল হইতে দেখা যায়। রজতকামীর রজত-গ্রহণের ঐরূপ প্রচেষ্টা কেবল ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এই ভিন্ন জাতীয় দুইটি জ্ঞানের, এবং ঐ জ্ঞানের বিষয় ইদং বস্তু এবং রজতের পরস্পর ভেদ-জ্ঞানের অভাব নিবন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে এইরূপ বলা সঙ্গত হয় কি? বুদ্ধিমান্ লোককে জানিয়া শুনিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, না জানিয়া, অজ্ঞানমূলে তো কোন কার্য্যই কদাচ করিতে দেখা যায় না। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের কোনরূপ জ্ঞান থাকে না। এই জন্য সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের কোনরূপ প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও দেখা যায় না। জাগরণে এবং স্বপ্নে জ্ঞান থাকে, সেই সময় চেষ্টা, প্রবৃত্তি প্রভৃতিও থাকে। ইহা হইতে জ্ঞান যে প্রবৃত্তির (চেষ্টার) কারণ, 'ইদম্' এবং রজতের ভেদ-জ্ঞানের অভাব যে কোনমতেই রজতার্থীর রজত-গ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে না, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। ইহার উত্তরে অখ্যাতিবাদী যদি বলেন যে, ইদং জ্ঞান, রজত-জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের বিষয় ইদং-বস্তু এবং রজতের পরস্পর ভেদ-জ্ঞানের অভাব নিবন্ধনই যে রজতার্থীর রজত-গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, তাহা আমরা (অখ্যাতিবাদীরা) বলি না। আমরা বলি এই যে, মূলে দোষ থাকার দরুণ ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি-জ্ঞানের, এবং ঐ প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির বিষয় 'ইদম্' এবং রজত-বস্তুর ভেদ গৃহীত হয় না। এই ভেদ-বুদ্ধির অভাব-বুদ্ধিই রজতার্থীকে রজত গ্রহণে প্ররোচিত করে। কোনরূপ প্রবৃত্তিই অখ্যাতিবাদীর মতে অজ্ঞানপূর্ব্বক হয় না। রূপার খণ্ড দেখিয়া যেক্ষেত্রে 'ইদং রজতম্' এই প্রকার সত্য-জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানে যেমন ইদং-বস্তু এবং রজতের মধ্যে কোনরূপ ভেদ-বুদ্ধি না থাকায়, ভেদের অগ্রহ বা জ্ঞানাভাবই থাকে, 'ইদং রজতম্' এই প্রকার মিথ্যা-জ্ঞানের স্থলেও ইদং এবং রজতের মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ থাকিলেও, চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃ সেই ভেদ-বুদ্ধি জাগে না, ভেদের অগ্রহই ভাসে। কোনরূপ ভেদ-বুদ্ধি না থাকায়, সত্য এবং মিথ্যা, এই উভয় প্রকার জ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সাদৃশ্য-বশতঃ মিথ্যা-জ্ঞানও যথার্থ-জ্ঞানের মতই ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে; এবং রজতকামীকে রজত-গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। সুতরাং অখ্যাতি-বাদী ভেদ-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধনই মিথ্যা রজতকে সত্য রজতের ন্যায়

ব্যবহার করেন, সত্য রজতের ন্যায়ই মিথ্যা-রজত গ্রহণে সচেষ্ট হন, এইরূপে অখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ যেই আপত্তি তুলিয়া থাকেন, সেই আপত্তি হয় নিতান্তই ভিত্তিহীন। অখ্যাতিবাদী মীমাংসক ভ্রম-স্থলে উভয় প্রকার জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ-বুদ্ধির অভাববশতঃই রজত আহরণে প্রবৃত্ত হন না। ভেদ-বোধ না থাকার দরুণ সত্য রজত-জ্ঞানের সহিত মিথ্যা রজত-জ্ঞানের যে সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠে, সেই সাদৃশ্যের বলেই সত্য-জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা রজত-জ্ঞানের স্থলেও রজতার্থীর ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া থাকেন।

অখ্যাতিবাদীর এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে অন্যথাখ্যাতি-বাদের সমর্থক নৈয়ায়িক বলেন, ভেদ-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন সত্য এবং মিথ্যা জ্ঞানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিয়া তন্মূলে অখ্যাতিবাদী রজতার্থীর ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতির সার্থকতা উপপাদনের যে প্রয়াস করিয়াছেন, সেখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সাদৃশ্যটি কি এক্ষেত্রে রজতার্থীর জ্ঞান-গোচর হইয়া তাঁহার চেষ্টা প্রভৃতি উৎপাদন করিবে, না, অজ্ঞাত থাকিয়াই রজতকামীর ব্যবহার, চেষ্টা প্রভৃতির কারণ হইবে? দ্বিতীয়তঃ, অখ্যাতিবাদী যে সাদৃশ্যের কথা বলিলেন, সেই সাদৃশ্যের স্বরূপটি এখানে কিরূপ হইবে? কাহার সহিত কাহার কিরূপ সাদৃশ্য বুঝাইবে, তাহা অখ্যাতিবাদীর আরও স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। ভ্রম-স্থলে উৎপন্ন ইদম্ এবং রজতম্, এই দুইটি জ্ঞানের সহিত 'ইদং রজতম্' এই প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের যে সাদৃশ্য আছে, সে সাদৃশ্য কি? তাহা হইলে বলিব, ভ্রমের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ইদম্ এবং রজত, এই দুইটি জ্ঞান একত্রে 'ইদং রজতম্' এই সত্য-জ্ঞানের সদৃশ, এইরূপ সাদৃশ্য-বোধ কোনক্রমেই সত্য-জ্ঞানের যাহা কার্য্য, সেই ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। কেননা, গবয়নামক অরণ্যচর প্রাণীটি গরুরই সদৃশ ইহা আমাদের জানা থাকিলেও, গবয় দেখিয়া গবয়কে গরু বলিয়া গ্রহণ করার প্রবৃত্তি আমাদের মনের মধ্যে জাগে কি? যদুকে মধুর সদৃশ বলিয়া বুঝিলেও, মধুকে যাহা বলিবার তাহা যদুকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও বলেন কি? এই জন্যই বলিতেছি যে, আলোচিত সাদৃশ্য-বুদ্ধি কদাচ ব্যবহার এবং প্রবৃত্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তারপর অখ্যাতি-বাদীর মতে ভ্রম-স্থলে উৎপন্ন ইদম্ এবং রজতম্, এই দুইটি জ্ঞানের মধ্যে যে

ভেদ-বুদ্ধি আছে সেই ভেদ-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন সত্য 'ইদং রজতং' জ্ঞানের সহিত মিথ্যা 'ইদং রজতং' জ্ঞানের যে সাদৃশ্যের উদয় হয়, সেই সাদৃশ্য ঐ সাদৃশ্যের জনক ভেদ-বুদ্ধির অভাব-বুদ্ধির সহিত সমকালে কিছুতেই থাকিতে পারে না। কারণ, অখ্যাতিবাদী যখন বলেন যে, ভ্রমের স্থলে উৎপন্ন ইদম্ এবং রজতম্, এই দুইটি জ্ঞান একত্রে 'ইদং রজতম্' এই সত্য-জ্ঞানেরই তুল্য, তখন তিনি ভ্রমের স্থলের দুইটি জ্ঞানকে 'দুইটি জ্ঞান' বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। অখ্যাতিবাদীর স্বীকারোক্তি হইতে তাঁহার যে জ্ঞানদ্বয়েব পরস্পর ভেদ-জ্ঞান আছে, তাহাই জানা যায়। সেই অবস্থায় ভেদ-জ্ঞানের অভাব আর থাকিল কোথায়? ফলে, দেখা যাইতেছে যে, সাদৃশ্যটি জ্ঞাত হইয়াই উহা রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হয় বলিলে, ভেদ-জ্ঞানের অভাব ব্যাখ্যা করা কোন মতেই সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, ভেদ-জ্ঞানের অভাব না থাকিলে প্রস্তাবিত সাদৃশ্য আদৌ জন্মিতেই পারে না। এই অবস্থায় ভেদ-জ্ঞানের অভাবমূলে যেই সাদৃশ্যের উদয় হয়, সেই সাদৃশ্য জ্ঞান-গোচর হইয়াই তাহা ব্যবহার ও প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে, অখ্যাতিবাদীর এইরূপ কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে নাকি? আর এক কথা, ভ্রম-স্থলে 'ইদং'-জ্ঞান এবং রজত-জ্ঞানের মধ্যে যে ভেদ-বুদ্ধির অভাব আছে, তাহা সত্য রজত-জ্ঞানের ভেদ-বুদ্ধির অভাবেরই তুল্য, এইভাবে সত্য ও মিথ্যা-জ্ঞানের সাদৃশ্য-বোধ উদিত হইয়া, তাহাই রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, তাহারও কোন বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না।[১]

১। প্রথম কল্পে সত্য 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানের সহিত ইদং রজতম্ এই ভ্রম-জ্ঞানের সাদৃশ্য বিবৃত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কল্পে 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রমের স্থলে অখ্যাতিবাদীর সিদ্ধান্তে যেরূপ ভেদ-জ্ঞানের অভাব আছে, সত্য ইদং রজতং জ্ঞানেও সেইরূপ ভেদ-বুদ্ধির অভাব আছে,—এইভাবে সত্য ও মিথ্যার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ভ্রম-স্থলের ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এই দুইটি জ্ঞান একত্রে 'ইদং রজতম্' এই সত্য-জ্ঞানের সদৃশ, এইরূপ যে সাদৃশ্য-বোধ তাহা দ্বারাও যেমন রজতার্থীর ব্যবহার, চেষ্টা প্রভৃতি উপপাদন করা যায় না; সেইরূপ ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এই দুইটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন ভেদ-জ্ঞানের অভাব দেখা যায়, তাহা সত্য রজত-জ্ঞানের স্থলের ভেদ-জ্ঞানের অভাবেরই তুল্য, এইরূপ সাদৃশ্য-জ্ঞানের সাহায্যেও রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। *ইহাই আলোচ্য সাদৃশ্য-ব্যাখ্যার মর্ম।*

কেননা, এক্ষেত্রেও ইদং জ্ঞান এবং রজত-জ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞানের মধ্যে ভেদ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ সাদৃশ্য স্বীকার করায়, পূর্ব্বের মতই স্বীয় উক্তির বিরোধই আসিয়া দাঁড়াইবে। কারণ, দুইটি জ্ঞান এই বোধ থাকিলে ভেদ-জ্ঞানই তো থাকিল, ভেদ-জ্ঞানের অভাব আর সেখানে থাকিবে কিরূপে ? ভেদ-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন সাদৃশ্যেরই বা উদয় হইবে কিরূপে ? ভেদ-বুদ্ধির অভাবমূলে উৎপন্ন সাদৃশ্যটি পরিজ্ঞাত হইয়াও তাহা যেমন ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ সাদৃশ্যটি অজ্ঞাত থাকিয়াও চেষ্টা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মাইতে পারে না, ইহাই দেখা গেল। জ্ঞাত সাদৃশ্য যেমন দুই প্রকারের হইতে দেখা গিয়াছে, অজ্ঞাত সাদৃশ্যও সেইরূপ দুই প্রকারই হইতে দেখা যায়। ইহার কোনটিই যে রজতার্থীর ব্যবহার, চেষ্টা প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তাহাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা আবশ্যক। ভ্রমের স্থলের 'ইদং' এবং 'রজতম্' এই জ্ঞানদ্বয়ের সহিত 'ইদং রজতম্' এই যথার্থ জ্ঞানের যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্য অজ্ঞাত থাকিয়াই যদি ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হয় বল, তবে সেই অজ্ঞাত সাদৃশ্য 'ইদং রজতং' এই সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে যেমন আছে, সেইরূপ 'ইদং রজতম্' এই মিথ্যা-জ্ঞান এবং সত্য ঘট-জ্ঞানের মধ্যেও তাহা আছে। এই অবস্থায় অজ্ঞাত সাদৃশ্য যদি রজতের ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতির উৎপাদনে সমর্থ হয়, তবে ঘটের আনয়ন প্রভৃতি ব্যবহার উৎপাদনেই বা তাহা সমর্থ হইবে না কেন ? ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর অখ্যাতিবাদী দিতে পারেন না। অতএব অজ্ঞাত সাদৃশ্যকে ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ বলা কোনমতেই চলে না। সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে ভেদ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্য অজ্ঞাত থাকিয়া, অন্য কোন জ্ঞান উৎপাদন না করিয়াই ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে, এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কেননা, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি না জানিয়া কখনও কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না, জানিয়া শুনিয়া, তবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। সুধী যখন রজত আহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রবৃত্তির লক্ষ্য রজতকে রজত বলিয়া বুঝিয়াই যে তিনি রজত-গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি ? রজত তাঁহার জ্ঞানের বিষয় না হইলে, সেই অজ্ঞাত রজত-সম্পর্কে তাঁহার কোনরূপ চেষ্টারই উদয় হইত না। অতএব বলিতেই হইবে

যে, ভেদ-বুদ্ধির অভাবমূলে যেই অজ্ঞাত সাদৃশ্যের উদয় হয়, তাহা অন্য কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াই রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তি প্রভৃতির কারণ হইয়া থাকে। এই জ্ঞানই হইল অনুপস্থিত রজতকে সম্মুখস্থ রূপে দেখা, এবং ইহাকেই অন্যথাখ্যাতিবাদী ভ্রম আখ্যা দিয়াছেন। সত্য কথা দাঁড়াইল এই যে, ভ্রমের ব্যাখ্যায় অখ্যাতিবাদীকে অজ্ঞাতসারে অন্যথা-খ্যাতিবাদেরই শরণ লইতে হইল।

নিজ-সিদ্ধান্তের সমর্থনে অখ্যাতিবাদী যদি বলেন যে, উল্লিখিত অজ্ঞাত ভেদাগ্রহ কোন পৃথক্ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া ভ্রান্তদর্শীকে তাঁহার ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে না, সম্মুখস্থিত দ্রব্যের রূপার তুল্য চাকৃচিক্য-নিবন্ধন রজতের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া রজতের যে স্মৃতি জন্মে, সেই রজত-স্মৃতিই হয় রজতার্থীর প্রবৃত্তির মূল। এইরূপ বলারও কোনই মূল্য নাই। রজতের স্মরণই শুধু কস্মিন্‌কালেও রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হয় না। রজতাভিলাষী ব্যক্তি সম্মুখে অবস্থিত 'ইদম্' বস্তুকে রজত মনে করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। সম্মুখে কিছু না দেখিয়া কেবল রজতকে মনে মনে স্মরণ করিয়া কোন স্থিরমস্তিস্ক ব্যক্তিই সম্মুখের দিকে দৌড়ায় না। এই অবস্থায় কেবল রজতের স্মৃতিকে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক বলিয়া কোন সুধীই মনে করিতে পারেন না। রজতার্থীর প্রবৃত্তির মূলে আছে তাঁহার রজতের উদগ্র লালসা। ইচ্ছা বা লালসা না থাকিলে প্রবৃত্তিই হয় না। ইচ্ছার মূলে থাকে জ্ঞান। যাহা আমি চিনি না, জানি না, সেই বিষয়-সম্পর্কে আমার ইচ্ছাও হয় না, কোনরূপ প্রবৃত্তিও জন্মে না। জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বিষয় সর্ব্বদাই এক এবং অভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, সম্মুখস্থিত বস্তুকে রজত বলিয়া না বুঝিলে, কেবল রজতকে মনে মনে স্মরণ করিয়া রজতার্থী উহা গ্রহণ করিতে কদাচ অভিলাষী হইত না এবং তাঁহার রজত-গ্রহণের প্রবৃত্তিও জন্মিত না। আরও স্পষ্ট কথায় বলিলে বলিতে হয় যে, আলোচ্য অজ্ঞাত ভেদাগ্রহ ভ্রমরূপ একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট-জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া, কোনক্রমেই রজত-গ্রহণের জন্য রজতার্থীর যে চেষ্টা দেখা যায় তাহার হেতু হইতে পারে না। অখ্যাতিবাদী যদি স্বীয় মতের পোষণে বলেন যে, সম্মুখস্থ বস্তুটিকে রজত বলিয়া নাই বা চিনিলাম; কিন্তু ইহা যে রজত নহে, তাহাও তো আমি বুঝি না। ইহা রজত নহে, এইরূপ বুঝিলে অবশ্য রজত-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতাম না।

ইহা রজত না বলিয়া যখন বুঝি নাই, রজতের উদগ্র লালসাও ভিতরে জাগিতেছে, এই অবস্থায় রজত-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহা খুব অসঙ্গত হইবে কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তুমি (অখ্যাতিবাদী) যখন সম্মুখে অবস্থিত বস্তুটিকে রজত বলিয়া চিনিতে পার নাই, তখন তুমি উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও না কেন? কিন্তু উপেক্ষা তো তুমি কর না, বরং উহার প্রতি ধাবিতই হও। এই অবস্থায় ইদম্ এবং রজতের ভেদ-জ্ঞানের অভাবকেই শুধু কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলে, তাহা প্রবৃত্তি এবং উপেক্ষা, এই উভয় প্রকার বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিরই কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ফলে, গ্রহণ-প্রবৃত্তি এবং উপেক্ষা, পরস্পর এই দুই বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া মানুষ তখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহাতো পড়ে না। বরং পরিদৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করিবার জন্য মানুষ চঞ্চলই হইয়া উঠে, দেখিতে পাই। লোকের এইরূপ গ্রহণ-প্রবৃত্তি দেখিয়াই বলিতে হয় যে, কেবল ভেদ-জ্ঞানের অভাব-বুদ্ধিই রজতার্থীর প্রবৃত্তির কারণ নহে। সম্মুখস্থিত ইদং পদগম্য বস্তুতে রজত-বুদ্ধির উদয় হয় বলিয়াই, রজতার্থী উহা গ্রহণে উন্মুখ হয়; অর্থাৎ আলোচ্য ভেদ-বুদ্ধির অভাব 'ইদং রজতম্' 'ইহা একখণ্ড রূপা' এইরূপ একটি তৃতীয় বিশিষ্ট-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া রজতার্থীর রজত-গ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। সহজ কথায় দাঁড়ায় এই যে, রজতার্থীর রজত-গ্রহণ-প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অখ্যাতিবাদীকে স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। ইহাই হইল অন্যথাখ্যাতিবাদী কর্ত্তৃক অখ্যাতিবাদের খণ্ডনের মূল কথা।[১]

ন্যায়োক্ত অন্যথাখ্যাতিবাদের বিবরণ

অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকের মতানুসারে ভ্রমের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর অধ্যাস-ভাষ্যে বলিয়াছেন, যত্র যদধ্যাস-স্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে।[২] অধ্যাস-ভাষ্য; যত্র যেখানে, যেই শুক্তি প্রভৃতিতে, যদধ্যাসঃ, যেই রজত প্রভৃতির অধ্যাস হইয়া থাকে, তস্যৈব, তাহারই, সেই শুক্তিকা প্রভৃতিরই, যাহা বিপরীত ধর্ম্ম অর্থাৎ রজত প্রভৃতি শুক্তি-বিরুদ্ধ বস্তুর যে ধর্ম্ম-রজতত্ব প্রভৃতি তাহার কল্পনা বা আরোপই অধ্যাস

১। ভামতী, ২৮ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং;

২। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভামতী-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যের উল্লিখিত অধ্যাস বা ভ্রমের লক্ষণটিকে অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতের

বা ভ্রম বলিয়া জানিবে। উল্লিখিত ভাষ্যোক্তির মর্ম্ম এই যে, শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান হয়, তাহা কেবল শুক্তি-জ্ঞানও নহে, কেবল রজত-জ্ঞানও

ভ্রমের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শাঙ্কর-ভাষ্যের ভাষ্যরত্নপ্রভা-নামক টীকার রচয়িতা পণ্ডিত গোবিন্দানন্দ আলোচ্য লক্ষণটিকে অসৎখ্যাতি-বাদী বা শূন্যবাদী বৌদ্ধ-মতের ভ্রমের লক্ষণ বলিয়া তাঁহার টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ লক্ষণস্থ 'বিপরীত ধর্ম' শব্দে সদ্‌বস্তুর সত্তারূপ ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্মকে অর্থাৎ অসত্তাকে গ্রহণ করিয়া, ইহাকে শূন্যবাদীর অভিপ্রেত লক্ষণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ভামতী-রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র 'বিপরীত ধর্ম' পদে অন্য বস্তুর ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন, শুক্তির ধর্ম্ম শুক্তিত্বকে গ্রহণ না করিয়া, শুক্তির বিপরীত ধর্ম্ম রজতত্বকে বুঝিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ বিপরীত শব্দের বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, পণ্ডিত বাচস্পতি তাহা করেন নাই। ইহাই উক্ত দুই প্রকার ব্যাখ্যার প্রভেদ। গোবিন্দানন্দের মতে ভাষ্যকার শঙ্কর 'অন্যত্র অন্য-ধর্মাধ্যাসঃ, ভাষ্যোক্ত এই প্রথম লক্ষণটির দ্বারা সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী, এই তিন প্রকার আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের এবং অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক মতের ভ্রমের লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধোক্ত আত্মখ্যাতিও বাস্তবিক পক্ষে অন্যথাখ্যাতিবাদেরই প্রকারভেদমাত্র, তদ্‌ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্যথাখ্যাতিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি—(ক) আত্মখ্যাতি এবং (খ) বাহ্য-খ্যাতি। বৌদ্ধ-তার্কিকগণ আত্মখ্যাতিরূপ অন্যথা-খ্যাতিকে, ন্যায়-বৈশেষিক বাহ্য-খ্যাতিরূপ অন্যথাখ্যাতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী-টীকায় প্রথম লক্ষণের ব্যাখ্যায়ই চার প্রকার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত আত্মখ্যাতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দা-নন্দ সেখানে সৌত্রান্তিক বৈভাষিক, যোগাচার, এই তিন শ্রেণীর বৌদ্ধ-মতোক্ত আত্মখ্যাতির এবং অন্যথাখ্যাতিবাদী ন্যায়-বৈশেষিকের অনুমোদিত ভ্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত তৃতীয় লক্ষণটির দ্বারা গোবিন্দানন্দ অসৎখ্যাতি-বাদীর (শূন্যবাদীর) অভিপ্রেত ভ্রমের লক্ষণের নির্ব্বচন করিয়াছেন। দ্বিতীয় লক্ষণে যে মীমাংসোক্ত অখ্যাতিবাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, এবিষয়ে বাচস্পতি এবং গোবিন্দানন্দ উভয়েই একমত। ভ্রমের লক্ষণের ব্যাখ্যায় ভামতী ও ভাষ্য রত্নপ্রভার উক্ত মত ভেদের রহস্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাচস্পতি ভামতীতে প্রথম লক্ষণের মধ্যেই চার প্রকার বৌদ্ধ-মতকে অন্তর্ভুক্ত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, ভামতীর সে ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে বলিতে পারা যায় যে, অখ্যাতিবাদী মীমাংসক ভাষ্যোক্ত দ্বিতীয়-লক্ষণে প্রথম-লক্ষণোক্ত সর্ব্বপ্রকার বৌদ্ধ-মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয়-লক্ষণে অন্যথাখ্যাতি-বাদী নৈয়ায়িক মীমাংসোক্ত অখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় অন্যথাখ্যাতি-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে অদ্বৈত-বেদান্তী ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত অন্যথা-খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়া অনির্ব্বাচ্যতাবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। ভ্রমের বিবরণে এইরূপ একটি ক্রমবিকাশের ধারা ভামতীর ব্যাখ্যায় সুধী পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিবেন। ভামতীর ব্যাখ্যাই জিজ্ঞাসুর নিকট অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। আমরা ভ্রমের বিশ্লেষণে এখানে ভামতী-মতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

নহে ; এই দুইটি জ্ঞান হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান। এই জ্ঞানের বিশেষ্য হইল 'ইদম্' অংশ, বিশেষণ হইল রজত। সুতরাং ইহা যথার্থ-জ্ঞান হইল না, ভ্রম-জ্ঞানই হইল। ইদম্ এবং রজতের এই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবটি আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধও স্বীকার করেন, কিন্তু অখ্যাতি-বাদী (অগ্রহবাদী) মীমাংসক ইহা স্বীকার করেন না। ভ্রম-জ্ঞানের বিষয় অনুপস্থিত রজত রজতার্থীর প্রবৃত্তি কিরূপে উৎপাদন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলেন যে, প্রথমতঃ সম্মুখে অবস্থিত চাক্‌চিক্যময় বস্তুর সহিত চক্ষুর সংযোগ হয়। চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃ সেই চাক্‌চিক্যময় বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম বা স্বরূপ (শুক্তিকা-রূপ) জ্ঞানগোচর হয় না, 'ইদং'-রূপেই তাহা তখন জ্ঞানে ভাসে। তারপর, সম্মুখস্থ চাক্‌চিক্যময় বস্তুর এবং রজতের সাদৃশ্য-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া রজতের স্মৃতি জন্মে। স্মৃতি-জ্ঞানের বিষয় সেই অনুপস্থিত রজতের সহিত সম্মুখে অবস্থিত ইদং-বস্তুর যে অভেদ বা তাদাত্ম্য চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাকেই ভ্রম আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য ভ্রম-জ্ঞানোদয়ের ফলে অসত্য রজত দেখিয়াও 'এই রজত লাভ করিলে আমার জীবনের অনেক প্রয়োজন সাধিত হইবে,' এইরূপে সত্য রজতের মতই উপকারিতা-বুদ্ধির (ইষ্ট সাধনতা-জ্ঞানের) উদয় হইয়া থাকে ; এবং রজতকামীর রজত-গ্রহণের জন্য ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছার পর গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা আসে। এইরূপ প্রবৃত্তির মূলে আছে ঐরূপ ভ্রান্ত রজত-বোধ। ইহা কেবল ইদমের প্রত্যক্ষও নহে, রজতের স্মৃতিও নহে ; স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষ ভিন্ন তৃতীয় একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান। এই জ্ঞানের বিষয় এবং বিশেষ্য হইল 'ইদম্'-বস্তু, আর রজত-অংশ হইল বিশেষণ বা প্রকার। ইদং-রূপে সম্মুখে অবস্থিত বস্তুর চাক্‌চিক্য দেখিয়া রজতের স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হইয়া, "জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ"-বলে ইদমে রজতের ভ্রম-প্রত্যক্ষ জন্মে। জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, দৃশ্য বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ব্যতীত দৃশ্য বস্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় না, হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের মূল ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের এই সম্বন্ধের নামই 'সন্নিকর্ষ'। ইহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের এই সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ যে-ক্ষেত্রে সোজাসুজি পাওয়া যায় না, অথচ সেইরূপ দৃশ্য বিষয়েরও যে

প্রত্যক্ষ হইবে, তাহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেখানে একটি অলৌকিক বা গৌণ-সন্নিকর্ষ মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখা যায় না। সেইরূপ স্থলেই 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ' স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রথমে মনের সহিত স্মৃতি-পথে আরূঢ় বিষয়ের একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তারপর সেই স্মৃত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত মনের সঙ্গে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার ফলে, স্মৃত বিষয়ের সহিতও চক্ষু প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের একটি গৌণ-সম্পর্ক সঙ্ঘটিত হয় এবং তাহার বলেই বিষয়টি প্রত্যক্ষগোচর হয়। এইরূপ 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ' সত্য এবং মিথ্যা উভয় প্রকার জ্ঞান-স্থলেই হইতে দেখা যায়। সুরভি চন্দন দেখিতেছি, এইরূপে চন্দনের সুবাসের যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাও যেমন 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষমূলক' প্রত্যক্ষ, 'ইদং'-রূপে পরিজ্ঞাত শুক্তিতে অনুপস্থিত, স্মৃত-রজতের প্রত্যক্ষও সেইরূপ জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ। এইরূপ প্রত্যক্ষের সাহায্যে ভ্রান্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচরে অবস্থিত স্মৃতি-পথে আরূঢ় রজতকে ইদমের সহিত অভিন্নভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে। ইহাই হইল ভ্রম। ঐরূপ ভ্রান্ত রজত-প্রত্যক্ষের পর রজতের উপকারিতা নিম্নোক্ত প্রকারে অনুমানের সাহায্যেও উপপাদন করা যাইতে পারে।

(ক) রূপার দ্বারা যেই কায হয় সম্মুখে অবস্থিত বস্তুও সেই কায করিবার যোগ্য, (প্রতিজ্ঞা)

(খ) যেহেতু সম্মুখে অবস্থিত বস্তুও রজত বটে, ইহাতেও রজতের ধর্ম্ম রজতত্ব আছে ; (হেতু)

(গ) যেখানে যেখানে রজতের ধর্ম্ম রজতত্ব থাকে, তাহাই রূপার দ্বারা যেই প্রয়োজন সাধিত হয় সেই প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, যেমন আমার হাতের মুঠায় অবস্থিত রজত, (দৃষ্টান্ত)

(ঘ) এই রজতেও রজতত্ব আছে, (উপনয়)

(ঙ) সুতরাং এই সম্মুখস্থ বস্তু যে রূপার প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (নিগমন)

এইরূপে রজতের উপকারিতা-বোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমান্ দর্শক রজত-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভ্রান্ত ব্যক্তির রজত-গ্রহণের প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অখ্যাতি-বাদী বলেন যে, ইদং-বস্তুকে রজত নহে বলিয়া ভ্রান্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। এইজন্যই সে রজত-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অখ্যাতিবাদী

তাঁহার এই অভিমত নিম্নোদ্ধৃত অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

(ক) সম্মুখস্থিত বস্তু' রূপার দ্বারা যেই উপকার সাধিত হয়, সেই উপকার-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, (প্রতিজ্ঞা)

(খ) যেহেতু উহা রজতভিন্ন বলিয়া প্রতীতিগোচর হয় না ; (হেতু)

(গ) যাহা রজতভিন্ন বলিয়া প্রতীতিগোচর হয় না, তাহা রূপার দ্বারা যেই উপকার সাধিত হয় সেই উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, যেমন পূর্ব্বে অনুভূত সত্য রজত ; (উদাহরণ)

(ঘ) 'ইদং রজতম্' বলিয়া ইদমে যে রজত-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাও রজতভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না ; (উপনয়)

(ঙ) সুতরাং ইহাও রজতসাধ্য উপকার-সাধনে সমর্থ হইবে বৈকি ! (নিগমন)

অখ্যাতিবাদীর উল্লিখিত অনুমানের বিরুদ্ধে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলেন, অখ্যাতিবাদী মীমাংসকের ঐরূপ অনুমানের হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে, তাহা অখ্যাতিবাদী লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? সাধ্য যেখানে নাই বা থাকে না, সেরূপস্থলেও অখ্যাতিবাদীর প্রদর্শিত হেতুটিকে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় ; ঐরূপ (সাধ্যের ব্যভিচারী) হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না, উহা হয় হেত্বাভাস বা দূষিত হেতু। রূপার দ্বারা যেই কায হয়, সেই কায করিবার ক্ষমতা (আলোচ্য অনুমানের সাধ্য) একমাত্র রূপাতেই থাকে, অন্য কোথায়ও তাহা থাকে না। কিন্তু 'রজতভিন্ন বলিয়া বুঝা যায় না' এইরূপ হেতুটি রজতে যেমন থাকে, সেইরূপ রজতভিন্ন ঝিনুক-খণ্ড প্রভৃতিতেও যে তাহা থাকে, তাহা তুমি (অখ্যাতিবাদী) নিজেই স্বীকার করিতেছ। কারণ, তুমিই বলিতেছ যে, সম্মুখস্থ 'ইদং'-বস্তু রজত নহে, অথচ তাহা রজতভিন্ন বলিয়া প্রতীতিগোচর হইতেছে না ; অর্থাৎ যাহা রজত নহে তাহাতেও তোমার প্রদর্শিত অনুমানের হেতুটি যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমার নিজের স্বীকারোক্তি-দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এই অবস্থায় আলোচ্য অনুমানের হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে, তাহা তুমি কোনমতেই অস্বীকার করিতে পার না। সুতরাং তোমার উল্লিখিত অনুমানের কোনই মূল্য দেওয়া চলে না। রজতার্থী ব্যক্তির সম্মুখস্থ 'ইদং'বস্তু-সম্পর্কে যে-জ্ঞানোদয় হয়, তাহা বস্তুতঃ পক্ষে রজত-জ্ঞান হইতে পৃথক্ একটি জ্ঞান নহে। ঐ জ্ঞান

সম্মুখস্থ 'ইদং'-বস্তু হইতে অভিন্নভাবে প্রতীয়মান রজত-সম্পর্কেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্মুখস্থ 'ইদং'-বস্তুকে বিশেষ্য করিয়া এবং রজতাংশকে বিশেষণভাবে গ্রহণ করিয়া সেখানে যে এক বিশিষ্টবুদ্ধিই জন্মে, তাহাও নিম্নোক্ত অনুমানের সাহায্যেই প্রমাণ করা যায়।

ভ্রম-স্থলে উৎপন্ন রজত-জ্ঞান সম্মুখস্থ বস্তু-সম্পর্কেই উদিত হইয়া থাকে, (প্রতিজ্ঞা)

যে-হেতু সম্মুখে অবস্থিত বস্তু প্রতিনিয়ত রজতার্থী ব্যক্তিকে রজত-গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে, (হেতু)

যে-জ্ঞান যেই অর্থী ব্যক্তিকে যেই বিষয়ে নিয়তই প্রলুব্ধ করে, সেই জ্ঞান সেই বস্তু-সম্পর্কেই উদিত হইয়া থাকে। যেমন বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ের স্বীকৃত সত্য-রজতের জ্ঞান, (উদাহরণ)

ভ্রম-স্থলের রজত-জ্ঞানও প্রতিনিয়তই রজতার্থীকে রজত-গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে, (উপনয়)

সুতরাং ভ্রান্ত রজত-জ্ঞানও যে সম্মুখস্থ বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই উদিত হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। (নিগমন)

ভ্রমের ক্ষেত্রে 'ইদং রজতম্' এইরূপে যে-জ্ঞানোদয় হয়, তাহা কেবল ইদং-জ্ঞানও নহে, কেবল রজত-জ্ঞানও নহে, ইদমের সহিত অভিন্নভাবে উৎপন্ন রজতের একটি বিশেষ প্রকারের বোধ।

ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এই দুইটি জ্ঞান স্বীকার না করিয়া তৃতীয় একটি বিশিষ্ট ভ্রম-জ্ঞান স্বীকার করিলে, সকল জ্ঞানেরই প্রামাণ্য-সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্য-সম্পর্কে সংশয় জাগিলে আমরা কোন জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিতে পারি না। কোন্ জ্ঞানটি ভ্রম, কোন্ জ্ঞানটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। সকল জ্ঞানকে প্রমা বা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে আর সে ভয় থাকে না। সুতরাং 'যথার্থং সর্ববিজ্ঞানম্', সমস্ত জ্ঞানই সত্য, এই সিদ্ধান্তই নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া উচিত। অনুমান প্রভৃতি দ্বারাও এইরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকের এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক বলেন যে, অখ্যাতিবাদী জ্ঞানমাত্রেরই প্রামাণ্য-সাধনের উদ্দেশ্যে যেই অনুমানের উপন্যাস করিয়াছেন (অখ্যাতিবাদীর অনুমান আমরা ৪০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি) সেই অনুমানও নির্দ্দোষ নহে। জ্ঞানের

প্রামাণ্য অখ্যাতিবাদীর মতে স্বতঃ এবং স্বাভাবিক হইলেও, জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদানের মধ্যে কোথায়ও যদি কিছু দোষ থাকে, (দ্রষ্টার চক্ষু যদি কামলা-রোগে দূষিত হয়) তবে ঐ দূষিত-কারণমূলে উৎপন্ন জ্ঞান যে সত্য না হইয়া মিথ্যাই হইবে, তাহা তো সকলেই এমন কি অখ্যাতি-বাদীও অনুভব করেন। এই অবস্থায় যেহেতু ইহা জ্ঞান, অতএব তাহা সত্য, এইরূপ নিশ্চয় করা কোনমতেই চলে না। জ্ঞানত্বকে হেতুরূপে উপন্যাস করিয়া অখ্যাতিবাদী জ্ঞানমাত্রেরই যে সত্যতার অনুমান করিয়াছেন, সেই অনুমানের (জ্ঞানত্ব) হেতু যে হেত্বাভাস হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি।

এইরূপে অন্যথাখ্যাতিবাদের সমর্থক ন্যায়-বৈশেষিক নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া প্রভাকরোক্ত অখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে অন্যথাখ্যাতি-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদী অদ্বৈত-বেদান্তী আলোচ্য অন্যথাখ্যাতিবাদে দোষ প্রদর্শন করতঃ স্বীয় অনির্ব্বাচ্য সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অন্যথাখ্যাতিবাদের খণ্ডন ও অনির্ব্বাচ্যখ্যাতিবাদ স্থাপন

ভ্রমের ব্যাখ্যায় অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদী বলেন, অন্যত্র অবস্থিত রজতের 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ' বশতঃ 'ইদমে' প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ অভিমতও যুক্তিসহ নহে। কারণ, প্রত্যক্ষ-স্থলে দৃশ্য বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির সন্নিকর্ষ বা সংযোগ অত্যাবশ্যক। যেই বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির সন্নিকর্ষ হয় না, তাহার কখনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ-ভ্রমস্থলে 'ইদং'-বস্তুতে যদি দূরবর্ত্তী গৃহে অবস্থিত রজতের প্রত্যক্ষই স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই গৃহে অবস্থিত রজতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দূরবর্ত্তী রজতের সহিত চক্ষুর সংযোগ তো ঘটে না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, 'ইদং'-পদবাচ্য শুক্তি প্রভৃতিতে রজতের যে ভ্রম-প্রত্যক্ষের উদয় হয়, সেখানে রজতের সেই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ উদিত হয় না। 'ইদমে' বস্তুতঃ রজত নাই, অথচ সত্য রজতের প্রত্যক্ষের মতই কোন বিশেষ দেশ, কাল প্রভৃতিকে লইয়াই যে এখানে রূপার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অনুভব করেন। এই সর্ব্বজনীন প্রত্যক্ষ-বোধ উপপাদন করিবার জন্য অবিদ্যাবশতঃ সেই দেশে এবং কালে তখনকার মত অনির্ব্বচনীয় বা প্রাতিভাসিক রজতের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, এইরূপ অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তই

স্বীকার্য্য। যদি বল যে, ভ্রম-স্থলে রজতের যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানোদয় হয়, তাহা তো আমাদের (অন্যথাখ্যাতিবাদীর) মতে লৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, উহা তো অলৌকিক (জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষজন্য) প্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক; অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ অপেক্ষিত নহে। রজত বস্তুতঃ এখানে সন্নিহিত নাই বলিয়াই তো তাহার প্রত্যক্ষের জন্য অলৌকিক-সন্নিকর্ষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেই অলৌকিক জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষবশতঃ গৃহে অবস্থিত রজতেরই বা 'ইদমে' প্রত্যক্ষ হইতে বাধা কি? ইদং-বস্তুর সহিত চক্ষুর সংযোগ হইবার পর রজতের ন্যায় চাক্‌চিক্য প্রভৃতি দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত রজতের যে স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহাই তো রজতের জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ। সেই অলৌকিক-সন্নিকর্ষ এবং ইদমের সহিত চক্ষুর সংযোগরূপ লৌকিক-সন্নিকর্ষ, এই দুইটি মিলিত হইয়াই ঝিনুক-খণ্ডে 'ইদং রজতম্' ইহা. একখণ্ড রূপা, এইরূপ বিভ্রম জন্মে। ভ্রমের এইরূপ ন্যায়োক্ত ব্যাখ্যার প্রতিবাদে অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন যে, এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে যে-সকল অনুমানে পক্ষ (অনুমানের সাধ্য বহ্নি প্রভৃতির আধার পর্ব্বত প্রভৃতিকে পক্ষ বলে) প্রত্যক্ষগম্য, সেই সকল স্থলে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত পক্ষে সাধ্যের আর অনুমান-জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। আলোচিত জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষবশতঃ সে সকল ক্ষেত্রে পক্ষে সাধ্যের প্রত্যক্ষই হইয়া দাঁড়ায়। পর্ব্বত-গাত্র হইতে উত্থিত ধূমরাজি দেখিয়া 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্' এইরূপে ধূমও বহ্নির যে ব্যাপ্তির স্মৃতি হইয়া থাকে, ঐ ব্যাপ্তি-স্মৃতিবলে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান না হইয়া, জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষবশতঃ অনুমানের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র বহ্নিপ্রভৃতির প্রত্যক্ষই উৎপন্ন হইবে। কেননা, অনুমানের উপাদান (সামগ্রী) এবং প্রত্যক্ষের উপাদান (সামগ্রী) এই উভয়-বিধ উপাদান বা সামগ্রী বিদ্যমান থাকিলে, সেক্ষেত্রে অনুমানের উদয় না হইয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই উদয় হয়, ইহাই হইল সর্ব্ববাদি-সম্মত নিয়ম। ফলে, প্রবলতর প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনুমানমাত্রেরই যে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অনুমানের এইরূপ উচ্ছেদ-নিবারণোদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধে অনুমানের প্রামাণ্য-সমর্থনের জন্য নৈয়ায়িক যদি বলেন যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের সামগ্রী এবং অনুমানের সামগ্রী, এই উভয় প্রকার সামগ্রী বা উপাদান উপস্থিত থাকিলে, তবেই সেখানে প্রবলতর প্রমাণ প্রত্যক্ষের

দ্বারা অনুমান বাধিত হইবে; এবং সেক্ষেত্রে অনুমান না হইয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই উদয় হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষটি যদি লৌকিক না হইয়া অলৌকিক হয়, তবে সে-স্থলে অলৌকিক প্রত্যক্ষ-অপেক্ষায় অনুমানই প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইবে। অনুমানের উচ্ছেদ হইবে কেন? নৈয়ায়িকের এইরূপ সমাধানেরও কোন মূল্য দেওয়া যায় না। কেননা, লৌকিক প্রত্যক্ষ-সামগ্রীর ন্যায় (elements which originate external perception) অলৌকিক প্রত্যক্ষ-সামগ্রীও (elements of internal perception) যে অনুমান অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া থাকে, তাহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। দৃষ্টান্তহিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, দূর হইতে মুড়া-গাছের গোড়া দেখিয়া উহাকে মানুষ ভ্রম করিয়া, হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গাছের গোড়ায় আরোপ করতঃ 'মনুষ্যোঽয়ং করচরণাদিমত্ত্বাৎ' ইহা একটি মানুষই বটে, যেহেতু উহার হাত-পা প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, এইরূপে গাছের গোড়াকে মানুষ বলিয়া অনুমান বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই করিয়া থাকেন। ন্যায়ের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-অনুসারে কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অনুমানের উদয় না হইয়া অনুমানকে বাধা করিয়া প্রত্যক্ষেরই উদয় হইবে। এই প্রত্যক্ষকে অবশ্য এখানে লৌকিক বলা যাইবে না; জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষই বলিতে হইবে। কেননা, মানুষ তো বস্তুতঃ পক্ষে এখানে নাই; যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভ্রম-প্রত্যক্ষের উদয় হইতেছে তাহা তো মানুষ নহে, গাছের গোড়া। অনুপস্থিত মনুষ্য-কায়ার সঙ্গে এক্ষেত্রে চক্ষুর সংযোগ না থাকায়, এই প্রত্যক্ষকে লৌকিক-প্রত্যক্ষ বলিবে কিরূপে? ইহাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা ছাড়া গত্যন্তর কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমান বিষয়ে লৌকিক এবং অলৌকিক, এই উভয়বিধ প্রত্যক্ষ-সামগ্রীই অনুমান হইতে বলবত্তর হইবে এবং অনুমানের বাধ সাধন করিবে। ফলে, অনুমানের উচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই। অনুমানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা নৈয়ায়িক অনুমানের উচ্ছেদ সাধন করিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। অনুমানের উচ্ছেদের ভয়ে অগত্যা তিনি জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ-পক্ষই নিশ্চয় পরিত্যাগ করিবেন। আলোচ্য জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ না মানিলে, ভ্রমের ক্ষেত্রে ঝিনুক-খণ্ডে অনুপস্থিত রজতের ভাতিও হইতে পারে না, প্রত্যক্ষও সম্ভবপর হয় না। ভ্রম-স্থলে 'ইদং'-বস্তুকে সকলেই

রূপার খণ্ড বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। রজতের এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা-উপপাদনের জন্য সাময়িক অনির্ব্বচনীয় রজতের উৎপত্তিই অবশ্য স্বীকার্য্য। জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ না মানিলে 'সুরভি চন্দনম্' এইরূপ জ্ঞানে সৌরভের সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ যোগ না থাকায় সৌরভের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষতা উপপাদন করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া উক্ত জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ মানার অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, বেদান্তীর মতে সেই সকল যুক্তির কোনই মূল্য নাই। কেননা, অদ্বৈত-বেদান্তী ঐরূপ ক্ষেত্রে চন্দন-সৌরভের যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই আদৌ স্বীকার করেন না।

তারপর, জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও, উহা দ্বারা যে শুক্তি-রজতের বিভ্রম ব্যাখ্যা করা যায় না, ভ্রান্তির ব্যাখ্যার জন্য রজতের সাময়িক আবিদ্যক উৎপত্তিই স্বীকার করিতে হয়, তাহা সমর্থন করিতে গিয়া বেদান্তী বলিয়াছেন যে, জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ বশতঃ ন্যায়-মতে চন্দন-সৌরভের যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ঐ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানটি অনুব্যবসায়ের সাহায্যে যখন দ্রষ্টার গোচরে আসে, তখন সাধারণ প্রত্যক্ষ হিসাবেই তাহা দ্রষ্টার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে, চক্ষু প্রমুখ কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। 'চন্দনের সুবাস আমি উপলব্ধি করিয়াছি' এইরূপেই অনুব্যবসায় হইয়া থাকে, 'চন্দনের সুবাসকে আমি চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছি' ন্যায়-মতেও এইরূপে অনুব্যবসায়ের উদয় হয় না। ইহাই যদি জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায়ের রহস্য হয়, তবে জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াও, শুক্তি-রজত-ভ্রমে 'আমি রজতের টুক্‌রাটিকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছি' এই প্রকার রজতের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকও উপপাদন করিতে পারিবেন না, 'আমি রজতকে জানিয়াছি' এইরূপে সামান্যতঃ রজতের বোধই কেবল নৈয়ায়িক সমর্থন করিতে পারেন। শুক্তিতে রজত-ভ্রমস্থলে 'রজতকে আমি চক্ষুর সাহায্যে দেখিতেছি' এইরূপেই যে অনুব্যবসায়ের উদয় হয়, তাহা সকলেই অনুভব করেন। এই অবস্থায় জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ মানিলেও তাহা দ্বারা ন্যায়-মতে শুক্তি-রজতের ভ্রমের ক্ষেত্রে রজতের চক্ষু-গ্রাহ্যতা উপপাদন সম্ভবপর হয় না। রজতের চক্ষুগ্রাহ্যতা সমর্থন করিবার জন্য অনির্ব্বাচ্য রজতের সাময়িক উৎপত্তিই স্বীকার করিতে হয়। সহজ কথায় অন্যথাখ্যাতিবাদীকেও ভ্রমের ব্যাখ্যায় অদ্বৈত-বেদান্তেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদের সমর্থক অদ্বৈত-বেদান্তের মতে ভ্রম-স্থলে ঝিনুক-খণ্ডের 'ইদং'-রূপে সামান্যতঃ জ্ঞানোদয় হইলে, চাক্‌চিক্য প্রভৃতি সাদৃশ্য নিবন্ধন ঝিনুক-খণ্ড যেই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত (অদ্বৈত-বেদান্তের মতে বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত, চৈতন্যে অধিষ্ঠিত বলিয়াই জড়-প্রপঞ্চের প্রকাশ সম্ভবপর হইয়া থাকে) সেই চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যার তমোভাগ হইতে অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হইয়া তাহা প্রত্যক্ষের গোচর হয়। এই রজত 'ইদং'-রূপে প্রত্যক্ষের গোচর হয় বলিয়া, ইহাকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় একেবারে অলীকও বলা যায় না; রজতের কল্পিত আধার শুক্তিকার জ্ঞানোদয়ে বাধিত হয় বলিয়া, ইহাকে সত্যও বলা যায় না। সৎ এবং অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া এই রজতকে 'সদসৎ'ও বলা যায় না, সদসদ্‌ভিন্নও বলা যায় না। এইভাবে কোনরূপেই এই রজতের স্বরূপ নির্ব্বচন করা যায় না বলিয়াই, ইহাকে 'অনির্ব্বাচ্য' বলা হইয়া থাকে। এই অনির্ব্বাচ্য বস্তু অদ্বৈত-বেদান্তে 'প্রাতিভাসিক' বলিয়া পরিচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজত ভ্রান্তদর্শীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই কেবল এই অনির্ব্বাচ্য রজতের সত্যতা স্বীকৃত হয়। ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে উহার আর কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাবৎ প্রতিভাসমবতিষ্ঠতে, যেই পর্য্যন্ত প্রতিভাস বা প্রকাশ থাকে, সেই পর্য্যন্তই কেবল বর্ত্তমান থাকে, এইজন্যই এই শ্রেণীর বস্তুকে 'প্রাতিভাসিক সৎ' বলা হইয়া থাকে। ইদমে রজতের ঐরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষি-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত অবিদ্যার সত্ত্বগুণের পরিণাম। অনির্ব্বাচ্য অভিনব রজতের উপাদান হইল শুক্তি-চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যা। গুণময়ী অবিদ্যার শরীরে বিক্ষোভ বা আলোড়নের সৃষ্টি হইলেই অভিনব রজত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যার সেই বিক্ষোভের যাহা হেতু, সাক্ষি-চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার ক্ষোভেরও তাহাই হেতু বলিয়া জানিবে। এইজন্য একই সময়ে রজত এবং রজতের প্রত্যক্ষানুভূতি উৎপন্ন হয় এবং অধিষ্ঠান শুক্তিকার জ্ঞানোদয়ে একই সময়ে আবার তাহা তিরোহিত হয়; কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই বিভ্রম অবিদ্যার পরিণামও চৈতন্যের বিবর্ত্ত। ভ্রমের উপাদান কারণ অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়, সুতরাং আবিদ্যক রজত এবং তাহার ভ্রান্তি প্রভৃতি সকলই অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে অনির্ব্বচনীয় হইতে বাধ্য। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শুক্তি-রজত এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট রজত, এই উভয় প্রকার রজতই অদ্বৈত-বেদান্তের

অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতির পরিচয়

মতে অনির্ব্বচনীয় এবং মিথ্যা। উভয়ই মিথ্যা হইলেও রজতের ভ্রম-স্থলে 'ইদং'-রূপে উহা প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া, সে-স্থলে বাহ্য অবিদ্যাংশ হয় অভিনব রজতের উপাদান কারণ, সাক্ষি-চৈতন্যাশ্রিত আন্তর অবিদ্যাংশ হইয়া থাকে রজতের জ্ঞানরূপ বৃত্তির উপাদান কারণ। স্বপ্ন-ভ্রমে সাক্ষি-চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যার তমোগুণাংশ স্বপ্নদৃশ্য বিষয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং সেই অবিদ্যারই সত্ত্বগুণাংশ স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান-বৃত্তিরূপে পরিণতি লাভ করে। স্বপ্ন-ভ্রমে আন্তর অবিদ্যাই স্বপ্নদৃশ্য বিষয় ও স্বপ্ন-জ্ঞান এই উভয়েরই উপাদান কারণ হইয়া থাকে। শুক্তি-রজত, স্বপ্ন-দৃষ্ট রজত প্রভৃতি যেমন মিথ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চকেই অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে অনির্ব্বচনীয় এবং মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। শুক্তি-রজতের এবং স্বপ্ন-রজতের উপাদান কারণ যেমন অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা, সেইরূপ এই দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরও উপাদান কারণ অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যাই বটে। প্রভেদ শুধু এই যে, শুক্তি-রজতের উপাদান কারণ তুলা অবিদ্যা বা জীব-চৈতন্যের উপাধি খণ্ড অবিদ্যা, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ মূলা অবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর-চৈতন্যের উপাধি অখণ্ড অবিদ্যা। শুক্তি-রজতের স্রষ্টা অজ্ঞ জীব, মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চের স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। রজতের অধিষ্ঠান শুক্তির জ্ঞানোদয়ে পরিদৃষ্ট রজত এবং রজত-বুদ্ধি, এই উভয়ই যেমন তিরোহিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিত নিখিল বিশ্বই জগদধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানোদয় হইলে তিরোহিত হয়। জীব, জগৎ প্রভৃতি কোন বিভাবই আর তখন থাকে না। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে অজ্ঞানের ছায়া-চিত্রগুলি সকলই চিরতরে সমূলে বিলুপ্ত হয়, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরম ব্রহ্মই কেবল অবশিষ্ট থাকে। ইহাই অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদের বা মায়াবাদের মর্ম্মকথা।[১]

এই অনির্ব্বাচ্যবাদ আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। যাহা প্রকাশিত হয়, সব সময় তাহাই বস্তুতঃ সত্য হয় না। যাহা তোমার আমার নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা অসৎও হইতে পারে। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তোমার আমার দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়া

১। এই মায়াবাদ ও অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদ আমরা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ৯—১২ পরিচ্ছেদে অধ্যাস ও মায়াবাদের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাকে আমরা ১মখণ্ডের সেই আলোচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

থাকে বলিয়াই যে উহাদিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, অদ্বৈত-বেদান্তীর নিকট এইরূপ যুক্তির কোনই মূল্য নাই। 'ইদং রজতম্' এইরূপে ভ্রম-স্থলে ঝিনুকের খণ্ড রজতরূপে সকলের নিকটই প্রকাশিত হইয়া থাকে। রজতার্থীকে রূপার টুক্‌রা পাইবার আশায় ঝিনুক-খণ্ডের অভিমুখে ধাবিত হইতেও দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া ঝিনুক তো আর রূপা হইয়া যায় না। উহা যেই ঝিনুক সেই ঝিনুকই থাকে। যেই বস্তু যেই রূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকাশিত রূপেই যদি সেই বস্তু সত্য হয়, তবে মরুভূমিতে মরীচিকায় জলের যে প্রকাশ হয়, তাহাকেও সত্যই বলিতে হয়, এবং সেই জল পান করিয়াও পিপাসাতুর ব্যক্তির জল-পিপাসার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা তো হয় না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, আরোপিত বস্তু প্রকাশিত হইলেও, তাহাকে বস্তুতঃ সত্য বলা চলিবে না। সৌর-কিরণ-রূপে জল কখনও সত্য বস্তু হইতে পারে না। মরীচি-জল সত্য বস্তু না হইলেও, তাহারও যখন উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন অসত্য বস্তুও যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

মীমাংসা-মতের অনুসরণ করতঃ (ভ্রম-স্থলে সর্ব্বত্রই সৎখ্যাতি সমর্থন করিয়া) যদি বলা যায় যে, জগতে অসৎ বলিয়া কিছু নাই, অভাব বলিয়াও কোন পদার্থ নাই, সকল বস্তুই ভাবস্বরূপ এবং সৎ বা সত্য পদার্থ। কেবল সময় সময় কোন একটি ভাব-বস্তুকে অপর আর একটি ভাব-বস্তুর সহিত মিশাইয়া, অর্থাৎ তাহাকে সেই অপর ভাব-বস্তুর রূপে রূপায়িত করিয়া যখন আমরা তাহার ব্যবহার করি, তখনই তাহাকে অভাব আখ্যা দিয়া থাকি। অভাব বলিয়া কথিত হইলেও ঐ অভাব স্বরূপতঃ ভাবই থাকে। যাহার যাহা স্বরূপ তাহার কখনই বিচ্যুতি ঘটে না। ঘট প্রমুখ বস্তুরাজি স্বীয় ঘটরূপেই সত্য বটে, পটের অভাবরূপে ঘট সত্য নহে, অসত্য। এই পটাভাব এখানে ঘটেরই স্বরূপ, ঘট হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। যখনই আমরা বলি যে, ঘটঃ পটো ন ভবতি, তখনই পটের অভাব ঘটের বিশেষণরূপে প্রতিভাত হইয়া, পটের অভাবরূপে ঘট যে সত্য নহে, তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দেয়। অভাব বলিয়া এইমতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। একটি ভাব-বস্তুই অপর একটি বস্তুর অভাব বলিয়া অভিহিত হয়; ঘটই হয় পটের অভাবের রূপ। ভাবান্তরমভাবঃ, ইহাই হইল সত্য কথা। বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুকেই আমরা দুই ভাবে দেখিয়া

থাকি। কখনও তাহাকে ভাবরূপে দেখি, কখনও তাহাকে অভাবরূপে দেখি। যেই বস্তুর যাহা নিজরূপ, সেই নিজরূপে যখন বস্তুকে দেখিতে পাই, তখনই আমরা তাহাকে ভাব-বস্তু বলি, আর যখন অপর কোনও বস্তুর স্বরূপ মনে করিয়া বস্তুটিকে দেখি, তখনই তাহাকে অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যখন বলি, 'ঘটাভাববদ্ ভূতলম্' (ঘটাভাবশালী ভূতল) তখন শুদ্ধ ভূতলের রূপ আমাদের দৃষ্টিতে ভাসে না। ঘট প্রভৃতি বস্তুর অভাব ভূতলের বিশেষণরূপে আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয়, এবং তাহার সহিত ভূতলকে মিশাইয়া সেইভাবে ভূতলকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তখনই কেবল আমরা ভূতলকে ঘটাভাবশালী (ঘটাভাববদ্ ভূতলম্) বলিয়া উল্লেখ করি। প্রকৃতপক্ষে ঘটাভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই; অভাব বলিয়া ভূতলের কোন বিশেষ ধর্ম্ম যে আমাদের প্রতীতির গোচর হয় তাহাও নহে; কেবল বিরোধী ঘটাভাবরূপে ভূতলের ভাবনাই ঘটাভাবের ভাবনা। ঘটাভাবরূপে ভূতলের জ্ঞানই ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান, আর ভূতলরূপে ভূতলের যে বোধ তাহাই ভূতলের স্বরূপের জ্ঞান বা ভাবরূপে জ্ঞান। ভাব-অভাব শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাত্র। অভাব বলিয়া স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নাই। ভাবই একমাত্র তত্ত্ব।[১]

উল্লিখিত যুক্তিবলেই মীমাংসক পণ্ডিতগণ সমস্ত বস্তুকেই ভাব বস্তু এবং সকল প্রকার জ্ঞানকেই সত্য-জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, স্বীয় অখ্যাতি সিদ্ধান্তকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যে বস্তুমাত্রকেই যাঁহারা অসৎ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, সেই বৌদ্ধ-মতকে নির্ম্মমভাবে তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-তার্কিকগণের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান ছাড়া বাহ্য বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। বাহ্য বস্তুমাত্রই অসৎ। অসত্য বাহ্য বস্তুর কোন প্রকার কার্য্যকারিতাও নাই। জ্ঞান ব্যতীত এই মতে জ্ঞেয় বলিয়া যেমন কিছু নাই, আমি বা

১। স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে।
বস্তুনি জ্ঞায়তে কৈশ্চিদ্রূপং কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ১২ ॥
মীমাংসা-শ্লোকবার্তিক, অভাব-পরিচ্ছেদ, ১২ শ্লোক;

বস্তুমাত্রই তাহার নিজের রূপ এবং অপরের রূপের দ্বারা সর্ব্বদা সৎ এবং অসদাত্মক, ভাবরূপ, অভাবরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। বস্তু সৎ, না অসৎ, তাহা লোকে সময় বিশেষে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য-নিবন্ধনই কেবল বুঝিতে পারে।

অভাব-সম্পর্কে অনুপলব্ধি পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সেই আলোচনা দেখুন।

জ্ঞাতা বলিয়াও কোন পৃথক্ তত্ত্ব নাই। ক্ষণিক বিজ্ঞানই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সিদ্ধান্তে একমাত্র তত্ত্ব। সেই জ্ঞানের প্রতিনিয়ত উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে। এইরূপে জ্ঞানের ধারা বা স্রোতঃ চলিয়াছে। এই জ্ঞান-ধারার অন্তর্গত প্রত্যেকটি জ্ঞানই নিজ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব জ্ঞানের স্বভাবের অনুরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের বিষয় পরবর্ত্তী জ্ঞানেও সংক্রামিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। জ্ঞাতা 'আমি-বিজ্ঞান' বা আলয়-বিজ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিষয়-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই আবিদ্যক, অনাদি বাসনা-কল্পিত। ভাবনার দৃঢ়তা-বলে বাসনার সমূলে উচ্ছেদ হইলে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বুদ্ধির বিবিধ বিভাবেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিভাবের নিবৃত্তি ঘটিলে যে-বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই মহোদয়, মুক্তি বা পরিনির্ব্বাণ বলিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে—ভাবনাপ্রচয়বলান্নিখিল-বাসনোচ্ছেদবিগলিতবিবিধবিষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধবিজ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইতি। সর্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধ-দর্শন; জ্ঞেয় বিষয়ই আদৌ না থাকিলে জ্ঞান সেই অসৎ জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করে কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ-তার্কিকগণ বলেন, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, উহা অসৎ বা অসত্য জ্ঞেয় বিষয়কেও প্রকাশ করিয়া থাকে। অসত্য বা মিথ্যা বিষয়কে প্রকাশ করিবার যে-শক্তি জ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম অবিদ্যা—তস্মাদসৎপ্রকাশনশক্তিরেব অবিদ্যেতি সাম্প্রতম্। অধ্যাস-ভাষ্য-ভামতী; অসৎখ্যাতিবাদী বৌদ্ধের অসদ্‌বাদের খণ্ডনে মীমাংসক পণ্ডিত প্রভাকর বলেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চকে অসৎ বা অসত্য সাব্যস্ত করিতে গিয়া, বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের অসদ্‌বস্তুকে প্রকাশ করিবার যে-শক্তি স্বীকার করিলেন, (যেই শক্তিকে তাঁহারা অবিদ্যা বলেন) বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানের সেই শক্তি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা দ্বারা অসদ্‌বস্তুর প্রকাশের কতটুকু সাহায্য হয়? ঐ শক্তির কি কি কার্য্য সাধন করিবার সামর্থ্য আছে? তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি বল যে, ঐ শক্তির যাহা কার্য্য তাহাই অসৎ, এইরূপে অসতের কার্য্যতা উপপাদন সম্ভবপর হয় কি? যাহা অসৎ তাহা চিরদিনই অসৎ, তাহা আবার কার্য্য হইবে, জন্মলাভ করিবে কিরূপে? অসৎ আকাশ-কুসুম কখনও জন্মে কি? কার্য্য বা জন্য হইলে তো তাহা সৎই

হইল, তখন তাহাকে আর অসৎ বলা যায় কিরূপে? সুতরাং অসৎ-কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে এইরূপ বলা কোনমতেই চলে না। ঐরূপ উক্তি হয় বিরুদ্ধ উক্তি। বৌদ্ধোক্ত ঐ অসদ্ বস্তুকে জ্ঞেয় বা জ্ঞান-প্রকাশ্যও বলা যায় না। বিজ্ঞানবাদীর মতে যখন জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয় বলিয়া কিছুই নাই। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানেরই এক একটি বিশেষ আকার মাত্র। এই অবস্থায় অসৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চকে জ্ঞেয় বা জ্ঞান-প্রকাশ্য বলিলে, এই মতে একটি সাকার বিজ্ঞানকেই অপর একটি সাকার বিজ্ঞানের জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সেই বিজ্ঞানও যখন নির্ব্বিষয় নহে, তখন তাহাকেও আর একটি বিজ্ঞানের জ্ঞেয় বলা ছাড়া গতি নাই। এইরূপে অসতের খ্যাতি স্বীকার করিতে গেলে, অনবস্থাই আসিয়া দাঁড়ায় নাকি?

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে সৎস্বরূপ জ্ঞানের সহিত অসত্য বিষয়ের সম্বন্ধ কি হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। যদি বল যে, বিষয় বস্তুতঃ অসৎ হইলেও ঐ অসৎ বিষয়ই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে, নির্ব্বিষয় জ্ঞান কখনও কাহারও গোচরে আসে না। তথাকথিত অসৎ বিষয় না থাকিলে সাকার বিজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করাও সম্ভবপর না। ইহাই সত্য-জ্ঞান ও অসত্য বিষয়ের সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে। এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে সৎখ্যাতিবাদের সমর্থক মীমাংসক বলেন যে, অসৎ কারণমূলে কদাচ কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অসৎ ইহার স্বভাবও নহে। এই অবস্থায় অসতের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারে না, এইরূপ বলা নিতান্তই অসঙ্গত নহে কি? তারপর, অসতের আবার সাহায্য করিবার শক্তিই বা কোথায়? সেই শক্তি থাকিলে তো সেই শক্তির সূত্র ধরিয়া অসৎ সৎই হইয়া দাঁড়ায়, তাহা অসৎ হইবে কেন? যদি বল যে, যে-জ্ঞান অসৎকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই জ্ঞানই অসৎপদার্থে সেই শক্তির আধান করিয়া থাকে। তবে আমরা (প্রতিবাদীরা) বলিব যে, শক্তির আধার বলিয়াই অসৎ আর তখন অসৎ হইবে না, উহা তখন এক শ্রেণীর সৎই হইয়া পড়িবে। দৃশ্যমান নিখিল বিশ্ব, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যদি একেবারেই অসৎ হয়, উহাদের যদি কোনরূপ সত্যতাই না থাকে, তবে উহাদিগকে সত্য বলিয়া লোকে প্রত্যক্ষ করে কেন? সুতরাং জ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, সেই সকল বাহ্য বস্তুর সত্যতা অনস্বীকার্য্য।

বাহ্য বস্তুকে অসৎ বলা কোনমতেই চলে না। ইহাই হইল সৎখ্যাতিবাদী মীমাংসক কর্ত্তৃক বৌদ্ধোক্ত অসৎখ্যাতিবাদের খণ্ডনের মূল কথা।

অনির্ব্বাচ্যখ্যাতি-বাদের সমর্থক অদ্বৈত-বেদান্তী মীমাংসকোক্ত সৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন করিতে গিয়া বলেন যে, মীমাংসক-সম্প্রদায় ভ্রম-স্থলে সত্য বস্তুর খ্যাতি স্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানকেই যে যথার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। মরুভূমির সৌর-কিরণমালায় জলের যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকে কি করিয়া যথার্থ এবং অবাধিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়? যাহা প্রকৃতপক্ষে জল নহে, (সৌর-কিরণ) তাহাকে যদি 'জল নহে' বলিয়া বুঝা যায়, তবেই ঐ বুদ্ধিকে সত্য বলা চলে; অজলকে যদি 'জল' বলিয়া মনে করা হয়, তবে কোন বুদ্ধিমান্ দার্শনিকই ঐ বুদ্ধিকে সত্য বলিতে পারেন না। মরু-মরীচিকা যে জল নহে, তাহা তুমি মীমাংসকও মান। মরু-মরীচিকা যে জল নহে ইহাই সত্য, মরীচিকা-জল কখনই সত্য হইতে পারে না। যে-পদার্থ বস্তুতঃ জল নহে (মরু-মরীচিকা) তাহা জল হইবে কিরূপে? মরু-মরীচির জলরূপ যে কল্পিত তাহা নিঃসন্দেহ। মরু-মরীচিকার ঐ কল্পিত জলরূপ ব্যাবহারিক সত্য বস্তু নহে। ব্যাবহারিক সত্য বস্তু হইলে তাহা হয় মরীচি হইবে, আর না হয় নদীর জল হইবে। যদি বল যে, ইহা মরীচি হইবে, তবে তাহা দেখিয়া 'ইহা মরীচি' এইরূপ বুদ্ধিই হওয়া উচিত, 'ইহা জল' এই প্রকার জ্ঞান হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। পক্ষান্তরে, উহা 'নদীর জল' মরীচি নহে, এইরূপ বুঝিলে, উহা দেখিয়া 'নদীর জল,' এইরূপ বুদ্ধিরই উদয় হওয়া স্বাভাবিক, মরুভূমিতে জল এই প্রকার প্রতীতি হওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে। এখানে মীমাংসক যদি বলেন যে, পূর্ব্বে নদী প্রভৃতিতে যেই জল ভ্রান্ত ব্যক্তি দেখিয়াছে, এই জল দেখিয়া সেই জলের স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগরূক হইয়া থাকে, কেবল কোথায় দেখিয়াছে মানসিক দুর্ব্বলতা-বশতঃ সেটুকু তাহার স্মৃতির গোচর হয় না, জলেরই শুধু এখানে স্মৃতি হইয়া থাকে। এইভাবেও মরীচি-জলের প্রতীতি ব্যাখ্যা করা মীমাংসক আচার্য্যগণের মতে সম্ভবপর হয় না। কেননা, ঐরূপ অপরিস্ফুট, আংশিক স্মৃতিবশে শুধু জল এইরূপেই তাহা জ্ঞানে ভাসিতে পারে, এখানে মরু-মরীচিকায় জল এইরূপে জলের আধারের জ্ঞান সহ তাহা কিছুতেই প্রতীতিগোচর হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,

সৎখ্যাতিবাদী মীমাংসক পণ্ডিতগণ মরু-মরীচিকায় জল-ভ্রান্তিতেও যে সত্য জলের প্রতীতি স্বীকার করেন, তাহা কোন মতেই যুক্তিসহ নহে। জলরূপে প্রকাশমান সূর্য্য-মরীচি কস্মিন্ কালেও সত্য হইতে পারে না। সূর্য্য-মরীচি সূর্য্য-মরীচিরূপে প্রকাশিত হইলেই তাহা সত্য এবং স্বাভাবিক হইবে। সূর্য্য-মরীচির কল্পিত জলভাব সত্য নহে, মিথ্যা। অসত্য বস্তু অনুভবের গোচর হয় না, এইরূপ কথা বলা চলে না। অসত্য বস্তু যদি অনুভবের গোচর নাই হয়, তবে জলরূপে প্রকাশমান সূর্য্য-মরীচিকেও প্রতিবাদী মীমাংসকের সত্যই বলিতে হয়। কিন্তু কোন সুধী দার্শনিকই জলরূপে সূর্য্য-মরীচির প্রকাশকে সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। ঐ জল ইদং-রূপে সম্মুখস্থ হইয়া প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ জলকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ বা অলীকও বলা চলে না। মরু-মরীচিকার জল অধ্যস্ত বা আরোপিত হইলেও সত্য-জলের ন্যায় সম্মুখস্থ হইয়া প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। উহা বস্তুতঃ সত্য জলও নহে, পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য কোন বস্তুও নহে। এইজন্য অদ্বৈত-বেদান্তী এই মরীচি-জল সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, সদসদ্ ভিন্নও নহে, ইহা অনির্ব্বাচ্য এবং অনৃত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে অধ্যস্ত বা আরোপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই অনাদি মিথ্যা অজ্ঞান-সংস্কার-প্রবাহেরই পরিণতি এবং এই জড় বিশ্বপ্রপঞ্চ হইতে অত্যন্তবিলক্ষণ স্বপ্রকাশ পরমার্থসৎ অদ্বয়ব্রহ্মেই আরোপিত বটে। সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চও যে স্বরূপতঃ অনৃত, অনির্ব্বাচ্য এবং অধ্যস্ত, তাহা সুধীমাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। প্রমা বা যথার্থ-জ্ঞানের অরুণালোকে অনাদি, অনির্ব্বাচ্য মিথ্যা অজ্ঞানান্ধকারের চিরতরে সমূলে সমুচ্ছেদ এবং নিত্য, চিন্ময়-আনন্দঘন পরমাত্ম-দর্শনই মননাত্মক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার লক্ষ্য।

সমাপ্ত

ওঁ শান্তিঃ

নির্ঘণ্ট বা সূচীপত্র

গ্রন্থ-সূচী

গ্রন্থকার-সূচী

শব্দ-সূচী